রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

469959

Dhaka University Library
469959

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক আহমদ কবির (অবসরপ্রাপ্ত)
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

পিএইচ.ডি. গবেষক
মোঃ জমির হোসেন
রেজিঃ নং- ৭৭/২০০৮-২০০৯
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

মোঃ জমির হোসেন আমার তত্ত্বাবধানে "রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি" বিষয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণা সন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন । তার অভিসন্দর্ভ অন্য কোথাও উপস্থাপিত হয়নি কিংবা এর অংশবিশেষ প্রকাশিত হয় নি

আহমদ কবির, ২৯ [illegible] ২০১
অধ্যাপক আহমদ কবির
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
এবং গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ।

সূচিপত্র ঃ

ক্রঃ নং	অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১॥	প্রথম	ভূমিকা	৭-১১
২॥	দ্বিতীয়	প্রসঙ্গ কথা	১২-৭২
৩॥	তৃতীয়	বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট	৭৩-৯৯
৪॥	চতুর্থ	রবীন্দ্রনাটকের পরিচয়	১০০-১১২
৫॥	পঞ্চম	রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি	১১৩-১৬৫
৬॥	ষষ্ঠ	রবীন্দ্রনাটকে সংস্কৃতি	১৬৬-২২০
৭॥	সপ্তম	সামগ্রিক মূল্যায়ন	২২১-২২৫
৮॥	অষ্টম	বর্ণানুক্রমিক সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	২২৬-২২৭

সংকেত সূচি

র-র = রবীন্দ্র রচনাবলী
কলি = কলিকাতা
পৃ : = পৃষ্ঠা
বি-ভা = বিশ্বভারতী
সং = সংস্করণ
প্র-প্র = প্রথম প্রকাশ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ 'রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক বৈশিষ্ট্যাবলি লক্ষণীয়। কারণ, শিল্পসাহিত্যের শাখায়িত ধারায় নাটক একটা শক্তিশালী মাধ্যম। এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য, গণসংহতি, সমৃদ্ধি আজ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতার সম্মোহ শিল্পভাবনাই নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত– যা অন্য কোনো সাহিত্য শাখায় এতটা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এর বহুবর্ণিল আয়োজন উপস্থাপনাও দর্শকসাধারণের মন নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করে রাখে। মঞ্চ, অভিনয়, আলোকসজ্জা, দৃশ্যোপকরণ, অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, সংলাপ, সংগীত– ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মানুষের ইন্দ্রিয়-অনুভব প্রতিমুহূর্তে আলোড়িত করে থাকে। এ অবস্থায় নাট্যশিল্পই পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অধিকতর জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে পরিচিতি পায়। রবীন্দ্রনাটকের বেলায় এই সত্যস্বরূপ আরো বেশি সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সেখানে আরো কিছু নবতর মাত্রা প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। এখানে তা রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য প্রতিভা-প্রতীতিতে আরো ভাস্বর হয়ে ওঠে। এতে বাংলা নাটক যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিশেষত, রবীন্দ্রপ্রতিভার অবিরাম বিবর্তন-বিকাশ এই নাট্যশিল্পকে বহুবিচিত্র পথে সাফল্য এনে দেয়। এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁর ত্রিবিধ শক্তিশালী ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছি। রবীন্দ্রনাথ একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযোজকরূপে আবির্ভূত। এ সূত্রে তিনি তাঁর নাটকে অবিরাম রূপ রূপান্তরের কাজে ব্যাপৃত হন। এবং এরই বহুভঙ্গিম ধারা প্রকৃতি তাঁর জীবনভর সাহিত্য সাধনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম জীবনের গীতিনাট্য থেকে শুরু করে শেষ জীবনের নৃত্যনাট্য পর্যন্ত এই রূপ-রূপান্তর অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে রূপক, সংকেত, তত্ত্ব, সমাজ, রাজনীতি, ঋতু, কাব্য, হাস্যরস, ব্যাঙ্গাত্মক ইত্যাদি বিষয়-বিস্তৃতির মাধ্যমে নাট্যরচনা অব্যাহত রাখেন। এছাড়া অন্য ভাষায় নিজের নাটকের অনুবাদ-প্রক্রিয়াও সমানতালে চলতে থাকে। পাশাপাশি এসব নাটকের অভিনয়ক্রিয়া দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সপ্রাণ অংশগ্রহণ বজায় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে সর্বমিলিয়ে সাতচল্লিশটি নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে একই নাটকের একাধিক রূপ-রূপান্তর লক্ষণীয়। আবার কিছু কিছু নাটকের অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেন নি। আবার কোথাও বা তিনি একাধিক নাটককে একীভূত একক রূপে রূপাদন করেন। আবার কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পের নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। এ অবস্থায় গবেষণাক্ষেত্রে জটিলতা এড়ানোর জন্যেই কিছুটা সংস্কার-রীতি অনুসৃত হয়। এক্ষেত্রে রূপান্তরিত নাটকের পরিবর্তে মূল নাটককেই গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। কারণ, গবেষণা-আলোকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি আলোচনায় রূপান্তরিত নাটকে খুব একটা পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' ও রানী' নাটকটি ১৮৮৯ খ্রি. প্রকাশিত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর পর এটি রূপান্তরিত আকারে 'তপতী' নামে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে তিনি 'অচলায়তন'-কে 'গুরু', 'রাজা'-কে 'অরূপরতন', 'শারদোৎসব'-কে 'ঋণশোধ' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটককে ভেঙে 'পরিত্রাণ' নামে রূপান্তরিত করেন। এসব রূপান্তরিত নাট্যরূপের পরিবর্তে এখানে মূল নাটকগুলো গবেষণার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খ্রি. প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনা করেন।

পরের বছরই আরো একটি গীতিনাট্য রচনা করতে দেখা যায়। এটির নাম হচ্ছে 'কালমৃগয়া'। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কালমৃগায়া'র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানতে পারেন নি। পরবর্তীতে এই নাটকটি মায়ার খেলা'র সাথে একীভূত হয়ে গেছে।

"বাল্মীকিপ্রতিভার গান সম্বন্ধে এই নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমৃগয়া, ... পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।"[১]

কাব্যনাট্য পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু নাটক নিতান্তই ক্ষুদ্রকায় ও নাট্যধর্মবিরহিত। এগুলোর মধ্যে সবিশেষ কিছু নাটক গবেষণাকর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'নলিনী' পরবর্তীকালে স্বয়ং কবিকর্তৃক উপেক্ষিত ও বর্তমান পাঠকসমাজের কাছে প্রায় অপরিজ্ঞাত।"[২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস অবলম্বনে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লেখেন ১৯০৯ খ্রি.। পরবর্তীতে এটি 'পরিত্রাণ' নামে রূপান্তর লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের কাহিনী অংশ অনেকটা অদল-বদল করে 'মুক্তধারা' নাটক রচনা করেন। এই নাটকটিও রচনা করার সময় রবীন্দ্রনাথ তা 'পথ' নামে অভিহিত করেন। পরে নাটকটি 'মুক্তধারা' নামেই কবিকর্তৃক প্রকাশ, প্রচার ও প্রসার লাভে সমর্থন পায়। আলোচ্য গবেষণাগ্রন্থে 'মুক্তধারা' নাট্যরূপটি নিয়েই বিশ্লেষণের সূত্রপাত ঘটে'। 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) নাট্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'রথের রশি' (১৯২৩) ও 'কবির দীক্ষা' (১৯২৮)-এর পূর্ববনাম ছিল 'রথযাত্রা' ও 'শিবের ভিক্ষা'। আমরা পরবর্তী রূপাদর্শকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

এভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দেখা যায়– রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটক রূপ-রূপান্তরের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে। এর মধ্যে একই নাটকের স্থানগত, কালগত, কাহিনীগত, চরিত্রগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। ফলে রবীন্দ্রনাট্য গবেষণায় একটা জটিলতর অবস্থা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এর একটা সর্বসম্মত সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মতৈক্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর একই নাটকের বহুবিধ রূপ-রূপান্তর সৃষ্টি করে যান। যা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিরসন করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়-গুরুত্ব ভেবেই নাটকগুলো বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। এতে শিরোনাম অংশের গবেষণা-সাপেক্ষে এই রূপান্তরিত নাটকসমূহ কাতারবন্দি হওয়ার সুযোগ পাবে। আলোচ্য গবেষণা-অভিসন্দর্ভ 'রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি'-র ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতিআদর্শ অনুসরণ করা হয়। সে হিসেবে রবীন্দ্ররচিত একটা নাট্যতালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। যা আলোচ্য গবেষণাগ্রন্থের রাজনীতি ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপট-সূত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে। আলোচনার বাইরে-থাকা নাটকগুলো অপ্রাসঙ্গিক ভেবে গ্রহণ করা হয় নি।

ক্রমিক নং	নাটকের নাম	প্রথম প্রকাশ/রচনা
১.	বাল্মীকিপ্রতিভা	১৮৮১
২.	প্রকৃতির প্রতিশোধ	১৮৮১
৩.	খ্যাতির বিড়ম্বনা	১৮৮৩
৪.	মায়ার খেলা	১৮৮৬
৫.	রাজা ও রানী	১৮৮৮

ক্রমিক নং	নাটকের নাম	প্রথম প্রকাশ/রচনা
৬.	বিসর্জন	১৮৮৯
৭.	চিত্রাঙ্গদা	১৮৯০
৮.	গোড়ায় গলদ	১৮৯২
৯.	বিদায় অভিশাপ	১৮৯২
১০.	মালিনী	১৮৯৪
১১.	বৈকুণ্ঠের খাতা	১৮৯৬
১২.	লক্ষ্মীর পরীক্ষা	১৮৯৭
১৩.	কাহিনী (সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন, হাস্য কৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক	১৯০৭
১৪.	শারদোৎসব	১৯০৮
১৫.	রাজা	১৯১০
১৬.	ডাকঘর	১৯১২
১৭.	অচলায়তন	১৯১২
১৮.	ফাল্গুনী	১৯১৬
১৯.	মুক্তধারা	১৯২২
২০.	গৃহপ্রবেশ	১৯২৫
২১.	চিরকুমার সভা	১৯২৬
২২.	রক্তকরবী	১৯২৬
২৩.	শোধবোধ	১৯২৬
২৪.	নটীর পূজা	১৯২৬
২৫.	কালের যাত্রা	১৯৩২
২৬.	বাঁশরি	১৯৩৩
২৭.	চণ্ডালিকা	১৯৩৩
২৮.	তাসের দেশ	১৯৩৩
২৯.	শ্যামা নৃত্যনাট্য	১৯৩৯
৩০.	মুক্তির উপায়	১৯৪০

আলোচ্য গবেষণা শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি' অভিসন্দর্ভটি নির্বাচন করেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক আহমদ কবির। তাঁর অবিরাম আন্তরিক অনুপ্রাণনা ও স্নেহশীল সহায়তায় গবেষণাকর্মটি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়। এছাড়া মাতৃস্থানীয় সহৃদয়-সহযোগ ও উৎসাহ প্রদানে ঢাকা সিটি কলেজের বাংলা বিভাগের স্বনামদৃপ্ত অধ্যাপক, বড় আপা নীলুফার বেগম সবসময় আমাকে প্রাণিত করেছেন। এ অবদান কখনো বিস্মৃত হবার মতো নয়। যা আমাকে প্রতিনিয়ত গবেষণা কাজে উৎসাহিত করে তোলে। শত-সহস্র ব্যস্ততা– চাকুরি, লেখালেখি, চিকিৎসাকর্ম, গিন্নিপনা ইত্যাদির মাঝেও স্ত্রী শাহানা আফরোজ প্রতিনিয়ত তথ্য ও তত্ত্বপ্রদানে সহায়তা করেন। তাছাড়া আলোচ্য গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে নানাজনের কাছ থেকেই সহযোগিতা পেয়েছি। যাঁদের নামের তালিকা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। স্বল্প পরিসরের ভূমিকায় নামোল্লেখ না করলেও তাঁদের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সুহৃদ-শুভানুধ্যায়ীসহ সবাইকে নিরন্তর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

তাং:

বিনয়াবনত

মোঃ জমির হোসেন

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, র্কলি- ১৪০২, পৃ: ৪৮৩
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রী অজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ- ১৯৯৯, কলি, পৃ: ২৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রসঙ্গ কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) অসাধারণ প্রজ্ঞা-প্রতিভার অধিকারী। এক অতলস্পর্শ সৃজনক্ষমতা তাঁর চরিত্রকে সুষম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছাড়িয়ে বৈশ্বিক বলয়ে রবীন্দ্রনাথ আজ প্রায় তর্কাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এর পেছনে তাঁর অজস্র সৃষ্টিসাফল্য চোখে পড়ে। সমকালীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পরিবার পরিপার্শ্ব তাঁকে নিবিড়ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ, লুটপাট, আইন-সংস্কার, জেল-জুলুম- ইত্যাকার অবস্থায় রবীন্দ্রমনন বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ফলে সমকালীন ভারতীয় জীবনে প্রচণ্ড অমানিশা- অন্ধকার নেমে আসে। একদিকে মুক্তিকামী মানুষের ক্রমাগত বেঁচে থাকার সংগ্রাম- অন্যদিকে সাম্রাজ্যিক শাসনব্যবস্থার নির্লজ্জ আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে চলে। এতে শত-সহস্র বছরের ভারতীয় জীবন-সংস্কৃতিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঐতিহ্যিক জীবনের আচার-আচরণ, শিল্প-সাহিত্য, ঘর-সংসার, চাওয়া-পাওয়া, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম- ইত্যাদির মধ্যে একটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে সংঘাত সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রগতি ও প্রাচীন সংহতির মধ্যে একটা বোঝাপড়া অবিরাম চলতে থাকে। যা বাঙালি জীবনকে অন্তর্গত ও বহির্গত আন্দোলনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। উনবিংশ-বিংশ শতকের এই বাস্তবতা এদেশীয় মানুষের জীবনব্যবস্থায় একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করে

এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রপ্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। একদিকে অবিরাম প্রগতিধারা- অন্যদিকে প্রাচীন সংহতি নিয়ে তার যাত্রাপথ শুরু। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে লালন করেছেন। পাশাপাশি যে-কোনো পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানাতেও কার্পণ্য করেন নি। তবে অবশ্যই তা দেশীয় সংস্কৃতির উপযোগিতায় গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশীয় মৃত্তিকালগ্ন সমাজসত্যকে স্বীকরণ করেই এই স্ফূর্তিবিকাশ গৃহীত হয়েছিল। এ ব্যাপারে তথাকথিত কোনো ধর্মীয় মতামত বা পথকেও অনুসরণ করা হয় নি। মানবতার আলোকে প্রগতির নিরিখে ও যৌক্তিক বিবেচনায় ধর্মভাবনার ভিত্তিরচনায় তিনি বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে ধ্বজাধারী কপটচারীর ধর্মবিকার মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই এহেন ভয়ংকর ধর্মাচারকে ধিক্কার জানিয়েছেন।

উনবিংশ-বিংশ শতকের ভারতীয় জীবনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। যা বালক রবীন্দ্রনাথকেও নিবিড়ভাবে আলোড়িত করে। বলতে গেলে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। বালক বয়সেই তিনি ব্রিটিশ রাজনীতির নানাদিক নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। এ পর্যায়ে গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি রচনায় একটা উচ্ছ্বাসমুখর সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। স্বদেশি চেতনায় দিনরাত সভা-সমিতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, মিটিং-মিছিল ও আন্দোলন সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারপর থেকে জীবনের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় কখনো তিনি এ পথ থেকে সরে আসেন নি। রাজনীতির প্রায় প্রতিটি প্রাঙ্গণেই তাঁর সদর্প বিচরণ অব্যাহত ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনায় একটা ভিন্নতর মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনায় বরাবরই একটা নান্দনিক ভাবভাবনা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

কোনোরকম হত্যা, খুন, গুম, প্রতিহিংসা বা সশস্ত্র পথে পরিচালিত হয় নি। নিতান্তই মানবতার আলোকে সর্বকিছুর পরিণতি দান করা হয়। রবীন্দ্রনাথের এই মননচৈতন্য দেশীয় রাজনীতি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভূমিকা রেখেছিল। এতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজনীতি নিয়েও তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত হতে দেখা যায়। যা আন্তর্জাতিক মহলেও বেশ প্রশংসা লাভ করে।

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রভাবনায় সংস্কৃতিও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে বাধ্য। কারণ, সংস্কৃতির মধ্যে মানবসমাজের অনাদি অনন্ত ভাবভাবনা নিহিত থাকে। এ অবস্থায় রবীন্দ্রদর্শনের বিশ্বপ্রতিম প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি ভাবনায় একটা বহুমাত্রিকে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, শাস্ত্র-সূত্র, সমাজ-সংসার, দাম্পত্য-দৈন্য, জীবন-যাপন– ইত্যাকার বিষয়বস্তু তার সংস্কৃতিচিন্তার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে আত্ম-আধ্যাত্মিক সুবাদে একটা বিশ্বজনীন মাত্রা-মহিমাও যুক্ত হতে দেখা যায়। বিশেষত, সার্বজনীন মননচিন্তায় রবীন্দ্রপ্রতিভার একটা ভিন্নতর চারিত্র্য মহাত্ম্য ফুটে ওঠে। দেশীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রচিন্তায় কোনোকিছুই বাদ যায় নি। অন্যদিকে পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের মূলীভূত উপাদানও তাঁর সৃষ্টিশীল ভাবনায় নিবিড়ভাবে স্থান করে নিয়েছে। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিচিন্তা বিশেষ কোনো ছকসীমানায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তা উন্মুক্ত-উদার, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ দ্বারা লালিত। মূলত, এক বিশ্বপ্রতিম মানবতাবোধের কল্যাণপ্রদ ভাবভাবনার আলোকে নিবেদিত। কোনোরকম নির্দিষ্ট ধর্ম-কর্ম বা ভেদবুদ্ধি দ্বারা তা কখনো ভারাক্রান্ত হয় নি। সংস্কৃতি-ভাবনায় রবীন্দ্রসৃষ্টিতে পরিপার্শ্ব পৃথিবীর প্রায় সবকিছুই জায়গা করে নিয়েছে। প্রাত্যহিক সমাজ-সংসার, নিসর্গ-প্রকৃতি, ধর্মশাস্ত্র, রাজনীতি-অর্থনীতি– কোনোকিছুই বাদ যায় নি। তবে কবি– সার্বভৌম রবীন্দ্রপ্রতিভায় তা একটা ভিন্নরকম আবহ তৈরি করেছে। যেমন, এ সুবাদেই প্রকৃতিবন্দনা, গীতিমাধুর্য, ছন্দস্পন্দ ও পদলালিত্য তাঁর সৃষ্টিপরিক্রমায় বিশেষভাবে অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। একটা সবিশেষ জীবনদর্শন এই চিন্তাচেতনাকে বিশেষত্ব দান করেছে। বলতে গেলে, প্রায় সব সৃষ্টি-সুবাদে রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত কাব্যিকতা মূর্তরূপ লাভ করে থাকে। এ তাঁর অন্তর্গত মননচৈতন্যের ফসল। যা তিনি বহুবার অকপট স্বীকারোক্তির মাধ্যমে উচ্চারণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে কবি-অভিধায় পরিচয় দিতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন। একপ্রকার আত্মতৃপ্তিও তাঁকে উচ্ছ্বাসমুখর করে তুলত। সত্যিকার অর্থে, রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ প্রবণতার জন্যই তাঁর রাজনীতি ও সংস্কৃতি ভাবনা একটা ভিন্নতর মর্যাদা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অখণ্ড-অন্বয় আত্মানুভূতিতে ভাস্বর। কবি-অভিধায় মানুষের নিত্য সহচর এবং নিসর্গ প্রকৃতির অনিবার্য অংশবিশেষ। এ অর্থেই রবীন্দ্রপ্রতিভা সর্বত্রসঞ্চারী এবং তিনি বিশ্বপ্রকৃতির অনুপম রূপকার হিসেবে কীর্তিত।

'আত্মপরিচয়' প্রদান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র .... শুভনিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য: তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা

নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি– যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা-- এই আমার কাজ ।...

বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে নিখিলের চিত্ত, তারই তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজও তার বিরাম নেই । সত্তর বৎসর পূর্ণ হল, আজও এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটে কিন্তু বিশ্বকর্মার ফর্মাশের যে অন্ত নেই । তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চিরচঞ্চল গাম্ভীর্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোওয়াতে পারি নে । এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর ।"১

জীবনের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের এই আত্মকৃত মূল্যায়ন বড় বেশি তাৎপর্যময় । অনেকটা সোজাসুজি কথায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত রূপরহস্য ফুটে ওঠে । এ অর্থে তিনি বিশ্ব প্রকৃতির অনিবার্য প্রতিনিধি । পৃথিবীর রঙ-রূপ, সুর-ছন্দ, রূপ-অরূপ, সুপ্ত-প্রকাশ্য, লীলায়িত ভাবতরঙ্গ ফুটিয়ে তোলাই তাঁর কাজ । মানুষের নান্দনিক বোধবুদ্ধি নিয়েই রবীন্দ্রনাথের কারবার । সত্য যেখানে চিরায়ত প্রতিমূর্তিতে আবির্ভূত । আর ধর্ম যেখানে মনন ও মনুষ্যত্ববোধের আলোকে পরিস্নাত । বিশেষত চিরায়ত মানবাত্মার সত্য, নিত্য, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বতঃপ্রবৃত্ত, সহজাত ও মানবিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় । মানুষের সর্বোচ্চ স্বস্থ-স্বাভাবিক বিকাশ বিবর্তনই এর লক্ষ হিসেবে গৃহীত । কোনোপ্রকার ধর্ম-কর্ম, শাস্ত্র-সংবিধান, সম্প্রদায়-সমবায়, জাত-পাত, মতবাদ-বিসম্বাদ এখানে স্বীকৃত নয় । এ অর্থে রবীন্দ্রনাথকে কোনো ধর্ম সম্প্রদায় বা শ্রেণিচরিত্রে দাঁড় করানো সম্ভব নয় । সর্বমানবিক সমন্বয়বোধের অগ্রদূতরূপেই রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে । এ সূত্রেই তিনি তাবৎ বিশ্বের যাবতীয় কল্যাণপ্রসূ চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক । অন্যদিকে মানবাত্মার পক্ষে অন্যায়-অসংগত অনাচারের প্রশ্নে প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদী । রবীন্দ্রনাথের জীবনভর অজস্র সৃষ্টি সম্ভারের ভাঁজে ভাঁজে অনুরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে ।

রাজনৈতিক আলোকে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে গেলেও উপর্যুক্ত মূল্যমান মনে রাখতে হবে । অন্য কোনো দিক থেকে দেখতে গেলেই নানারকম বিভ্রান্তি এসে জড়ো হয় এবং অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকেও অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করতে দেখা যায় । এর ফলেই সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতিবিদ, রাজনীতিসচেতন অথবা রাজনীতি থেকে পলায়নপর ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন । অনেকে আবার একধাপ এগিয়ে রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি । আবার কেউ কেউ রাজনীতির সাথে রবীন্দ্রনাথের খুব অল্পই সাদৃশ্য খুঁজে পান । মূলতঃ সবগুলো যুক্তির পেছনেই অল্পবিস্তর সত্যতা লুকিয়ে রয়েছে । অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় মনন-মনস্বিতার রূপায়ণে কখনো কখনো রাজনীতির দ্বারস্থ হন । আবার শৈল্পিক সাফল্য সিদ্ধ হওয়ার পর কেটে পড়েন । এ অর্থে শুধু রাজনীতি কেন? সমকালীন সমাজবাস্তবতার যে কোন বিষয়কেই তিনি তাঁর শিল্পসাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন । ধর্ম, অর্থ, সংস্কৃতি, সভা, সমিতি, সেমিনার, বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রচার ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না । এমনকি ইতিহাস, ঐতিহ্য থেকে শুরু করে পুরো বিশ্বের শাস্ত্র-সংবিধান তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তা তিনি স্বকীয় সমন্বয় স্বভাবধর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেন । এই ব্যাপক অর্থেই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে হবে । কোন প্রকার বিশেষ সীমায়তি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় । যেমন, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েও নানারকম পরস্পরবিরোধী বক্তব্য আমরা লক্ষ করেছি । শুধুমাত্র একটা সবিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা অবলোকন করার ফলেই এরকম বিপত্তি এসে জড়ো হয়েছে ।

"রাজনীতি আর 'রবীন্দ্রনাথ' দুটোর গোড়াতেই 'র' এই সামান্য মিলটুকু ছাড়া আর বেশি কিছু মিল দেখা যায় না- অথচ, মিল যে একেবারে নেই তাও নয়। গোড়া থেকেই একটা কথা আমাদের পক্ষে মনে রাখা ভালো যে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন দূরে সরে থাকতেই ভালোবাসতেন এবং বিজ্ঞ রাজনীতিকেরাও চাইতেন না যে তিনি এসে তাঁদের দলে যোগ দিন। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে, একবার লোকমান্য টিলক তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে ইয়োরোপে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। টিলক আরও জানিয়েছিলেন যে, তিনি রাজনীতি ও তার সংসৃষ্ট আন্দোলন থেকে যেমন দূরে আছেন তাঁর পক্ষে তাই থাকা বাঞ্ছনীয়- টাকাটা তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য টাকাটা গ্রহণ করেননি, ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪-২৫)। টিলক ও অন্যান্য রাজনীতিকেরা জানতেন যে পৃথিবীর মনীষিমণ্ডলে তিনি যে স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা, তাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে তিনি যা বলবেন রাজনীতিকদের কথার চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। তথাপি রাজনীতি থেকে তিনি যে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন তাও নয়, সে যুগের যে রাজনীতি ছিল তাতে তাঁর মত সংবেদনশীল মনীষীর পক্ষে তা সম্ভবও নয়।"[2]

এ অবস্থায় রবীন্দ্রজীবনে সমকাল-সংস্থিত সমাজবাস্তবতার আলোকেই তাঁকে বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ, সমাজের অনুপুঙ্খ প্রতিটি প্রান্তকে ছুঁয়েই রবীন্দ্রপ্রতিভার সাফল্য ও সিদ্ধি। এ সুবাদেই সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনিবার্য হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রজীবনের সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী ভারতীয় সমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ঝড় বয়ে যায়। রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা- প্রায় সবক্ষেত্রেই রীতিমত একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনধারা সূচিত হতে থাকে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকেই এর সমূহ প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ করা যায়। এছাড়া পারিবারিকভাবেও রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তৎকালীন সমাজে ঠাকুরবাড়ি প্রায় সবদিক দিয়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দণ্ডায়মান ছিল। জাতীয় রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষানীতি- প্রায় সব ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির লোকজন নীতিনির্ধারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ঐতিহ্য পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাধ্যমেই সবিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। এর পূর্বের ইতিহাস অন্য দশটা সাধারণ গৃহী পরিবারের মতোই গতানুগতিকায় আবর্তিত। দ্বারকানাথ ইংরেজ-ভক্ত ভূমিকায় প্রিন্স খেতাব অর্জন করতে সক্ষম হন এবং সাথে সাথে প্রভূত ভূমিসম্পদের মালিক হয়ে পড়েন। অতঃপর অজপাড়াগাঁ খুলনার দক্ষিণডিহি ছেড়ে কলকাতার অভিজাত এলাকায় বসবাস শুরু করেন। এখান থেকেই ঠাকুর পরিবার ক্রমান্বয়ে একটা আভিজাত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকেন। একটি রাষ্ট্রের প্রায় সব ক্ষেত্রেরই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরই এখানে আগমন ঘটে। বিশেষত, জাতীয় সংস্কৃতির লালন-পালন, সংরক্ষণ-পরিমার্জন, বিকাশ-বিবর্তন, প্রতিষ্ঠা- প্রণোদনাসহ যাবতীয় ব্যাপারে ঠাকুর বাড়ি অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো ভূমিকা-বিস্তার এই পরিবারের নেই। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়াই মূল কথা। এছাড়া ধর্ম চর্চাকেন্দ্রিক নৈতিক আদর্শ-অনুশীলন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় একটা গভীর অনুরাগ লক্ষ করা যায়। তবে এসব অধ্যায়- অনুশীলন তথাকথিত গতানুগতিকার ছকে-বাঁধা ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ধারায় বয়ে চলে ইতিহাস ঐতিহ্যের পথ ধরে। যা সমকালীন সমাজবাস্তবতা আত্মীকরণ করে থাকে। এই আত্মস্থ-সমন্বয় বেয়েই ভবিষ্যৎ সমাজবাস্তবতা নির্মিত হয়। এ অর্থে ঠাকুর পরিবার সুস্থিতি ও প্রগতির মেলবন্ধন রচনার যাবতীয় আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। এর ফলেই তৎকালীন জাতীয় সংস্কৃতি চর্চায় এই পরিবারের সন্তানগণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অভিষিক্ত হন। এ সুবাদেই

ঠাকুরবাড়ি বিভিন্নভাবে তৎকালীন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি তথা সমুন্নত ব্যক্তি তৈরির স্বার্থেই তাঁরা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। এ অবস্থা রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই অব্যাহত ছিল। বিশেষত, রামমোহন রায় প্রবর্তিত আদর্শ-অন্বেষাই এই পরিবারকে সর্মধিক হারে পরিচালিত করেছে রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বারকানাথ, পিতা দেবেন্দ্রনাথ হয়ে নিজেও অনুরূপ স্রোতে অবগাহন করার সুযোগ পান বরং রবীন্দ্রনাথ অনেক অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত আকারে এই পারিবারিক ঐতিহ্যের মূর্তরূপ ফুটিয়ে তোলেন

"প্রভাতকুমার মহর্ষির সম্বন্ধে লিখেছেন যে, 'মহর্ষির প্রকৃতিতে প্রগতিস্পৃহার সহিত স্থিতিশীলতা আশ্চর্যরূপে সংমিশ্রিত ছিল। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানেন, তাঁরা জানেন যে, রবীন্দ্রনাথের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়নি স্থিতিশীলতা থেকে মহর্ষি নড়েননি– অথচ দেশের প্রগতিমূলক কাজের সঙ্গে যে তাঁর যোগ ছিল না তা নয়। এ যোগ দ্বারকানাথেরও ছিল। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত জমিমালিক সমিতি (Land holders Association)-এর প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি একজন মহান উদ্যোক্তা, এই সমিতির পক্ষ থেকে তিনিই টমসন সাহেবকে বিলাতে তাদের উকিল হয়ে কাজ করবার জন্য নিয়োগ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Press Ordinance Act-এর বিরুদ্ধে রামমোহন ও দ্বারকানাথ দুজনেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এর চার বছর পরে রামমোহন Jury Act-এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত British Indian Associaiton-এর দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সহকারী সম্পাদক, Indian Mirror পত্রিকার তিনি ছিলেন একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পরবর্তীকালে IIBert Bill প্রভৃতিরও প্রতিবাদ প্রতিবাদকারিগণের তিনি ছিলেন অন্যতম। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ দেশের ও জাতির স্বার্থে সাড়া না দিয়ে পারেননি। অথচ প্রবল রাজনীতির স্রোতে ঝাঁপিয়েও পড়েননি– রবীন্দ্রনাথও আমরণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গিয়েছেন।"[১]

অনুভবকাতর রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রেই পরিপার্শ্ব দ্বারা তাড়িত হন। স্বকাল সমাজের প্রতিটি প্রান্তই তাঁকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করে। এর অন্যতম কারণ– ঠাকুরবাড়ি প্রথাবদ্ধ সমাজকাঠামো থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থান নেয়। যা প্রতিনিয়ত প্রগতিশীল ভাবভাবনায় সৃজনমুখর। সবরকমের অন্ধ জড়মূর্ত সংস্কার বিশ্বাস পরিহার করা হয় রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন,

'আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজে যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারি দিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়েছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে- সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচারবিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধসংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোন চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। এ কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ

রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয় নি।"

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল পর্বে পরাধীন ভারতবর্ষ পুরো এক শতাব্দী পার করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের শাসনস্বরূপ ভারতীয় জনগণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের রাজ্যশাসন কখনো প্রজাহিত বা রাষ্ট্রস্বার্থে পরিচালিত হয় নি। মূলত শোষণ-আহরণ ও ইংল্যান্ডে যাবতীয় সম্পদ পাচার করাই ছিল উদ্দেশ্য। ফলে ক্রমান্বয়ে ভারতীয়দের দুর্ভোগ দুর্দশা চরমে পৌঁছে। এসময় অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-দৈন্য, আইন সংস্কার, জেল-জুলুম, হত্যা-নির্যাতন– ভারতীয়দের জীবনকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলে। এ অবস্থায় ভারতীয় জনগণও বসে নেই। স্বাধিকারপ্রমত্ত চেতনায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, সভা-সমিতি, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, বক্তব্য-বিবৃতি, সমবায়-সংগঠন- ইত্যাকার আয়োজনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সৃজন-সৃষ্টি এই রাজনৈতিক চেতনাকে ধারণ করে স্ফূর্তিলাভ করে। এটি একটি কবিতা যা 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে ১৮৭৫ খ্রি. দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি হিন্দুমেলায় পাঠ করেন। এই হিন্দুমেলা তৎকালীন স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধের প্রতীক-প্রতিভূরূপে গঠিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ইংরেজ পাদ্রীদের অনিয়ন্ত্রিত ধর্মপ্রচার বাঙালির চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। অনেকেই অন্ধ অনুকরণের চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। এ অবস্থায় বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি একটা হুমকির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এহেন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশীয় কিছু পুরোধা-পুরুষ এগিয়ে আসেন। তাঁরা জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য জীবনপন সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সভা, সমিতি, সেমিনার, সমাবেশ, আন্দোলন,বিক্ষোভ ও অন্যান্য ক্রিয়াদি-কৌশল সমানতালে চলতে থাকে। ইংরেজদের কোম্পানী শাসন (১৭৫৭) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে এবং একের পর এক বিক্ষোভ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মকালীন পর্যায়ের কিছু বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন– সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭), কৃষকবিদ্রোহ (১৮৭৩), প্রজাবিদ্রোহ (১৮৩৯-৪২), ফরাজী আন্দোলন, তিতুমীরের বিদ্রোহ, পাগলা পন্থীদের বিদ্রোহ– ইত্যাদি নামে এসব ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন বেশ জাঁকিয়ে বসে। এসব বিপ্লব বিক্ষোভের তরঙ্গাভিঘাতে ঠাকুরপরিবারও নড়েচড়ে ওঠে। তাঁরা কখনো সশস্ত্র সংগ্রাম বা দাঙ্গা-ফ্যাসাদে বিশ্বাসী নন। তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ পন্থা সংযম-সংহত, পরিশীলিত-পরিস্রুত, মার্জিত-সংস্কৃত, নান্দনিক-মানবিক, শৈল্পিক-আদর্শিক– সর্বোপরি মনুষ্যত্ববোধের আলোয় উচ্চারিত। রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন অনুরূপ পথের অনুসারী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁদের 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা ও এর ভূমিকা-সম্পর্কিত আলোচনা উল্লিখিত হতে পারে। স্বদেশের ঐতিহ্যিক জাতীয়তাবোধের উন্মোচনে এই মেলার অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। মূলত ঠাকুরপরিবারের সপ্রাণ পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

"রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে বাসকালে ১৮৬১ সালে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতায় আসিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রভৃতিদের সহিত মিলিত হইয়া 'স্বাদেশিকের সভা' গঠন করেন। ১৮৬৬ সালে তল্লিখিত prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বলিয়াছেন এই পুস্তিকার দ্বারা উদবুদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। সেই পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করেন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রধানত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির

দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক সাহায্যে এবং রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের আন্তরিক উৎসাহে হিন্দুমেলা জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইহার প্রথম অধিবেশন ১২৭৩ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ, সহকারী সম্পাদক নবগোপাল। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, কুস্তি ও ব্যায়ামাদির পুনর্বিকাশে উৎসাহদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দ্বিতীয় বর্ষের সভায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন 'ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষের সাহায্য যাচঞা করি, ইহা সাধারণের লজ্জার বিষয়। অতএব যাহাতে আত্মনির্ভরতা ও আত্মসম্মান জাগরণ জাতীয়-চরিত্রে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।"[1] এই হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ করে তৎকালীন সমাজে স্বদেশীমন্ত্রের ঢেউ বয়ে যায়। এর সাথে অনেকেই একে একে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করতে থাকেন। এ পর্যায়ে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গা মোহন দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা বহুবিধ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি নারী শিক্ষার ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া শ্রমজীবি মানুষের উজ্জীবন প্রশ্নেও তাঁদের নিরতনিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ ব্যাপারে কবিতা রচনার মাধ্যমে শিবনাথ শাস্ত্রী স্বকীয় মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন,

"উঠো জাগো শ্রমজীবি ভাই
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী-নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠো জাগো ডাকিতেছি তাই।
ওই দেখ চলছে সকলে
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায়ে পায়ে ধনীরাও চলে
ছোট বড় ধায় কুতুহলে।[2]

কবিতার আবেগঘন আহ্বানের মাধ্যমে স্বদেশি চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এতে নানারকম উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হতে থাকে। ছন্দস্পন্দের নানামাত্রিক ধ্বনিমাধুর্য পাঠকসাধারণের মনকে উজ্জীবিত করে তোলে। এসব কবিতা সেসময় অনেকেরই মুখে মুখে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যা রীতিমত স্বদেশিমন্ত্রের মতো ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। অনেক সময় দেখা যায়, এসব প্রচার প্রসারের ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যাতে জনগণমন খুব সহজেই এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে পারে।

হিন্দু মেলা'র অনুষ্ঠানটি বাংলা চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিনে সম্পন্ন হতো। এখানে বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রবন্ধ পাঠ, স্বদেশীয় বস্তুর প্রদর্শনী, ঐতিহ্য-ইতিহাস পর্যালোচনা তথা দেশাত্মবোধ-সম্পর্কিত যাবতীয় আয়োজন থাকত। সর্বোপরি জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি-সম্বলিত ভাবানুভব জাগ্রত করাই ছিল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন,

"আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক পরিচ্ছদ, ভাব ভাষা আমার দুচক্ষের বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে, স্ত্রী স্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না, কিন্তু আমার বরাবর ভয়

হয় পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গোড়া থেকেই স্বদেশী কালচার ধরিয়া বসিয়া আছি। ঘরের মধ্যে আছি .....কখনও আমি বাড়ির বাহিরে কোন বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না. দেখ, এরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশন হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতী গন্ধ ছিল রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণ বাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বার আনা বিলাতী, চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot আমিও সেইরকম patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল ...... নব গোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল, আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব করিতে পারিত; কুস্তি জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সেসব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল- তাঁতি, কামার, কুমোর ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম- 'ওসব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার? মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি, খাটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাত জোড় করিয়া রাখিয়া আছে। আমি বলিলাম- 'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ, এই তুমি দেশী painting করাইছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি টাঙাইয়াছ? ছবি খানি সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তার ঝোঁক ছিল বড় বড় ইংরেজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলাম।"[৭]

জাতীয় গৌরবসমন্বিত উজ্জীবনমন্ত্রে ঠাকুরবাড়ির অবদান অনেক। জাতীয় সংগীত রচনার মাধ্যমে তাঁরা এই ধারাকে প্রাণিত করে তোলেন। গীতিসুরের ললিত ধারায় বাঙালি প্রাণ চিরদিন আসক্ত। এই চিরায়ত প্রবৃত্তির কথা ভেবেই ঠাকুরবাড়ির সন্তানগণ সংগীতকে অবলম্বন করেন। এ পর্যায়ে তাঁরা জাতীয় সংগীত রচনার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যবোধকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। যেমন- সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেন, 'মিলে সবে ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ, গণেন্দ্রনাথ লেখেন, 'লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে,' দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করেন, 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' আর রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ে বেশ কিছু জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন। ঠাকুরবাড়ির অন্যতম তারকাপুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য জীবনস্বপ্নে এই বড় দাদাকেই অনুসরণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সব প্রান্তকেই তিনি ছুঁতে চেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক পর্যায়ে কতিপয় প্রবীণ-নবীণ সমন্বয়ে এক গুপ্ত 'সঞ্জীবনী সভা' স্থাপন করেন। এই সভায় জাতীয় কল্যাণমূলক প্রয়াস ও দেশীয় বস্তু ব্যবহারের পদ্ধতি প্রয়োগ বিবেচিত হতো। বেদমন্ত্রের অনুশীলন ও পট্টবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় সভায় আগমন ছিল এই সভার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য। এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও তাঁর বহুবিধ কার্যপরিধি জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়।

"সঞ্জীবনী সভা স্থাপন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না; বাঙালির মৃতকল্প প্রাণে জীবনীশক্তি দান করিবার জন্য তিনি যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে; তাঁহার সার্বজনীন পোশাক তাঁহার শিকারবিদ্যা ও শিকারবিদ্যা- শিখানোর উদ্যম, তাঁহার তাঁত ও দেশলাই-এর কল করিবার প্রয়াস ও সর্বশেষে স্বদেশীয় স্টীমার কোম্পানী খুলিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইবার কাহিনী আজ অজ্ঞাত। বাঙালির সকল প্রকার স্বাদেশিকতা ও বিপ্লবাত্মক কর্মের মূলে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির ব্যর্থ জীবনের অবিস্মরণীয় কথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযোগী তথ্য-রূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। ইহার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কাল কাটিয়াছিল "[৮] রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এসব বহুবর্ণিল কর্মের সাথে পরিচিত ছিলেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সশরীর উপস্থিতির মাধ্যমে তাতে অংশ নেন। যেমন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেন,

"আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না; এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।"[৯] হিন্দুমেলা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ করেন। এতে এই মেলার অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন,

'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি এসব স্বদেশানুরাগসম্বলিত ক্রিয়াকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। যার উৎস উপাদান তাঁদের পরিবারের মধ্যেও বিভিন্নভাবে সুরক্ষিত হতো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উপায়ে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকাও বিশেষভাবে আলোচনার দাবিদার। পিতা দেবেন্দ্রনাথ-সূত্রেও তাদের মধ্যে এসব উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক পরিমাণে বিস্তার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির খসড়ায় পিতৃদেব প্রসঙ্গে বলেন–

"আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই, ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ ও ছোটকাকা মহাশয় (নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিলাতের সমাজে বর্ষাযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই। এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে। আমাদের পিতামহ ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছিয়ার বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন; ...... কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়। তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট খেতাব-লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।"[১১] এতে বোঝা যায়, ঠাকুরপরিবার বিদেশীয়ানা রীতিনীতি অত্যন্ত সযত্নে পরিহার করে চলেন। সম্পর্ক রেখেই যেন সম্পর্ক ত্যাগ করা– এই দ্বৈত নীতি অনুসৃত হয়। এর ফলে অবশ্য ঠাকুরবাড়ি ইংরেজ চরিত্রের অন্তর্গত স্বরূপ-প্রকৃতি অনুধাবন করার সুযোগ পায় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে অধিকতর গুরুত্ব কৌশলের সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হন। পাশাপাশি বিজাতীয় আচার-আচরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে উপলব্ধি সৃষ্টি হতে থাকে। এভাবে ঠাকুরবাড়ি এদেশীয় জীবনপদ্ধতি সমধিক পরিমাণে লালন করার সুযোগ পান এবং এর ফলেই তাঁদের যাবতীয় প্রয়াস-পদক্ষেপ স্বদেশপ্রেমের গভীর প্রভায় প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কস্মিনকালেও তাদের হৃদয়গত স্বদেশানুরাগ ম্লান হওয়ার সুযোগ পায় নি। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা অনেকসময় বিদেশিয়ানা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন,

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন।

আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ অজস্র এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও স্বদেশনুরাগের অম্ল-উষ্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। স্বভাবত কারণেই তাঁর স্পর্শবিহবল চরিত্রে এসব প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করে। বিশেষত, রাজনীতির উত্তাল আবহই প্রথমত তাঁর সৃজনশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। পাশাপাশি এর ফলেই মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধের চেতনা দানা বাঁধতে থাকে। আর ঠাকুরবাড়ির বহুমাত্রিক ক্রিয়াকলাপ রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রত্যক্ষ প্রণোদনার উৎস হিসেবে কাজ করে। এই হয়ে ওঠার ভিত্তি-বৈভব তাঁকে সারাজীবন রাজনীতিসচেতন ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। এবং তিনি জাতীয় রাজনীতি ও রাজনীতিকদের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করার সুযোগ পান।

"তাঁর কৈশোরে নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের উদ্যোগে প্রথম জাতীয় চেতনার উদ্বোধন হয় স্বদেশী মেলায় এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথকে দেখি সেখানে কবিতা পাঠ করতে। এর অল্পদিন পরে আত্মপ্রকাশ করে কংগ্রেস এবং তার আদি নায়ক যাঁরা। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, নৌরজী প্রমুখ, তাঁদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। তাঁদের রাজনীতি বৃটিশ রাজমুকুটের অধীনে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন দাবী পর্যন্ত এসেই থেমে থাকে। গোড়ার ধাপে রবীন্দ্রনাথকেও অনেকটা এই মতের অনুবর্তী দেখি। এর পর কংগ্রেসে ওঠেন চরমপন্থী লাজপত রায় তিলক ও বিপিনচন্দ্র। লাল-বাল-পাল নামে খ্যাত এই ত্রয়ী দাবী করেন পূর্ণ স্বাধীনতা। এঁদের সংগেও বান্ধবতা দেখি রবীন্দ্রনাথের।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা'র নবম অধিবেশনে স্বরচিত কবিতা নিয়ে উপস্থিত। কবিতাটি তিনি সেখানে আবৃত্তি করে শোনান। এতে দর্শকসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন। এই অধিবেশন বসে ১৮৭৫খ্রি. ১১ ফেব্রুয়ারি। এ সময় বালক রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। এ বয়সে রচিত কবিতার মধ্যেই তাঁর জাতীয় বোধসম্পন্ন বিপ্লবের বহ্নিশিখা উদগীরণ হতে দেখা যায়। সেখানে সমকাল-সমাজস্থিত রাজনীতির সুস্পষ্ট রূপরেখা ফুটে ওঠে।

ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সুমহান কীর্তিগাথা তুলে ধরা হয়। তাছাড়া দেশীয় কীর্তিমান ব্যক্তিপুরুষদের জীবনচরিত নানাভাবে আলোচিত হতে থাকে। এতে বাঙালিমাত্রেই একটা আত্মগত চেতনা অনুভব করেন। কারণ, সমকালীন সমাজব্যবস্থায় একটা মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বহিরাগত রাজনীতির স্বার্থপ্রবুদ্ধ বিধিবিধান ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এদেশীয় মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে। স্বকীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকে। একটা অজানা অন্ধকার যেন পুরো জাতিগোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে সিদ্ধান্তহীনতায় আত্মগত দ্বন্দ্ব-দৈন্য বাঙালি সমাজব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ নানারূপ সৃষ্টিকর্ম ও সশরীর উপস্থিতির মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরেন। বিশেষত, কবিতার সুললিত বাণীভঙ্গিমাই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন। যেমন, 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় তিনি আক্ষেপভরে বলেন, 'ভারত কঙ্কাল আর কি এখন/পাইবে হায়রে নূতন জীবন'।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রেমের কাব্যবোধ ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হতে থাকে। তারপর একে একে চলে কবিতা ও গান রচনা। যা তাঁর বহুবর্ণিল সৃজনকর্মে নানাভাবে নানা ভঙ্গিতে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যেও অনুরূপ ভাবানুভব লক্ষ করা যায়। যেমন, দস্যুদের মুখে ব্যবহৃত একটি গানে জাতীয়তা ও স্বাধীনতাবোধের চিত্তচাঞ্চল্য বেশ চমৎকারভাবে বর্ণিত। সেখানে বলা হয়–

"এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।

না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি–
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী ।
রাজা প্রজা, উঁচু নিচু, কিছু না গনি ।
ত্রিভুবন-মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়–
মাথার উপরে রয়েছেন কালী সমুখে রয়েছে জয় ।”[১৮]

রবীন্দ্রনাথের এসব যুগধর্ম-প্রভাবিত রচনাসৃষ্টি তৎকালীন সমাজে বেশ আলোড়নের ঝড় তোলে । যেমন, Indian Daily News' পত্রিকায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'The Hindoo Mela'. The Ninth Anniversary of the Hindu mela was opened at 4P.M on Thursday. The 11th instant, at the well-known parseebagan.... on the Circular Road by Rajah Komal Krishna, Bahadoor, the president of the National Society.... Baboo Rabindra Nath Tagore, the youngest son of Baboo debendro Nath Tagore, a handsome lad of some 15, had composed a Bengali Poem on Bharut (India) which he delivered from memory; the suavity of his tone, much pleased his audience." (15 Feb, 1875)."[১৯] এছাড়াও নামে-বেনামে রূপক প্রতীকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন । তাঁর অসম-অসাধারণ বৈপ্লবিক উপস্থাপনায় দেশ-মাতৃকা- মনন-সমন্বিত ব্যক্তিবর্গ আশার আলো দেখতে পান এবং রবীন্দ্রনাথকে একজন দেশ-হিতৈষী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে থাকেন । স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ তাঁকে ঘিরে নানারূপ স্বপ্নকল্পনায় মেতে ওঠেন । 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার কার্তিক ১২৯৬ (১৮৮৯) সংখ্যার ৩৬৫ পৃষ্ঠায় 'স্নেহলতা' গল্পে 'সঞ্জীবনী সভা'র অনুরূপ একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে–

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন ।
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয়গান
সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয় ।

চারু নামে ষোড়শবর্ষীয় বালক এই গুপ্ত সভার সদস্য । সেখানকার সে Poet Laureate বা রাজকবি; সকলে একসঙ্গে ইহা গাহিয়া উঠিলে চারু আপনাকে শেক্সপীয়রের সমকক্ষ মনে করিত । এই উপন্যাস লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী গল্পস্থলে ভ্রাতা সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই বলিয়া একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন ।"[১৬] রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের উন্মাদনায় একের পর এক কবিতা ও সংগীত রচনা করে চলেন । হিন্দু মেলার দশম অধিবেশনকে সামনে রেখেও রবীন্দ্রনাথের একটি দেশাত্মবোধ-সম্বলিত কবিতা রচিত হয় । এটি সেই অধিবেশনে পঠিত হতে দেখা যায় । এই কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেন–

"লর্ড কার্জনের সময় দিল্লিদরবার সম্বন্ধে একটা গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি– লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে তখনকার ইংরেজ গবর্মেন্ট ক্লাসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এইজন্য সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই টাইমস পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অতুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলায় দাঁড়াইয়া।"[১৭] রবীন্দ্রনাথের এসব বক্তব্যবিষয়ের স্মৃতিবিবেচনায় তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই উন্মোচিত হয়। এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিবিড় রাজনীতি সম্পৃক্ততার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব। হিন্দুমেলার দশম অধিবেশনে পঠিত কবিতার মধ্যেও অনুরূপ চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। কবিতাটি রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পরবর্তীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে এটি ব্যবহার করেন। সেখানে কবিতায় ব্যবহৃত 'ব্রিটিশ' শব্দের পরিবর্তে 'মোগল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতাটির কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

"কিসের তরে গো ভারতের আজি সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যতদিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে সম্মান ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি!
কুমারিকা হতে হিমালয়- গিরি এক তারে কভু ছিল না গাঁথা
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।
হারে হতভাগ্য ভারতভূমি
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষগান,
এস গো আমরা যে ক–জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।[১৮]

এই কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ব্রিটিশ-বিরোধী বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। কিন্তু তা কোথাও প্রকাশের উপায় ছিল না। কারণ, ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট, এর কারণে কোনো সরকার-বিরোধী লেখা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ আইনের ফলে ইংরেজ সরকার দেশীয় স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালির কণ্ঠরোধের জন্য পাকা বন্দোবস্ত করেন– ইতোমধ্যে অনেক পত্র-পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

"কিছুকাল হইতে দেশীয় কাগজগুলি ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করিতেছিল; তাহাদের সেই ক্ষীণকণ্ঠের অস্তিস্বরও রোধ করিবার জন্য এই আইন পাস হইল। এই আইনের কবলে পড়িয়া ভারতের বহু দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রিকা লোপ পায়; বাংলাদেশের সোমপ্রকাশ সাধারণী ও নববিভাকর স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিল; আর্যদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিল; দ্বিভাষী অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা কলেবর সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ইংরেজি

সাপ্তাহিক-রূপে রাতারাতি পরিবর্তিত হইল– কেবল পূর্বের বাংলা নামটা তাহার গায়ে রহিয়া গেল।"[৯] এই দমন-পীড়ন ক্রমান্বয়ে দারুণভাবে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এতে করেও স্বাধীনচেতা বিপ্লব-বিদ্রোহ ততোধিক উৎসাহে জ্বলে ওঠে। সুবিশাল ভারতভূমির নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু পূর্বেই তা শুরু হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারও নানা উপায়ে এসব আন্দোলন দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যান। একের পর এক আইন সংস্কার, পুলিশি অভিযান, নিষেধাজ্ঞা, অভিনয় বন্ধ, ইলবার্ট বিল, ড্রামাটিক পারফরম্যান্স এ্যাক্ট, গণগ্রেফতার, নির্বাসনদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড– ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহাকে নির্মমভাবে দমন করা হয়। অবশেষে এই আন্দোলন-সংগ্রাম ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাপক প্রতীকী ব্যঞ্জনার আশ্রয় লাভ করে। শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সৃষ্টিসাহিত্যে এসব স্বাধীনতা-সংক্ষুব্ধ চেতনাকে অলঙ্করণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের দিল্লী দরবার কবিতাটিও এ অবস্থায় শাসকবর্গের বিরক্তি-বিরাগ উৎপাদন করে। এতে করেই তাঁর বড় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই কবিতাটি তাঁর নাটকে একটু ভিন্নভাবে প্রকাশ করেন

"বৃটিশবিরোধী কোনও কিছুই সরকার সহ্য করবে না। পনের-ষোল বছরের বহু কিশোর বৃটিশ সরকারের রোষানলে পুড়ে মরেছে। রবিকে বাঁচাবার জন্য জ্যোতিদাদা কবিতাটিকে তার নিজের লেখা 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ঢুকিয়ে দিলেন। 'বৃটিশ' শব্দটির পরিবর্তে মোগল শব্দটি বসান হলো। বৃটিশ সিংহের গর্জন করবার প্রয়োজন হ'ল না।"[১০]

এভাবে সৃজনশীল সাহিত্যিকগণ তাঁদের সৃষ্টিকর্মে স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের স্বপ্ন-কাঙ্ক্ষা রূপায়িত করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন পর্যায়ে একে একে গণবিদ্রোহও সংঘটিত হতে থাকে। সমাজের সর্বস্তরে ব্রিটিশবিরোধী গণ-আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করে। যা ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই এদেশের মুক্তিপাগল মানুষের মনে দানা বাঁধে

"ইংরাজ প্রায় দুশো বৎসর রাজত্ব করেছে– মধ্যে মধ্যে তাকে উত্যক্ত হতে না হয়েছে এমন নয়। ১৭৬৬ সালে বাংলা ও বিহারের চুয়ার অভ্যুত্থান থেকে কখনো উড়িষ্যার জমিদাররা, কখনো তামিলনাড়ু বা অন্ধ্রের পলিগারেরা, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কখনো সাঁওতালরা কখনো তিতুমীরের মত দলপতি, ইংরাজকে উত্যক্ত করেছে মহীশূরে, সৌরাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে, রাজপুতানার নানা স্থানে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গণ অভ্যুত্থান চলেছে। এর পরে সিপাহী বিদ্রোহ"–[১১]

কিন্তু এর মধ্যেও ইংরেজদের তুষ্টি-তোষণ কাজে এদেশীয় কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠি তৎপর হয়ে ওঠে। দেশের স্বার্থ-সুবিধা জলাঞ্জলি দিয়ে এসব ব্যক্তিবর্গ নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ব্যাপকভাবে গৃহীত হতে থাকে। নবমুক্তির রেনেসাঁ আন্দোলনে বাঙালিপ্রাণ দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এ সুবাদে সমাজ-সংস্কারক রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) পর্যন্ত ইংরেজদের আগমনকে আশীর্বাদরূপে অভিষিক্ত করেন।

"... রামমোহন এদেশে ইংরেজের আগমন বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন। ইংরাজী ভাষার প্রচার পাশ্চাত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আমদানী তো তিনি চেয়েছিলেন বটেই, এদেশে ইংরাজের জমিদারী ও নীলচাষকে পর্যন্ত তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।"[১২]

এ অর্থে রবীন্দ্রনাথও অনেকক্ষেত্রে ইংরেজকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সার্বিকভাবে কখনো তা গ্রহণ করতে পারেন নি তিনি গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে প্রগতিশীল ধারায় বিদেশি শিক্ষা-সংস্কৃতি মেনে নেয়ার পক্ষপাতী। অন্ধ অনুকরণে বরাবরই তাঁর বিপক্ষে অবস্থান। যা-কিছু আমাদের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি ধারার উপযোগী তা তিনি সবসময় সাদরে গ্রহণ করে

নিয়েছেন। কিন্তু যা-কিছু বাঙালি জাতিগত সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন,

"সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর- একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। ..... ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না। এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।"[২৩] কিন্তু এই ইংরেজপ্রীতি অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ অজস্র উপমা তথ্যাদি সহযোগে যা উপস্থাপন করেন। অনুকরণ বা পরানুকৃতির বেলায় তাঁর পদক্ষেপ অত্যন্ত সতর্ক। সেখানে কোনোক্রমেই বাঙালি জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি ক্ষুণ্ন হবার মতো নয়। যে-কোনো ব্যাপারে অন্ধ অনুকরণ বা মোহমত্ততাকে তিনি চিরকাল প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার নবাগত থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিমুখ হওয়ারও বিপক্ষে। অন্ধ অনুকরণে নকল বাঙালিদের বিপর্যয়কর অবস্থা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। আবার এর মধ্যে স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতাও বিদ্যমান, যা পরিস্থিতিকে আরো বেশি জটিল ও ভয়ংকর করে তোলে।

"কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আর্যসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না। ইহা নিশ্চয় এবং যে-দুর্বলচিত্তগণ ইহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে। ইহাতেও সন্দেহ নাই।"[২৪]

এ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি শ্লেষাত্মক বর্ণনায় কতিপয় অনুকরণ- অন্ধ বাঙালির চারিত্র্যচিত্র ফুটিয়ে তোলেন। উপমা রূপকের আলঙ্কারিক কথায় এ অবস্থার একটা মনোরম পরিস্থিতি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'দুই-চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিতেও পারে, কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না, কারণ ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই, এমন অবস্থায় সমস্ত কাকসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সংবরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।'[২৫] এই পরানুকৃতির অন্ধ প্রবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো সমর্থন করতে পারেন নি। তবে অবশ্যই তিনি পরিবর্তনের পক্ষে। যা সবসময় মূলানুগ ইতিহাস ঐতিহ্যের পারম্পর্য রক্ষা করে গঠিত, দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশে প্রয়োজনানুযায়ী গৃহীত। যা আমাদের মূলের সাথে কখনো সামঞ্জস্যহীন নয়।

"যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহাকে বলে অনুকরণ করা। .... প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে। অনুকরণের নিয়মে নহে, কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তি স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ বারাবরই এক শ্রেণীর বাঙালি চরিত্রের এই পুচ্ছগ্রাহী অনুকরণ লক্ষ করেছেন তারা স্বকীয় অবস্থান-অস্তিত্ব ভুলে পররাজ্যের কাল্পনিক লীলাবিলাসে মত্ত। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় ব্যক্তিক স্বার্থের অহংসীমায় বসবাসরত এসব গোষ্ঠি বরাবরই জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী এ অবস্থাটি কখনো বৃহত্তর জাতিগত স্বার্থের অনুকূল নয়, বরং তা কখনো কখনো মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে সমাজসচেতন রবীন্দ্রনাথ জন্মের পরপরই এহেন পরিবেশ-পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন পরাধীন ভারতে একশ্রেণির চাটুকার ইংরেজভজা সম্প্রদায় নির্লজ্জভাবে আবির্ভূত। তারা সরকারের সাথে আঁতাত-অবস্থান নিয়ে রাতারাতি প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে পড়ে। দেশীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধানো জৌলুসে এরা অবগাহন করতে থাকে। এদের সহযোগিতায় ইংরেজ সরকার রাজনৈতিক শাসনদণ্ড তীব্রবেগে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এহেন পরিবেশ সম্পর্কে তৎকালীন শিল্পী সাহিত্যিকগণ লেখনীর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। এ পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯১২), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁদের বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টি ঘটনাচরিত্র অনুরূপ আবহ অন্বেষার রূপপ্রকৃতি তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব এসব সৃজন-সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তিনি বিভিন্নভাবে উজ্জীবন উদ্দীপনায় নিজেকে গড়ে তোলেন।

পরাধীন ভারতের বহুমাত্রিক দৈন্যদশা রবীন্দ্রনাথকে আলোড়িত করে। বিশেষত, ইংরেজ সরকারের অন্ধ অনুকরণপ্রিয় বশংবদ শ্রেণির কারণে তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কর্ম নয়- আয়োজন আস্ফালনের মধ্যেই এদের জীবন অতিবাহিত পরনিন্দা ও পরচর্চায় আত্মপ্রসাদজনিত সুখসম্ভোগ পেয়ে বসেছে। কর্মে ও কথায় বিস্তর ফারাক, অহংবোধের ফাঁপা বুলিতে যাবতীয় কর্মক্রিয়া ভরপুর। সেখানে সত্য ও সঠিক কর্মীচরিত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। এহেন বাস্তবতায় বাঙালির চরিত্র অকর্মণ্য অথর্ব চিন্তায় বরাবরই জড়িমাগ্রস্ত। আবার এরই মধ্যে ইংরেজ সরকারের দেয়া অবৈধ সুযোগ-সুবিধা তাদের বেপরোয়া করে তোলে। দিনরাত কেবল সরকারের গুণকীর্তন করাই একমাত্র ব্রত। এর ফলেই এই তোষামুদে শ্রেণী রাতারাতি প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে পড়ে। ফলে সামাজিক ভারসাম্য ক্রমান্বয়ে বিঘ্নিত হতে থাকে। দেখা দেয় অসঙ্গত সমাজের অনতিক্রান্ত অস্থিরতা। এতে করেই যাবতীয় সুস্থ, স্বাভাবিক, সমুন্নত চিন্তাধারা মুখ থুবড়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির অনুরূপ চরিত্র প্রসঙ্গে বলেন, "......... আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি। পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহবল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সৃষ্টির উন্মাদনা-সম্বলিত কাব্যকৃতি দিল্লি দরবারবিষয়ক রচনাটিও এরকম পরিপার্শ্ব দ্বারা আলোকিত। "..... যখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর আর্তনাদে শিহরিত, তখন লর্ড লিটন জনমানসে সম্রাজ্যবাদী স্পর্ধা ও আতঙ্ক প্রচারের উদ্দেশ্যে মুঘল বাদশাহদের অনুকরণে দিল্লীতে বিপুল ব্যয়ে এক দরবার অনুষ্ঠান করেন (১৮৭৭)। দেশীয় রাজন্যবর্গ, প্রভাবশালী ভূম্যধিকারীগণ এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় আশ্রিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য দিল্লীতে সমবেত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রতি

এমন দায়হীন নিষ্ঠুর অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি রচনা করেন।[২৮] এসময় দেশের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মকরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নানারূপ অসঙ্গত অনাচারের ফলে জনজীবন দুর্বিষহ হতে থাকে। এ দেশের সহায়-সম্পদ ইংরেজ সরকার নিজ দেশে প্রেরণ করতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। দেখা দেয় একের পর দুর্ভিক্ষ মহামারী। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। এ ছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষণ-পীড়ন, দমন-নির্যাতন, হত্যা-গুম, নির্বাসন-দণ্ডভোগ, স্বাধীনতা-উন্মুখ ভারতীয় জনগণের মনকে বিষিয়ে তোলে। এতে করে তারাও বসে নেই। পর্যায়ক্রমে বিপ্লব বিদ্রোহ ও আন্দোলন- অধিকার প্রশ্নে স্বাধীনতা স্পৃহা দানা বাঁধতে থাকে। এ সময় রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে এসব পরিপার্শ্ব দ্বারা পরিচালিত হন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন। কতিপয় প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন: 'অন্ত্যেষ্টি সংকার', 'দয়ালু মাংসাশী' 'জুতাব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রবন্ধের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিমানহত তীব্র খেদোক্তি প্রকাশিত। কিন্তু পরাধীন রাজ্যের নানামাত্রিক সীমাবদ্ধতায় তা প্রকাশ করাও কঠিন। ফলে বাধ্যগত কারণেই তাকে আলঙ্কারিক বর্ণনার দ্বারস্থ হতে হয়। যা রবীন্দ্রস্বভাবের জন্য অনেকটা অনুকূলও বটে। এ সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলো তীব্র শ্লেষ-বক্রোক্তি রূপক প্রতীকের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাভঙ্গিমা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে যা স্বাধীনতাকামী সাধারণ ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রতিপন্ন হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁদের মুক্তিকামী উৎসাহ-স্পৃহা প্রবলবেগে উজ্জীবিত হতে থাকে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তিহীন বর্ণনা-বিবৃতি সত্যিই মনোমুগ্ধকর। যা পররাজ্যলোলুপ শাসক ও শোষিতের প্রাণমূল-প্রান্ত ছুঁয়ে উচ্চারিত। যেমন, 'অন্ত্যেষ্টি সংকার' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"ইংরাজশাসন-বিদ্বেষী একদল লোক ক্রোধভরে বলেন- দেখ দেখি ইংরাজের কি অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া তাহার সভ্যতা: ভারতবর্ষের বিষয় পাইয়া সে ধনী: অথচ সেই ভারতবর্ষের প্রতি তাহার কি অন্যায় ব্যবহার। আমার বক্তব্য এই যে, তাহারা তো ঠিক উত্তরাধিকারীর মতো কাজ করিতেছে। ভারতবর্ষের মুখাগ্নি করিতেছে। ভারতবর্ষের শ্রাদ্ধ করিতেছে, আরও কি চাও। ভূত ভারতবর্ষ যখন মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপদ্রব করিতেছিল, তখন বড়ো বড়ো কামান-গোলার পিণ্ডদান করিয়া তাহাকে একেবারে শান্ত করিয়াছে। তাহা ছাড়া শাস্ত্রে বলে, নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করিয়া লোকে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। চিত্রগুপ্তের ছোটো-আদালত হইতে এ ঋণের জন্য ইংরাজের নামে বোধ করি কোনো কালে ওয়ারেন্ট বাহির হইবে না। যে দেশে, যেখানে চরিবার প্রশস্ত মাঠ পাইয়াছে Jane Cow (John Bull-এর স্ত্রীলিঙ্গ) সেইখানেই নিজের সন্তানগুলিকে চরাইয়া ও পরের সন্তানগুলিকে গুঁতাইয়া বেড়াইতেছে। অতএব উত্তরাধিকারীর ও পূর্বপুরুষের কর্তব্য-সাধনে তাহাদের কোনো প্রকার শৈথিল্য লক্ষিত হইতেছে না। তবে তোমার নালিশ কি লইয়া?"[২৯]

'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্লেষাত্মক বর্ণনায় বাঙালির অধঃপতিত অবস্থার কথা তুলে ধরেন। আত্মপ্রত্যয়হীন ও আত্মপদার্থরহিত এক শ্রেণীর বাঙালি বরাবরই পরানুকৃতিতে তৎপর। অকর্মণ্য-অলস চিন্তার ফাঁপা বুলিতে ভরপুর অথচ হীনমন্য আয়োজন আস্ফালনের কোনো কমতি নেই। এহেন পুচ্ছগ্রাহী সম্প্রদায় দেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির পথে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। এরা স্বকীয় অবস্থান-অস্তিত্ব ভুলে অন্যের অন্ধ অনুকরণে পারঙ্গম। রবীন্দ্রনাথ সবসময় এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দেন। 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধেও তাঁর অনুরূপ বক্তব্য বিবৃতি লক্ষ করা যায়। ইংরেজ সরকারের যাবতীয় কর্মযজ্ঞে এহেন আত্মপদার্থহীন সম্প্রদায় ইন্ধন

যুগিয়েছে এবং দেশীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ ধারাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। রবীন্দ্রনাথ গল্পচ্ছলে 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধে এই মারাত্মক অবস্থার রূপপ্রকৃতি তুলে ধরেন,

'আমাদের দেশের প্রাচীন দার্শনিক বলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব পূর্ণ-আত্মার মধ্যে লীন করিয়া দেওয়াই সাধনার চরম ফল: পূর্ণতর জীবের মধ্যে অপূর্ণতর জীবের নির্বাণমুক্তি প্রার্থনীয় নহে তো কি? একটা পশুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে যে, সে মানুষ হইয়া গেল: মানুষের জীবনীশক্তিতে অভাব পড়িলে একটা পশু তাহা পূরণ করিতে পারিল, মানুষের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া গিয়া মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সুখ, স্বাস্থ্য, উদ্যম তেজ নির্মাণ করিতে পারিল, ইহা কি তাহার সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় প্রথমত সে নিজে স্বপ্নের অগোচর সম্পূর্ণতা লাভ করিল। দ্বিতীয়ত মানুষের মতো একটা উন্নত জীবকে সম্পূর্ণতর করিল ছাগলদের মধ্যে এমন দার্শনিক কি আজ পর্যন্ত কেহ জন্মায় নাই, যে তাহার লম্বা দাড়ি নাড়িয়া সমবেত শিষ্যশিশুবর্গকে এই নির্বাণমুক্তির সম্বন্ধে ভ্যাকরণ-শুদ্ধ উপদেশ দেয়। আহা যদি কেহ এমন ছাগহিতৈষী জন্মিয়া থাকে তবে তাহার নিকট আমার ঠিকানাটা পাঠাইয়া দিই এবং সেই সঙ্গে লিখিয়া দিই যে, জ্ঞানালোকিত ইয়ং-ছাগদের মধ্যে যাঁহার মুক্তিকামনা আছে তিনি উক্ত ঠিকানায় আগমন করিলে সদয়হৃদয় উপস্থিত লেখক মহাশয় তাঁহাকে মুক্তিদানপূর্বক বাধিত করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, পশুদের উপকার করিবার জন্য, ব্যয়সাধ্য হইলেও, দয়ার্দ্রচিত্ত লোকদের মাংস খাওয়া কর্তব্য। আমাদের দেশে এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহাদের মত এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজত্ব অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি ইংরাজদের মধ্যে একেবারে লীন হইয়া যাইতে পারে, তবে সুখের বিষয় হয়।"[৩০] বাঙালির এই অস্তিত্ব আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ বরাবরই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে একথাও সত্য, বৃহত্তর বাঙালি গণমন কখনো স্বকীয়-স্বত্ব বিসর্জন দিতে নারাজ। যুগে যুগে ইতিহাসের সাক্ষ্য-পারম্পর্য পাতায় সে কথাই লিপিবদ্ধ রয়েছে রবীন্দ্রনাথও এই কথাটি বেশ ভালোভাবেই জানতেন। মানতেন ও বিশ্বাস করতেন। 'দয়ালু মাংসাশী' প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি বলেন,

"....উদ্ভিদ্‌ভোজী ভারতবর্ষকে ইংরাজ-শ্বাপদেরা দিব্য হজম করিতে পারিয়াছেন: কিন্তু পাকযন্ত্রের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকাতে মাংসাশী কান্দাহার গ্রাস করিলেন, ভালো হজম হইল না: পেটের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। মাংসাশী জুলুভূমি ও ট্রান্সবাল পেটে মূলেই সহিল না। আহার করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া মাঝের হইতে বলহানি হইল। রোগ হইবার উপক্রম হইল। অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক।"[৩১]

বাঙালির স্বত্ব-অস্তিত্ব গলাধঃকরণ করা এত সহজ নয়। বর্ণসংকর এই সম্প্রদায়ের হয়ে-ওঠা অত্যন্ত সুসংহত শত-সহস্র বছরব্যাপী গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ হতে থাকে। বহুমিশ্র প্রাণের এই সংস্কৃতি একটা সুমহান ঐতিহ্যের আশ্রয়ে লালিত। যুগে যুগে আর্য-অনার্য, শক-হূণ, কোল-ভিল, অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, মোগল-পাঠান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ইংরেজ-মুসলিম– ইত্যাদি জাতি সম্প্রদায়ের সমন্বয়-সহযোগ ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু কখনো সে স্বকীয়-সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দেয় নি। বরং প্রয়োজনমাফিক গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে প্রগতিশীল পথে এগিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতি এর ধর্ম নয়– বরং আত্মকৃত সমূহ সমুন্নতি অর্জনই মূল লক্ষ্য।

"...... বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বহুলাকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই– সমস্ত নিরর্থক বহুলের

ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধারণরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক না তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে- যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার মানিবে না। .... মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা: কখনোই তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না: ইহাই তামসিকতা- এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই

যে-সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সকল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। ... স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়- এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে, আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি" [১২] এই সমন্বয়-সহাবস্থান ভারতীয় ইতিহাসের চারিত্র্য-লক্ষণ বর্ণসংকর জাতিসত্তার প্রধানতম উৎস। মূলত একটা গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য এই জাতিগত অস্তিত্বের প্রাণ-প্রতিমা নির্মাণ করেছে রবীন্দ্রনাথ এক মুহূর্তের জন্যেও এই অনুভব-অন্বেষা বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাঁর প্রায় পুরো সৃষ্টিকর্ম জুড়ে এর সপ্রাণ উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং পাশাপাশি যেখানে একটা বিশ্বগত ঐক্য-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে; যা রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত তাঁর সৃষ্টি স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষ একটা ঐক্যসাধনায় যুগ-যুগান্তর পার করেছে। এক অদ্ভুত সমন্বয়ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মগত ভিত্তিবৈভব তৈরি করে নিয়েছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে আত্মস্থ করেছে অথচ স্বকীয় স্বরূপপ্রকৃতিকে কখনো বিসর্জন দেয় নি। এখানেই ভারতীয় জাতিসত্তার মৌল বৈশিষ্ট্য নিহিত। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না- এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না। তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের"।[১৩]

এই সমূল-সংস্থিত ভারতীয় সংস্কৃতি বরাবরের মতোই সমুন্নত। পররাজ্যলোভী সাম্রাজ্যবাদীর কবলে কখনো তা বিনষ্ট হবার মতো নয়। ইংরেজদের আগ্রাসী রাষ্ট্রনীতির সম্মুখেও তা আপন গৌরবে দেদীপ্যমান- এ কথা রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। কারণ, এর মূলে আছে ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরন্তর প্রাণনা প্রণোদনা ইংরেজদের রাষ্ট্রনৈতিক বিধিবিধানের তুলনায়ও এই ভারতীয়ত্ব গৌরবের অধিকারী এবং তা ঐতিহ্যিক সুষমায় ভরপুর রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক ভাবনায় বলেন, "যাহাদের বুট-তরী আশ্রয় করিয়া তোমরা ভবসমুদ্র পার হইতে চাও, সেই ইংরাজ মহাপুরুষেরা কী করেন একবার দেখো-না। তাঁহাদের রাজসভায়, তাঁহাদের পার্ল্যামেন্ট সমিতিতে এবং অন্যান্য নানা মূলে কতশত প্রকার অর্থহীন অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানে।

অতীত কাল ধরণীর মতো আমাদের অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে। ...আমি কিছু পরগাছা নহি, গাছ হইতে গাছে ঝুলিয়া বেড়াই না। বাহিরের রৌদ্র, বাহিরের বাতাস, বাহিরের বৃষ্টি আমি ভোগ করিতেছি, কিন্তু মাটির ভিতরে ভিতরে প্রসারিত আমার অতীতের উপর আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া কাঁদি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি, সরল বাল্যকালের সমীরণ ভোগ করি– নবজীবনের প্রথম সংকল্প মহৎ উদ্দেশ্য, তরুণ আশাসকল পুনরায় দেখিতে পাই "[৩৪] রবীন্দ্রনাথের এই প্রাণমূল প্রান্ত ঘিরে বাঙালির একটা দীপ্যমান অস্তিত্ব বহমান। তবে এর মধ্যেও প্রতিনিয়ত সংযোজন-বিয়োজন বয়ে চলে। প্রগতিশীল পথের কল্যাণধারায় তা প্রতিনিয়ত পরিস্নাত। দু'শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন। সেখানে প্রচুর পরিমাণে অসংগতি রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজদের বাড়াবাড়িও লক্ষণীয়। যা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে অবলোকন করেন। তিনি এহেন জঘন্য আচরণের বিরুদ্ধেও বিপ্লবাত্মক ভাষায় অবতীর্ণ হন। প্রথমবারের মতো বিলাতবাসের সময়ই রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রবাস থেকে প্রেরিত 'ভারতী' পত্রিকার উদ্দেশ্যে লিখিত একটি পত্রে বলেন,

"এখানকার গলিতে গলিতে যে 'জন-জোন্‌স্‌-টমাস' গণ কিলবিল করছে, তারা ভারতবর্ষের যে-অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে– অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রষ্ট্র হয়ে যায়, যে– রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই নয়) সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক-একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এরকম অবস্থায় তাদের যে বিকৃতি ঘটে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে। কোনো জন্মে যে– মানুষ ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দাও, ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরেই জর্জরিত করবে। সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে চালানো যায়।"[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমকালীন সমাজ-সরকারের সাথেই সম্পৃক্ত পরাধীন ভারতবর্ষের বহুবিধ সমস্যা-সমাচার এর মধ্যে ভাষা খুঁজে পায়। পাশাপাশি পররাজ্যগ্রাসী ইংরেজ সরকারের নানা অসঙ্গত-অনাচার রবীন্দ্ররচনায় সবিশেষ গুরুত্বের সাথে চিত্রিত হয়। সুনিবিড় মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় এসব ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যে কোনোরকম অন্যায়-অনাচার অসঙ্গতি-মানবতাচ্যুতি ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই সোচ্চার। এ অবস্থায় তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন। একেবারে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। যা মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও লক্ষ করা যায়। অথচ তিনি রাজনীতির সাথে কখনো সরাসরি জড়িত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহুবার বহুভাবে অনুরূপ বক্তব্যবিবৃতি প্রদান করেন।

১৯৩৫-এর অ্যাক্ট অনুসারে নতুন শাসননীতির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন। এই নীতির সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা কবিকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এ উপলক্ষে একটি প্রতিবাদ সভায় তিনি অংশ নেন। দিল্লিতে মদনমোহন মালব্য কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারী-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সভায় এক টেলিগ্রাম বার্তায় রবীন্দ্রনাথ বলেন,

You all know that I have always disapproved of the communal award. I hope our leaders will join their forces to save from its paralysing grip the political integrity of the nation".[৩৬]

আহূত এই প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ একটা সুদীর্ঘ বক্তব্য তুলে ধরেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনন-মনস্বিতা উপলব্ধি করা সম্ভব। জীবনের শেষ পর্যায়ে উচ্চারিত এই কথাগুলোর মাধ্যমে অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা যায়

রবীন্দ্রনাথ কখনো রাজনীতিবিদ হতে চান নি। অথচ দেশের প্রয়োজনে, মানবিকতার প্রশ্নে বারবার ছুটে গিয়েছেন প্রতিবাদ প্রতিরোধের লক্ষে। সভা, সমিতি, সেমিনার, সশরীর উপস্থিতি, সৃজনসৃষ্টির মাধ্যমে অথবা যে-কোনো উপায়ে। রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারী-বিরোধী প্রতিবাদ সভায় বলেন:

"আমি রাজনীতির লোক নহি। আজিকার আলোচনার বিষয়– সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা– মুখ্যত রাজনীতিরই প্রশ্ন স্বভাবগত কুণ্ঠা সত্ত্বেও এ আলোচনায় আমি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধকে বিচূর্ণ করিবার জন্য যে শক্তি আজ উদ্যত হইয়াছে তাহার প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী সুদৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন. য়ুরোপ এখন এক তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতেছে। নবযুগের যে আদর্শ একদিন সে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল আজ তাহাকে সে নিজেই অস্বীকার করিতেছে। প্রতারিত পক্ষকে চিরপঙ্গু করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপীয় সংবাদপত্রগুলিও আজ প্রভুশক্তির পক্ষ হইতে বিদ্বেষবিষ উদগার করিতেছে। আমাদের সংবেদনশীল জাতীয় চেতনার মূলোচ্ছেদকল্পে উদ্‌ভাবিত যে অভিনব পরিকল্পনা আজ আমাদের গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সহিত পূর্বোক্ত কোনো ঘটনার তুলনা করিতে আমি সংকোচ বোধ করি। বৃহত্তর জগতের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন; যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এ নির্দয় অপমানের ভুক্তভোগী তাহাদের কাছেই ইহা গভীরভাবে অর্থবহ। আমাদের কাছে ইহা আজ এত বড়ো সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে যে বার্ধক্য ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও আমি এ সভায় অনুপস্থিত থাকা লজ্জাজনক মনে করিলাম।"[৩৭] রবীন্দ্রনাথের এই আত্যন্তিক দায়বোধ তাঁকে সারাজীবন তাড়া করে ফেরে। মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননাই এই উজ্জীবন মন্ত্রের মূল নিয়ামক শক্তি. যে কোনো রকম প্রতিবন্ধক বা বিঘ্নবিপত্তি তাঁকে এই আহ্বান থেকে নিরস্ত করতে পারে নি। তবে তাঁর এই প্রতিবাদ প্রতিরোধপন্থা সবার থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে প্রচলিত কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। তাঁর প্রতিবাদ ছিল অত্যন্ত নান্দনিক ও মানবিকবোধসম্পন্ন। নীতি আদর্শের যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপিত এবং যা চিরায়ত মানবাত্মার সুগভীর সত্যের আলোকে গৃহীত। যা-কিছু মন-মনন ও মনুষত্ববোধের উপযোগী– তা-ই চিরন্তন শাস্ত্র-সংহিতার আলোকে গ্রহণ করতে হবে। সেখানে কোনো আরোপিত শাস্ত্রাচারের স্থান নেই। এ অবস্থায় ব্যক্তিগত জীবনে, ব্যক্তিচরিত্রেরও সমুন্নতি প্রয়োজন। অধ্যাত্ম-আত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমেই তা কেবল সুসংহত হতে পারে

ক্রমাগত সত্যশাস্ত্রের পরিচর্যায় মানবাত্মার সমূহ বিকাশ– বিবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠে। এই আদর্শিক ব্যক্তি-চরিত্র সমাজের প্রতিটি প্রান্তকেই ক্রমাগত আলোকিত করে তোলে। রাজনৈতিক জীবনেও অনুরূপ চারিত্র্য-মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। যা দেশ-জাতির কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের প্রতীকী চরিত্ররূপে গণ্য হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অনুরূপ স্বপ্ন-আশা লালন করেছেন। যেখানেই এর ব্যত্যয় ঘটে– সেখানেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এবং ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি সবসময় এই নীতি-আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যান। এর বাইরে কোনোরূপ প্রতিহিংসার রাজনীতি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। অথবা, জ্বালাও-পোড়াও, গুপ্ত-হত্যা, বর্জনবিদ্বেষ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তিনি ঘোর বিরোধী এখানেই প্রচলিত রাজনীতির সাথে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। এর ফলেই তিনি বারবার এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতি থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছেন। এবং তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামতকে মেনে নিতে পারেন নি। কবি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তা বিশ্বের যে কোনো স্থানে বা যে কোনো অবস্থায় হোক তাঁর স্পর্শমুখর মন কখনো বসে থাকতে পারে না। আবার এর মধ্যেই তাঁর নিরন্তর কাব্যসাধনা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যায়.

"......রবীন্দ্র-সত্তার সবটাই আধ্যাত্মিক তুরীয়তা নহে, কাব্যও নহে, সাময়িক ও স্থানিক ঘটনা ও অপঘটনা তাঁহার স্পর্শচেতন মনকে উত্তেজিত করে– বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই দুঃখরূপে বরণ করেন। দেশের মধ্যে পরাধীনতার

দুঃখ ও অপমান তো আছেই; বিদেশে কোথায়ও শান্তি নাই, সুখ নাই । কোথায় ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, কোথায় চীন- স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে- এ সবের জন্য বাঙালি কবির কি বেদনা ।"[২৮]

এই আন্তর্জাতিক অন্বয়-অন্বেষা সারাজীবনই রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে চলে । এ ব্যাপারে কোথাও তাঁর এতটুকু শৈথিল্য নেই । বরং তীব্র ভাষা-ভঙ্গিমা অথচ যৌক্তিক কার্যকারণের মাধ্যমে এসব ব্যাপারে মতামত তুলে ধরেন । যেমন, ১৩৪৪ সালে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন,

"চীনের প্রতি [জাপানের] নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার আছে । আমরা কী করতে পারি? ... এই দুঃখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি; এর শক্তি যতই ক্ষীণ–হোক এও সৃষ্টির কাজ । আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু মন আছে; আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত করি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ, যদি এ কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে- এ কথা মনে রেখে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি । আমাদের মেশিন-গান নেই । কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে- তার মূল্য যতটুকুই হোক তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব ।"[২৯] এই বক্তব্যের সাথে কবির অন্যান্য বহু রচনাধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে- যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিতিশীল রাজনীতির সাম্রাজ্যবাদী ঘোর ঘনঘটা প্রস্ফুরিত হয়ে ওঠে । যেমন- 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের ১৭ ও ১৮- সংখ্যক কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ।

মানুষের নির্লজ্জ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠেছে । আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের মরণনেশায় তারা অস্থির । একদিকে মানুষের ক্রূর-জটিল হিংস্র থাবা- অন্যদিকে অসহায়ত্ব এক বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করেছে । যা প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নিরতিশয় বেদনায় মুষড়ে পড়েছেন । এ অবস্থায় তিনি বিভিন্ন রচনাসৃষ্টির মাধ্যমে স্বকীয় মতাদর্শ তুলে ধরেন । বিশেষত, কাব্যিক বাণীভঙ্গিমায় একটা বিদ্রোহাত্মক ভাবাদর্শ ফুটিয়ে তোলেন । এহেন রাজনৈতিক উন্মত্ততায় কবি মানুষের মূঢ়, স্থানু ও নির্বিকারত্বকে ঘৃণা করেছেন । এবং পাশাপাশি স্বকীয় দায়বোধের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন । শুধু তাই নয়, এ অবস্থায় তিনি মানুষের শুভবোধকে অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করেন নি । যা একদিন সুষমাপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে । প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ১৮-সংখ্যক কবিতায় তিনি "দানবের সাথে থাকা সংগ্রামের তরে/প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে" বলেও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন ।

এসব কবিতার মাধ্যমে কবি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন । সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদমত্ততা আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা স্পষ্ট করে তুলেছে । বিশেষত চীন-জাপান যুদ্ধের ভয়াবহ আয়োজনে কবি যারপরনাই শঙ্কিত । যুদ্ধজয়ের জন্য জাপানি সৈন্যদের বুদ্ধমন্দিরে প্রার্থনাবিষয়ক একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় । এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় মুষড়ে পড়েন । একদিকে বরপ্রার্থনা, অন্যদিকে হত্যাযজ্ঞের প্রস্তুতি । কী সুনিপুণ প্রহসন প্ররোচনার অভিনয়ক্রিয়ায় মানুষের পদযাত্রা । প্রার্থনাগারে মানুষের এই ভেকধারী কপটতা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করেন । কথায়-চলায়, ধর্মে-কর্মে, ব্যবহার-পরিহার, প্রার্থনা-পরিকল্পনা- ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষের স্ববিরোধ আচরণ লক্ষণীয় । যা সমাজ-দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে । রবীন্দ্রনাথ সবসময় মানুষের এই হঠকারিতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন । জাপানি সৈন্যদের যুদ্ধজয়ের প্রার্থনায়ও তিনি অনুরূপ মননচেতনায় প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হন । এতে মানুষের কপট ধর্মবিকারকে প্রচণ্ড ভাষায় আক্রমণ করেন । একদিকে যুদ্ধের রণক্ষেত্রে হত্যাযজ্ঞ অন্যদিকে যুদ্ধজয়ের প্রার্থনা- যা সাম্রাজ্যবাদীর চরম হঠকারিতারই বহিঃপ্রকাশ । পাপপঙ্কিল দুর্গন্ধকে কখনো কোনো কপটতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না । অথবা কোনো ধর্মবচন দিয়েও তা লালন করা সম্ভব

নয় । বরং এতে পাপাচারক্রিয়া আরো বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে । জাপানি সৈন্যদের যুদ্ধজয়ের প্রার্থনায়ও অনুরূপ একটা গ্লানিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । যা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বেদনাবিহ্বল করে তোলে ।

বিশ্বযুদ্ধের এই ডামাডোল কবির বার্ধক্যগ্রস্ত জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে । চারিদিকে হত্যা, খুন, জখম, সন্দেহ, অবিশ্বাস, হানাহানি ও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্ব যেন টালমাটাল । জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কবি আজ থমকে দাঁড়িয়েছেন । মানুষের প্রতি মানুষের সবপ্রকারের মূল্যবোধ আজ ভুলুণ্ঠিত । নির্মম সাম্রাজ্যবাদের দাবদাহে সারা বিশ্ব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । নিষ্ঠুরতার চরম অবমাননায় মনুষ্য-মানবতা কেঁদে কেঁদে মরে । কবি এমন দৃশ্য দেখে অত্যন্ত বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উদভ্রান্ত হয়ে আছেন । শীর্ণসন্তপ্ত বার্ধক্যের ভারবাহী গ্লানিতো লেগেই আছে । তবুও এর মধ্যে তাঁর সৃজনচেতন মন চুপ করে বসে নেই । কাব্যকলার মুখরিত বাণীবিন্যাসে কখনোবা গর্জে ওঠেন । সন্ত্রস্ত রাজনৈতিক পরিবেশের স্থলেও তাঁকে একটা কিছু বলতে হবে । কারণ, এ দায়ভার থেকে তাঁর এক মুহূর্তের জন্যেও বিরাম নেই । মৃত্যুর পূর্ববর্তী বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে কবি 'প্রচ্ছন্ন পশু' (২৪ ডিসেম্বর ১৯৪০) কবিতায় বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের এক তাণ্ডবচিত্র তুলে ধরেন । মনুষ্যত্ববিহীন হিংস্রতার থাবায় সারা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে । মানুষ বেশে নির্লজ্জ মিথ্যাচার এ অবস্থাকে আরো ভয়াবহ করে তোলে । এদের এই ভেকধারী আচরণের অবসানকল্পে কবি বারবার প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করেছেন । একসময় হয়তোবা মানুষের মধ্যে সত্যমিথ্যার একটা স্বচ্ছতম ধারণা গড়ে উঠবে । সাম্রাজ্যিক মোহমত্ততার কালো মেঘ কেটে গেলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে । প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে । এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখরদারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্ছে । পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চলছে । য়ুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ । রক্তমোক্ষণক্লান্ত নিপীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে । পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে । হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে । চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে ।[৪০]

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্ঠুর আগ্রাসনের প্রতিবাদে 'আফ্রিকা' কবিতা রচনা করেন । এখানে তাঁর মানবিক বোধবুদ্ধিজাত চিত্ত-বিক্ষেপ লক্ষ করা যায় । যুদ্ধের অস্থিতিশীল বিস্তার মানুষের অবারিত শান্তি-সুখ বিঘ্নিত করে চলেছে । যা রবীন্দ্রনাথ সুগভীর উদ্বেগের সাথে অবলোকন করেছেন । বিশেষত, আবিসিনিয়ার পতনের পরপরই তিনি 'আফ্রিকা' কবিতাটি রচনা করেন ।

এখানে তিনি আফ্রিকার স্নিগ্ধশীতল পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন । প্রকৃতির অনাবিল শ্যামশ্রীমণ্ডিত আফ্রিকায়ও সাম্রাজ্যবিদদের লোলুপ রক্তচক্ষু বর্ষিত হয়েছে । মানবতার ক্রূর অবমাননায় সেখানকার জনপদও রক্তাক্ত অসৎ বর্বরের দল যেন একটা কালিমালিপ্ত অধ্যায় সংযোজন করে দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাবভাবনার আলোকে কালান্তর প্রবন্ধে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলেন ।

রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার রচনা 'কালান্তর'-এ অনুরূপ ভাবভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯খ্রিঃ শুরু হলেও অনেক পূর্বেই এর প্রস্তুতি শুরু হয় । রবীন্দ্রনাথ গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনা অবলোকন করতে থাকেন । ইউরোপ-এশিয়া জুড়েই নানারকম অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিবেশ অস্থিতিশীল

করে তোলে। জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় এসেই একের পর এক সাম্রাজ্যবাদী কর্মসূচি নিয়ে মেতে ওঠে। এতে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। যা ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

"হিটলার তিনের দশকের গোড়াতেই ক্ষমতায় এসেই ১৯১৮-এর সন্ধি শর্তগুলি একে একে লঙ্ঘন করতে থাকেন ইঙ্গ-ফরাসী মিত্র-শক্তি নিরুপায় দর্শক রূপে শুধু তা দেখেই যান। সুদেতেনল্যাণ্ড ডানজিজা ইত্যাদি একে একে জার্মানীর দ্বারা কবলিত হয়। কীল খালে জোর করে জার্মানী জাহাজ চালায় তখনো বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন নিষ্ক্রিয়। ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেন থেকে সাধারণতন্ত্রী সরকার উৎখাত করে সামরিক একনায়করূপে স্বয়ং চেপে বসেন। তারপর চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ড তাদের অন্যায় দাবীকে সমর্থন করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। এই সমস্ত সম্ভাবনীয়তা পূর্ণ ঘটনাই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন এবং ভাবী বিপর্যয়ের আশংকা ব্যক্ত হয় তাঁর তদানীন্তন বই কালান্তরে।"[৩১]

'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এখানে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির অন্তর্গত কারণসমূহ ভাষা খুঁজে পায়। রবীন্দ্রনাথ দর্শনসুলভ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তাঁর স্বভাবগত কবিসুলভ বর্ণনাবৈশিষ্ট্যে আলোচ্য পরিস্থিতির একটা রসস্নাত অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। পরপর দু'টো বিশ্বযুদ্ধের ঘৃণ্য রাজনৈতিক তৎপরতা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদীর লোলুপ অধিপত্যবাদই এই যুদ্ধের কারণ। মানুষের প্রভুত্বপ্রিয়তার বেপরোয়া বল্গাহীন বিস্তার বিষক্রিয়াই এর মধ্যে ইন্ধন যুগিয়েছে। সারা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। বাণিজ্য-সুবাদে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা বরাবরই একটা মিলন মেলবন্ধনের সহায়তায় সম্পর্ক বজায় রাখে। এর সাথে রাজনীতির কোনো সংস্পর্শ নেই। কিন্তু আধুনিক যুগের শিল্পবিপ্লবের বদান্যতায় পুঁজিবাদের মোহমত্ততা মানুষকে পেয়ে বসে। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার অনিবার্য অবস্থায় আধিপত্য বিস্তারের একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর এর জন্য মোক্ষম অস্ত্র হলো রাজনীতি। কারণ, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে অভিন্ন রাজনীতির কৌশল-কার্যক্রম সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এক গণতন্ত্রের ধুয়া তুলেও তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই রাজনীতির অপ্রতিহত ক্ষমতা খবরদারিও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিপতির পর্বতপ্রমাণ অর্থসংগহের মূলেও তা ইন্ধন যোগাতে থাকে। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো প্রথমত ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমন করলেও পরে তা রাজনীতিতে মোড় নেয়। এমনকি ক্ষমতাদখলের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সারা পৃথিবীতেই বৃটিশদের এই অপতৎপরতার সাক্ষী-স্মারক লক্ষণীয়। ভারতের মাটিতে বৃটিশদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরবর্তীতে রাজ্যদখল অনুরূপ পরিস্থিতিরই সাক্ষ্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মর্মগাঢ় যৌক্তিকতায় বিশ্বরাজনীতির এই স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। তিনি প্রাসঙ্গিক বর্ণনার আলোকে বলেন,

'ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুত্বচেষ্টা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল– এই কারণে তখনকার যত-কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাটে মাঠে গোঠে ঘাটে ফিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গন্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেইখানেই- জমাখরচ সব

এক জায়গাতেই কিন্তু এখন বাণিজ্যপ্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে– তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না

য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জার্মানির। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষবেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড়ো কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।

এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই। নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট। আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে– যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।[৪২]

'ছোটো ও বড়ো' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ চরিত্রের বহুবর্ণিল চরিত্রচিন্তন উদঘাটন করেন এবং এর মধ্যমে ভারতশাসনের স্বরূপ প্রকৃতিও চিহ্নিত করা হয়। পাশাপাশি ভারতীয়দের সাথে এই শাসক শাসনের নানাবিধ সম্পর্ক-সমবায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই আলোচনার বিস্তৃত-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ জাতির একটা অনুপুঙ্ক্ষ ইতিহাস তুলে ধরেন। সেখানে তাদের বিশ্বপ্রতিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য ও শিল্পী-সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। দেশের বাইরে তাদের বণিকবৃত্তি, বাণিজ্যবিস্তৃতি ও ঘৃণ্য অপকৌশলগত রাজনীতির অন্তর্নিহিত কারণসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। দেশে তাদের যাবতীয় মহত্ত্ব-মাধুর্য বজায় থাকলেও বাইরে এসে এ–রূপ পাল্টে যায়। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের এই দ্বৈত রূপচিত্রকে ছোটো-ইংরেজ ও বড়ো-ইংরেজ নামে আখ্যায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"যে বড়ো-ইংরেজ ষোলো-আনা মানুষ, আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের ওপারে, আর এ পারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো-আনা ছাঁটিয়া যে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই। অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাবণ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অন্যকেও বাড়াইতে থাকে সে-সমস্ত কি বাদ পড়িল। এই ছোটোখাটো ছাঁটাছোঁটা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না এমন অত্যন্ত দামি ও নিখুঁত ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির জন্য ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃষ্ণা কেন। বোঝে না তার কারণ, কলে ছাঁট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ... ভারত অধিকারের গোড়ায় ইহারা সৃজনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ কালান্তরস্থিত 'শূদ্রধর্ম' প্রবন্ধে ভারতীয়দের চিত্তচিন্তন-সম্পর্কিত একটা স্বরূপ সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন । ধর্ম ও শ্রেণিচরিত্র নির্ণয়ে সমাজকৃত কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় । যা আমাদের স্বাধীনতার শৃঙ্খলকে আরো দৃঢ় করে বাঁধে । আত্মবোধের উজ্জীবন-উচ্ছ্বাস প্রতিনিয়ত মাথা কুটে কুটে নিঃশেষিত হতে থাকে । ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিগত চরিত্র নির্ধারণে ধর্মকে জুড়ে দেয়া হয় । যা বিন্দুবিসর্গ পরিমাণ এদিক-সেদিক হলেই তা অধর্মের শামিল । এখানে একটা শ্রেণিগত দায়িত্ববোধ যন্ত্রবৎ কর্তব্যকর্মের যাঁতাকলে আবর্তিত হয় । আত্মবোধসমন্বিত চিৎপ্রকর্ষের কোনো সুযোগ নেই । ক্রমাগত সমূহ-সমুন্নতি অথবা উন্নত আদর্শের পথে উজ্জীবিত ব্যক্তিবর্গও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত । এ অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি-সম্প্রদায় খুব সহজেই আগ্রাসনের আসনটি পাকাপোক্ত করে নিতে পারে । বেশ নিরুপদ্রব ও সহজ-সাবলীলভাবে এর ক্রিয়াপদ্ধতি বিস্তার লাভ করে । রবীন্দ্রনাথ ভারতের শূদ্র ও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উদাহরণ টেনে এ অবস্থার একটা চমৎকার রূপপ্রকৃতি তুলে ধরেন । এবং এর মাধ্যমে তিনি ভারতের পরাধীন শৃঙ্খল সংকটের অন্তর্নিহিত রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী হন । তাঁর মতে, ভারতের এহেন বর্ণবিভক্তিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বারবার টিকে থাকার সুযোগ করে দেয় এবং ইংরেজ রাজ্যশাসনের এই দীর্ঘকালব্যাপী শোষণ সন্ত্রাসের মূলেও এই ব্যবস্থাটি অনেকাংশে দায়ি । সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের ঘনঘটা । প্রতিবাদ প্রতিরোধের উপায় অবলম্বনও তৈরি হতে থাকে । সেখানে শুধু ভারতবর্ষই দাসবৃত্তির ধর্মীয় আত্মপ্রসাদজনিত আনন্দে বিভোর । প্রভুত্ব প্রকাশের ইংরেজ দরবারে নতজানু প্রাণীর মতো একাত্মতা প্রকাশ করে তৃপ্ত । রবীন্দ্রনাথ এহেন অবমাননাকর অবস্থার বর্ণনায় বলেন,

> তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ । এখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে করে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে । সে মারবে ... সে মরবে । কেন মারবে কেন মরবে এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ । সে বলবে, স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ স্বধর্মে নিধনং শ্রেঃ । ইংরেজ– সাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না– ইংরেজের হয়ে যে কুলিগিরির বোঝা বয়ে মরে, সে বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই; ইংরেজের হয়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায় । যে পর তার শত্রু নয়; কাজ সিদ্ধ হবা মাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে । শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা । তার কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী । নিধনের অভাব হচ্ছে না; কিন্তু তার চেয়েও মনুষ্যের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য বলে মনে করে । অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিশ্বাস ফেলে বলবে: I miss my best servant.[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর তিন মাস আগে রচনা করেন রাজনৈতিক অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট' । প্রবন্ধটি আগাগোড়াই প্রবল রাজনৈতিক সচেতনতায় ভরপুর । বিশ্ব রাজনীতির একেবারে অন্তর্গত রূপরহস্য অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে । এর অনুপুঙ্খ ঘটনাপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথের নখদর্পণে অবস্থিত । একেবারে স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত– যা রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে বলে যেতে পারেন । রবীন্দ্রনাথের ছাপার অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত নামে রাজনীতিবিষয়ক কবিতা ও 'সভ্যতার সংকট' রচনাটি একসূত্রে গাঁথা । প্রথম সেই দিল্লি-দরবার সংক্রান্ত কবিতা ও সভ্যতার সংকট-এর বিষয়বস্তু মূলত রাজনীতি । সমকাল সমাজস্থিত বিশ্বরাজনীতি নিয়ে সুগভীর বিশ্লেষণ– ব্যাখ্যা এখানে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে । এতে অনুমান করা কঠিন নয় রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই কী সুগভীর চিন্তন-চেতনায় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতায় সংকট' প্রবন্ধে যেন এই জীবন-নিষিক্ত দর্শনভাবনারই দ্বারস্থ হন । এখানে তিনি পুরো জীবনেরই একটা সারগর্ভ রূপরেখা তুলে ধরেন এবং সেখানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটা সমন্বয়-সহাবস্থান

প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য ঘিরে এই আলোচনার কোনো কিছুই বাদ পড়ে নি। ইংল্যাণ্ড, স্পেন, রাশিয়া, জাপান, চীনসহ বিশ্বরাজনীতির একটা অনুপুঙ্খ মানচিত্র এখানে আবিষ্কার করা সম্ভব। বিশেষত, ইংরেজ জাতিকে ঘিরেই 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটির আদিগন্ত বর্ণনা মুখর হয়ে ওঠে। সেখানে ভারত শাসন-সুবাদে ইংরেজ চরিত্রের স্বরূপচিত্র তুলে ধরা হয়। সভ্য ইংরেজ জাতির প্রতি একসময়ের মোহমুগ্ধ আবরণ আস্তে খসে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বরাজনীতিতে ইংরেজ জাতির একটা কুৎসিত-কদর্য রূপই রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়ে। যার প্রভাবে ভারতবর্ষ নিদারুণ দৈন্যদশায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন,

"...সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন। কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেইসঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল।

.... সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি: অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য"[৪৫(ক)]। রবীন্দ্রনাথ এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হতাশার পাথরচাপা বুকে দারুণভাবে মুহ্যমান। তবু এর মধ্যেও স্বাধীনতাপিয়াসী মুক্তিকামী ভারতীয় জনগণ শৃঙ্খল-ভাঙার স্বপ্নে বিভোর। যা কবিকে একখণ্ড বিশ্বাসের বেলাভূমিতে দাঁড় করিয়ে দেয়। তিনি আশায় বুক বাঁধেন এবং মানুষের অন্তহীন সুষমা সম্ভাবনার প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ কখনো অরাজক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির একটানা একাধিপত্যে বিশ্বাসী নন। মানবাত্মার নির্দয়-নির্মম অবমাননার সময়কাল কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। একসময় যার অবসান ঘটে এবং সেখানে মানবমহিমার পূর্ণ পরিস্থিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠে। এ অর্থেই কবি মানুষের চিরায়ত মানবাত্মার অন্তহীন সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। যা তাঁকে দৈন্যদশাপ্রাপ্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতায় আস্থাশীল করে তোলে। এবং তিনি মানুষের প্রতিই জীবনের শেষ বিনম্র প্রীতি-প্রণতি জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশে হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে: নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে–

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"[৪৫(খ)]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবভাবনা আক্ষরিক অর্থে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি প্রচলিত কোনো দলীয়নিষ্ঠ রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। যে কোনো ব্যাপারে অন্ধ অনুকরণ তাঁর স্বভাবও নয়। মানুষের জন্য এবং

মানুষকে ভালোবেসেই রবীন্দ্রনাথের পুরো সৃষ্টিজীবন নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁকে প্রথাবদ্ধ কোনো শ্রেণিচরিত্রে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এমনই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা বিশ্লেষণ করতে হবে ফলে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন, আবার ছিলেন না– দু'টোই সত্য কথা। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর সর্বশেষ কিছু রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কিছু অবস্থা-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। যা তাঁর সমকাল, উত্তরকাল এবং এখন পর্যন্ত বেশ আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে বয়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। এখানে শিল্পী ও শিল্পের দায়বদ্ধতা কখনো কখনো ভীষণভাবে অনুভূত হয়। ফলে স্বকাল, সমাজ, মানুষ, রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ শিল্পের মধ্যে প্রবলভাবে জায়গা করে নেয়।

"Croce বলেন যে, সমাজের দার্শনিক কবি ও শিল্পীরা unpolitical man হইবেন না; if we may so speak more exactly, a sympolitical one, who is concerned in politics as in every human activity. He is concerned not to produce bad propagandist poetry, phiosophy are history, still less to undertake political activities outside his province, but simply to transmute his passionate concern into pure poetry, philosophy or history; and this he could not do if he had not this passionate concern, if his mind were indiffernet that is to say empty".[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই পরাধীন ভারতবর্ষে শ্লেষ বক্রোক্তি বা কাব্যিক ব্যঞ্জনায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। আবার কখনোবা রঙ্গরসের আধারে সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানেন। হাস্য-পরিহাসের রূপক রূপচিত্রের মাধ্যমে একেবারে অন্তর্দেশ-অভ্যন্তর ফুটিয়ে তোলেন। কূপমণ্ডুক মানুষের সংকীর্ণতা, প্রতিহিংসা, দলীয় লেজুড়বৃত্তি, বশংবদ মুৎসুদ্দিগিরি, চাটুকারিতায় অসৎ উপার্জন ইত্যাদি অসঙ্গতি-অনাচার রবীন্দ্রসৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়। দেশীয় রাজনীতির অদূরদর্শী ও হীনমন্য-দলাদলি তাঁর আক্রমণের শিকারে পরিণত। এহেন অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক শর্বর্ম্মিছলের রাজনীতি তিনি বরাবরই ব্যঙ্গাত্মক বঙ্কিম ভাষায় তুলে ধরেন।

কবিতার রূপক প্রতীকের মাধ্যমে সমকালীন সমাজবাস্তবতা ফুটে ওঠে। নানারকম অসঙ্গতি অনাচার ভারতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। যা অনেকসময় প্রতিবাদ করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও নানারকম কালো আইনের কারণে প্রতিবাদকারীর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া হয়। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে জেল-জুলুম, হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্বাসন, নির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে তা অব্যাহত থাকে। এ অবস্থায় স্বাধীনতাকামী দেশীয় জনসাধারণ নানারকম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। অন্যদিকে কবি-সাহিত্যিকগণ নানামাত্রিক রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে এহেন সম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিলিপি তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথও নানারকম সাহিত্যশিল্পের দ্বারস্থ হন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে তার এই প্রয়াস-প্রবৃত্তি সমানতালে চলতে থাকে রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক অবস্থা একেবারে জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে রচিত একটি ছড়ায় তিনি অনুরূপ একটি ভাবভাবনা ব্যক্ত করেন। সেখানে একটি ছড়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অনাচারের চিত্র তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা চটুল ভাবভঙ্গিমায় তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,

পুণ্য ভাতরবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই।
সমুদ্দুরের এ পারেতে এ'কেই বলে লড়াই।

সিন্ধুপাড়ে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি
বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি ।
সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে ।
রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগডুগি
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি ।"[৯২]

ইংরেজ সরকারের বহুবিধ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কারের মধ্যে বঙ্গবিভাগ প্রক্রিয়াটি অন্যতম । ভারত-বাঙালি সমাজের অখণ্ড আত্মানুভূতি খণ্ড-বিখণ্ড করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য । 'ডিভাইড এণ্ড রুলস' পলিসির অংশ হিসেবে ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের মধ্যে একটা বিভেদ–বৈষম্য তৈরি করে দেয় । যাতে করে তাদের শোষণ-পেষণ ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে একক কোনো বিপ্লব-বিদ্রোহ দানা বাঁধতে না পারে । এদিকে এদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমানদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় । তাদেরকে নানাভাবে গোষ্ঠিগত প্রলোভনের টোপ ছুঁড়ে দিতে দেখা যায় । স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যেই এই আয়োজন-অন্বেষা চলতে থাকে । অবশেষে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করার সরকারি প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় । "বঙ্গদেশ বলিতে তখন বুঝাইত বিপুল দেশ-বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ বা বর্তমানের বাংলাদেশ । এখন চারজন গবর্ণর যতখানি প্রদেশ শাসন করেন, তখন একজন ছোটলাটের উপর ততখানি ভূখণ্ড পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল সরকারি পক্ষের যুক্তি যে, এত বড়ো প্রদেশ একজন ছোটলাটের পক্ষে শাসন করা সুকঠিন । তখন ছোটলাটকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বা কোনো অধ্যক্ষ-সভাও ছিল না । সুতরাং স্থির হইল আসাম প্রদেশের সহিত রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ তিনটি যুক্ত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে, চীফ কমিশনের বদলে শাসক হইবেন একজন লেফটেনেন্ট- গবর্ণর, তাঁহার রাজধানী হইবে ঢাকা, শৈলাবাস শিলং । বঙ্গদেশ বলিতে থাকিবে বর্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বিহার-ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা অর্থাৎ, বাঙালি বিহারি ও উড়িয়া পূর্ববৎ একই রাষ্ট্রপ্রশাসন-ব্যবস্থায় থাকিল এবং পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের সহিত অসমীয়ারা ও উপজাতিসমূহ এক শাসনাধীন থাকিল ।"[৯৩] এই ঘোষণায় কিছু তাঁবেদার গোষ্ঠি উৎফুল্ল প্রকাশ করতে থাকে । কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ এর দূরভিসন্ধিমূলক চাতুর্য-চরিত্র্যে খুব সহজেই অনুমান করতে পারে । শুরু হয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধজ্ঞাপক সভায় মিছিল, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও অন্যান্য কর্মসূচি । এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন । তিনি দর্শনসুলভ ভাষাভঙ্গিমায় বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং বাঙালি জাতির পক্ষে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করতে থাকেন । এবং এর একটা পূর্বাপর কার্যকারণ ব্যাখ্যা-সূত্র দাঁড় করান । সেখানে অত্যন্ত যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ রচনা-সৃষ্টির মাধ্যমে এই বঙ্গ ভঙ্গের প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হয় । রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ উদ্ধৃতির মাধ্যমে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্বকীয় অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন । তিনি বলেন,

"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না । বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভুতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে । পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম । এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব । বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে । সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ । কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আন্তরিক ঐক্য উদবেল হইয়া উঠিবে– তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু

বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন। একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন। এই পূর্বপশ্চিম হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন, রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে। ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে। সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।”[৪৯] এ অর্থেই বঙ্গ-বিচ্ছেদ-সুবাদে ভারতীয়তের অর্জনও কম নয়। এতকাল তাঁরা পারস্পরিক বিভেদ-বৈষম্য, শ্রেণি-চারিত্র্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, অভিজাত-অনভিজাত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-দৈন্য ও ঐক্য-মতানৈক্য নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। এই প্রথম বহিঃশক্তির প্রচণ্ড ধাক্কায় আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে আত্মগত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পরস্পর পরস্পরের প্রতি এগিয়ে আসতে থাকেন। নিজের স্বত্বঅস্তিত্ব- অস্মিত্ব রক্ষায় একবার নড়েচড়ে বসতে উদ্যত হলো। স্বকীয়-সুপ্ত ক্ষমতার প্রতি আত্মপ্রত্যয়ীর বলিষ্ঠ প্রয়াস ক্রমাগত ব্যাপ্ত হতে থাকে। এবং নিজেকে পুরোপুরি চিনে নিয়েই বাঙালি সাম্রাজ্যবাদী বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়। যা একসময় স্বাধীনতার দুর্বার চেতনাকে শাণিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বাঙালি চরিত্রের এই আত্মবোধনজ্ঞাপক বৈপ্লবিক বিকাশকে পরম শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দিত করেন। এবং তিনি অত্যন্ত মনোগ্রাহী ভাষায় ভারতীয়দের এই সুষম-সাহসিক উচ্চারণকে উৎসাহ প্রদান করেন। এ-সূত্রে তিনি এ দেশের অন্তর্গত ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনেও তাঁদের সুস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। এবং ঘরের সম্পদেই পরকে মোকাবেলা করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। অথচ, এতকাল যা ছিল জড়িমাগ্রস্ত অভ্যাসের হেঁয়ালিপূর্ণ প্রাত্যহিকতায় বিপর্যস্ত। আজ এরই মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেয়ার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ কাব্যময় ভাষার মৃদু-মাধুর্য ভঙ্গিতে বলেন,

“তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব। প্রোভিন্‌সাল কন্‌ফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না। এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টকে বলিব ধন্য– তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না– তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে– আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব-সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।”[৫০]

রবীন্দ্রনাথ অন্তর্গত অর্থেই মহাপুরুষ। কালের ঔচিত্য-বোধসমন্বিত নিরিখে একজন যথার্থ ব্যক্তিত্ব কাল পেরিয়ে মহাকালের চিরায়ত ধারায়ও তা টিকে থাকার স্পর্ধা করতে পারে। অর্থাৎ, কাল-কালান্তর ছাড়িয়ে একজন চিরায়ত যুগন্ধর-পুরুষ-রূপে কীর্তিত। যা রবীন্দ্রনাথের চরিত্র মূল্যায়নে প্রতিমুহূর্তেই মনে রাখা দরকার। নইলে প্রতি পদে পদে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা। এবং পরিণামে রবীন্দ্রমনীষার মূল্যমান নির্ধারণে অজস্র ভুল-বিভ্রান্তি জড়ো হতে বাধ্য। যে কোনো ব্যাপারে রবীন্দ্রপ্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যবিভা অব্যাহত রয়েছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ,

রাজনীতি, সমাজসংস্কার, অর্থনীতি– ইত্যাদি ব্যাপারে তা সর্বোচ্চ অনুভব অন্বেষার সাথে অনুসৃত হতে দেখা যায় এর সাথে যুক্ত হয় তাঁর স্বভাবসুলভ কবিত্বকৃতি । জন্মসূত্রে পাওয়া মনন-মনীষা, ধর্মচর্চা-শিল্পচর্চা, সমৃদ্ধি-সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার-অধিকার– ইত্যাকার প্রাপ্তিযোগ রবীন্দ্রনাথকে গড়ে তোলে । এ কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ বেদ, উপনিষদ, সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বৌদ্ধবাদ, খ্রিস্টবাদসহ পৃথিবীর সর্বমানবিক বোধবুদ্ধি-সমন্বিত চিন্তায় পরিস্নাত এবং দ্বৈত-অদ্বৈত যোগাযোগের মাধ্যমে এক অখণ্ড বিশ্বাত্মার সাথে অন্বিত । এই এক আত্মার মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ-লীলা, দুঃখ-বিরহ, অভিসার-মিলন, পরিণয়-পরিণতি সংঘটিত হচ্ছে । যা আবার সেই পরম আমিরূপী এক অখণ্ড আত্মার সাথেই মিলিয়ে যায় । জন্ম-মৃত্যু পেরিয়ে সৃষ্টি জগতের এই প্রবাহ-পরিক্রমা অব্যাহত রয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এই অখণ্ড অনন্ত সৃজনসৃষ্টির প্রতিভূ হয়েই সারাজীবন বাণীর সাধনা করে যান । রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই । এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে আমি প্রণাম করেছি মহৎকে ; আমি কামনা করেছি মুক্তিকে । যে মুক্তি পরম-পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি 'সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি । তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ । আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে– এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা– তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি ।"[৩১] এই সর্বানুগ-সর্বসম্মত রবীন্দ্রনাথ যে-কোনোরকম বিভেদ বৈষম্য ও বিচ্ছেদ-ব্যবচ্ছেদ-পূর্ণ নিয়মনীতি মেনে নিতে নারাজ । এ যেন আত্মখণ্ডন খর খড়্গের প্রচণ্ড আঘাতের যন্ত্রণা বয়ে আনে । ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গ-বিচ্ছেদ সিদ্ধান্তের কালেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ দাহ্য-দহন আঘাতে দগ্ধ হতে থাকেন তিনি একেবারে সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান । অজস্র শিল্পসৃষ্টির পাশাপাশি সভা-সেমিনারের মাধ্যমেও তা অব্যাহত রাখেন । ১৩১৪ সালে অনুষ্ঠিত পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী-তে রবীন্দ্রনাথ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন । এ পর্যায়ে তিনি একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণ রচনায় প্রবৃত্ত হন । এ ভাষণের মধ্যেও তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার একটা সারগর্ভ উপস্থাপনা লক্ষণীয় । সেখানে বারবার ঘুরেফিরে বঙ্গ-বিভাগ প্রসঙ্গই স্থান করে নেয় । রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এ অবস্থার কার্যকারণ ও উপযোগ-অভিযোগ তুলে ধরেন । এবং এর অন্তর্নিহিত রূপপ্রকৃতির একটা ব্যাখ্যাসূত্র তুলে ধরা হয় । বঙ্গবিচ্ছেদ উপলক্ষে বাঙালি চরিত্রের আত্মগত শৌর্য-বীর্য আবিষ্কার করতে হবে এবং তা যুগোপযোগী প্রস্তুতির দ্বারা শাণিত হওয়া প্রয়োজন । সেখানে বাহ্যিক বিভেদ-বিভাজন কোনোক্রমেই কার্যকর হতে পারে না । রবীন্দ্রনাথ এ জন্যেই বাঙালির একাত্ম-অন্বয় অনুভবের ঐতিহ্যকে উৎসাহিত করে তোলেন । তিনি বলেন,

"বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি । এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরো বেশি চেষ্টা করিতে হইবে । পরের নিকট যে দুর্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায় । পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয় । এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে । আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না: কারণ, এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি: ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষকে পাঠাইয়াছেন ইহার

কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, ভ্রাতৃগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে– আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারংবার ক্ষমা করিতে হইবে। পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না।”[২২]

বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে জড়িমাগ্রস্ত বাঙালি নড়েচড়ে বসে। ঐতিহ্যগত অভ্যাসের আবেগ ও নৈষ্কর্ম প্রচণ্ড বস্তুবতার মুখোমুখি হয়। এতে কিছু কিছু যুবসম্প্রদায় দেশের জন্য ওঠে-পড়ে লেগে যান। অত্যুৎসাহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিকে দিকে সংক্রমিত হতে থাকে। এমনকি তা একসময় জ্বালাও-পোড়াও, গুপ্তহত্যা, বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও গোপনীয় কর্মকাণ্ডের মতো ভয়াবহ পথে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এহেন বিধ্বংসী বিস্তারকে কখনো সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি আত্মোন্নয়নের পথে আত্মশক্তির মাধ্যমে সবকিছু মোকাবেলা করতে চান। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অন্যান্য নন্দনবোধ উপকরণকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে গড়ে তুলতে হবে। একটা সার্বজনীন মুক্তির চেতনা ক্রমান্বয়ে আত্মবোধের মাধ্যমে জাগ্রত করা প্রয়োজন। এই চেতনালব্ধ শক্তিই দেশের সার্বিক মুক্তি আনয়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে। যা এ দেশকে একটা স্থায়ী স্বাধীনতার সুখ এনে দিতে সক্ষম। অন্যথায় বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা তা কখনো সম্ভব নয়। যা জীবনে বারবার পরাধীনতার গ্লানিকর শৃঙ্খল বয়ে আনতে পারে। কারণ, আজ ইংরেজ জাতির কাছ থেকে জাতি মুক্ত হলেও কাল অন্য যে-কোনো জাতি ক্রমান্বয়ে একইভাবে প্রবেশ করতে পারে। অথবা পরদিন অন্য কোনো জাতি অথবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সুতরাং এ অবস্থায় আগে চাই আত্মবোধসম্পন্ন সমুন্নত মানুষ। মানবিক গুণাবলিতে সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী। মনুষ্যত্ব-মূল্যবোধ-সম্পন্ন চরিত্রের মানবতাই ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম। এজন্যে স্বাধীনতার বহ্নিময় চেতনা একেবারে আত্মগত-অনুভব থেকে উদগীরণ হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ইনিয়ে-বিনিয়ে কতশত উপমা উদাহরণযোগে এই কথাগুলোকেই বলে গেছেন। মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্যেও এর কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন,

“তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল। যেহেতু ইংরেজ সরকারের পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জনের মূলে, সেইজন্যে সেইদিন এই কথা বলতে হয়েছিল 'এহ বাহ্য'। এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই কথা বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া।”[২৩]
রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধেই বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক তত্ত্বদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ে তাঁকে প্রচলিত কোনো রাজনীতিকের শ্রেণিচরিত্রে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি একটা নিজস্ব দর্শনদীক্ষাসুলভ মতবাদ উপস্থাপন করেন। যা মানুষের মৌলিক, নান্দনিক ও চিরায়ত প্রবৃত্তির সাথে বিজড়িত। এ শুধু রাজনীতি কেন? জগৎ ও জীবনে মানুষের জন্য তা অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন। এবং মানুষের সঠিক মুক্তির লক্ষ্যেই এ পথের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তাঁর অখণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ জীবনানুভবের একটি অংশ মাত্র। আবার এ পথ বেয়েই তিনি অনন্ত অসীম মানবাত্মার সাথে মিলিত হতে চান। সুতরাং বাহ্যিক কোনো ক্রিয়াকর্মসূচি নয়– আত্মগত উৎকর্ষের মাধ্যমেই মানুষ সে

পথের যোগ্য হয়ে ওঠতে পারে। নইলে বারবার এবং ক্রমাগত তাকে পরাধীনতার গ্লানি বহন করতে হবে; এর থেকে কোনো পরিত্রাণ নেই। দেশের মধ্যে আত্মগত বিস্তার দায়িত্ব পালন ও ন্যায়নিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ আপন হয়; এবং এই অর্জনের আত্মশক্তি জাতি ও জাতীয় জীবনের মুক্তিদূতরূপে আবির্ভূত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে। কিন্তু আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য, এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

... দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই- সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্যব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।"[৩৪]

এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। শুরু হয় মুক্তিকামী ভারতীয়দের সর্বাত্মক আন্দোলন। এ সময় রবীন্দ্রনাথ নানামুখী বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বরূপ প্রকৃতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এবং কখনো কখনো এসব কর্মকাণ্ডে সশরীরে উপস্থিত হন। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রচুর সভা সমিতি সেমিনারে যোগদান করতে দেখা যায়। এবং এ উপলক্ষ্যে বিচিত্র সব রচনার মাধ্যমে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। তবে এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ স্বদেশী আন্দোলনকেই অধিকতর উপযোগী মনে করেন। এবং এর সপক্ষে তাঁর যৌক্তিক কারণসমূহ উপস্থাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ যেন আত্মকৃত স্বাধীনতাস্বপ্নেরই প্রতিফলন মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন,

"......মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে- তাদেরই আপন বেশে এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস। এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। ... সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহুদিনের রুদ্ধদ্বারে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াল অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধ্যা, অনেকদিন থেকে এই শিক্ষার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি: .... প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই যে প্রেম উদবেলিত হয়েছে এটা একটা অবান্তর বিষয় নয়- এইটেই যুক্তি.. । ... কারণ, আমি একেই আমার দেশের মুক্তি বলি... ।"[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমযোগেই দেশের আত্মিক মুক্তি কামনা করেছেন। যা মূলতঃ ব্যক্তিক চরিত্রের মন ও মনশীলতার উপর গঠিত; এবং মনুষ্যত্ববোধের বিবেকনিয়ন্ত্রিত চিন্তা ও চেতনার দ্বারা পরিস্নাত; এ তাঁর কবিসুলভ জীবনভাবনারই

অন্য একটা রূপ-রূপান্তর মন্ত্র। এ অর্থেই সমালোচকগণ তাঁকে রাজনীতির সাথে যুক্ত অথবা বিযুক্ত ভেবে দ্বিধান্বিত হন। যেমন রবীন্দ্র জীবনীকার বলেন,

"রাজনীতি কবির ধর্ম নহে। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন যেখানে উহা মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত নহে, মানবধর্ম হইতে খণ্ডিত নহে; যেখানে রাজনীতি ধর্মকে অতিক্রম করে না– সেই রাজনীতির সহিত কবির অন্তরের যোগের সম্ভাবনা।"[৫৬] রবীন্দ্রনাথ এ লক্ষেই যাবতীয় প্রয়াস পদক্ষেপে প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন রকমের আয়োজন-অন্বেষা অব্যাহত থাকে। ইতিহাস ঐতিহ্য চর্চার পাশাপাশি যাবতীয় সামজিক ক্রিয়াকর্মও এ উদ্দেশ্যে নিবেদিত এবং এর মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ

"এই প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবিরের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র (৪র্থ ও ৫ম খণ্ড) সমালোচনায় তিনি একস্থানে বলিয়াছেন– 'প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য এই যে, কেবলমাত্র প্রতিবাদ বা সমালোচনার মধ্যে তা বদ্ধ থাকেনি। ... তাঁর বক্তব্য এবং চেষ্টা এই যে ভারতীয় চরিত্রের দুর্বলতার যে রন্ধ্রপথে এদেশে শনির আবির্ভাব তাকে বন্ধ করতে হলে কেবল অন্যের সমালোচনা চলবে না। তার জন্যে প্রয়োজন আত্মবিচার এবং চরিত্র পূজা'– চতুরঙ্গ পৌষ– ১৩৪৭"।[৫৭] এই আত্মকৃত ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বরাবরই মুখর। সত্য ও মিথ্যাকে সমানভাবে গ্রহণ-বর্জন করার মতো সৎসাহস সবসময় বজায় ছিল। যে-কোনোরকম প্রবোধ-প্রলোভন কখনো তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি। ফলে কোনো মতামতকেই তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। শুধুমাত্র সত্যের নির্যাসটুকুই অকপট বিশ্বাসের সাথে মেনে নিয়েছেন। বাকিটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ পর্যায়ে মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'কবি সার্বভৌম' গ্রন্থের 'জাতীয় জীবন' অধ্যায়ে বলেন,

".... কোনো পলিসি বা মতকে একেবারে সর্বতোভাবে সত্য বলে মেনে নিয়ে তিনি কখনো অচলায়তন গড়তেন না। হিংসাত্মক প্রবলতাকেই হোক বা সবল অহিংসার দৃঢ়তাতেই হোক যখনই কোনো সত্য বিশ্বাস ও অকপট প্রচেষ্টা দেখেছেন কবি তাকে স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক পথে যতটুকু সত্য, যতটুকু ন্যায় আছে, ত্যাগ আছে, মানবধর্মের মহত্ত্ব আছে সেটুকু তিনি সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছেন।"[৫৮] এ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সামান্য ও বিভাজনের ভিত্তিতে নিজের অবস্থানকে তুলে ধরেন। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্র থেকেই স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। যেমন, ১৩১৩ সনের সাহিত্য সম্মিলনী সভার সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে একজন সর্বাঙ্গসার্থক কৃতিমান পুরুষরূপে অভিনন্দিত করেন,

"সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আপনারা রবীন্দ্রবাবুকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করুন যিনি আমাদের সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্র আর নাই। গদ্যে পদ্যে তাঁর অসীম প্রতিভা। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি আমাদের একজন প্রধান অধিনায়ক, ইহা তিনি স্বীকার করুন আর নাই করুন।"[৫৯]

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই তাঁর স্বীয় আদর্শ-অবস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপন সংগ্রাম করেছেন। সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম– প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর এই আত্মোৎসর্গ লক্ষণীয়। যখন যেখানে প্রয়োজন মনে করেন- সেখানেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আবার প্রয়োজনমত সরেও এসেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ করা যায়

"রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন এবং ছিলেন না– এই দুই কথাই সত্য। এ কথা যথার্থই সত্য যে তিনি সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের ন্যায় কখনো রাজনৈতিক কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই; কিন্তু যখনই দেশের ডাক পড়িয়াছে তখনই যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা দেশবাসীর বা সরকার-বাহাদুরের অপ্রিয় হইলেও নির্ভীকভাবে ও নিঃসংকোচে বলিয়া গিয়াছেন। সরকারের দোষ প্রচুর পরিমাণে দেখাইয়া আমাদের একদল নেতা নিজ কর্তব্য সমাপন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করেন– রবীন্দ্রনাথ সে-ধরনের সমালোচক নহেন। দেশবাসীর মধ্যে যে পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া বিদেশীর এই শাসনকে সম্ভব করিয়াছে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তিনি বারবার বলিয়াছেন; পরাধীনতার কারণ বাহিরে নাই– তাহা আমাদের মধ্যেই আছে। সাধারণত স্বাধীনতা অর্থে রাজনীতিক স্বাধীনতা বুঝায়; কিন্তু উহা যে মানবের সর্ববিধ স্বাধীনতা বা মুক্তি বিষয়ে প্রযোজ্য, এ কথা সহজে স্বীকৃত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর জন্য এই সর্ববিধ স্বাধীনতা চাহেন– কেবল রাজনীতিক স্বাধীনতায় তিনি তুষ্ট নহেন।"[৬০] রবীন্দ্রনাথ এই সমূহ স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে কখনো দ্বিধান্বিত হন নি। বিশেষত, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকা বেশ চোখে পড়বার মতো।

"যাকে আমরা স্বদেশী আন্দোলন বলে জানি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম চিন্তানায়ক। তখন তিনি একেবারে প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখনকার দিনের কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরা ভুলতে পারবেন না রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, সংগীত ও উপস্থিতির যে কি উদ্দীপনাময়ী শক্তি। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর ইঙ্গিত থেকে বঞ্চিত হলে স্বদেশী আন্দোলন ভিন্নতর মূর্তি গ্রহণ করত।"[৬১] তবে এ আন্দোলন যে সবসময়ই রবীন্দ্রকৃত নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছে– তা নয়। কখনো কখনো তা বিকৃত পথে ধাবিত হয়। এবং তখনই তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এমনকি তিনি মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সাথেও মতপার্থক্য ব্যক্ত করেন। অবশ্য যখন তা রবীন্দ্র আদর্শের পরিপন্থী ও ধ্বংসাত্মক পথে পরিচালিত হয়। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আগমন করেন। এখানে কবির সাথে মহাত্মার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলে। সেসময় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন একেবারে তুঙ্গে। কিন্তু কোথাও কোথাও তা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে কাছে পেয়েই বলতে থাকেন–

"গান্ধীজী! আপনি ঘরের বারান্দায় এসে দেখুন, আপনার অহিংসপন্থীরা কী করছে! তারা চিৎপুর রোডের দোকানগুলো থেকে কাপড় চুরি করে এনেছে এবং আমাদের বাড়ির উঠোনে জ্বালিয়ে এখন একদল বিকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন সাধুর মতো উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। এই কী অহিংসা? গান্ধীজী, আপনি স্বয়ং জানেন আমরা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। আপনি কি আপনার অহিংস নীতির সাহায্যে এ ধরনের আবেগ কঠোরভাবে দমন করতে পারবেন? আপনি জানেন। আপনি তা পারবেন না।"[৬২]

এই সংকীর্ণ গলিঘুঁজি পথের চৌর্যবৃত্তি দ্বারা কখনো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। এতে শুধু চিত্তের দৈন্যদীর্ণ স্বার্থপরতাই বৃদ্ধি পায়। অসৎ পথের কলঙ্ক-কালিমা সত্যের পথকে ঢেকে দেয়। এর মাধ্যমে বড় হওয়ার সুযোগ নেই, বরং আত্মগ্লানির সংকীর্ণ সীমায় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ বারবার এই হীন স্বার্থপ্রবুদ্ধ পথকে প্রত্যাখ্যান করেন তিনি ভারতীয়দের সুমহান ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তা মহৎ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভরপুর, সত্যিকার অর্থেই দেশমাতৃকার জন্য এই আত্মনিবেদন। রবীন্দ্রনাথ সেই বৃহত্তর মুক্তির লক্ষ্যেই স্বদেশী আন্দোলনকে

উৎসাহিত করতে চান। যে পথে ভারতমাতা চিরকালই এ দেশের সন্তানদের আহ্বান করতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার নৈতিক স্বরূপপ্রকৃতি উল্লেখ করতেও ভুলেন নি।

"দেশভক্তির আলোক জ্বলিল. কিন্তু সেই আলোতে এ কোন দৃশ্য দেখা যায়– এই চুরি ডাকাতি গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে- দৈন্য যে-জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিক্যাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্য সেই জড়তা সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিক্যাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না। এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। য়ুরোপীয় সভ্যতায় এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি. কিন্তু বিধাতার দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে: আর বাহ্য ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি. তারপর পোলিটিক্যাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো. যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।[৬৩]

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই স্বদেশী আন্দোলনের নামে এই বর্বরোচিত আচরণকে পরিত্যাগ করার কথা বলেন। এ পথে কখনো শুভ পরিণতি সম্ভব নয়। সহজ. স্বাভাবিক. সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত পথেই মানুষের সার্বিক মুক্তি-অর্জন সম্ভব হতে পারে।

"স্বদেশী উত্তেজনার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পন্থার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্যায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না. অন্যায়ের ঋণটাই ভয়ংকর ভারী হইয়া উঠে। ... অতিশয়-পন্থা বলিতে আমরা এই বুঝি. যে পন্থা না ভদ্র. না বৈধ. না প্রকাশ্য: অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই 'একস্ট্রিমিজম' বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি। সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে. 'এক্স্ট্রিমিজম' গর্বমেন্টের নীতিতেও অপরাধ।"[৬৪]

এসব চরমপন্থার উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে রবীন্দ্রনাথ কখনো মেনে নিতে পারেন নি। আর এসবের আড়ালে নেতা-কর্মীদের কপটতাও সমধিক হারে ভয়ংকর। রবীন্দ্রনাথ এহেন জঘন্য কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধেই সারাজীবন তৎপর ছিলেন। তিনি মনে করেন. আত্মগত চরিত্রের স্খলন-পতন. সহিংস আচরণ ও প্রতারণার কপট ভড়ং এক সূত্রে গাঁথা। যা তিনি বাঙালি চরিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে অবলোকন করেন। বক্তৃতার নামে জিহবা আস্ফালন ও কাজের বেলায় সটকে পড়া এ যেন ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ অন্যায়ের প্রতিবাদে কূপমণ্ডুক প্রাণির মতোই পলায়নপর প্রবৃত্তির নিকট বন্দি। এসব মেরুদণ্ডহীন অকর্মণ্য জবুথবু জীবনজড়িমাই বাঙালির স্বাধীনতা-সাম্রাজ্য কেড়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের এসব অসংগতি-অনাচার অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে তাঁর এই আত্মোপলব্ধি অনেকটাই একটা আন্তরিক মুহূর্তে ধরা পড়েছে। এ আলোচনায় জালিওয়ালানবাগ হত্যাকাণ্ড. সুবিধাবাদী রাজনীতি. মানুষের হঠকারিতা. রাজনীতির নামে অপদার্থ-অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিবর্গের লম্ফঝম্ফ-ইত্যাকার সমাজবাস্তবতা উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথ বলেন.

"........সেই প্রথম স্বদেশী যুগে নেমেছিলুম তো কাজে, কিন্তু টিকতে পারলুম না, গদগদ sentimenatalism-এ ভারাক্রান্ত সে আবহাওয়া ক্রমে আবিল হয়ে উঠল, ধিক্কার এলো মনে। সব বক্তৃতা দিতে উঠতেন- মাটি তো নয়, যেন মা'টি, কেঁদে ভাসায় আর কি। অসহ্য হয়ে উঠত আমার। কিছুতেই মিলতে পারলুম না। একটা সত্য আদর্শের দ্বারা চালিত, সুস্থ বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠ, সবল চরিত্র আমাদের দেশে একেবারে বিরল। সে সময় আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল, যখন দেখলুম কত মৌখিক কত ব্যর্থ এসব গদগদ বক্তৃতা। ... জানো সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারের সময়, তখনও এদেশে ভালো করে খবর পৌছয়নি। আমি বোধ হয় আশু চৌধুরীদের ওখান থেকে খবর পাই, ভালো করে মনে নেই। শুনে যে একটা প্রবল অসহ্য কষ্ট হয়েছিল, সে আজও মনে করতে পারি। কেবল মনে হতে লাগল- এর কোনো উপায় নেই, কোনো প্রতিকার নেই, কোনো উত্তর দিতে পারব না, কিছুই করতে পারব না? এও যদি নীরবে সইতে হয় তাহলে জীবনধারণ যে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সেই রাত্রেই ওই চিঠিই লিখলুম। রাত চারটের সময় চিঠি শেষ করে তবে আমি শুতে যেতে পেরেছিলুম। কাউকে বলিনি এ বিষয়ে, রথীদেরও না, জানি এসব ব্যাপারে বেশি পরামর্শ কিছু নয়। ... সেই সময় আমি গান্ধিজীকে বললুম যে, এ ব্যাপার নিয়ে আপনি একটা দেশব্যাপী আন্দোলন এখনই শুরু করুন, কিন্তু তিনি তখন রাজী হলেন না। তখন তাঁর বড়লাটের সঙ্গে কোনো একটা সুবিধের পরামর্শ চলছিল- সেটা নষ্ট করতে চাইলেন না, পরে অবশ্য এই ব্যাপারকেই প্রধান প্ল্যাটফর্ম করে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার কী যে আশ্চর্য লেগেছিল বলতে পারিনে। তারপর চিত্তরঞ্জনকে বললুম যে, একটা প্রটেস্ট মিটিং এর ব্যবস্থা কর, আমিও বলব তোমরাও বলবে। সে বললে, আপনি করুন, আমরা না হয় সভায় উপস্থিত থাকব। একে কি বলতে চাও? এই সব হল পোলিটিসিয়ানদের পলিটিক্স। সুবিধে বুঝে বুঝে চলতে হবে, এর সঙ্গে কখনো মন মেলাতে পারিনি।"[৬৫]

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির এই বর্ণবহুল ভেদনীতিতে কখনো আস্থা পোষণ করতে পারেন নি যা অন্তরে বাইরে কপটতায় ভরপুর। এখানে মননশীল চিন্তায় শুদ্ধ আত্মার বসবাস কখনো সম্ভব নয়। সৃজনশীল ভাবনায় নব নব উদ্ভাবনও সুদূরপরাহত। এ অবস্থায় দেশ-মাতৃকার প্রগতি-প্রণোদনা কখনো আশা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বারবার এহেন রাজনীতির বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত হন। এবং বহুবার তিনি রাজনীতির এই প্রেক্ষাপট থেকে দূরে সরে দাঁড়ান রাজনীতি যখনই হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, সন্ত্রাস, হত্যা ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়- তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছেন।

"বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। যে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল, বাঙালি ও ভারতীয় জীবন ধারার সামগ্রিক ভাবে উন্নয়ন, শুধু বিদেশী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে নিস্ফল উত্তেজনা সৃষ্টি নয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এবং স্বদেশিক আন্দোলন হঠাৎ রাজনৈতিক দলাদলি উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসী হিংসা, স্বদেশীয়ানার ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা এবং হিন্দুয়ানির ছদ্মবেশে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি উগ্র হয়ে জাতির শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে নিল। রবীন্দ্রনাথ মনের আকাশকে কখনোও খণ্ড খর্ব করে দেখতে চাননি, স্বদেশ প্রেমের স্থলে রক্তশোষী উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেননি। শাসকের বিরুদ্ধে গুপ্ত অভিযানের রক্তাক্ত পরিণাম কোন দিন মেনে নিতে পারেননি।"[৬৬] এসব বাহ্যিক আড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতার জন্য তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। মনের মধ্যে একটা বৈরাগ্য ভাবের স্বেচ্ছানির্বাসিত আত্মবলয় তৈরি হয়। সেখানে তিনি এ উপলক্ষে সৃষ্ট যতসব রচনা ও পুঁথিবিভ্রাট থেকেও মুক্তি পেতে চান।

রাজনৈতিক দলাদলি, হানাহানি, ষড়যন্ত্র ও কূটিলতার মিথ্যা মরিচীকা সমাজব্যবস্থাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও কপটচারিতায় মানসিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ে মনুষ্যত্ববোধের সবক'টি বিশ্বাস-বৈভব মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কবি রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ হতাশাবোধে মুষড়ে পড়েন। মানবিক সম্পর্কের এই পারস্পরিক বৈরীতা কবিআত্মার পক্ষে মারাত্মক বেদনাবোধ সৃষ্টি করে। কবিগণ বরাবরই মানুষের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার জয়গান উচ্চারণ করে থাকেন সেখানে এই বিরোধ বৈরীভাব কবির পক্ষে একপ্রকার আত্মখণ্ডন ছাড়া আর কিছুই নয়। এক নিদারুণ যন্ত্রণা– যা তাকে অহর্নিশ পুড়িয়ে মারে এ অবস্থায় কবি রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত মানুষকেই হৃদয়ের সবটুকু অর্ঘ নিবেদন করেছেন কারণ, এর বাইরে একজন কবির কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মানুষের সর্বময় জয়জয়কারের কথা ভেবেই তিনি নিদারুণে উচ্চারণ করেন,

"আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যবঞ্চিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি– পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।[৬৭]

কিন্তু চেষ্টা করলেও পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো স্পর্শচেতন ব্যক্তির পক্ষে তো তা আদৌ সম্ভব নয়। যখনই মানবিকতার গৌরব-গরিমা বিপর্যস্ত হয়– তখনই রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন। অথবা মানবতার বিপর্যস্ত-বিত্রস্ত অবস্থায় তিনি বরাবরই এবং সারাজীবনই অতন্দ্র সময় কাটিয়েছেন। কাজেই যতই বিরুদ্ধ বাস্তবতা হোক, রবীন্দ্রনাথ তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত-বিমর্ষ চিত্তে রাজনীতির এক নির্মম দৃশ্যপট দেখে আঁৎকে উঠেন। শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে (কবিতা, আশ্বিন, ১৩৫০) লেখেন–

"আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎসতায় আবিভূত হল। এক দিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর– এক দিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাই নে। ... পৃথিবীর তিন মহাদেশে– এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে– এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না– মনুষত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে।" চারিদিকে যুদ্ধের বীভৎস আয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বেপরোয়া আস্ফালনে সারা পৃথিবী আজ প্রকম্পিত। তবু বিশ্বমানবতার পক্ষেই কবির অবস্থান সুদৃঢ়।

তিনি 'সেঁজুতি' কাব্যের জন্মদিন কবিতায় অনুরূপ একটি ভাবানুভব তুলে ধরেন। সাম্রাজ্যিক শক্তির ক্রমাগত নির্লজ্জ আত্মপ্রসারে সারা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। মানুষরূপী জন্তুর হুংকারে স্বাভাবিক জীবনযাপন বিপন্ন হতে চলেছে আত্মসুখপরায়ণ ও স্বার্থান্ধ এসব জাতিগোষ্ঠির কাছে পুরো মানবজাতি জিম্মি হয়ে পড়ে। এর মধ্যে কিছু জ্ঞানপাপীর মূঢ়তাও কবিকে দারুণভাবে আশাহত করে তোলে। এতে সার্বিক পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কপট ধ্বজাধারীদের বাহ্যিক সাধুবচনই সমকালীন রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। তবে শেষপর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথ এতসব কিছুর পরেও অবিশ্বাসী হতে পারেন নি। সত্য, সুন্দর ও চিরায়ত মানবসম্পর্কের

পথই তিনি অবিনশ্বর বলে মনে করেন। যা কখনো, কোনো অবস্থায়ই বিলুপ্ত হতে পারে না। শেষপর্যন্ত এই সত্য-সুন্দরের বিজয় অনিবার্য বলেও তিনি মনে করেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্লজ্জ বিস্তারের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হন। যা তাঁর অজস্র রচনার মধ্যে এর সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিশেষত, শেষ বয়সে রচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে এরই অন্তর্গত চিন্তাচেতনার পরিচয় মেলে। যেমন, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন,

"এমন সময়ে দেখা গেল। সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কিরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।[১৬]

'রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি' অভিসন্দর্ভ নিয়ে গবেষণায় 'প্রসঙ্গ কথা' অধ্যায়ে রাজনীতি বিষয়ের কিছুটা প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, সহাবস্থান ও তাঁর রচনায় সমকালীন ভারত-বিশ্ব রাজনীতির কতিপয় প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়। এ পর্যায়ে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির আলোকে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে প্রথমেই সংস্কৃতিবিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো এবং পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতির একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা যেতে পারে। অথবা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্ররচনায় সংস্কৃতির প্রভাব-প্রচ্ছায়া-বিষয়ক একটা নীতিদীর্ঘ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

সংস্কৃতি-জ্ঞাপক শব্দের কোনো সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই। শব্দটিও নানা আকারে প্রকারে ও পন্থায় গৃহীত। 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলা ভাষায় অল্প কিছুদিন যাবৎ ব্যবহৃত। ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২২ খ্রি. রবীন্দ্রনাথের সাথে পরামর্শক্রমে এটির ব্যবহার শুরু করেন। ইংরেজি culture শব্দের প্রতিশব্দরূপেই মূলত সংস্কৃতি শব্দের প্রচলন হয়। এর আগে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনা বোঝাতে 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের সমন্বিত ভাবনায় 'কৃষ্টি'র পরিবর্তে 'সংস্কৃতি' শব্দটি জায়গা করে নেয়। যদিও প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটি নিয়ে তৃপ্ত হতে পারেন নি। 'কৃষ্টি'র মূলগত অর্থ কর্ষণ-কার্য। চাষ অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, culture অর্থে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটিকে গতানুগতিকভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শব্দটি সম্বন্ধে তাঁর একটু অস্বস্তি ছিল। ১৯২২ সালে সুনীতিকুমার প্যারিসে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুকে culture এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করতে শুনে সুনীতিকুমারের খুবই মনে ধরে শব্দটি এবং বাংলা শব্দের জগতে একটি নতুন শব্দের সংযুক্তি সম্ভাবনার কথা ভেবে তিনি আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

"১৯২২ সালেই সুনীতিকুমার দেশে ফিরে এসে culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার 'কৃষ্টি' শব্দের চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। যদিও তারপরে দীর্ঘ বছর 'সংস্কৃতি'র চেয়ে 'কৃষ্টি' শব্দটি বাংলা ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু 'কৃষ্টি'র সেই সুদিন আর নেই। কৃষ্টির জায়গা দখল করেছে 'সংস্কৃতি'" [১৭]

'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। অনেকটা তা অসংজ্ঞেয়। এবং সুনির্দিষ্ট ছক সীমানায় আবদ্ধ করা কঠিন। জগৎ, জীবন, সমাজ তথা প্রকৃতিবিশ্বের সবকিছু নিয়েই সংস্কৃতির ভিত রচিত। আর এতো কখনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নীতির তোয়াক্কা রাখে না। অনিশ্চিত, আপেক্ষিক ও সম্পুরক সমবায়-সহাবস্থান নিয়ে এগিয়ে চলে। নানামুখী বৈশিষ্ট্য

বৈপরীত্য বিভিন্নতাই এর মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে। স্থান-কাল পাত্রভেদে জীবন ও সমাজ ভিন্ন. আবার প্রকৃতি, পরিবেশ, আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিপার্শ্ব-প্রবাহ জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং এই জগৎ-জীবন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে বিশেষ কোনো সুনির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ফলে সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনায় সমালোচকগণ নানামুখী বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। আর এ বিতর্ক প্রতিনিয়ত নব নব আঙ্গিক-উপাদান নিয়ে এগিয়ে চলে। এতে সংস্কৃতিবিষয়ক ধারণাও স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সুযোগ পায়। আর জীবনের destination যেহেতু কারো পক্ষেই অনুমান করা সম্ভব নয়- সেহেতু সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনারও কোনো সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করা এক সুকঠিন ব্যাপার।

তবে একথা সত্য যে জীবন প্রতিদিন বহুমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অপরিসীম কৌতূহল জিজ্ঞাসায় জগৎ ও জীবনের যত নব নব রূপপ্রকৃতি উন্মোচিত হচ্ছে। আজকের আবিষ্কার বা উদঘাটন আগামীকালই হয়তোবা প্রত্যাখ্যান। আবার আগামীকালের সত্যানুসন্ধান আজকের দিনে একেবারেই অজানা। এই বিবর্তনের ধারায় মানুষের ক্রমাগত অভিযাত্রা তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। মানুষ প্রতিমুহূর্তে হয়ে ওঠার তাগিদে এক নিরন্তর চেতনা অনুভব করে থাকে। পৃথিবীর অন্যসব সৃষ্টির মধ্যে এই অনুপ্রাণনা অনুপস্থিত. একমাত্র মানুষই জন্মমুহূর্তে বড় অসহায়। পুরোপুরিভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল ক্রমান্বয়ে সে পরিপার্শ্ব পরিস্থিতির সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলে। এই তৈরি হওয়ার প্রাণনা-প্রণোদনা তাঁর মজ্জাগত. এর ফলেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষ আর আজকের মানুষের মধ্যে এত পার্থক্য। সেই আদিম প্রকৃতির অরণ্যচারী গুহা গহবরের মানুষ আজ আকাশচুম্বী সভ্যতার কর্ণধার। জল, স্থল, আকাশ পেরিয়ে মানুষ গ্রহ নক্ষত্রে নিজের বিজয় পতাকা চিহ্নিত করে দেয়। দিক দিগন্তের দুর্গম গিরি তুষারে মানুষ ছুটে চলেছে। তারপরও এর বিরাম নেই। মানুষ প্রতিমুহূর্তে এই হয়ে-ওঠা গড়ে-তোলার স্বপ্নে বিভোর। এর শেষ কোথায়? মানুষ নিজেই জানে না। জানে না বলেই মানুষ ক্রমাগত ছুটে বেড়াচ্ছে। তবে একথা ঠিক, মানুষকে যে-কোনো মূল্যে সৃষ্টি করে যেতেই হবে। এই তাঁর অমোঘ-অনিবার্য নিয়তি হিসেবে নির্ধারিত।

এই বিবর্তনের বিস্ময়কর ধারায় মানবজীবনের সংস্কৃতি নির্ধারণ করা কঠিন. মানুষের অবিরাম সংগ্রাম প্রক্রিয়ার সাথেই সংস্কৃতির সম্পর্ক। এ কথা মনে রেখেই ড. পবিত্র সরকার সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

"মানুষ আসার আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর যে অবস্থা দাঁড়াল- এই দু'য়ের তফাতই হলো সংস্কৃতির তফাত। পৃথিবীর জীবন প্রতিবেশে মানুষের সৃষ্টি যা কিছু সে সবই সংস্কৃতি, বাকিটা হল প্রকৃতি।"[২৩]

এই গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এবং এর মধ্যেই সংস্কৃতি সাধনার প্রাণগত প্রণোদনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে. জীবনের প্রয়োজনে মানুষের এই বহুভঙ্গিম ছুটে-চলা সংস্কৃতির অবয়ব-আকৃতি গড়ে তোলে। এ অর্থে সংস্কৃতির রূপরেখাও অতিদূর বিস্তৃত হতে বাধ্য. অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তাকে অজস্র পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। জীবন সংগ্রামের প্রশ্নে জগৎ-জীবন-প্রকৃতির সাথে বহুমাত্রিক ভূমিকায় অংশগ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে. এ সুবাদেই মানুষের সংস্কৃতি সাধনার রূপপ্রকৃতি বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হতে থাকে "প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা-বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে ইহারই নাম জীবিকা-চেষ্টা. মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তার সহজসাধ্য করা। দৈহিক মানসিক প্রয়াস-প্রযত্নে এই জীবিকা যে ক্রমেই আয়ত্ত

করিয়াছে– এই প্রয়াস- প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার এক-একটি উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।”[৭১]

ক্রম-পরম্পরা পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের আন্তর প্রকৃতিও বদলে যায়। সে নিজেকে উপযোগ উপস্থাপনার মাধ্যমে শুধরে নেয়। ক্রমাগত গ্রহণ-বর্জন, আত্মানুসন্ধান-আবিষ্কার, আত্মোপলব্ধি-সমৃদ্ধি ও সৃষ্টি-সন্তুষ্টি নিয়ে এগিয়ে চলে। “He (man) opposes himself to nature as one of her own forces 2 setting in motion the arms and legs, head and hands. The natural forces of his body, in order to appropriate nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature.” (Capital-Marx, vol. I, pt. III, ch. vii, sec. I).[৭২]

এই পরিবর্তন মূলত মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সাথে বিজড়িত। একটা পরিশ্রুত জীবন ভাবনাই এর মধ্যে প্রাণবায়ু নির্গমন করে। ড. আহমদ শরীফ এ পর্যায়কে সংজ্ঞায়িত করে বলেন, “পরিশীলিত ও পরিশ্রুত জীবন-চেতনাই সংস্কৃতি।”[৭৩] এ জীবন অবশ্যই মানুষের নান্দনিক বোধবুদ্ধি দ্বারা জারিত। সুন্দর সুখস্বপ্নের এক বিপুল-বিচিত্র আয়োজন। জীবনের যত সৎ, মহৎ, পুষ্পিত ধ্যান-ধারণা এখানে বারবার এবং ক্রমাগত উঁকি দিয়ে যায়। প্রকৃতি বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য-সুষমা করায়ত্ত করার এক উদগ্র বাসনা কাজ করে। মূলত পরিমার্জিত জীবনভাবনার নিরন্তর প্রাণ প্রণোদনাই সংস্কৃতির ভিত্তি বৈভব নির্মাণ করতে থাকে। “সংক্ষেপে সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা, কাব্যপাঠের মারফতে ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায়, বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা; গল্পকাহিনীর মারফতে, নর-নারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণ কাহিনীর মারফতে, বিচিত্র-দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবন-কাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।”[৭৪]

সমালোচক গোপাল হালদারের এই সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনায় একটা ব্যাপ্তি আছে। এর মধ্যে জীবনের সার্বভৌম-সংস্কৃতি প্রস্ফুরিত হয়ে ওঠে। অনেকে আবার সংস্কৃতি আলোচনায় এর রূপপ্রকৃতি নির্ধারণে কিছু সীমা-পরিসীমা জুড়ে দেন। উৎস-অনুষঙ্গ চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হন। যেমন– ড. আহমদ শরীফ বলেন,

“সংস্কৃতির উৎসও অনেক। কেননা জীবনচেতনা ও জীবনের প্রয়োজন ঋজুও নয়, এককও নয়। এ জন্যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নৈতিকবোধ, আর্থিক অবস্থা, শৈল্পিক মান, রাজনীতির প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রয়োজন, মানবিক অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক সংস্থান, দার্শনিক চেতনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছু সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক একটি সংস্কৃতি।”[৭৫] সংস্কৃতির এই উৎস অন্বেষায় ঐতিহাসিক ধারাপরম্পরাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। M Felix Keesing তার Cultural Anthropology গ্রন্থে ‘Cultrue’ শব্দটির সংজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন এই বিষয়ে বিশ্বখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Clyde Kluckhohn (ক্লাইড ক্লাকহোন)-এর মতামত। সেই মতে Culture বা সংস্কৃতি হলো– “all those historically created designs for living, explicit and implicit.

rational, irrational and non-rational which exist at any time as potential guides for the behaviour of man" । 'অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো একটি জনগোষ্ঠির বংশানুক্রমে জীবনযাপন প্রণালীর নানা ছক, যার কিছু প্রকাশ্য, কিছু যুক্তিযুক্ত, কিছু যুক্তিবিরোধী, যে ছকগুলি মানুষের আচরণ বিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে ।"[৭৬] এছাড়া প্রখ্যাত সংস্কৃতি গবেষক বিনয় ঘোষ বলেন, "কালচার ট্রেট', হল সংস্কৃতির প্রত্যেকটি মৌল পদার্থ ও উপাদান, যার নানারকম সমাবেশে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপমণ্ডল হয় । যেমন– শিকার, চাষবাস, ঘরবাড়ি, দেবদাসী, দেবালয়, আচার-ব্যবহার প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান ।"[৭৭] জীবনের এই সৃজনমাত্রিক উপকরণ অনুষঙ্গ ঘিরেই সংস্কৃতির অবয়ব নির্মিত হতে থাকে । সময়, সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি তথা সবকিছুর সাথে অন্তর্গত চেতনার একটা মেলবন্ধন রচিত হয় । এবং ক্রমাগত জীবনের অস্তিত্বগত প্রয়োজনে সংস্কৃতির অনুরূপ রূপনির্মিতি সৃজিত হতে থাকে । একটা জাতির গর্বিত ইতিহাস ঐতিহ্যের পথ বেয়েই সংস্কৃতির অবয়ব-আকার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় । এর সাথে যুক্ত হয় বর্তমানের সময়োপযোগী ধারা-পরম্পরা । সেখানে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব । যেমন কালের অক্ষয়পটে ভাস্বর কৃতিমান ব্যক্তিত্ব-পুরুষ এই সংস্কৃতির মূলে প্রাণবায়ু সঞ্চার করে দেয় । তাঁদের অবিস্মরণীয় কীর্তি-গাথা এবং এরই ঐতিহ্যিক লালন-অনুসরণ সংস্কৃতির অবয়ব-অবস্থিতি নির্মাণ করতে থাকে । যা সময়োপযোগী পরিবেশ পরিস্থিতিকে আত্মীকরণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করে "বুদ্ধদেব-কনফুসিয়াস-সক্রেটিস-যীশুখৃষ্ট-হযরত মুহাম্মদ, কালিদাস-হাফেজ-শেকসপিয়ার-গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথ, কালের গর্জন অগ্রাহ্য করে এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ের মতো উন্নতশিরে । এঁদের উন্নতশীর্ষকে অন্তরে ধারণ করতে না পারলে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না । তাই সংস্কৃতির জন্য অতীতের জ্ঞান এতো প্রয়োজনীয় । কেবল 'বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় আবেগে উল্লাসি নৃত্য করলে সংস্কৃতি হয় না । অতীতে মানস পর্য্যটন প্রয়োজনীয় । অতীতেরই একটা রূপ আছে, বর্তমানের নেই । বর্তমান চিরচলন্ত, চিরপরিবর্তমান, তাই রূপের সীমায় বাঁধা পড়ে না । অতীত রূপের সীমায় বাঁধা, সে একখানা ছবির বই, আর এই ছবির বইখানা হাতড়াতে-হাতড়াতে অন্তরে যে সৌন্দর্য্য, যে শ্রদ্ধা জাগে তাই সংস্কৃতি ।"[৭৮]

অতীত, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ঘিরে সংস্কৃতির রূপরেখা একটা উৎকর্ষ উন্নয়নের পথে এগুতে থাকে । এ হচ্ছে মানুষের কাঙ্ক্ষিত কামনার যোগফল । তবে মানুষের এই অনুভাবনা পৃথিবীর সর্বত্র জুড়েই বিরাজিত । রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল– তথা সর্বত্রই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট । এর মধ্যে বিজ্ঞানের শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে বিজ্ঞানই যেন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে । মানুষের চিন্তা-চেতনা, কামনা-বাসনা, জীবন-জীবিকা, প্রাপ্তি-পরিণতি– প্রায় সবই যেন একচ্ছত্র আধিপত্যের সাথে দখল করে নেয় । বিশ্বের সর্বত্র এর অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষণীয় । এমনকি ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনেও এই ঢেউ আছড়ে পড়েছে । যাতে পরিবর্তনের একটা সামগ্রিক রূপরেখা প্রতিভাত হয়ে ওঠে । প্রাসঙ্গিক আলোচনায় গোপাল হালদার বলেন,

"..... বৈজ্ঞানিক জীবনধারার প্রচলনেও সমাজ পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে– তাহাকে বাধা দেওয়া অসাধ্য– আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তারও নূতনত্ব আসিতেছে । মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞানের প্রয়োগে নব কলেবর ধারণ করিতেছে । মানুষের সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে । তাই ভবিষ্যতের পথে মানুষের প্রধান অস্ত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি: আর বিজ্ঞানই মানুষের সেই নূতন জীবন-বেদ ।

যে পৃথিবী আদিকালের মানুষ দেখিতে পাইত, তাহা আর নাই । মানুষের চোখে তাহার রূপই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে । মনে হইবে, সেই তো সূর্য উঠে, সূর্য ডুবে, সেই তো মানুষ জন্মে-মরে, সেই প্রাণলীলা তেমনিই তো চলিয়াছে

সত্য। তথাপি আমরা জানি-মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আর তেমনটি নাই। বিজ্ঞান তাহার পরিচিত জগৎ, পরিচিত ধ্যানধারণা বদলাইয়া দিতেছে।"[৭৯] বিজ্ঞানের এই সর্বগ্রাসী পরিবর্তনের মুখে জগৎ জীবনের আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আর সাথে সাথে সংস্কৃতি-সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাও দ্রুততার সাথে পাল্টে যেতে থাকে। পাশাপাশি মানুষের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি এসে সেখানে যুক্ত হয়। ফলে এই পরিবর্তনের রূপময় প্রকৃতি বৈচিত্র ও বহুভঙ্গিম হতে বাধ্য। এতে স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের জীবনধারাও ভিন্নরূপে দেখা দেয়। এই বহুমাত্রিক জীবনধারাই সংস্কৃতির একটা ব্যাপকভিত্তিক স্বরূপ-অবয়ব গড়ে তোলে। যা মূলত জগৎ ও জীবনের একটা সার্বিক অবস্থাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়। "একটি জনগোষ্ঠির তৈরি জীবনযাত্রার প্রণালী, ছক, আচরণবিধি, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ভাষা, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংগীত, অবসর যাপনের পদ্ধতি, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম-বিশ্বাস, সামাজিক উৎসব, সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক বিচার পদ্ধতি সবই ওই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মধ্যে যুক্তিযুক্ত এবং যুক্তিবিরোধী, ভাল, খারাপ, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতা সবই থাকতে পারে। মিলে-মিশেই থাকতে পারে, এবং থাকেও।"[৮০] অর্থাৎ, সংস্কৃতিবিহীন কোনো মানবসমাজের অস্তিত্ব নেই। স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষ বিভিন্ন হলেও তা জাতিগত সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। একটি জাতি বা সমাজের বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ তথা যাবতীয় পারিপার্শ্ব নিয়েই সংস্কৃতির রূপাবয়ব গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারটিকে অনেকে আবার একেবারে শ্রেণি-বিস্তার নির্ণয় নিরূপণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেন। যেমন, সমালোচক গোপাল হালদার 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে বলেন,

"সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শুধু যে রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়- চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়- তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি- মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই। প্রথমত উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means): দ্বিতীয়ত সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজ-যাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure) আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদ। সেই মানস-সম্পদ এই হিসাবে সমাজ সৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (superstructure) সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধ-সত্য। কথা এই যে, সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়- এইটিই আসল কথা।"[৮১] এসব কথার মাধ্যমে সংস্কৃতিকে মানব সমাজের পরিপূরক বলেও প্রতিপন্ন করতে চান। সেখানে দেখা যায়, যে কোনো শ্রেণি, পেশা, পরিবেশ, স্থান, কাল পাত্রমাত্রেই সংস্কৃতির অধিকারী। যদিও তা রূপ-রূপান্তর অথবা কাল কালান্তরের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, মানবজীবন-মাত্রকে ঘিরেই সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। 'সংস্কৃতি' বা 'culture' মানুষ মাত্রেই আছে- এরই প্রতিধ্বনি শুনি ক্লাইড ক্লাকহোন-এর কথায়। তাঁর সোচ্চার ঘোষণা, 'to be human is to be cultured'"[৮২] তবে সংস্কৃতির এই ধারা-পরম্পরা ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ বিবর্তনেই অধিকতর হারে ব্যাপৃত থাকে। সমুন্নত মানুষ সৃষ্টির কাজে সমুন্নত সংস্কৃতির লক্ষ উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়। এ অবস্থার কারণে স্বভাবতভাবেই পরিপার্শ্ব প্রকৃতির অনিবার্য প্রভাব এসে যুক্ত হতে দেখা যায়। পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাকার সহযোগ-সমন্বয় এই

সংস্কৃতিরই অংশবিশেষ। যা একজন মানুষকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে দিতে সক্ষম। এ অর্থে সংস্কৃতির উৎস ও লক্ষ্যও বিচিত্রতর হতে বাধ্য। তবে ব্যক্তিচরিত্রের উৎকর্ষ সাধনার কল্যাণকামিতায় সংস্কৃতির অন্যতম উদ্দেশ্য নিহিত "সংস্কৃতির উৎসও অনেক। কেননা জীবনচেতনা ও জীবনের প্রয়োজন ঋজুও নয়, এককও নয়। এ জন্যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নৈতিক বোধ, আর্থিক অবস্থা, শৈল্পিক মান, রাজনীতির প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রয়োজন, মানবিক অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক সংস্থান, দার্শনিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছু সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি সংস্কৃতি।"[৮৩] এ সবকিছুরই সহাবস্থান-সমন্বয় ব্যক্তি মানুষকে গড়ে তোলে। মানবিক বোধবুদ্ধিসমন্বিত মনন-মনীষা যার পুষ্পিত প্রকাশরূপে সমাদৃত হয়ে থাকে। ফলে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন উন্নত চরিত্রের মানুষই সংস্কৃতির পরিচায়করূপে গৃহীত সেখানে মানুষের শ্রেষ্ঠতম গুণাবলি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যেমন– সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কল্যাণকামিতা, পরহিত-প্রবৃত্তি সংযত-সংহত-পরিশীলিত আচরণ, পরদুঃখকাতরতা, দেশ-প্রেম, মূল্যবোধ, ঔচিত্যবোধ, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা– ইত্যাদি তথা মানবধর্মই জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রকরূপে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। যা সংস্কৃতির প্রধান পরিচিতিরূপে যুগে যুগে মানুষের কাছে সমাদর লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ বলেন,

"মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির উৎস ও প্রসূন, বীজ ও ফল। কেননা মনুষ্যত্বই মানুষের সৌন্দর্য-অন্বেষা, কল্যাণবুদ্ধি ও মানবপ্রীতি জাগায়। আর কে অস্বীকার করবে যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কল্যাণকামিতা ও মানবপ্রীতিই সংস্কৃতিবানতার শেষ লক্ষ্য।"[৮৪] এই মননপ্রসূত প্রয়াস-প্রবৃত্তি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি প্রতিভাষরূপে ফুটে ওঠে। মানুষের নান্দনিক বোধবুদ্ধি এর অন্তর্গত অনুপ্রাণনারূপে ক্রিয়াশীল রয়েছে। মানুষের এই চিরায়ত প্রণোদনায় হয়ে-ওঠার নিরন্তর ভাবনাই সংস্কৃতির প্রাণ। এই চিৎপ্রকর্ষের সমূহ সমুন্নতিই সংস্কৃতিবান মানুষের প্রাণ-প্রতিমা নির্মাণ করে দেয়। যা জাতিগত জীবনেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক এক কথায় সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে চমৎকার বাগভঙ্গিমায় বলেন,

"সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা জাতির সর্বাঙ্গীণ চিত্তোৎকর্ষ।"[৮৫] সংস্কৃতির এই মর্মগত সমুন্নতি-সমন্বিত ব্যক্তিকেই আমরা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে অভিহিত করি। যা মূলত শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমে রূপলাভ করে থাকে। যেমন– কাব্য, উপন্যাস, নাটক, চিত্র, সংগীত, গল্প ইত্যাদি উপায় মাধ্যমে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। "সাধারণ বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা 'সংস্কৃতিবান' বলতে সমাজের সেইসব মানুষকেই চিহ্নিত করেন, যাঁরা সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, নাট্যকলা, নৃত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি কোনও এক বা একাধিক বিষয়ে জানেন-বোঝেন: অথবা এই ধরনের চারুকলার কোনোও একটি বিষয়ের সঙ্গে নিজের কর্ম-জীবন জড়িয়ে গেছে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই।"[৮৬]

সংস্কৃতির এই বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্যভাবেই একজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে সংস্কৃতি-সার্বভৌম ব্যক্তিপুরুষ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। জাতীয় সংস্কৃতির একটা সর্বাঙ্গসুন্দর রূপময় রূপাবয়ব তাঁর চরিত্রকে বিভূষিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি ও সৃষ্টিজীবনে এর বহুবর্ণিল স্বরূপ প্রকৃতি লক্ষণীয়। এমনকি তা ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বপৃথিবীর জনজীবনকে স্পর্শ করেছে। তবে তা তাবৎ সংস্কৃতির মূলীভূত মর্মসত্যকে অঙ্গীকার করেই বিকাশ লাভ করে। ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সার্বজনীন ধারাপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। "আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথকে ভারতসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক বলা যায়। ভারত সংস্কৃতির মৌল অভিপ্রায়কে আত্মস্থ করে নিয়ে আজীবন অস্খলিত নিষ্ঠায় কবি তার ভাবধারাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে তার আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতসংস্কৃতি যেন রবীন্দ্রনাথের মানবসত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তার ফলে অতীত ভারত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে

এমন প্রবল আবেগের সঞ্চার করেছে এবং তাঁর ধ্যানে এত উজ্জ্বল রূপে ধরা দিয়েছে। তাঁর অসংখ্য মননমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা তার পরিচয় বহন করে।"[৮৭] অতীত ঐতিহ্যের এমন সুযোগ্য সন্তান ভারতীয় জীবনে খুব কমই দেখা যায়। বেদ, উপনিষদ পৌরাণিক যুগ বেয়ে আধুনিক যুগের প্রতিটি প্রান্ত রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে যায়। বিশেষত ভারতীয় ঐতিহ্যের সগৌরব সংস্কৃতি-সংহতি তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের ভাঁজে ভাঁজে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ভারতভূমির প্রকৃত আত্মার স্পন্দনই তাঁর প্রাণপ্রতীতি নির্মাণ করে দেয়। তিনি জন্মের পরপরই পারিবারিকভাবেও এই ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ছিলেন।

"বৈদিক ঋষি তথা ব্যাসবাল্মীকি ও কালিদাসের রচনায় ভাবভারতের আত্মা ধরা দিয়েছে, এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি এঁদেরই উত্তরসাধক। তাঁর রচনাতে ভারতীয় ভাবধারা যেন যথার্থ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। তাই কারও মতে, He is the greates Indian of history, কেউ বা বলেছেন, He is India অর্থাৎ ভারত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বা প্রতিনিধি তিনিই। ভারতীয় ভবধারাকে তিনি একদিকে যেমন সার্থকভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন, অপর দিকে তেমনি এই ধারা তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার কিরণ-সম্পাতে উদ্‌ভাসিত হয়ে নূতন রূপ ধরেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বস্তুত তাঁকে বলা যায় যথার্থ 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি'"।[৮৮] রবীন্দ্রনাথের এই সর্বময় গ্রহণ, বর্জন, আত্মীকরণ, উপস্থাপন মূলত ইতিহাস ঐতিহ্যের পথ বেয়েই অধিকতর স্ফূর্তিলাভ করেছে। প্রাচীন ভারতের শিল্পসাহিত্যই রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। তিনি সারাজীবনই গর্বিত ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী। এবং তা আত্মীকরণের মাধ্যমে নবসৃষ্টির উন্মাদনায় তৎপর। সেখানে রবীন্দ্রচিন্তায় একটা যুগোপযোগী মাত্রামহিমা যুক্ত হতে দেখা যায়। এর মাধ্যমেই রবীন্দ্রসৃষ্টি কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্যবিভায় চিরন্তন ভাস্বরতা অর্জন করে নেয়। তবে তা অবশ্যই ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে সংহতি-প্রতীতি রক্ষা করে চলে। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই প্রাচীন ভারতের সাহিত্যসৃষ্টি বর্ণনায় একেবারে মুখর। বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ধর্মশাস্ত্র, নীতিসাহিত্য ও পুরাণপ্রসঙ্গে তাঁর অজস্র সৃষ্টসম্ভারের মধ্যে এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। এ ছাড়া অশ্বঘোষ-শূদ্রক ও বিশাখদত্ত, কালিদাস, বানভট্ট-ভর্তৃহরি ও অমরু, ভবভূতি, শংকরাচার্য- সোমদেব ও বিহ্লণ, জয়দেব প্রমুখ কবির কাব্যকৃতিসমূহ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। তাঁদের কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, উপকরণ, অবয়ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ রবীন্দ্রকাব্যেরও প্রাণকণিকা গড়ে তোলে। এ ছাড়া বৈষ্ণব, বাউল, সুফি সাহিত্যের কবীর, নানক, চৈতন্য, লালন, গগন, মদন প্রমুখ সাধু সন্তদের আদর্শ অন্বেষাও তাঁকে প্রভাবিত করে। এবং এর মাধ্যমেই রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটা প্রাণমূল-প্রবাহ ধীরে ধীরে রূপাবয়ব পেতে থাকে। যা তিনি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে যাবতীয় সৃষ্টিকর্মে প্রয়োগ করেছেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ কখনো কোনো নির্দিষ্ট মত-পথ বা শাস্ত্র-সংহিতায় আবদ্ধ ছিলেন না। বৃহত্তর ভারত-সংস্কৃতির সার্বজনীন-সার্বভৌম স্বরূপ-প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন। এ জন্যে তিনি হিন্দু ও প্রগতিশীল ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যেও কোনো ভেদরেখা এঁকে দেন নি। পারিবারিকভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি হয়েও হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন,

"রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা পাঠে জানা যায় যে, সংস্কৃত মন্ত্র ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ যেমন অকৃত্রিম তেমনি গভীর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দুসংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন: কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দির মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল

বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন। প্রাচীন মন্ত্রের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। তবে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাঁহার মজ্জাগত সামাজিক সংস্কারসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।"[৮৯]

প্রাচীন ভারতের যাবতীয় ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই অধিকার করে রয়েছে। সে-সময়কার কৃষ্টি-সংস্কৃতি এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাঁর শিক্ষাভাবনা, কাব্যসৃষ্টি, ধর্মাদর্শ, জীবনপদ্ধতি, নাট্যসৃষ্টি, কথাশিল্প, প্রবন্ধরচনা– প্রায় সবক্ষেত্রেই এই মূলীভূত সত্য-সহযোগ নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এই অনুরাগ আনুগত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহুবার বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্বীকার করেছেন। অতীতের সব মূল্যবান উপাদান নিয়েই তিনি তাঁর সৃষ্টি পরিক্রমা ঐশ্বর্যবান করে তোলেন।

এ প্রসঙ্গে তাঁর অজস্র সাহিত্যসৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন, 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'অতীতের ছায়া'য় তিনি মুগ্ধপ্রাণ অতীতবন্দনায় আত্মনিয়োগ করেন। শান্ত-সৌম্য ঐশ্বর্যবান অতীতকে অত্যন্ত মূল্যমান মর্যাদায় তুলে ধরা হয়। এর মধ্য দিয়ে তাঁর ঐতিহ্যিক সুষমাবোধ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্ম-কর্ম, শাস্ত্র-সংবিধান, নিসর্গ-প্রকৃতি বরাবরই রবীন্দ্রচিত্তকে সম্মোহভাবনায় কাছে টানে। কারণ, ঐতিহ্যিক সেই সংস্কৃতি-সংহতির মধ্যে একটা বিশ্বপ্রতিম গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

এমনকি বিশ্বসভ্যতার যে কোনো অধ্যায়ের সাথে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি একাসনে বসার স্পর্ধা করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই সুমহান ঐতিহ্যধারা আপন মননমজ্জার মধ্যে লালন করেছেন। তিনি মনে করেন যে, একমাত্র অতীতেরই একটা ভাষা আছে, যা অন্য কোনো কালে পরিদৃষ্ট নয়। এমনকি অন্যান্য যে কোনো সভ্য দেশের তুলনায় প্রাচীন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ ছিল। এ প্রসঙ্গে মুগ্ধপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই। অন্য দেশে নগর হইতে সভ্যতার সৃষ্টি আমাদের দেশে অরণ্য হইতে: বসনভূষণ-ঐশ্বর্যের গৌরব সর্বত্রই আছে। আর বিবসন নির্ভূষণ ভিক্ষাচর্যের গৌরব ভারতবর্ষেই: অন্যান্য দেশ ধর্মবিশ্বাসে শাস্ত্রের অধীন, আহার-বিহার-আচারে স্বাধীন: ভারতবর্ষ বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আহার-বিহার-আচারে সর্বতোভাবে শাস্ত্রের অনুগত।"[৯০]

এই অতীত ভারতেরই শান্ত-সৌম্য-শ্রী-মণ্ডিত জীবন সংস্কৃতির মুগ্ধরূপ রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন আলোড়িত করেছে। একটা অপরিসীম নিবিড় মুগ্ধতায় তিনি এই জীবন-প্রকৃতিকে অবলোকন করতে থাকেন। 'প্রাচীন ভারত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধতললাট
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্ঝনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সংগীত আর নূপুরঝংকারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জে, বিজয়-উল্লাসে,

রথের ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্বনাতকর্মকলরোলে
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাঁহার
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।"[৯১]

জাতীয় জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপাবয়বই সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে গৃহীত। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিভাবনা আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। তাঁর অন্তর্গত ভাববলয়ের মধ্যে জাতি, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে নিসর্গ-প্রকৃতি, স্রষ্টা-সৃষ্টি, গ্রহ-নক্ষত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিস্তৃত। মূলত এক অখণ্ড ভাবনাসমন্বিত সৃষ্টিপরিক্রমা জুড়েই রবীন্দ্রসৃজন উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে। সেখানে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থেকে একেবারে আত্ম-আধ্যাত্মিক সীমানা পর্যন্ত বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নিজের মধ্যে এই অখণ্ড-আবহ অনুভব লালন করেন। এবং এরই প্রেক্ষণবিন্দু ঘিরেই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিলীলা সৃজিত হতে থাকে।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের কিছু কবিতায় তাঁর এই ভাবসমবায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এ অর্থে সংস্কৃতির একটা পূর্ণাবয়ব রূপচিত্র রবীন্দ্রচিত্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। এরই পথ বেয়ে জগৎসংসারের সবকিছু রবীন্দ্রসৃষ্টিতে জায়গা করে নিয়েছে। তাছাড়া অনুরূপ ভাবভাবনার ফলেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সন্ততিরূপে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। পরিপার্শ্ব প্রকৃতির সবকিছুই রবীন্দ্রচিন্তায় অভিন্ন অনুচর হিসেবে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকার অর্থেই একজন সার্বভৌম সংস্কৃতি চরিত্রের অধিকারী। বিশ্বপৃথিবীর সবকিছুই রবীন্দ্র অস্তিত্বের সাথে একাকাররূপে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তিনি আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন,

"আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্রসূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্যচন্দ্র মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্তজীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল- ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে।[৯২]

বিশ্বসৃষ্টির এই পূর্ণাঙ্গ রূপপ্রকৃতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত বিচরণ। তবে তা অবশ্যই মর্তপৃথিবীর মাটি ও মানুষকে স্বীকরণ করেই বিকশিত। এবং এর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের সত্য সাধনা একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সেখানে কোনোরকম বিকৃতি বা বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবনের সবকিছুকে নিয়েই মনুষ্যত্বের সাধনা পূর্ণ হতে পারে। কোনো অংশকে নিয়ে বা রেখে কেবল তা ব্যর্থ-বিসদৃশ হতে বাধ্য। "যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা

ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। ... ছাঁট-দেওয়া সত্য, এবং ঘর-গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই; আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।"[৯৩] রবীন্দ্রনাথ সত্যের এই সাধনায় পূর্ণাঙ্গের প্রয়াসী। তাঁর এই মনন মন্থনজাত প্রেরণায় যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে জন্ম-জন্মান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত মৃত্যু যেখানে কোনো বাধা-যবনিকা বা প্রতিবন্ধক নয়। সেখানে মানবাত্মার একটা অনাদি-অনন্ত রূপচিত্রই প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ 'জন্মদিনে' কাব্যে বলেন,

> "হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
> করো অপাবৃত,
> সেই দিব্য আবির্ভাবে
> হেরি আমি আপন আত্মারে মৃত্যুর অতীত।"[৯৪]

রবীন্দ্রনাথের এই অদ্বয়-অনুভব অনেকটা তাঁর পরিবারসূত্রেই প্রাপ্ত। ঐতিহ্যিক ধারা পরম্পরার মাধ্যমে প্রোথিত, যা পুরুষাণুক্রমে বাঙালি জাতির অন্তর্গত চেতনার সাথে নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবণতার মূলে বুদ্ধের অহিংস-অমেয় বাণী অধিকতর ক্রিয়াশীল রয়েছে। যা তাঁর অজস্র সৃষ্টিম্ভারের ভাঁজে ভাঁজে নিবিড়ভাবে লক্ষণীয়। জীবনের শেষ পৌষ উৎসবের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত [শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্] এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হয়ে জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাক্। ... মানুষের সম্বন্ধে অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত থেকে প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশবিদেশে অভিযান করেছিল। পরম্পরকে আত্মসাৎ করবার জন্যে নয়।"[৯৫]

রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম প্রধান সাধনা শিক্ষাবিষয়ক চিন্তার আদর্শ প্রচার। প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম এক অভিনব আদর্শ-অন্বেষা তুলে ধরেন। এবং এর প্রয়োগ পরীক্ষাও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়। এই শিক্ষায়তনের মূল আদর্শও একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনানুভবকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত। কিন্তু কবির এই অধ্যাত্ম-অবনী মাটি ও মানুষের ধূলি-ধূসরিত সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। কবি বারবার কেবলই মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এবং মানুষ প্রকৃতির মধ্যেই তিনি তাঁর পরমপুরুষের পূজা সম্পন্ন করে যান। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের উপকরণ নিয়েই এই নিবেদনের অর্ঘ সজ্জিত হয়। সেখানে স্বর্গসুখের সহজ-সুন্দর ছবি লুকিয়ে রয়েছে। কবির প্রার্থনাও তাই এই সুরেই নির্বেদিত–

> "কবি, তবে উঠে আসো– যদি থাকে প্রাণ
> তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
> বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা– সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
> চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
> সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে কবি,
> একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।[৯৬]

রবীন্দ্রনাথের এই দর্শনসুলভ সংস্কৃতিভাবনাও ক্রমাগত রূপ-রূপান্তর পথের অনুসারী। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জগৎ ও জীবনলীলা পরিবর্তমান স্রোতে ধাবিত। এ সূত্রে সংস্কৃতিভাবনাও বিবর্তনধারার অনিবার্য স্রোতে বয়ে চলে। এ অর্থে

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যথার্থ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিলীলা অবিরাম একটা রূপরূপান্তরের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনেও এই চারিত্র্য-লক্ষণ ফুটে ওঠেছে। অনবরত তিনি মত মতান্তরের স্রোতে স্থান-স্থানান্তর ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবাস অবস্থানের ব্যাপারেও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষণীয়। এমনকি গৃহনির্মাণের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তহীনতাই বারবার চোখে পড়ে। এ অবস্থার প্রয়াস-প্রবৃত্তি রবীন্দ্রজীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন, "আমরা যে কামরাগুলোতে থাকতাম, সেগুলো থেকে আলাদা এক ঘরে পিতার নিজস্ব পাঠাগার ছিলো। সেটা তিনি অনবরত ঘরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিতেন। দীর্ঘ সময় একই ঘরে বা কামরায় অবস্থান করে তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। যখন তিনি ঘর বা কামরা পরিবর্তন করতে পারতেন না তখন প্রাচীর তুলে দিতেন এবং যখন আবার হাঁপিয়ে উঠতেন, তখন সেটা সরিয়ে ফেলতেন। শান্তিনিকেতন তাঁর পরিবর্তনপ্রিয় স্বভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। সেখানে এক ডজনেরও অধিক কুটির রয়েছে, যেগুলোতে তিনি বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর মনের ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সৌন্দর্য-বর্ধক বস্তুসমূহের বিন্যাস পরিবর্তন করতেও পছন্দ করতেন।"[৯৭]

রবীন্দ্রনাথের এই পরিবর্তনপ্রিয়তা তাঁর সৃজনপ্রবণতাকেও প্রতিনিয়ত নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছে। একটা হয়ে-ওঠা বা গড়ে তোলার অবিশ্রান্ত বাসনা এর বাঁকে বাঁকে চিহ্ন রেখে যায়। কবি অভিধায় প্রিয়জন রবীন্দ্রনাথ আত্মকৃত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন, "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। .... কিন্তু আজ জানিয়াছি, সেসকল লেখা উপলক্ষমাত্র– তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে। সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ... সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার অনুকূলতা করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন– তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত, বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন।"[৯৮] বিশ্বপ্রকৃতির নিরন্তর অভিব্যক্তি-সৃষ্টিলীলা রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অস্তিত্বের মধ্যেও অনুভব করেন। বিকাশ বিবর্তনের একটা ক্রমিক ধারাবাহিকতা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজগৎ বরাবরই আচ্ছন্ন করে রয়েছে। যা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের সাথেও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। "কবিমনের বিশ্বানুভূতি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদের উপর যে প্রতিষ্ঠিত ... এই কবিতায় সেই জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ধ্যানলব্ধ অনুভূতি নূতন ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে–

> জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
> এ বিস্ময় মনে আজ জাগে–
> লক্ষকোটি নক্ষত্রের
> অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
> ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
> দিকে দিকে

> তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
> অকস্মাৎ করেছি উত্থান
> অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
> ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে ।"[৯৯]

কিন্তু সৃষ্টির এই ধারাবাহী ক্রমবিকাশ এখনো শেষ হয় নি । ফলে তা প্রতিনিয়ত নব নব অবয়ব-আকৃতির মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে । কিন্তু একদিন তা পরিণতপথে নিজের সম্পূর্ণাঙ্গ রূপমাধুর্য ফুটিয়ে তুলবে । তখন বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য পরিকল্পনাও অবগত হওয়ার সুযোগ থাকবে ।

রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ একটা ভাববক্তব্য 'রোগশয্যায়' কাব্যের নয়-সংখ্যক কবিতায় ফুটে ওঠেছে । সেখানে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় সৃষ্টিরহস্যের গূঢ়তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে । সেই অনাদিকাল থেকেই সৃষ্টিধারা একটা সুনির্দিষ্ট পথে যাত্রা শুরু করেছে । কিন্তু এ সম্পর্কে কারোরই সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই । আমরা কেবল তার সবিশেষ অংশের অংশী মাত্র । অপূর্ণের সৃজনবেদন ক্রমাগত বয়ে চলেছি । এর পূর্ণাবয়ব রূপপ্রকৃতি একমাত্র বিশ্বস্রষ্টাই অবগত আছেন । যা হয়তো ভবিতব্যই বলতে পারে । কাঙ্ক্ষিত সৃজনসাধন ও সমন্বয়সহযোগ এই পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিস্বরূপ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে । এর ফলেই সৃষ্টিবিধাতার উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে । এ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ 'মূর্তিকার দিয়ে আসি মন্ত্র পড়ি/ধীরে ধীরে উদঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা" বলেও মন্তব্য করেন ।

রবীন্দ্রনাথের এই মহাজাগতিক ভাবভাবনার মূলেই তাঁর সংস্কৃতিচিন্তার পরিচয় বিধৃত । তিনি সবসময়ই সৃষ্টি প্রকৃতির সাথে নিজের অস্তিত্বকে একাত্ম-অভিন্নরূপে অনুভব করে থাকেন । ফলে বিশ্বসৃষ্টির উত্থান-পতন, ভাঙা-জোড়া, সৃষ্টি-বিন্যাস-এমনকি সবকিছুর সাথেই জড়িত । বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই অনাদি-অনন্তকাল ধরেই এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে । সেখানে রবীন্দ্রনাথের মনন-সৃজন প্রতিমুহূর্তে সৃষ্টির আবেগে অনুরণিত । এরই প্রতিভাস প্রতিচ্ছবিরূপে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক চেতনা একটা বিবর্তিত পথপরিক্রমায় ধাবিত । যা একদিন পূর্ণাঙ্গ পরিণতরূপ অর্জন করবে বলেও কবি বিশ্বাস করেন । "পৃথিবীতে পুরাকালে বহু জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূভাগের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে । যখন সেই-সব ঘটিয়াছিল, তখন সে-যুগের মানুষ ভাবিয়া থাকিবে সৃষ্টি বুঝি লোপ পাইবে, প্রলয়কাল উপস্থিত । কিন্তু সেই সমুদয়ের মধ্য দিয়া পৃথিবী পূর্ণ পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । সেইরূপ নানা বিপ্লব, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সভ্যতা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । বস্তুত কবির মতে মানবসৃষ্টি এখনো শেষ হয় নাই । সভ্যতার ভাঙন ধরে নাই, সভ্যতা এখনো পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহাই হইতেছে আশাবাদী কবির বাণী ।"[১০০]

রবীন্দ্রনাথ 'দস্তুর সভ্যতা' নামক পত্রেও অনুরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করেন । তিনি মনে করেন, জগৎজুড়ে গ্রহণ-বর্জন, সংশোধন-উন্নয়ন, ভুল-চুক, কাটাকুটি তথা সবকিছু নিয়েই সৃষ্টিপরিক্রমার অন্তর্নিহিত সত্যতা বিরাজিত । এর ফলেই ক্রমাগত সত্যের সাধনায় একটা পরিণত রূপ দেখা দেয় । মানুষ খুঁজে পায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত সত্যের যথার্থ সীমানা সেখানে সবরকম প্রতিবন্ধক বিপত্তি মাড়িয়ে সাধনালব্ধ সত্যতাই শুধু জেগে থাকে । রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে বলেন, "দেখছি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না, ওজনের ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেইজন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী ক'রে । আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা, যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগৎগুরুরা তারি ধ্যান করেছেন । ... তা যদি না হ'ত তবে যাঁরা সত্যের জন্য মঙ্গলের জন্য martyr হয়েছেন তাঁদের পাগল বলতুম । উলটে এই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে যারা তাঁদের বিদ্ধ করেছে তারাই মত্ত তারাই অন্ধ ।"

রবীন্দ্রপ্রতিভায় স্থিতি-সংহতি ও প্রগতিস্পৃহার মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনা অব্যাহত রয়েছে। একদিকে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিত্তিবৈভব অন্যদিকে উন্মেষশালী নব নব প্রগতিপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে গড়ে তোলে। এতে করেই রবীন্দ্রপ্রতিভা প্রতিনিয়ত নানামুখী রূপরূপান্তরের মাধ্যমে বহুবর্ণিল সৃষ্টিসৌধ নির্মাণ করে যায়। যা তাঁর বাল্যজীবনেই অনেকাংশে পরিদৃষ্ট হয়।

সমসাময়িক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার যুবক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা। ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্ধমান আলোক চারিদিক আলোকিত করিবে। ...সেই অমল, কোমল, কমল শোভাসমন্বিত মুখশ্রী সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ ভাসা-ভাসা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত পদ্ম-পলাশ লোচন- সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেনী-বিনায়িত চিকুর ঝলমল মুখমণ্ডল- সেই রহস্যে আনন্দে মাখান, হাসি-খুসীভরা অধর-প্রান্ত- সেই সৎচিন্তার প্রসবক্ষেত্র, সুন্দর শুভ্র, পরিস্কার দর্পণোপম ললাট- ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।"[১০১] রবীন্দ্রসম্পর্কিত এই ভবিষ্যৎবাণী মোটেই ব্যর্থ হয় নি। বরং তা বিস্ময়কররূপে সাফল্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার এই দীপ্তি ও কীর্তি ধীরে ধীরে পুরো বিশ্বকে আলোকিত করে তোলে। যা প্রতিনিয়ত অভাবনীয় সৃজ্যমান রূপপ্রকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেন, "... নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্য সূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি: বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠেছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে: আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে।"[১০২] তাঁর এই পরিবর্ধমান প্রবাহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। বরং বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রতিনিয়ত আরো শাণিত ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে। কোনোরকম প্রথানুগত্য আচার-সংস্কার তা প্রতিহত করতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেন, "সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র, সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।"[১০৩]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস-প্রবৃত্তি প্রসঙ্গে জবহরলাল বলেন,

"Contrary to the usual course of development as he [Tagore] grew older he became more radical in his outlook and views"[১০৪]

রবীন্দ্রনাথের এই ক্রমরূপান্তর সৃজন-প্রয়াস তাঁর অজস্র রচনায় লক্ষণীয়। বলা যায়, জীবনের প্রভাতবেলা থেকে একেবারে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। তাঁর মধ্যে একটা সমালোচক-সত্তাও প্রতিমুহূর্তে জাগ্রত ছিল। যা তাঁর রচনাকর্মকে বারবার পরিমার্জন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন, রূপান্তর, সংশোধন, সংকোচন, বর্জন ও ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যায়। সমালোচনার একটা খুঁতখুঁতে স্বভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অহরহ জাগ্রত ছিল। যা তিনি জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়েও মনের মধ্যে লালন করেন।

নিজের এই সমালোচক-সত্তার অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি ব্যক্ত করেন। নিজের মধ্যে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আলোচনা-সমালোচনা ও খুঁতখুঁতে স্বভাব বরাবরই বজায় ছিল। এর ফলে সারাজীবনই তিনি নিজের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে সংশয়াপন্ন ছিলেন। কলম চালিয়ে নিজের লেখাকে অজস্রবার পরিবর্ধন-পরিবর্জন, সংকোচন-প্রসারণ ও রূপ-রূপান্তরের মাধ্যমে চূড়ান্ত করেছেন

ক্ষণিকা কাব্যের 'কর্মফল' কবিতায় তিনি অকপটে তাঁর এই মননপ্রবৃত্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি পরজনমেও তাঁর এই প্রয়াস-প্রবৃত্তি অক্ষুণ্ন থাকবে বলে মতামত প্রদান করা হয়, এবং সে অবস্থায় একমাত্র সমালোচনা করাই হবে তার প্রধান কর্ম।

সমালোচনার দ্বিধা-দৈন্য রবীন্দ্রনাথকে সবসময় পীড়িত করেছে; অনেক সময় নিজের অপরিণত-অপরিপক্ক রচনাসমূহ নিয়ে বিব্রতবোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "মনে আছে, কোনো-এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন-সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্তস্বরূপে লেখক উদ্ধৃত করেছিলেন যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।"[১০৪] রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবভঙ্গিমাই শেষ বয়সে রচিত 'অবর্জিত' কবিতায় ফুটে ওঠে–

> "লিখিতে লিখিতে কেবলই গিয়েছি ছেপে
> সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে
> কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
> ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী
> এ অপরাধের জন্যে যে জন দায়ী
> তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।[১০৫]

রবীন্দ্রনাথের এই ভুলচুক-সমন্বিত গ্রহণ-বর্জন বা রূপ-রূপান্তর তাঁর অজস্র রচনায় পরিদৃষ্ট হয়। অনেক সময় একই লেখা সম্পর্কে তার স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। দু'একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে যেমন– 'চিত্রা' কাব্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ জীবন-সায়াহ্নে এসে মত পরিবর্তন করেন, এই কাব্যের বহু আলোচিত জীবনদেবতাবিষয়ক বক্তব্য ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এই কাব্যের আলোচনায় তিনি বারবার নানামুখী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি জীবনদেবতাকে কখনো অন্তর্যামী আবার কখনোবা ব্যক্তিত্বেরই দ্বৈতসত্তা বলে দাবি করে থাকেন। সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নমাত্রিক বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধের উৎসর্গ-পত্রে বলেন, "একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ; কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতা মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল।"[১০৬] এই দোলায়িত-সন্দিগ্ধ মতামতই 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। "সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রচনা আরম্ভেই বলিলেন, একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে।' ... কবি পূর্বে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, লেখার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, নিজের আনন্দ ছাড়া; এখন সে মত পরিবর্তিত; তাই বলিতেছেন, "লেখকের রচনার.. প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ। .... রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে ... সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। সেইজন্যেই লেখকেরা লেখেন।"[১০৭] রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিচয় প্রদান করতে গিয়েও সিদ্ধান্তহীনতার আশ্রয় নেন। যেমন– তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই উভয়ধর্মের আচার-প্রথাকে অনুসরণ করেন। 'ধর্মপ্রচার' প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্র জীবনীকার বলেন, "১২৯১ সালে তিনি রাজা রামমোহন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমেই জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিতেছিলেন যে, এ ভাবে খণ্ড করিয়া দেখিলে সাধনা ব্যাহত হয়। 'আমরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্ম নামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া হিন্দু সমাজের অপর অংশকে সেই চিহ্নের সাহায্যেই হৃদয়ের

স্থান হইতে বঞ্চিত করি, তবে ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রহ্মকেই দূরবর্তী করিয়া রাখি । ... আমি ব্রাহ্মসমাজে– ব্রাহ্মসমাজে নহে, আমাদের সমাজে, হিন্দুসমাজে, সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্তমনে প্রার্থনা করি ।"[১০৮]

রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনার কলাকৌশল ও অভিনয়রীতিতে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুসারী তাঁর অনেক নাট্যভাবনার মূলে এর উপকরণ-উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে । যা একসময় তিনি নাটকের পক্ষে অতীব-আতিশয্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন ; সেখানে তিনি আবার প্রাচ্য ভাবধারাকেই শ্রেয় বলে মনে করে থাকেন । প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে বলেন, "আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে । যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই । পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে । কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে ।"[১০৯] এ ছাড়া ইংরেজদের আগমন সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় । ইংরেজ শাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁর বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন, "রবীন্দ্রবাবুর এই উক্তি এবং পূর্বোদ্ধৃত উক্তি উভয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত একের প্রত্যেক ছত্র অপরের প্রত্যেক ছত্রের প্রতিবাদ করিতেছে । তিনি একবার বলিতেছেন যে, 'বিদেশী বর্জন অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার । এ যে শক্তি । এ যে সম্পদ ।" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "ইংরাজকে জব্দ করিব বলিয়াই দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম । ইংরাজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহার সন্দেহমাত্র নাই ।"– এইরূপই আগাগোড়া ।"[১১০] ভারতের প্রধান দুই জাতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন । "যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন– বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না– আমাদের নিজেদের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব । ... সেই রবীন্দ্রনাথই পরে স্বীয় উক্তি পদদলিত করিয়া 'সদুপায়' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন– 'মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই– দুই পক্ষে একরকম মিলিয়া ছিলাম । কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।"[১১১]

রবীন্দ্রনাথ প্রতিনিয়ত নিজের রচনাকর্ম নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব-দীর্ণ চেতনায় দোলায়িত । এক প্রকার অতৃপ্তি-অন্বেষা সবসময় তাঁকে তাড়িত করেছে । ফলে তাঁর প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিকর্মই অবিরাম রূপ-রূপান্তরের মাধ্যমে গড়ে ওঠে । যেমন– 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাস অবলম্বনে বিসর্জন (১৮৯০) নাটক । 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাস অবলম্বনে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটক যা পরবর্তীতে 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) নামে প্রকাশিত হয়েছে । 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' (১৯০৮) অবলম্বনে নাটক 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬), 'কর্মফল' গল্পের (১৯০২) নাট্যরূপ 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'শেষের রাত্রি' (১৯০৩) গল্পের নাট্যরূপান্তর 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'গোড়ায় গলদ' (১৮৮২) এর নাট্য রূপান্তর 'শেষরক্ষা' (১৯২৯), 'একটি আষাঢ়ে গল্প '(১৮৯২) অবলম্বনে 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' উপন্যাস-কেন্দ্রিক লেখা 'মালঞ্চ নাটক' (১৯৩৪), 'মুক্তির উপায়' (১৮৯২) গল্পটির নাট্যরূপ 'মুক্তির উপায়' (১৯৩৮) ও 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর হচ্ছে 'যোগাযোগ' (১৯৩৬) । এই পরিবর্তন-প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথকে এক মুহূর্তের জন্যেও নিস্তার দেয় নি

একটা অজানা অতৃপ্তি সবসময়ই তাড়া করে। "জীবনের শেষ পর্বে কাব্যনাট্য ও গীতিনাট্যগুলিকে নৃত্যনাট্যে রূপ দেওয়ার এবং অভিনয়কালে নৃত্যনাট্যগুলির পুনঃ পুনঃ সংস্কার সাধনের মধ্যেও সেই সমালোচক মনের অতৃপ্তিই লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের বা পূর্বের রচনাগুলিকেই বেছে নিয়েছেন নৃত্যনাট্যে রূপ দেওয়ার জন্য। 'নটীর পূজা' লেখা হয় ১৯২৬ খ্রি. 'শাপমোচন' ১৯৩১ ও 'তাসের দেশ' ১৯৩৩, 'চিত্রাঙ্গদা' (নৃত্যনাট্য) ১৯৩৬ খ্রি. নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' ১৯৩৮ এবং 'শ্যামা' ১৯৩৯-এ। আর এগুলি সবই তাঁর পূর্বেকার রচনার রূপান্তরিত সংস্করণ। 'নটীর পূজা' কবির পূজারিণী (১৯০০) কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ, 'শাপমোচন' তাঁর ঐ নামের কবিতাটির নাট্যরূপান্তর, 'তাসের দেশ' তাঁর একটি আষাঢ়ে গল্পের (১৮৯২) নৃত্যনাট্যরূপ, নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ঐ দুই নামেরই গীতিনাট্যের রূপান্তর এবং শ্যামা তাঁর 'পরিশোধ' কবিতা ও ঐ নামেরই (পরিশোধ) নৃত্যনাট্যের পরিমার্জিত সুসমৃদ্ধ নৃত্যনাট্যরূপ।"[১১২]

ব্যক্তি চরিত্রের সমুন্নতি-সমৃদ্ধি মূলত সংস্কৃতিচর্চার লক্ষ হিসেবে পরিগণিত। ফলে এর ক্রমধারা ধীরে ধীরে সংহত হওয়ার সুযোগ পায়। ব্যক্তির সুষমামণ্ডিত আদর্শ-অবস্থিতি সমাজ পরিবর্তনের আকরস্বরূপ। যুগে যুগে যার অমিয়স্পর্শে জগৎ-জীবন কাঙ্ক্ষিত লক্ষের দিকে এগিয়ে গেছে। এমনকি পুরো রাষ্ট্রের সমূহ সম্ভাবনা অনেক সময় একজন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যা রাষ্ট্রজীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে গৃহীত হয়। এ অর্থে সেই ব্যক্তি সেখানকার প্রতিনিধি-স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত। এভাবে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই জাতিগত সংস্কৃতির প্রতীক-প্রতিভু হওয়ার ক্ষমতা রাখে। বিশ্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এর নজির-নমুনা খুব একটা কম নয়। হোমার, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, মিল্টন, বায়রন, ভার্জিল, শেক্সপিয়র, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী শুধুমাত্র ব্যক্তি পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নন। তাঁরা প্রত্যেকেই একেকটি জাতি, রাষ্ট্র, যুগ, তথা কালের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বজনীন মর্যাদায় অভিষিক্ত। মহাকালের স্রোত সংঘর্ষে যা কখনো ম্লান হবার মতো নয়। শুধুমাত্র ব্যক্তি-মনীষার এক উত্তুঙ্গ সমুন্নতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এ অর্থেই সংস্কৃতিচর্চায় ব্যক্তি মানুষের উৎকর্ষ-অন্বেষা প্রধান প্রতিপাদ্যরূপে বিবেচিত হয়

রবীন্দ্রনাথ জীবনভর তাঁর ব্যক্তি ও সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি চরিত্রের সমুন্নতি তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। দেশ, জাতি বা রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তিই সবার উপরে স্থান পাওয়ার যোগ্য। কারণ, ব্যক্তিমনীষাই একটি জাতি বা সম্প্রদায়কে সংস্কৃতিবানরূপে গড়ে তুলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই আত্মগত উৎকর্ষ- অনুশীলন কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন নিজেকে স্বচ্ছ-সুন্দর ও পরহিতব্রতী করে তোলাই ছিল তাঁর সাধনা।

তাঁর অজস্র কাব্যকথার ভাঁজে ভাঁজে এই ভাবানুভব ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিশেষত, গীতিমাল্য, গীতালি ও গীতাঞ্জলি পর্যায়ের কাব্যসমূহে অনুরূপ ভাবাবেশ অধিকতর রসস্ফূর্ততায় ফুটে ওঠেছে। তিনি নিজের মনন-প্রবৃত্তির অবিরাম সমুন্নতিজনিত রূপ-রূপান্তর কামনা করেছেন। এবং ক্রমাগত পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজেকে অন্বিষ্ট করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন

তিনি মনে করেন, ব্যক্তিচরিত্রের সমূহ উন্নতির ফলেই সর্বপ্রকার জাতিগত সমস্যার সমাধান সম্ভব। মানুষের সবরকম কল্যাণকামিতার প্রেরণাটুকু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হওয়া দরকার। বাহ্যিক আড়ম্বর-আয়োজন, জৌলুস-বিলাস, সংবিধান-সংযোজন, শাসন-পেষণ ও অন্যান্য পদক্ষেপ কোনোরকম ভূমিকা রাখতে পারে না। আত্মগত সংশোধনই যথেষ্ট। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্প্রীতি জাতিগত কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। অপরের দয়াদাক্ষিণ্য বা আত্মপদার্থ বিকিয়ে দিয়ে তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভঙ্গ' প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করি না।... আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের

কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে। ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"[১১৩]

অন্তরের বিকাশ বিবর্তনই সভ্যতার ধারক ও বাহক। এর মধ্যে প্রতিবন্ধক এসে জড়ো হলেই সর্বকিছু মুখ থুবড়ে পড়ে। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা অথবা জাতি কোনটিই সমৃদ্ধ হতে পারে না। অর্থাৎ, ব্যক্তিমনের মুক্তি মানেই জগৎ জীবনের সামগ্রিক মুক্তির তুল্যমূল্য বহন করে। সুতরাং এই মুক্তির জন্য পরিপার্শ্ব-পরিস্থিতি অবারিত হওয়া দরকার "ব্যক্তিমুক্তি মানে বুদ্ধি, অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার মুক্তি। এই মুক্তির দ্বারটি খোলা রাখা দরকার; নইলে জীবনের পরম ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি হয় না বলে সভ্যতার আমদানী ব্যাহত হয়। কোন কোন ধর্ম্মের প্রতি নজর দিলেই একথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় চমৎকার সামাজিক বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ধর্ম্ম সংস্কৃতি সৃষ্টির উপায় হিসেবে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তথা ব্যক্তিস্বাধীনতায় অবিশ্বাসই তার কারণ। ...ভাবের চেয়ে আইনকে, প্রবণতার চেয়ে পদ্ধতিকে বড় করে দেখেছে বলে তারা মানুষের আন্তরিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

ব্যক্তিসৃষ্টির জন্যই সমাজসৃষ্টি। ...স্বশিক্ষিত না হলে সুশিক্ষিত হওয়া যায় না– একথায় সন্দেহ প্রকাশের যো নেই। ব্যক্তিমুক্তি তথা চিন্তা ভাবনার স্বাধীনতার প্রয়োজন। কেননা দেখতে পাওয়া গেছে, আজকে যা মিথ্যা বলে নিন্দিত কালকে তাই সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। মহাপুরুষদের প্রায় সকলেই Heretic বা প্রচলিত মতে অবিশ্বাসী। তাঁদের পথটি যাতে কণ্টকিত না হয় সেদিকে নজর রাখা দরকার। নব নব ভাব ও চিন্তার স্পর্শে তাঁরাই জগৎকে সঞ্জীবিত রাখেন।"[১১৪] রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ব্যক্তিমনীষার উন্মোচনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই প্রণোদনা-প্রাণনা গভীর অধ্যাত্মলোক থেকে উৎসারিত। সীমা-অসীম ও স্রষ্টা সৃষ্টির অনন্ত অন্বেষার আলোকে জারিত। স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন, আত্মকৃত অনন্তলোকের উপলব্ধি ও প্রাত্যহিক সমাজীবনে এর প্রক্ষেপন– রবীন্দ্রসৃষ্টিজগৎকে সমুন্নত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ অনুকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি মানুষের বিকাশ বিবর্তনে প্রয়াসী ছিলেন। শেষপর্যন্ত একটা আত্মমুক্তির অতৃপ্তিজনিত আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন সমালোচক বলেন, "তিনি চেয়েছিলেন আত্মশুদ্ধি ও আত্মউপলব্ধির তাগিদে, আত্ম-অবলুপ্তির তাগিদে নয়। দ্বৈতকে দূর করতে তিনি চাননি, চেয়েছিলেন পরমাত্মার স্পর্শে এসে নিজেকে মার্জিত করতে, নিজের ভেতরের আবর্জনা দূর করতে। আত্মবিলুপ্তি নয়, আত্মসৃষ্টিই তাঁর উদ্দেশ্য।"[১১৫] রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তি-সাধনা পরম স্রষ্টার দিকে সতত উন্মুখ। যা আবার সৃষ্টি প্রকৃতির মাধ্যমে আপনার রূপ খুঁজে খুঁজে পায়। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথের মুক্তচিন্তা মূলত বৃহত্তর মানবতার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। অবশেষে ব্যক্তিমনীষার কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত। সুতরাং ব্যক্তি চরিত্রের নিরন্তর উদ্বোধন জাগরণই তাঁর লক্ষ্য। আর এভাবে বিশ্বমানবতার সার্বিক মুক্তি-অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ 'মনুষ্যত্ব' নামক প্রবন্ধে জীবন ও মনুষ্যত্ব প্রসঙ্গে বলেন, 'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! উত্থান করো জাগ্রত হও– এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না– কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ...রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি। তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদঘাটন করিয়া দাও– আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো। নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই

বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল আকাশে। এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।"[১১৬] জাগ্রত আত্মার জয়গান জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ আজীবন বাণীর সাধনা করে গেছেন। তাঁর অন্তর্গত সাধনার মূলে এর সংস্পর্শ-সহযোগ জড়িয়ে রয়েছে। মানুষের মধ্যে অপরিসীম সম্ভাবনা বিদ্যমান। আত্মিক শক্তির সৃষ্টিপ্রাচুর্য অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পারে। কিন্তু পরিপার্শ্ব-পরিপ্রেক্ষিত সমবায়ে এই শক্তির উদ্বোধন হওয়া দরকার। অতীত, ঐতিহ্য, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, মূল্যবোধ, স্বপ্ন, উপলব্ধি, শিক্ষা– ইত্যাকার বৈশিষ্ট্যবিভব এর গড়ন-সৃজন সম্ভব হয়ে ওঠে। সেখানে মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনই হচ্ছে মূল কথা। এবং এর মাধ্যমেই জাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি সমূহ সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই সাধনার অতন্দ্র-ব্রতী-রূপে নিজেকে উৎসর্গ করে যান। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, "মনুষ্যত্বের উদ্বোধনেও তাঁর কণ্ঠ উদাত্ত। ওঠো, জাগো, আপনার প্রাপ্য ও দায়িত্ব বুঝে নাও। এই জাগার-বাণী তার কণ্ঠে পরম শোভা পাচ্ছে। জড়ত্ব পরিহার করে সাহস ও আনন্দের পাখা মেলে সুদূরের অভিসারী হবার জন্য তাঁর আহ্বান। ভোরের পাখির মতো সারা জীবন তিনি আলোকের আগমনী গেয়েছেন। এবং জাতির অন্ধকার গগন যে আসন্ন প্রত্যুষের অগ্রদূত, এ-কথা বারবার অনুপম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বস্তুবিক তিনি শুধু কবি নন, নেতা; ভাবুক নন, মন্ত্রদাতা; শিল্পে, সাহিত্যে ও নানাপ্রকার কল্যাণকর্মে তাঁর প্রেরণা কার্য্যকরী হয়েছে।"[১১৭] তাঁর এই জ্যোতির্ময় সাফল্যসিদ্ধির পেছনে এক অন্তর্ময় চৈতন্যলীলাই সক্রিয় আছে। যা তাঁকে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যিখানে একটা অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেয়। তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিপরিক্রমা অনশ্বর-অনন্ত মহিমায় পরিস্নাত হওয়ার সুযোগ পায়।

বিশ্বলোকের সবকিছুকে অন্বিষ্ট করে রবীন্দ্রসৃষ্টি একটা অনশ্বর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। এর মধ্যে জন্ম-মৃত্যু, গ্রহ-নক্ষত্র পেরিয়ে এক অখণ্ড চৈতন্যলোক দীপ্যমান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'রোগশয্যায়' কাব্যের কিছু কবিতায় অত্যন্ত চমৎকার বাণীভঙ্গিমায় এই ভাব-পরিক্রমা লক্ষণীয় মাত্রায় ফুটে ওঠেছে। তাছাড়া আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গেও কবির সহজ স্বীকারোক্তিতে অনুরূপ চিন্তাচেতনা লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, "... নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই– আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটিকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে। আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকতে পারে না"[১১৮]
রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সমুন্নতি একটা প্রবাহ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। ক্রম-বর্ধমান এই সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ধাপে ধাপে সৃজিত হতে থাকে। রবীন্দ্রজীবনের উদয়াস্ত জুড়েই এর অব্যাহত গতিচাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। যা শিল্পসৃষ্টির আদ্যোপান্ত অবয়বে সৌষম্যপূর্ণ ভাষায় উচ্চকিত। একটা সংযত-সংহত-সুন্দর রূপরেখায় চিত্রিত হয়ে আছে। "রবীন্দ্রনাথের জীবন একখানি সুগীত সঙ্গীতের মত। ওস্তাদ যেমন– তা-না- না থেকে আরম্ভ ক'রে মাঝখানে গমকে গিটকিরী এবং মীড়ের ছাড়াছড়ি করে সমে এসে পৌছান, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ছেলেবেলার খেলাধুলা থেকে আরম্ভ করে কৈশোর ও যৌবনের ভোগ-বিলাসিতার ভিতর দিয়ে এমন একটি স্থানে এসে পৌছেছেন সেখান থেকে তাঁর বীণায় বেজে উঠেছে বিরাট একের সুর। কৈশোর ও যৌবনের দাবীগুলি পূর্ণ না করলে তাঁর জীবনে এ ধরনের সম্পূর্ণতা আসত কি-না সন্দেহ। কবি-গুরুর জীবনে এক অপূর্ব ক্রমোন্নতি দেখতে পাওয়া যায় যা অন্যান্য কবির জীবনে খুব বিরল- তিনি যেন ক্রমশই প্রাণ থেকে মন এবং মন থেকে আত্মার উন্নতি লাভ করেছেন। তাই তাঁর কাব্য এতটা সম্পূর্ণ, এত সুন্দর।"[১১৯] এই সুন্দরের সাধনায়ই রবীন্দ্রসৃষ্টি নিবেদিত। আত্মিক সাধনার সুষমাময় স্তরে এই সুন্দরের

অধিষ্ঠান। সেখানে মানুষ সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে একটা অক্ষয়লোকের অধিকারী হওয়ার স্পর্ধা করতে পারে। অমৃতের সন্তানরূপে মানুষের যথার্থ অবস্থান চিহ্নিত হওয়া সম্ভব। নইলে আর সবই বিধ্বংসী-বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত

ক্রমাগত মানবচিত্তের সৃজনসাধনায় একটা অক্ষয়লোক অঙ্কুরিত হতে থাকে। সুখ-দুঃখের অতীত এই প্রাপ্তিযোগ মানুষকে অমৃতের সন্তানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের মননচিত্তের সৃজনসাধনায় অনুরূপ একটা প্রয়াস-প্রবৃত্তি লক্ষ করা যায় সংস্কৃতির ক্রমাগত হয়ে ওঠার একটা সার্বভৌম রূপপ্রকৃতি এর মধ্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্র ও সৃষ্টিপরিক্রমার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'রোগশয্যায়' কাব্যের ২৯-সংখ্যক কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক ব্যঞ্জনায় অনুরূপ ভাবব্যক্তব্য ফুটিয়ে তোলেন ; এর মধ্য দিয়ে চিরায়ত মানবপ্রকৃতির একটা সুষমাবোধ ছন্দস্পন্দের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে।

জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই বিবর্তনশীল মানবচরিত্রের কাছেই আত্মসমর্পণ করেন। যে মানুষ সুখ-দুঃখ, চড়াই-উৎরাই, আশা-নিরাশা, হতাশা-রিরংসা ও নানারকম পর্যায়ক্রমিক অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এবং এর ফলেই মানবসংস্কৃতি সংস্থিতি ও প্রগতিধারায় সংহত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। যা পর্যায়ক্রমিক প্রাপ্তিযোগের মধ্য দিয়ে একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও সৃষ্টিকর্ম মূলত এই দর্শনবোধের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের নানামাত্রিক ঘাত-প্রতিঘাত ও বিঘ্ন-বিপত্তিও কখনো তাঁকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। একেবারে জীবনের শেষ অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট'-এর মধ্যেও এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। এটি কবির সর্বশেষ জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে পঠিত হয়েছিল। তখন পরিপার্শ্ব পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি-হিংস্রতা ও পারস্পরিক প্রতিহিংসায় সমাজজীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একটা অনিবার্য অবক্ষয়-অমানিশা সারা পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। এর মধ্যেও কবি মনুষ্যত্ববোধের সার্বভৌম জয়গানে মুখর হয়েছেন। কবি 'ওই মহামানব আসে' বলে আশায় বুক বাঁধেন। যা তাঁর সংস্কৃতিবোধেরই পরিচায়ক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এবং পরিশেষে এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা মূলীভূত সত্যতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানবপ্রকৃতির ক্রমাগত রহস্য উন্মোচনই এই মননপ্রবৃত্তির মূল লক্ষ। যা পরিপূর্ণ সংস্কৃতিবোধেরই তাড়নায় নিবেদিত। এখানে কাব্যিকতা প্রকৃতি ও মনুষ্যপ্রাণ একাকাররূপে ধরা দেয়।

এই চিত্ত-চিন্তন ও মনন-সমন্বিত ব্যক্তি চরিত্রের অধিকারী হওয়াই তাঁর সাধনা। একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজজীবনের জন্যও তা অপরিহার্য। যা তাঁর অন্তর্গত জীবনদর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গৃহীত। জীবনভর অজস্র বাধাবিপত্তির মুখেও তিনি এ আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ান নি। যা সংস্কৃতিচর্চার মূল লক্ষ্য হিসেবেও সর্বসম্মতি লাভ করেছে। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথও সংস্কৃতিচর্চা ও রূপায়ণে সবিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এরকম একটা ইস্পাতকঠিন সাধনার মাধ্যমে তিনি সুদীর্ঘ সৃজনসময় অতিবাহিত করেন। ফলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও মানুষ এবং শুধুমাত্র মানুষকেই শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।

ক্রমাগত হয়ে-ওঠা ও গড়ে-তোলার একটা ইতিহাস প্রকৃতিপ্রাণের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে। যা মানুষকে অবিরাম সামনের দিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল। ধনসম্পদ হল স্তূপাকৃত, আবার গেল মিলিয়ে ধূলার মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে আবার ভেঙে দিয়ে গেল ; বয়স পেরিয়ে ছেলেবেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভা-ার। আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন করে খুঁজতে বেরিয়েছে গহনে প্রবেশের গোপন পথ। এমনি করে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর এক যুগ আসছে– মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয় আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার

অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে, সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো। যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই।[illegible]

এখানে কবি ও প্রকৃতিরহস্য একাকার হলেও একটা জীবনদর্শন অনুরণিত হতে থাকে। যা মানুষকে আশার ভেলায় পাঠিয়ে পাঠিয়ে জীবনসমুদ্রে পাড়ি জমায়। অর্থাৎ এই রহস্যজাল উন্মোচনের প্রয়াস-প্রবৃত্তিই মানবজীবনের পরম ধর্ম সেখানে একজন ব্যক্তিচরিত্র ক্রমান্বয়ে সমুন্নত মানুষ হওয়ার সুযোগ পায়। এবং এর মাধ্যমেই সৃষ্টি বিধাতার কল্পিত উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়গুলো সুরক্ষিত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৭০

২. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, Reprinted: 25th December, 1986, কলিকাতা, পৃ: ৩৯

৩. ঐ, পৃ: ৯-১০ থেকে উদ্ধৃত।

৪. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি, পৃ: ১৭২

৫. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৯৭০, কলিকাতা, পৃ: ৪৮-৪৯ থেকে উদ্ধৃত।

৬. 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা, স্বাধীনতা-শারদীয় সংখ্যা- ১৩৬২ (প্রথম প্রকাশ)।

৭. পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার বিদ্রোহ, হোসেন উদ্দীন হোসেন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ: ২৩১ থেকে উদ্ধৃত।

৮. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, পৃ: ৫৩

৯. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি- ১৪০২, পৃ: ৪৬৩

১০. ঐ

১১. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, পৃ: ৪৮ থেকে উদ্ধৃত।

১২. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৬২

১৩. রবীন্দ্র-সংস্কৃতি, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা ৩৪, পৃ: ৩৫

১৪. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৯৮

১৫. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, পৃ: ৪৯ থেকে উদ্ধৃত

১৬. ঐ, পৃ: ৫১ থেকে উদ্ধৃত।

১৭. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৬৩

১৮. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, পৃ: ৫৫-৫৬ থেকে সংকলিত।

১৯. ঐ, পৃ: ৫৫

২০. রবীন্দ্রনাথের গল্প, ড. সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মুক্তধারা, চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯০, ঢাকা, পৃ: ৩৩

২১. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, সাহিত্যশ্রীঃ কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ-১৯৮৬, পৃ: ১৫

২২. ঐ, পৃ: ১৫

২৩. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৫৬

২৪. ঐ, পৃ: ৫৩৮

২৫. ঐ, পৃ: ৫৩৫

২৬. ঐ, পৃ: ৫৩৫-৩৬

২৭. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৮২

২৮. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, কলিকাতা, পৃ: ২৯

২৯. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭০০-৭০১

৩০. ঐ, পৃ: ৬৮২

৩১. ঐ, পৃ: ৬৮৩

৩২. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৯১-৯২

৩৩. র-র, ২য় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৪০

৩৪. র-র, পঞ্চদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৯

৩৫. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৮১০

৩৬. Rabindranath Tagore on the Communal problem. The Modern Review, September 1934, P 347

৩৭. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ-১৪১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ: ৬৮-৬৯ থেকে উদ্ধৃত।

৩৮. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৪১১, কলকাতা, পৃ: ১১৪ ।

৩৯. প্রলয়ের সৃষ্টি, ৭ পৌষ, ১৩৪৪ । প্রবাসী, মাঘ-১৩৪৪, পৃ: ৫৬-৫৭, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৪১০, কলকাতা, পৃ: ১১৪-১১৫ থেকে উদ্ধৃত ।

৪০. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪১০, পৃ: ৬১৪

৪১. রবীন্দ্র-সংস্কৃতি, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ-১৩৯৪, কলিকাতা, পৃ: ১২০ ।

৪২. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৫৪-৫৫৫

৪৩. ঐ, পৃ: ৫৬০-৫৬১

৪৪. ঐ, পৃ: ৬১৪

৪৫. (ক) র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৪২
(খ) ঐ, পৃ : ৭৪৪

৪৬. Croce, Unpolitical Man (1931) in his philosophy. Selected by Klibansky and trans by Carritt, P: 53-54 । রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ-১৪১১, পৃ: ২১৭ থেকে উদ্ধৃত ।

৪৭. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৮৯-৯০

৪৮. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ- ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ১৪৩-৪৪ থেকে উদ্ধৃত ।

৪৯. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ৭৭৫

৫০. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৭৬

৫১. নতুন নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ নজরুল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, নবরাগ প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০০, ঢাকা, পৃ: ১৭ থেকে উদ্ধৃত ।

৫২. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৯৯

৫৩. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৮৬

৫৪. ঐ, পৃ: ৫৮৭

৫৫. ঐ, পৃ: ৫৯০-৯১

৫৬. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪০৬, কলকাতা, পৃ: ২০৩

৫৭. রবীন্দ্র-সাগর সংগমে, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৬৯, কলকাতা, পৃ: ৪৩৭ থেকে উদ্ধৃত ।

৫৮. ঐ, পৃ: ৪৩১ থেকে উদ্ধৃত ।

৫৯. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৬, কলকাতা, পৃ: ২০১ থেকে উদ্ধৃত ।

৬০. ঐ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৯৭০, কলকাতা, পৃ: ৪৭১

৬১. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সাগর সংগমে, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৬৯, কলকাতা, পৃ: ৫৫৬ থেকে উদ্ধৃত ।

৬২. রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির আলোকে, মোবাশ্বের আলী, প্রথম প্রকাশ- ২০০০ সন, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ৩৪ থেকে উদ্ধৃত ।

৬৩. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৬৩-৬৪

৬৪. ঐ, পৃ: ৫৬২-৬৩

৬৫. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, একাদশ মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৮৯, কলকাতা, পৃ: ৭১

৬৬. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (৪র্থ সংস্করণ) কলিকাতা, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৬২৯

৬৭. র-র, একাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ৭৪৪

৬৮. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ৭৪৪

৬৯. সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ, প্রবীর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই, পৃ: ১৩

৭০. লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, প্রকাশকাল ১৯৯১, পৃ: ১২ । সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ, প্রবীর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই, পৃ: ১৮ থেকে উদ্ধৃত ।

৭১. সংস্কৃতির রূপান্তর, গোপাল হালদার, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৮, মুক্তধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ৩৪

৭২. ঐ, পৃ: ৩৭ থেকে উদ্ধৃত ।

৭৩. স্বদেশ অন্বেষা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৭৭ বাংলা, পৃ: ১

৭৪. সংস্কৃতির রূপান্তর, গোপাল হালদার, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৮, মুক্তধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ২০

৭৫. স্বদেশ অন্বেষা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ১৩৭৭ বাংলা, পৃ: ১

৭৬. সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ, প্রবীর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই, পৃ: ১৯ থেকে উদ্ধৃত ।

৭৭. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রকাশকাল-১৯৫৭, পৃ: ৪৬

৭৮. সংস্কৃতি কথা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ২০০৮, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ৩৮

৭৯. সংস্কৃতির রূপান্তর, গোপাল হালদার, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৮, মুক্তধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ২৫৪-৫৫

৮০. সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ, প্রবীর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই, পৃ: ১৫ থেকে উদ্ধৃত ।

৮১. মুক্তধারা, চতুর্থ সংস্করণ: ২০০৮, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ৪২

৮২. সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ, প্রবীর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই, পৃ: ১৯ থেকে উদ্ধৃত ।

৮৩. আহমদ শরীফ, স্বদেশ অন্বেষা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১৩৭৭ বাং, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ: ১

৮৪. ঐ, পৃ: ৫

৮৫. রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পম্পা মজুমদার, প্রথম দে'জ সংস্করণ: ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ: ১৮

৮৬. সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ, প্রবীর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই, পৃ: ১৪

৮৭. রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পম্পা মজুমদার, প্রথম দে'জ সংস্করণ: ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ: ৩৩

৮৮. ঐ, পৃ: ১৭

৮৯. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, পৃ: ৩৯

৯০. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ৭৩৩

৯১. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৯-২০

৯২. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৪৫-৪৬

৯৩. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৫৫

৯৪. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৯

৯৫. আরোগ্য । প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৭, পৃ: ৪৬৪-৬৫ । রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪১১, পৃ: ২৬০-২৬১ থেকে উদ্ধৃত ।

৯৬. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৪২

৯৭. বিদেশী মনীষীদের রবীন্দ্রচর্চা, হেলালউদ্দীন আহমদ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, কুমিল্লা, পৃ: ৬২

৯৮. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, পৃ: ৪৩৩-৪৩৪ থেকে উদ্ধৃত ।

৯৯. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৪১১, কলকাতা, পৃ: ২৩৪ থেকে উদ্ধৃত ।

১০০. কবির অভয়বাণী, প্রবাসী, ভাদ্র-১৩৪৭

১০১. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৯৭০, কলকাতা, পৃ: ২৩৬ থেকে উদ্ধৃত ।

১০২. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৪১

১০৩. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ-১৪১১, কলকাতা, পৃ:২৪৯ থেকে উদ্ধৃত ।

১০৪. Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, 1946, P- 404

১০৫. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৩৮

১০৬. ঐ, পৃ: ৪২১

১০৭. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী-১৪০৬, কলকাতা, পৃ: ১৩৩-৩৪ থেকে উদ্ধৃত ।

১০৮. ঐ, পৃ: ১৩৯ থেকে উদ্ধৃত ।

১০৯. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৮০

১১০. অমরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রবন্ধ : সদুপায় । রবীন্দ্র-সাগর সংগমে, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ: ৪৩৫ থেকে উদ্ধৃত ।

১১১. ঐ, পৃ: ৪৩৫-৪৩৬ থেকে উদ্ধৃত ।

১১২. রবীন্দ্রনাট্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, ড. সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০২, পৃ: ১২৭
১১৩. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ৭৭৫
১১৪. সংস্কৃতি কথা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ– ২০০৮, পৃ: ৭৩
১১৫. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৫৭-৪৫৮
১১৬. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৫৭-৪৫৮
১১৭. সংস্কৃতি কথা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ– ২০০৮, পৃ: ১৬১
১১৮. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ১৪১
১১৯. সংস্কৃতি কথা, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ– ২০০৮, পৃ: ১৯৫
১২০. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ. ৬৪১

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট

সাহিত্যের প্রায় সবকটি শাখায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিস্ময়কর সফল-সৃষ্টি চোখে পড়ার মতো। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চিত্রকলা, সমালোচনা সব ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে সত্য। এমনকি অনেক সৃষ্টিসূত্রে তিনি প্রবর্তক পথিকৃৎরূপে নিজের অবস্থানকে গড়ে তোলেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা সমুজ্জ্বলরূপে ফুটে ওঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই পরিচয় প্রদানে বেশ তৃপ্তিবোধ করতেন। একটি পত্রে তিনি বলেন, "কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাগদত্তা হয়েছিল। তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধারে বটের তলা, বাড়ি ভিতরের বাগান, বাড়ি ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো এবং সমস্ত বাহিরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো আমার মনের মধ্যে ভারি একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল। ..... কবি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয়, তা স্বীকার করতে হয়; আর যাই হোক সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ... আমার আসল জিনিসটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি– আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান"। রবীন্দ্রনাথের এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টিকর্মও অনুরূপ সাক্ষ্য বহন করে। কাব্যকৃতির প্রায় সবরকম বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রচরিত্রে বিদ্যমান। অনুভবপ্রাণতা, স্বপ্ন, কল্পনা, প্রকৃতিচেতনা, ঈশ্বরভাবনা– সর্বোপরি মানবিকতার মনন মহিমাই রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপ্রতিভা নির্দিষ্ট করে দেয়। স্রষ্টা সৃষ্টি ও নিসর্গ প্রকৃতির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন রবীন্দ্রপ্রতিভায় মূর্তরূপ খুঁজে পায়। যা তাঁর অন্যতম সৃষ্টি নাট্যকর্মের মধ্যেও ফুটে ওঠে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা নাট্যরচনায় বিঘ্নবিপত্তিরূপেই আবির্ভূত। নাটকের বস্তুতান্ত্রিক ঘটনা চরিত্রের ঘনপিনদ্ধ রূপরসের বেলায় তা অন্তরায় বটে। ফেনিল উচ্ছ্বাসময় বর্ণনাবিলাসে প্লট চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় উপস্থাপনা ফিকে হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নাট্যধর্মবিরহিত রবীন্দ্র নাটকগুলো সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। এ সূত্রেই রবীন্দ্র নাট্যধারা প্রচলিত নাট্যক্রম থেকে ছিটকে পড়ে। যা অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ সান্নিধ্য স্পর্শে আপনার পথ খুঁজে নেয়। এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হতে থাকে। এ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক ভিন্নমাত্রার নাটক রচনায় পথিকৃৎ হয়ে আছেন। এসব নাটকে মুলত তাঁর কাব্যিক ভাবালুতাই প্রাধান্য পায়। রবীন্দ্রনাথ বিসর্জন নাটকের ভূমিকায় নিজের নাট্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেন–

কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি

এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্গত ভাববৈশিষ্ট্য অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাটকের রূপরহস্য অবগত হওয়া সম্ভব। মূলত রবীন্দ্রনাথের সহজাত কাব্যপ্রাণতাই তাঁর নাট্যসৃষ্টির মূলে সক্রিয় রয়েছে। এ সুবাদে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো বাংলা নাট্যধারায় স্বতন্ত্র মহিমা মর্যাদা অর্জন করে। "রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলা নাট্যধারাকে তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যেই মণ্ডিত করেছে। সর্বজনের 'ধূসর প্রখর রাজপথ' ছেড়ে একক সুরপন্থী রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকে যে সাংকেতিকতার প্রসার এনেছিলেন তা স্বতন্ত্ররূপেই বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ।"[১]

বাংলা নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ একটা সবিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। প্রচলিত নাট্যধারার সাথে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নাটকগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। আঙ্গিক, প্রকরণ, বিষয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যা বাংলা নাটকের উৎস বিকাশ ও পরিণতি প্রসঙ্গে বারবার লক্ষণীয় মাত্রায় ফুটে ওঠে। এ পর্যায়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা যেতে পারে। এতে রবীন্দ্রনাটকের একটা সুস্পষ্ট স্বচ্ছ অবস্থান আবিষ্কার করা সম্ভব, যার তুল্য-মূল্য বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলা নাটক, রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট নির্ণীত হতে পারে।

বাংলা নাটক আধুনিক যুগের সৃষ্টি। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় বাংলা নাটকও পাশ্চাত্য প্রভাবে নিজেকে গড়ে নেয়। কিন্তু এর পেছনেও আছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। যা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। বাংলা নাটকের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব-ভাবমূর্তি জানার জন্য তা অবশ্যই আলোচনার দাবিদার। প্রসঙ্গত বাংলা নাটকের সৃজনপরিক্রমায় এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জল, বায়ু, মাটি, মানুষ, সংস্কৃত নাট্য, লোকনাট্য, যাত্রা, পাঁচালী ও পরিপার্শ্ব-পরিস্থিতি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এ ছাড়া পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে শেক্সপীয়ার ও ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের নাম উল্লেখ করা যায়। সর্বোপরি একটা অনবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য অনুষঙ্গ বাংলা নাট্যসৃষ্টির পেছনে অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে। বিচ্ছিন্ন কোনো যুগ, বিভাগ, সন, তারিখ, ব্যক্তি বা প্রক্ষেপন প্রয়োজনে বাংলা নাটক সৃষ্ট নয়। বরং তা এ দেশের অনাদি-অকৃত্রিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আবহাওয়ার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

বাংলা নাটকের আদি-উৎস অন্বেষায় সংস্কৃত নাটককে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈদিক যুগে রচিত এসব নাটক প্রাচীনত্বের মানদণ্ডে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। যা উৎস ও সমবায় সহযোগ-সূত্রে বিশ্বনাটকের সাথে তুল্যমূল্য বহন করে। বিষয়, প্রকরণ, অবয়ব, উদ্দেশ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য বিদ্যমান। এমনই একটা ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ-সম্পন্ন নাট্যধারাই বাংলা নাটকের শেকড়ে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করে। এসব নাটকের রচনা বর্ণনাও বেশ গাম্ভীর্য-গভীর এবং মহান ঐতিহ্য অনুভবের আলোকে গ্রথিত। "...বৈদিক যুগেই বৈদিক যাগ-যজ্ঞের অঙ্গানুষ্ঠানরূপে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয়েছে এবং নাটকের প্রাথমিক রূপটি বৈদিক সংবাদ সূক্তসমূহের মধ্যেই নিহিত– ম্যাক্সমুলার প্রমুখের এই মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।"[৩] খ্রিঃ পূঃ যুগের একটা বিশেষ সময়কালে এসব নাটক রচিত। তবে খ্রিঃ পূঃ ৫০০ অব্দেই সংস্কৃত নাটক রচনার স্বর্ণযুগ বলে পণ্ডিতগণ মতামত প্রদান করেন। আর্য সম্প্রদায়ের একটা সমৃদ্ধ সাহিত্য-শাখা থেকে এসব নাটকের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। "আর্য গোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক প্রতিরূপ বৈদিক সূক্তগুলির মধ্যে, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সূক্তের মধ্যে নাট্যবীজের পরিচয় লাভ করা যায়"।[৪] মূলত বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের উৎসবকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান থেকেই ভারতবর্ষে নাট্যসৃষ্টির পথ সুগম হয়। যা পরবর্তীকালে আরো বেশি সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিশেষত পৌরাণিক যুগেই এই নাট্যধারা যুগার্জনকারী বৈশিষ্ট্যবিভায় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়। পৌরাণিক দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে নাটকের বহুবিস্তৃত পটভূমি সমাজমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সময় থেকেই নাটক রূপ রসের স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও এসব নাটকের অনুশীলন অনুসরণ অব্যাহত থাকে। এমনকি নাট্যকেন্দ্রিক শাস্ত্রসৃষ্টি ও মঞ্চাভিনয়ের বহুবিধ ক্রিয়াকর্ম এ সময়েই লক্ষ করা যায়। "পুরাণে শিবকে নটরাজ, নটেশ এবং নটনাথ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'সংগীত বিদ্যাবিনোদ'এ তিনি মহানট ও আদিনট বলে বর্ণিত। বিশ্বের স্রষ্টা ব্রহ্মা নাট্যকলা শেখেন মহাদেবের কাছ থেকে এবং তারপর তিনি গন্ধর্ববেদ বা নাট্যবেদ রচনা করেন। এটাই বিশ্বের সর্বপ্রাচীন নাট্য-শাস্ত্র। দেবতারা যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে প্রথম ভারতীয় বা হিন্দু-নাটক 'সমুদ্র-মন্থন' রচনা করেন। তারপর ব্রহ্মার কাছ থেকে নাট্যকলা শিক্ষা করেন ভরতমুণি। মহাকবি কালিদাস ভরতমুণিকে দেবতাগণের মঞ্চাধ্যক্ষ এবং অভিনেতা গণকে ভরত-সন্তান বলে বর্ণনা করেছেন। মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে দ্বিতীয় হিন্দু নাটক 'ত্রিপুরাধা' মঞ্চস্থ হয়। নটরাজ অর্থাৎ মহাদেব নিজেও এই নাটকের একজন দর্শক ছিলেন"[৫] নাটকের এই ব্যাপকভিত্তিক প্রযত্ন পরিচর্যায় ভারতীয় নাট্যধারা ক্রমান্বয়ে সংহত হওয়ার সুযোগ পায়। এতে পৌরাণিক দেবতা শিবের কৃতিত্ব অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত। "...বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের পরে পৌরাণিক যুগের শিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে শিবোপাসনাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত নাটকের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।"[৬] সংস্কৃত নাটকের এই ধারা পরম্পরা পর্যায়ক্রমে পরিণত পথে এগিয়ে যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে একেবারে আধুনিককাল পর্যন্ত এর সগৌরব যাত্রাপথ অক্ষুণ্ন থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা নাটকের গঠন গতিতে প্রাণ সঞ্চার করে দেয়। যা বাংলা নাটকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসূত্রে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদ (৬৫০-১১০০ খ্রিঃ) সমধিক পরিচিত। বাংলা নাটকের সূচনাসূত্র ও ইতিহাস পর্যালোচনায় এর গুরুত্ব কম নয়। চর্যাপদের মধ্যে কয়েকটি স্থানে নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয়ের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো বাংলা নাটকের আদর্শ আকররূপেও বিশ্লেষণের দাবিদার। এখানে এদেশের মৃত্তিকালগ্ন মানুষের চালচিত্র ফুটে ওঠেছে। যেমন ১০-সংখ্যক চর্যায় আছে– "তোহোর অন্তরে নড় পেড়া।' 'নড়পেড়া' শব্দের সংস্কৃত রূপ হচ্ছে 'নটপেটিকা।' এই শব্দের মধ্যমে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অভিনয়ের সাজসজ্জা ও প্রসাধন সামগ্রী বোঝানো হয়। এই অভিনয়সামগ্রী বহন করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও চর্যাপদে রয়েছে। সেসময় রীতিমত নাটক মঞ্চায়ন বা অভিনয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। ১৭-সংখ্যক চর্যায় বীণাবাদন, নাচ, গান ও অভিনয় প্রসঙ্গ বেশ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়–

> "নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।[৭]

বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ।”

এই পদটির মাধ্যমে নৃত্যগীতযুক্ত বুদ্ধ নাটকের পরিচয় দৃশ্যগোচর হয়ে ওঠে । যা তৎকালীন সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় । চর্যাপদের পাশাপাশি অন্যান্য সাক্ষ্য-সূত্র থেকেও বুদ্ধনাট্যকেন্দ্রিক অভিনয়রীতির প্রমাণ মেলে । এ ছাড়াও সেসময় সমাজের বিভিন্ন স্তরে অভিনয়রীতির ব্যাপক চর্চা ছিল বলে মনে হয় ।

“বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য যে আর এক ধরনের অভিনয়ের প্রয়োজন হতো তার সন্দেহাতীত প্রমাণ মিলেছে 'জাতক কাহিনীর বিভিন্ন বিবরণ থেকে । যেমন 'অবদান শতকম; কুবলয়' জাতকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে– “স শোভাবতীং রাজধানীমুপনিশ্রিত্য বিহরতি । যাবদ্দক্ষিণা পথাদন্যতারো নটাচার্য আগতঃ । তত্র শোভনেন রাজ্ঞা ভগবতঃ সকাশাত্ সত্যদর্শনং কৃত্বা নটাচার্যাণামাজ্ঞ দত্তা-বৌদ্ধং নাটকং মমপুরস্তান্নাটয়িতব্যমিত । তৈ রাজ্ঞা শিরসি প্রতিগৃহীতা এবং ভদন্তে তি । ততঃ সর্বননৈবৌদ্ধ নাটকং বিচার্য মুনিনির্জতং কৃতম ।' যাবদাজ্ঞোহমাত্যগণ পরিবৃতস্য পুরতো নটা নাটয়িতুমারদ্ধা ।” অর্থাৎ উল্লেখ আছে যে দক্ষিণাপথ থেকে এক নাট্যাচার্য আসেন এবং তিনি 'বুদ্ধ নাটক'-এ বুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন । আর অন্যান্য নটগণ তাঁর সঙ্গে ভিক্ষুকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন ।

উপর্যুক্ত 'কুবলয়' জাতকে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক'-এর উল্লেখ চর্যাপদে উদ্ধৃত বুদ্ধ নাটকের পূর্ববর্তী অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে । এছাড়া জাতকমঞ্জরী'তে উল্লেখ আছে যে 'নহি মোরা নট পাত্র ঠাট্টা তামাসার ।' এতে সেকালে প্রচলিত নাট্যাভিনয়রীতির সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ।”[৮] চর্যাপদের একটি কবিতার মধ্যেও অনুরূপ সমাজবাস্তবতার পারিচয় মেলে । এতে বৌদ্ধ নাটকের অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল । ১৭-সংখ্যক চর্যায় এই বহুমিশ্র নাট্যরীতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব । সেখানে বলা হয়–

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই

অর্থাৎ, “বাজিল (হে বজ্র) নাচছে, দেবী (নৈরামনি) গাইছে বুদ্ধের নাটগীত উল্টোরকমভাবে (কেননা, সাধারণ নাটগীতে পুরুষ গাইতো আর মেয়ে নাচতো) অভিনীত হয় ।

এই পদের ভেতর দিয়ে এমন সত্যে পৌঁছানো সম্ভব যে, প্রাচীন বাংলার লোকসমাজে বুদ্ধ নাটক ছাড়াও আরো কিছু অভিনয়রীতি বা নাট্যরীতির প্রচলন ছিল । আর সে সব নাট্যরীতিতে সাধারণত স্ত্রীলোকেরা নর্তকীর ভূমিকায় এবং পুরুষেরা গায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতো । কিন্তু বুদ্ধ নাটকের আসরে তার বিপরীত [অর্থাৎ বিসমা (বি + সম + আ + বিসমা) বা সমান নয় বা বিপরীত] ঘটনা ঘটত অর্থাৎ বুদ্ধ নাটকের আসরে নারী গাইতো এবং পুরুষ নাচতো । উপর্যুক্ত পদ থেকে তারই প্রমাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে । পদে বলা হয়েছে-দেবী অর্থাৎ নারী গান গাইছে আর বাজিল বা বজ্রাচার্য অর্থাৎ পুরুষ নাচছে । বুদ্ধ নাটক বিসমা বা স্বাভাবিকের ব্যতিক্রমভাবে অভিনীত হচ্ছে ।”[৯]

মধ্যযুগের প্রাচীন ও প্রথম নিদর্শন হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (১৩৪০-১৪৮০ খ্রিঃ)-এর নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য । এতে গীতিনাট্যের অভিনয়োপযোগী সব রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । মূলত একটি সার্থক নাটকের যাবতীয় লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে বিশেষত্ব দান করেছে । নাটকীয় কাহিনির কৌতূহল, আকস্মিকতা, গতিবেগ, সংঘাত, নাট্যশ্লেষ, নাট্যোৎকণ্ঠা বস্তুধর্মিতা- প্রভৃতি উপাদান বেশ শিল্পসংহত অবস্থায় পরিস্ফুট হয়েছে । এ ছাড়া অধিকারীর ভূমিকায় উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ, সংগীত ব্যবহার, সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্য প্রয়োগ ও বাঙালির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য-বিন্যাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে লক্ষণীয় । যা বাংলা নাটকের প্রাণময় স্রোতধারারই সাক্ষ্য-পরিচয় বহন করে চলে । বিশেষত বাংলা নাট্যধারার অনাদি অনন্ত কালের ফসল যাত্রা পাঁচালীর রূপময় প্রকৃতি এখানে লক্ষ করার মতো । লেখক বড়ু চণ্ডীদাস স্বয়ং তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদাবলীর উপর অভিনয়সূচক সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেন । যা বিশ্লেষণ করে গবেষকগণ এর মধ্যে বাংলা নাটকের মূলীভূত ধারার সত্যতা খুঁজে পান । এর মধ্যে লোকনাট্যের একটা ব্যাপকভিত্তিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষণীয় । কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, ঘটনাস্থল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পদাবলীর গোড়ায় সংস্কৃত ভাষায় লেখক কাহিনি ও চরিত্রবিষয়ক একটি বিবৃতি জুড়ে দেন । যা সংস্কৃত নাটকের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যবাহীরূপে দৃশ্যগোচর হয় । এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্যে অন্যান্য ভাষার প্রভাব প্রণোদনাও দুর্লক্ষ্য নয় ।

"ভরত উপরূপকের কথা না বলিলেও সাগরনন্দীর 'নাটক লক্ষণরত্নকোশ' এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্য দর্পণে উপরূপকের কথা বলা হইয়াছে। আঠারো প্রকার উপরূপকগুলির মধ্যে অনেকগুলিই নৃত্যগীতযুক্ত সংক্ষিপ্ত আকারের গীতিনাট্য। ত্রোটক ও সট্টক নৃত্যনাট্য নাট্যরাসক, কাব্য, বাসক হল্লিশ, ভাণিকা সবই নৃত্যগীত সম্বলিত গীতিনাট্য। সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশে লেখা এই ক্ষুদ্রায়তন নাটকগুলি হইতেই দশম শতাব্দীর পরবর্তী গীতিনাট্যগুলির উদ্ভব হইয়াছে।"[১০]

মধ্যযুগে বাংলা ও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) দান অপরিসীম। "শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসোত্তর জীবন বাংলার বাইরে পুরী ও অন্যান্য স্থানে অতিবাহিত করেন। তিনি যখন দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন, তখন অন্যের সাথে ভাব ও চিন্তা বিনিময়ের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিক্ষাষ্টক তাঁর একমাত্র রচনা বলে কথিত।[১১]

ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যায় চৈতন্যদেব মূলত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। এবং এই ভাষার মাধ্যমেই তাঁর ধ্যানমগ্ন তদগত ভাবের প্রকাশ ঘটতো। এরই প্রভাবে চৈতন্যদেবের অজস্র ভক্ত-পারিষদ সম্মোহ ভাবনায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার সৃজনশীল মনন চৈতন্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা সবিশেষ গুরুত্ব গরিমার আলোকে ধর্মগুরুর প্রশংসায় মুখর হন। প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাট্যকার রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের নাম উল্লেখ করা যায়। নাটকের প্রথমেই নাট্যকার চৈতন্যদেবের প্রশংসায় বলেন" সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুবঃ শচীনন্দন।" এসব নাটকের প্রকরণ পরিচর্যায় সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য-অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়। যা পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের গড়ন প্রকৃতিতে সুনিবিড় অবদান রাখে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যায় প্রাণপ্রতীতি ফিরে আসে। এ সময় চৈতন্যদেব স্বয়ং বাংলা ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। যা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "তিনি (শ্রীচৈতন্য) অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত রঘুনাথ বা রঘুনন্দনের সংস্কৃতচর্চা ও শাস্ত্রের আলোচনা ত্যাগ করিলেন; আর তৎস্থলে বাছিয়া লইলেন নিজের ও জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলা। এই ভাষায় তাঁহার গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং বেদ, পুরাণ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যরাও বাংলা ভাষার চর্চায় মাতিয়া উঠিলেন।"[১২] এর ফলেই জনমনের ভাষা বাংলা বিশেষ মর্যাদায় আদৃত হতে থাকে। চৈতন্যদেবের অজস্র ভক্তগণ এই ভাষায় ব্যাপকভাবে অনুশীলন শুরু করে দেয়। তাঁরা শিল্প সাহিত্যের চর্চার মাধ্যম হিসেবেও এই ভাষার মূল্যায়ন করতে থাকেন। এ সুবাদে তখন বাংলায় লোক নাট্যের ধারাটি বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এ সময় চৈতন্যদেবের ভক্ত পারিষদগণ ব্যাপকভাবে বাংলা নাটকের প্রবাহ-পরিচর্যা ছড়িয়ে দেন। বিশেষত যাত্রা পাঁচালী তথা গণনাট্যের একটা বিস্তৃত-ভিত্তিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। গীতিনৃত্য ও লোককাহিনি-সম্বলিত একক নাটক খোলাখুলি সাধারণ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌরাণিক ঘটনা-গাম্ভীর্য সুরক্ষিত হয়েছে। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০) এরই ধারাবাহিকতায় 'চণ্ডী' নাটকটি রচনা করেছেন। এটি চণ্ডী ও মহিষাসুরের যুদ্ধময় কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতিতে সংস্কৃত নাট্যনীতি গৃহীত হয়। যেমন, সংস্কৃত নাটকের মতো এখানে নটী সূত্রধর সংলাপ, নারী ও ইতরজাতীয় চরিত্রে প্রাকৃত ভাষার আরোপ এবং চরিত্রভেদে ভাষার ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ ছাড়া 'চণ্ডী' নাটকে যত্রতত্র সংগীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যা লোকনাট্য ও বাঙালির স্বভাবধর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভারতচন্দ্রের নাট্যরচনার বহু পূর্বেও মৈথিল সংস্কৃত নাটকের যুগলবন্ধন বাংলা নাটককে গড়ে তোলে। প্রায় দুশ বছর আগে রচিত চারটি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো নেপালে রচিত হয়েছিল। যেমন, কাশীনাথকৃত 'বিদ্যাবিলাপ', কৃষ্ণদেবকৃত 'মহাভারত', গণেশকৃত 'রামচরিত্র' এবং ধনপতি রচিত 'মাধবানল'। এগুলোর মধ্যে রামচরিত্র নাটকটি বাংলা ভাষায় রচিত। অন্য সবগুলো মৈথিলী ভাষায় রচিত। অবশ্য সে-সময় বাংলা ও মৈথিলী ভাষার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। এসব নাটকের মধ্যে সংস্কৃত নাট্যরীতি গভীরভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। অনুমান করা হয় মৈথিল ব্রাহ্মণগণ নেপালে গিয়ে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁরা সংস্কৃত নাট্যকাঠামোর মধ্যেই মৈথিল ভাষা প্রয়োগ করেন। ফলে সংস্কৃত আঙ্গিকে মৈথিল নাটক গড়ে ওঠতে থাকে। এসব নাটক সমকালীন সমাজে ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়েছিল। এতে নাটকগুলোর অপরিসীম জনপ্রিয়তা জিজ্ঞাসা কৌতূহল উদ্রেক করে। শুধু তাই নয়। এই নাট্যধারার প্রবল গতিবেগ বাংলা নাটকের অবয়ব অবস্থিতিও ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলে।

বাংলা নাটকের পূর্ণাবয়ব রূপপ্রকৃতি আধুনিক যুগের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সান্নিধ্য সহযোগ এর রূপনির্মিতিতে প্রাণ সঞ্চার করে। অষ্টাদশ শতক থেকেই এদেশে বিদেশি থিয়েটারের নির্মাণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এসব নাট্যমঞ্চে বিদেশি নাটকের অভিনয় শুরু হয়। বিশেষত, ইংরেজি নাটকই অধিকতর হারে মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। এসব নাট্যক্রিয়া অবলোকন করে বাঙালিরাও নাটক সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করেন। এছাড়া সমসাময়িক কিছু পত্র পত্রিকা বাঙালি সমাজকে

গভীরভাবে আলোড়িত করে। প্রসঙ্গত হিকির গেজেট ও ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যায়। এসব পত্রিকায় নাটক, অভিনয় ও মঞ্চ-সম্পর্কিত আলোচনা নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করা হতো। বিশেষত শেক্সপীয়র নাটকের বহুমাত্রিক শিল্পকৌশল ও সমালোচনা এতে স্থান পায়। নাটক বিষয়ে এই প্রচার প্রসারে বাঙালিসমাজ দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এবং নাটক রচনা, মঞ্চ পরিকল্পনা, অভিনয় পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা মনোনিবেশ করতে থাকেন। মূলত এ সময় থেকেই আধুনিক বাংলা নাটকের জন্য একটা উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। যা পরবর্তীকালে বাংলা নাটক রচনায় সবিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এ সময় কলকাতা শহরে গড়ে-ওঠা বিদেশি মঞ্চের মধ্যে ছিল 'দি প্লে হাইজ', 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার,' 'মিসেস ব্রিসটোর থিয়েটার' প্রভৃতি। সেসব মঞ্চে মূলত বিদেশি নাটকের অভিনয় সংঘটিত হতো। বাংলা নাটকের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মঞ্চ তৈরি হয় নি। তবে যাত্রাভিনয়ের ভাসমান মঞ্চব্যবস্থা দেশের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল।

১৭৯৫ খ্রিঃ রুশদেশীয় আগন্তুক গেরাসিম লেবেডফ প্রতিষ্ঠিত 'The Bengali Theatre'- এ প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়। এখানে 'The Disguise এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দু'টি ইংরেজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হতে দেখা যায়। এসব নাটকের অনুবাদকর্মে এ-দেশীয় আবহ অনুষঙ্গই ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ, বাগভঙ্গি ও নাম-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ-দেশীয় পরিপার্শ্ব-পরিস্থিতি প্রাধান্য পায়। তাছাড়া এসব প্রহসনে এ দেশের কবিতা গান ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙালি নাট্য ঐতিহ্যের কাছেই দ্বারস্থ হতে দেখা যায়।

প্রথম বাঙালি প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' সমকালীন সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি ১৮৩১ খ্রিঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চকে ঘিরে নাট্যামোদী বাঙালি সমাজে বেশ উচ্ছ্বাস-আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তাঁরা বিভিন্নভাবে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। একসময় প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই মঞ্চে ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত্রের একাংশ ও 'জুলিয়াস সিজারের পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হয়।

বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মঞ্চটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই মঞ্চেই প্রথম বাঙালি পরিচালিত বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছে। ১৮৩৩ খ্রিঃ মঞ্চটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই মঞ্চেই ১৮৩৫ খ্রিঃ ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। যাতে সম্পূর্ণরূপে দেশীয় আবহ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

বাংলা নাটকের উদ্ভব বিকাশে সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। বাংলা নাটকের কোনো সঠিক আদর্শ না থাকায় নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হন। একসময় তাঁরাই বাংলা নাটক রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, এ সুবাদে বাংলা নাটকও একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। ১৮২২ খ্রিঃ প্রবোদচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদরূপে 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' নামে একটি বাংলা নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। নাটকটি ধর্মীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতারূপে সমধিক পরিচিত। এতে বৈষ্ণব ও বেদান্ত ধর্মদর্শনের নিগূঢ় সাদৃশ্য-সমবায় উপস্থাপিত হয়। এ বছরই 'হাস্যার্ণব' নামে একটি প্রহসন রচিত হয়েছে।

এটি- জগদীশ্বরের 'হাস্যার্ণব' প্রহসনের অনুবাদ বলে অনুমান করা হয়। এখানে সামাজিক অসঙ্গতির চালচিত্র শিল্পসৌকর্যের আশ্রয়ে পরিবেশিত। প্রহসনের কাহিনিতে কামপরবশ মূর্খ রাজা ও লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞান চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি ব্যক্তিদের পরিহাস করা হয়েছে। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 'কৌতুকসর্বস্ব' নামে একটি প্রহসন সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। এটি ১৮২৮ খ্রিঃ অনূদিত হয়। এর প্রায় বিশ বছর পরে রামতারক ভট্টাচার্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকটি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ-নাট্যকর্ম সমকালীন সমাজে বেশ আলোড়নের ঝড় তোলে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'এ এ-সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা তুলে ধরেন। সেখানে তিনি অনুবাদনাট্যের উপযোগিতা প্রসঙ্গে নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক প্রকরণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ পর্যায়ে ১৮৪৯ খ্রিঃ নীলমণি পাল শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বনে 'রত্নাবলী' অনুবাদ করেন। তাছাড়াও নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকটি ১৮৫৫ খ্রিঃ অনূদিত হয়। যা পরবর্তীতে বেশ সাড়ম্বর আয়োজনের মাধ্যমে আশুতোষ দেবের বাড়িতে অভিনীত হতে দেখা যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অনুবাদকদের মধ্যে অধ্যাপক রামনারায়ণ সর্বাধিক সাফল্যের দাবিদার। তিনি মৌলিক নাটক রচনার পাশাপাশি অসংখ্য সংস্কৃত নাটকের অনুবাদক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যা সে সময়ে মঞ্চ সাধারণ নাট্যকার ঘিরে বেশ একটা উজ্জীবন অনুপ্রাণনা সৃষ্টি করে। এ সুবাদে সমকালীন নাট্যাঙ্গনে নাটক রচনা, অনুবাদ, মঞ্চ পরিকল্পনা, অভিনয় প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে বেশ একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়। যা বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রটিও নিবিড়ভাবে প্রস্তুত করে দেয়।

১৮৫২ খ্রিঃ বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত, জি.সি গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। নাটক দুটি পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত রীতি আদর্শ অনুযায়ী রচিত। মহাভারত কাহিনির অংশবিশেষ নিয়ে ভদ্রার্জুন নাটকের প্লট গৃহীত হয়েছে। মূলত অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের ঘটনাই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে অনুসৃত হয়। এ ছাড়া এখানে প্রকরণ পরিচর্যায় পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। নাট্যকার নিজেও নাটকটির বিজ্ঞাপনে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করার কথা স্বীকার করেন। এ রীতি বলতে আসলে শেক্সপীয়রের নাট্যরীতিটি বোঝানো হয়। 'ভদ্রার্জুন' নাটকের কাঠামোটি বিশ্লেষণ করলেই এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত শেক্সপীয়র নাট্যরীতিটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

শেক্সপীয়রের নাটক মূলত পাঁচটি অঙ্ক (Act) দ্বারা বিভাজন করা হয়। প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে আবার কয়েকটি দৃশ্য (Scene) অন্তর্ভুক্ত থাকে। নাটকে একটি মূল কাহিনি ভাব নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। আবার এর সাথে একাধিক শাখা কাহিনি শাখায়িত পল্লবিত আকারে নাট্য কাহিনিতে পরিণতি দান করে।

নাট্যকার তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটকে শেক্সপীয়রের অনুরূপ নাট্যরীতি অনুসরণ করেন। এতে তিনি বাংলা নাটকে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করে তোলেন। গতানুগতিক সংস্কৃত নাট্যরীতি পরিহার করে সেখানে তিনি আধুনিকতার বাতাবরণ উন্মোচনে উদ্যোগী হন। তবে সবরকম সচেতন সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি অবচেতন মনেই সংস্কৃত নাটকের অনেক নাট্য নির্দেশ গ্রহণ করেছেন। যেমন, দৃশ্যশেষে ঘটনার বর্ণনা, একই দৃশ্যে গদ্য-পদ্য সংলাপের ব্যবহার, ভাষা ও উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাস ব্যবহারে মূলত সংস্কৃত নাটককেই অনুসরণ করা হয়। এ ছাড়া বাঙালির স্বভাবধর্মের কথা বিবেচনায় এনে নাট্যকার নাটকটিতে গানের ব্যবহার করেছেন। তবে সবমিলিয়ে 'ভদ্রার্জুন' নাটকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিশ্রিত একটা সমন্বয়ধর্মী নাট্যরীতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাসই' প্রথম বিয়োগান্ত নাটক হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যে নাটকীয় পরিণাম মূলত মিলনান্তক হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে 'কীর্তিবিলাস'ই প্রথম বিয়োগান্ত নাটক হিসেবে একটা ঐতিহাসিক স্থান দখল করে নেয়। এখান থেকেই বিরহ-বিচ্ছেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ট্রাজিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটকের যাত্রাপথ সূচিত হতে থাকে।

'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার পাশ্চাত্য রীতি-আদর্শ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। অবচেতন মনেই হয়তোবা অস্তিত্ব ঐতিহ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতার সাথে পাশ্চাত্য প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। যেমন, অঙ্কবিভাগ, দৃশ্যবিন্যাস ও নাটকীয় পরিণতির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। অন্যদিকে সংলাপ ভাষাভঙ্গিমা ও অলঙ্কার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটককেই অনুসরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া নাটকীয় আবহ-অবস্থিতি বিনির্মাণের বেলায় নাট্যকার দেশীয় যাত্রা পাঁচালীর দ্বারস্থ হন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে ব্যাপক মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তার নিরিখে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) নাটকটি বিশিষ্টতার দাবিদার। সংস্কৃত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দেশীয় ঐতিহ্য অনুষঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে এটি রচনা করেন। একদিকে সংস্কৃত নাট্য-ঐতিহ্য অন্যদিকে লোকনাট্যের প্রাণময় ধারা- এই উভয়বিধ প্রবাহ-পরম্পরা অত্যন্ত সার্থকতার সাথে প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী অঙ্কবিভাগ, নান্দী-সূত্রধরের প্রবেশ, সূত্রধরের সাথে নটীর কথোপকথন, চরিত্র অনুযায়ী ভাষার ভিন্নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যবিন্যাস লক্ষণীয়। এ ছাড়া লৌকিক নাট্যের যমক-অনুপ্রাস, টাইপ চরিত্র, অশ্লীলতা, ভাঁড়ামি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহার বেশ সার্থকভাবে সম্পন্ন করা হয়। নাটকটির পরিণতিও সংস্কৃত নাটকের আদলে মিলনান্তকরূপে প্রদর্শন করা হয়।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক। মূলত বল্লালসেনীয় কৌলীণ্য প্রথার কুফল পরিণতি ফুটিয়ে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। নাট্যকার আলোচ্য নাটকের বিজ্ঞাপনে বলেন,

“পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কূল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যানতৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্থাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম; তন্নিমিত্ত পতিব্রতোপাখ্যানে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে। পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্ধরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম এই যে, “বল্লালসেনীয় কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন- কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে। তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসম্বলিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক

যিনি রচনা করিয়া রচকগণমধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাহাকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।"[১৩]

রামানারায়ণ পরবর্তীকালে সামাজিক নাটক 'নবনাটক (১৮৬৬) রচনা করেন। এতে বহুবিবাহের কুফল পরিণতি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। নাট্যকার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন, "ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।"[১৪] রামনারায়ণ 'নবনাটক' রচনা করতে গিয়ে সংস্কৃত নাট্যপদ্ধতি অনুসরণ করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষণীয়। যেমন, অঙ্কের মধ্যে গর্ভাঙ্কের ব্যবহার, মৃত্যুতে নাটকের পরিসমাপ্তি, নাটকের শেষে নটী-সূত্রধর কথাবার্তা- ইত্যাদি অংশ সংস্কৃত নাট্যরীতির সাথে বৈপরীত্য-বিচ্যুতি নির্দেশ করে। এ সব অংশ অনেকটাই যেন পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ দ্বারা আলোড়িত।

রামনারায়ণ 'রুক্মিণীহরণ (১৮৭১) নামে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন। এখানে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নাট্যবর্ণিত রীতি কোনোটিই সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় নি। নাট্যকার প্রতিমুহূর্তে একটা বিমিশ্র ভাবতরঙ্গে দোলায়িত হন। যেমন, অঙ্ক গর্ভাঙ্কের অসঙ্গতি ও প্রস্তাবনা বা নটী সূত্রধরের অনুপস্থিতি মিলিয়ে একটা অসম্পূর্ণ অবস্থা।

রামনারায়ণ রচিত অন্য একটি পৌরাণিক নাটক কংসবধ (১৮৭৫)। এখানে অঙ্ক গর্ভাঙ্কের কিছু বিভক্তি বিন্যাস থাকলেও অন্য কোনো নাট্যরীতি চোখে পড়ে না। মূলত বিষয় বিন্যস্ততার পথ বেয়ে পরিণতি প্রদানই নাট্যকারের মূল লক্ষ্য। এখানে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসনিধনই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত।

এ ছাড়া রামনারায়ণ রচিত তিনটি প্রহসনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (১৮৬৪) 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯) ও চক্ষুদান (১৮৬৯)। সামাজিক অসঙ্গতি অনাচার সুতীব্র শিল্পকৌশলের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই ছিল এসব প্রহসনের উদ্দেশ্য। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' প্রহসনে সমকালীন সমাজের অন্যতম সমস্যা পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি ও যথাযথ পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে সংস্কৃত প্রহসনের আদলে গান ও কবিতার ব্যবহার লক্ষণীয়। তাছাড়া প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে রামনারায়ণ এই প্রহসনে বিস্ময়কর দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হলো। যেমন,

> "সুমতি।- আমার আবার সুখদুঃখ,' পেয়াদার আর শ্বশুরবাড়ি।
> – মুখখানি ত নয় যেন শিউলির কাটারি খানি।
> – "ডাইনের কোলে গো সমর্পণ।" যে রক্ষক সেই ভক্ষক।
> – আমি ধরবো মাচ, না ছোঁব পানি।" এমনিভাবে থাক্‌বো এখন।
> – আঃ মাগী যেন 'বাঘের মাসী,' যেথা যায় আর আসতে চায় না।
> – তা আর 'নাচতে বসেছ, তার আর ঘোমটায় কাজ কি' উবুড় হয়ে বস্যে একবার, ভাবলে কি হবে বল?
> মতের মা।– বলে "গেরস্থের বৌ খাড়ু নাড়ে, কোত্তা বলে আমার জন্য বাত বাড়ে।"[১৫]

'উভয় সঙকট' প্রহসনে বহুবিবাহের অশুভ পরিণতি– চিত্রগাথা হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়। দুই সতীনের সপত্নী বিদ্বেষপ্রসূত মন্ত্রণায় নাকাল স্বামীর অবস্থা এখানে বর্ণিত। চক্ষুদান প্রহসনে পরস্ত্রীকাতর পুরুষের রূপময় প্রকৃতি উপস্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত সরস ভঙিতে প্রবাদ প্রবচনের মাধ্যমে নাটকীয় সংলাপ বিন্যস্ত। নাটকের রীতি আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যিক বাংলার লোকনাট্য প্রভাবই অধিকতররূপে পরিস্ফুট।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) আধুনিক বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অনুবাদের একঘেয়ে আবর্তন, সংস্কৃত নাটকের আড়ষ্ট অনুকৃতি ও লোকনাট্যের গ্রাম্যতা এড়িয়ে তিনিই প্রথম বাংলা নাটককে পাশ্চাত্যরীতিতে গড়ে তোলেন। তবে এতকিছুর পরও মধুসূদন কখনও কখনও নাটকের উপকরণ উপাদান সংগ্রহে দেশীয় সম্ভারের দ্বারস্থ হন। এ ব্যাপারে তাঁর এতটুকু কার্পণ্য নেই। বরং প্রায় ক্ষেত্রেই একটা সুষম সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্লট মহাভারতের আদিপর্ব থেকে গৃহীত। তবে এটি তিনি ইচ্ছেমত অদল-বদল করে স্বাধীনভাবে গড়ে তোলেন। যা বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা বৈপ্লবিক সূচনাও বটে।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকের আঙ্গিক-অবয়ব নির্মাণে মধুসূদন শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ গ্রহণ করেছেন। যেমন কাহিনির পঞ্চাঙ্ক বিভক্তি, অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিণতি ভাবনা, গতিবেগ, নাট্যোৎকণ্ঠা, বিরুদ্ধপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব- ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি গৃহীত। কিন্তু উপাদান-অনুষঙ্গ বিবেচনায় মধুসূদন সংস্কৃত নাটককেই আদর্শরূপে বেছে নিয়েছেন। নাটকটির সংলাপ রচনায় সংস্কৃত নাটকের মতো বিবৃতমূলক পরোক্ষরীতি অনুসরণ করা হয়। পরোক্ষ কাহিনি ও

চরিত্রের উচ্ছ্বাসমুখর বর্ণনাও সংস্কৃত নাটককেই বারবার মনে করিয়ে দেয় । শব্দবিন্যাস ও অলঙ্কার ব্যবহারে 'শর্মিষ্ঠা' সংস্কৃত নাটকের অনুসারী হয়ে ওঠে । যেমন, সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদসমষ্টি ও বাহুল্যপূর্ণ অলঙ্কারের ব্যবহার লক্ষণীয় । এ ছাড়া মধুসূদন এখানে বিদূষক জাতীয় চরিত্র, স্বগতোক্তি ও সংগীত ব্যবহার এবং নাটকীয় কাহিনির পরিণতিতে সংস্কৃত নাটককে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন ।

গ্রিক পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও সংস্কৃত নাটকের আদর্শ সমন্বয়ে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করেন । নাটকের অঙ্ক ও গর্ভাঙ্ক বিভক্তি ছাড়া বাকি পুরোটাই সংস্কৃত নাটককে আদর্শ মেনে সৃষ্টি করা হয় । যেমন, আকাশ ও নেপথ্যের দূরাগত শব্দ, ভরত বাক্যের ব্যবহার, বিদূষক চরিত্রের ব্যবহার, সংগীতের প্রয়োগ ইত্যাদি অংশ সংস্কৃত নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে ওঠে ।

মধুসূদন সর্বপ্রথম সর্বাঙ্গসম্পন্ন পাশ্চাত্য রীতিতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন । এটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডি হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে । নাটকটির কাহিনি জেমস টড প্রণীত 'রাজস্থান (Annals and Antiuities of Rajasthan. London 1824) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে ।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের আঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায় পুরোটাই পাশ্চাত্য রীতির অনুসারী । যেমন, পঞ্চাঙ্ক ভাগ ও অঙ্কের অন্তর্গত গর্ভাঙ্কের ব্যবহার, মূল কাহিনির সাথে শাখা কাহিনি, সংস্কৃতবহুল বিবৃতধর্মী অকারণ উচ্ছ্বাসপূর্ণ সংলাপ বর্জন, শ্লথগতিপূর্ণ স্বগতোক্তি পরিহার ইত্যাদি ব্যাপারে পাশ্চাত্য রীতি আদর্শই গ্রহণ করা হয় ।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভাব-ভাবনারও পরিকল্পনায় গ্রিক নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে । নায়িকা কৃষ্ণকুমারীর অনিবার্য নিয়তি নির্ধারণে এর প্রভাব লক্ষণীয় । এ ছাড়া কাহিনি বিনির্মাণে স্থান ঐক্য ও কাল ঐক্য রক্ষার ব্যাপারেও তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । পাশাপাশি 'কৃষ্ণকুমারী' তে সংস্কৃত নাটকের কিছু ক্ষীণধারার প্রতিফলনও দুর্লক্ষ নয় ।

এই নাটকের 'ধনদাস' চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া অবলম্বনে রচিত । 'বিলাসবতী' শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বসন্তসেনা চরিত্র অনুসরণে গড়ে তোলা হয় । জয়সিংহ শৃঙ্গাররসাত্মক সংস্কৃত নাটকের নায়ক চরিত্র দ্বারা পরিকল্পিত । এ ছাড়া কৃষ্ণকুমারী নাটকের সঙ্গীত ব্যবহারেও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব-প্রচ্ছায়া আবিস্কার করা সম্ভব ।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৪) একটি জনপ্রিয় নাম । বাস্তবভিত্তিক জীবনঘনিষ্ঠ নাটক রচনায় তিনি বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছেন । ফলে তাঁর নাট্যসমূহ অসাধারণ মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা দ্বারা অভিষিক্ত হতে থাকে । এর পেছনে ছিল দীনবন্ধুর জাতীয় দায়বোধনিষ্ঠ মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা । সমসাময়িক জীবন ও সমাজের অসঙ্গতি অনাচার তাঁকে অসমসাহসী কলম সৈনিক হতে শিখিয়েছে । এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম দেশের শাসক শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ । দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ । সভ্যনামিক মানুষের বর্বর অন্তর উদঘাটিত হইল ।"[১৬]

দীনবন্ধু মিত্র রচিত নাটকগুলো হচ্ছে– 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) প্রভৃতি ।

নাট্যরচনায় দীনবন্ধু মিত্র মূলত শেক্সপীয়রকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 'নীলদর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী' প্রভৃতি নাটকে অনুরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব । তবে সংস্কৃত নাটকের অনুষঙ্গ অনুরণনও লক্ষণীয় মাত্রায় ফুটে ওঠে । এ ছাড়া লোকনাট্যের ধারাপরম্পরাও দীনবন্ধু মিত্রকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে । যেমন, যাত্রা-পাঁচালীর যমক, অনুপ্রাস ও শ্লেষযুক্ত সমিল বাক্য, সংস্কৃত নাটকের সমাসবদ্ধ তৎসমবহুল বাক্য, অলঙ্কার আবেগ, স্বগতোক্তি ও ভাষা ব্যবহার দীনবন্ধুর নাটকে যত্রতত্র চোখে পড়ে । প্রহসন রচনায় দীনবন্ধু অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সামর্থ ও সৌকর্য চোখে পড়ে । তাঁর রচিত প্রহসনসমূহের ভাঁজে ভাঁজে এ কথার যথার্থ উপলব্ধি অনুধাবন করা সম্ভব । যেমন ঘটনার আকস্মিকতা, অভিনবত্ব, কৌতূহল, জটিলতা, উদ্ভট পরিস্থিতি, ক্রমোচ্চ উৎকণ্ঠা ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে পাঠকসাধারণের মনকে সম্মোহ ভাবনায় কাছে টানে । 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রহসন ।

নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন । বাংলা নাটকে দেশীয় ঐতিহ্য অনুষঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য । বাঙালির আদি-অকৃত্রিম যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি শৈল্পিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেন । এ পর্যায়ে নাট্যকার মনোমোহন গর্বিত বাঙালি জাতির হারানো সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হন । মনোমোহন বসু রচিত নাটকসমূহ হচ্ছে– 'রামাভিষেক' (১৮৬৭–, 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৫), 'প্রণয় পরীক্ষা (১৮৯৬) ইত্যাদি ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) বাংলা নাট্যধারায় একটা বিশেষ ভাবাদর্শের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এ ক্ষেত্রে দেশমাতৃকার কিছু ন্যায়নিষ্ঠ দায়বদ্ধতা তাঁকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করে। ফলে মৌলিক নাটক রচনার অবকাশ উদযাপন ছিল নিতান্তই অল্প। দেশের গৌরব ও ঐতিহ্য জাগ্রত করাই ছিল তাঁর আজীবন সাধনার প্রধান ব্রত। এই লক্ষাভিমুখী সাধন ভজন তাঁর যাবতীয় শিল্পসাধনাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত প্রায় ৩৩টি নাটকই অনুবাদ। মূলত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদেই তাঁর অধিকতর সাফল্য লক্ষণীয়। তিনি সংস্কৃত নাট্যকার ভাসের প্রায় সবক'টি নাটকই অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া ইংরেজি ও ফরাসি নাটকের অনুবাদেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃতিত্ত্বের স্বাক্ষর প্রদর্শন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছে– 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) ইত্যাদি। প্রহসনের মধ্যে রয়েছে, 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২) 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭), 'হিতে বিপরীত (১৮৯৬), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহণ' ইত্যাদি।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) অসাধারণ জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব। সমকালীন সমাজে নাট্যমঞ্চকে ঘিরে গিরিশচন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটা গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির চোখ-ধাঁধানো সান্নিধ্যে আত্মবিস্মৃত বাঙালির পথিকৃৎ পুরুষরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সেদিন বিভ্রান্ত জাতিকে মূলানুগ ঐতিহ্য অনুসন্ধানে ফিরিয়ে আনার মহানব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। বিজাতীয় অপসংস্কৃতির ভিড়ে দেশীয় মঞ্চ উপস্থাপন তাঁর দ্বারাই যথাযথরূপে সম্ভব হয়েছিল। এ জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি পৌরাণিক কেচ্ছা-কাহিনি ও দূরস্থিত আবহ-ঐতিহ্য সন্ধান করে ফেরেন। ফলে প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সমাজচিত্র সেখানে অনুপস্থিত। বস্তুনিরপেক্ষ শিল্পচেতন সংহতি-সমবায় থেকেও নাটকগুলো বঞ্চিত। তাছাড়া উদ্দেশ্য-মোহ তাড়নাও তাঁর শিল্পসত্তাকে বারবার আছন্ন করে ফেলে। ফলে সর্বাঙ্গসম্পন্ন শিল্পসৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সর্বোপরি সমকাল সমাজের গণমানুষ তাঁকে অকুণ্ঠ ভালোবাসার শীর্ষবিন্দুতে বরণ করে নিয়েছে। তিনি বাঙালির প্রাণময় ধারাপাতের একজন যথার্থ প্রতিভূ-প্রতিনিধিরূপেই আবির্ভূত হন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করেন। এই বিপুলসংখ্যক নাট্যসৃষ্টির পেছনে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনমনের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসাই ক্রিয়াশীল রয়েছে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) একটা সবিশেষ মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। আধুনিকতার অন্যতম মূলমন্ত্র স্বদেশপ্রেম তাঁর নাটকে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে চিত্রিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বলোকে তাঁর অবস্থান। মূলত সার্বজনীন জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমই ছিল নাটকীয় প্লট নির্বাচনের প্রধান লক্ষ। যা ছিল শুধুমাত্র দেশমাতৃকার কাঙ্ক্ষিত কল্যাণের নিকট নিবিড় ভাবে সমর্পিত। তিনি বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে উজ্জীবিত করে তোলেন। এ ক্ষেত্রে গণমানসে দেশপ্রেমের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। "জাতীয় মন্ত্র-দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার ক্ষুব্ধ জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা ফুটাইয়া তুলিয়া ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন। ... ভারতবাসীর শত প্রকার দুঃখলাঞ্ছনার মধ্যেও নাট্যকার আবার আমাদিগকে মানুষ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। এই সুগভীর আশাবাদ তাঁহার নাটকগুলিকে অমূল্য জাতীয় সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"[১৭]

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত নাটকসমূহ হচ্ছে– 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫) ইত্যাদি। এসব নাটকে মূলত শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করা হয়। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত নাটককেও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করেছেন। তিনি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও 'বাল্মীকি রামায়ণ' অবলম্বনে 'সীতা' নাটক রচনা করেন।

বাংলা নাটক বর্ণসংকর বাঙালি জাতির মতোই বহুমিশ্র প্রাণের সমবায়ে গড়ে ওঠে। যা সৃষ্টিলগ্নে পাশ্চাত্য নাটকের একটা প্রত্যক্ষ ভাবে আলোড়িত হয়। মূলত শেক্সপীয়র নাটকের আদর্শই গ্রহণ করতে দেখা যায়। তবে এ কখনো অন্ধ অনুকরণ নয়। গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে এ দেশের একটা উপযোগী অবকাঠামো বাংলা নাটকে সংহত রূপ খুঁজে পায়। অন্যদিকে এ দেশের ঐতিহ্যিক লোকনাট্য, যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা ও সংস্কৃত নাটকের রূপনির্মিতি অনেকস্থানেই বাংলা নাটকের ভিত তৈরি করে দেয়। তাছাড়া পরিপার্শ্ব-পরিস্থিতি, ভৌগোলিক ভিন্নতা, স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের স্বভাববৈশিষ্ট্যও বাংলা নাটকের পরতে পরতে মিশে আছে। নাটকের ভাবদর্শন নির্মাণের ক্ষেত্রেও একটা বিমিশ্র প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে শেক্সপীয়র নাটকের চরিত্রগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গ্রিক ট্রাজিডির নিয়তিবাদ সমান ভাবে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। তবে কোথাও কোথাও এর বিসদৃশ-বৈপরীত্য অবস্থাও দুর্লক্ষ নয়।

পাশ্চাত্য নাটকের দৃশ্যায়িত জীবনবোধ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বেগবান। অড়ষ্টহীন মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের চিত্রও অত্যন্ত প্রবল। পার্থিব জীবনের চাওয়া-পাওয়া সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। মানুষগুলো প্রচণ্ডরূপে অধিকারসচেতন ও প্রাপ্তির অনুকাঙ্ক্ষায় সবসময় মুখর। কোনোরকম কৃচ্ছসাধন নয়। জীবনকে জীবনের কাছেই উদযাপন করা উচিৎ। আড়ালে আবডালে বা নেপথ্যের কোনো মায়াবী হাতছানিতে তা কখনো প্রলুব্ধ হতে পারে না। এ অবস্থায় জীবন যেমন অত্যুচ্চ উচ্ছ্বাসে মুখর আবার দুঃখও তেমনি প্রচণ্ডরূপে যন্ত্রণাদায়ক। ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে মানসিক যন্ত্রণাদগ্ধ মহান ট্রাজিডি চরিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়। আবার হাস্য পরিহাসমুখর কমেডি চরিত্রও অনুরূপভাবে বেশ সার্থকতার সাথে ফুটে ওঠে। পাশাপাশি ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যবিভা এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে থাকে। ফলে এই আবহ অন্বেষায় সৃষ্ট নাট্যাদর্শ কখনো বাংলা নাটকে পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে বাঙালিদের সংস্কারসর্বস্ব সমাজজীবনে কোনোকিছুই অবাধ-অকুণ্ঠ বা স্পষ্ট নয়। আচারপরায়ণতার আত্মপ্রসাদ এ জাতিকে মর্মে মর্মে গেঁথে ফেলেছে। সবকিছুর মধ্যেই একটা অদৃশ্য অলৌকিক প্রচ্ছায়া নিশির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধজনিত স্বাধীনতা নিতান্তই কম। অন্যের হয়ে, অন্যকে খুশি করা, অপ্রতিভ অবস্থায় ভারবাহী হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আত্মগত অনুভবের ভাবভঙ্গিমা সেখানে বারবার নতজানু হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিমুহূর্তে রহস্যপ্রিয়তা, লুকোচুরি, শঠতা, সামঞ্জস্যহীনতা, বর্ণময়তা বাঙালির স্বভাববৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে আবহাওয়াগত বৈচিত্র্য বিভিন্নতা এসেও যুক্ত হয়। এ অবস্থায় এখানকার শিল্পসাহিত্যও অনুরূপ পোষকতা প্রাণনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। যাতে কখনো পুচ্ছগ্রাহীরূপে পুরোপুরিভাবে পরানুকৃতি সম্ভব নয়। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। বাংলা নাটকও নানা জাতি সংস্কৃতির সান্নিধ্যে ও স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে ভুলে থাকতে পারে নি। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উন্নত শিল্পসূত্রসমূহ আবার একেবারে ত্যাগ করে নি। আত্মীকরণের মাধ্যমে একেবারে নিজের করে নিয়েছে। এ অবস্থায় বাংলা নাটকের যাত্রাপথ সবসময় একটা সুষম সমন্বয়ের পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছে। তা একটা শক্তিশালী ভিত্তি কাঠামোর উপর নিজের অবস্থান তৈরি করে নেয়। যা পৃথিবীর যে কোনো শিল্প মাধমের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা রাখে।

বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমনই এক সময় সন্ধিস্থলে রবীন্দ্রনাথের আগমন ঘটে। বিস্ময়কর প্রতিভাদীপ্ত রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কিছু যুগান্তকারী কৃতিত্ব সম্পন্ন করেন। বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারাকে ঠিক রেখেই যেখানে শৈল্পিক সমুন্নতি প্রয়োগ করা হয়। পাশ্চাত্য নাটকের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় স্পষ্ট প্রকাশ তাঁর নাটকে আরো বেশি বহ্নিময় ও বেগবান। অসম্ভব প্রতিভার দীপ্তি ও দাহ নিয়ে তিনি এ ক্ষেত্রে বাংলা নাটককে আরো শাণিত করে তোলেন। আবার নাটকীয় উপকরণ-উপাদান সংগ্রহে দেশীয় সংস্কৃতিতে তিনি বিনম্র ভাবনায় সমর্পিত হন।

ব্যক্তিচরিত্রের মননশীল মানসপরিক্রমার পথ বেয়ে আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি। অন্তর্গত মানবচিত্তের বহুবর্ণিল বিস্তার বৈচিত্র্য সেখানে মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। বুদ্ধিদীপ্ত সুতীক্ষ্ম-মার্জিত বোধবুদ্ধি এই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিমা নির্মাণ করে থাকে। এরই যথাযথ প্রয়োগ প্রতিযোগিতায় আধুনিক সাহিত্য ক্রমোচ্চ শিখরে অভিষিক্ত হচ্ছে। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। অথচ বাস্তব সত্য হলো, বাংলা নাটকের ধারাটি আধুনিকতার এই প্রাণময় প্রবাহকে আত্মস্থ করতে পারে নি। এ জন্যে বহুমাত্রিক কার্যকারণও অবশ্য বিদ্যমান রয়েছে। এ পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই নাট্যকারগণ নানাবিধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও গোষ্ঠিগত স্বার্থরক্ষাই ছিল মূল কথা। ফলে নাটকের আঙ্গিক-উপাদানগত নির্মাণও সেদিকে দৃষ্টি রেখে সম্পন্ন করা হয়। এ অবস্থায় প্রকৃত শিল্পসম্মত নাট্যসৃষ্টির প্রয়াস বিঘ্নিত হতে বাধ্য। নির্মোহ-নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তা সম্ভবও নয়। এ প্রসঙ্গে মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের নাটকগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক দায়বোধের সতর্ক প্রহরায় রচিত। সেখানে ব্যক্তিক অনুভবের মননশীল প্রকাশের মাত্রা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

এরকম একটা বাস্তব বলয়বৃত্তের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হন। এ ক্ষেত্রে তিনি একটা রীতিমত বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা নাটকে ব্যক্তিচরিত্রের সংঘাত, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল, আকস্মিকতা, গতিবেগ, আন্দোলন অনুভবকে ফুটিয়ে তোলেন। আধুনিতার প্রধান দাবি- Humanism-এর যথাযথ প্রয়োগ-পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে। Man is the measurement of all things- এ কথাও যেন রবীন্দ্রনাটকের পাঠগ্রহণের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব। এ সুবাদে রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক বাংলা নাটকের প্রবর্তক পথিকৃৎ-পুরুষ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাছাড়া বাংলা নাটকের স্বরূপ-প্রকৃতি ও নির্মিতি-শৈলী নিয়েও তিনি নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এ পর্যায়ে তাঁর এই একক আধিপত্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকেই নির্ণীত হতে পারে।

"... রবীন্দ্রনাথকেই বলা চলে বাংলা ভাষার আধুনিক নাট্যের প্রবক্তা, কেননা তাঁর আগের এবং পরের বাঙালি নাট্যকাররা পরিমাণে তাঁর তুলনায় অনেক বেশি নাটক লিখলেও নাটকের শৈলী ও প্রয়োগরূপ নিয়ে তাঁর মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর আগে পরে আর কেউ করেননি বলেই মনে হয়।"[১৮(ক)]

আধুনিকতার প্রধানতম বিষয়সমূহ- শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, মানবতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, যন্ত্র ও জীবনের প্রতিযোগিতা, বুদ্ধিগত জটিলতা, ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ ইত্যাদি প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাটকে অত্যন্ত সার্থকতার সাথে চিত্ররূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা নাটকে এর উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাটকে এসব আধুনিক অনুষঙ্গ অত্যন্ত শিল্পসৌকর্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে মানুষ প্রবলরূপে অধিকারসচেতন। জীবনতৃষ্ণার চাওয়া-পাওয়া প্রতিমুহূর্তে তাড়িয়ে বেড়ায়। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাতে মানুষ আত্মচেতনায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। বাঙালি জীবনে এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অন্য কোনো নাট্যকার এই স্রোতধারাটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর নাট্যচরিত্রে অনুরূপ ভাবধারাসমন্বিত প্রবাহকে রূপায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর রাজা নাটকের নায়িকা সুদর্শনা, অচলায়তন নাটকের পঞ্চক, ডাকঘর নাটকের মাধবদত্ত, মুক্তধারা নাটকের রাজা রণজিৎ, রক্তকরবী নাটকের নন্দিনী প্রমুখ চরিত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা নাটক বরাবরই বাহ্যিক আড়ম্বর, জৌলুস কাঠামো ও সামাজিক নির্দেশনায় ভরপুর ছিল। অতিনাটকীয়তার উৎপাতে নাটকের কাহিনিসমূহে বারবার ছন্দপতন ঘটে। তাৎক্ষণিক আকস্মিক উপস্থাপনার মাধ্যমে চোখধাঁধানো আবেদন সৃষ্টি করাই ছিল উদ্দেশ্য। এতে দর্শকসাধারণ মস্তিষ্কের গোলক গহবরে পথ হাতড়ে বেড়ায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে হত্যা, খুন, ষড়যন্ত্র, ভাঁড়ামি, দুঃসাহসিকতা, দুর্ঘটনা- ইত্যাদি ব্যাপারগুলো জায়গা দখল করে নেয়। এ অবস্থায় কখনো নান্দনিক প্রয়াস প্রবৃত্তি বেড়ে ওঠতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এহেন বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর নাটকসমূহে মানবাত্মার অন্তর্লীন সূক্ষ্ম চেতনার বহুবর্ণিল রূপপ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলেন। যা বিশেষভাবে মননশীল সুধী সমাজের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুষম হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনে রবীন্দ্র নাট্যসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, এসব নাটক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এতে বাংলা নাট্যসাহিত্য বিশ্ব নাটকের চিরায়ত নন্দনসম্পদের অনিবার্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এই বিরল ব্যতিক্রম সৃষ্টিসাফল্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের ইতিহাসে একচ্ছত্র কৃতিত্বের অধিকারী।"রবীন্দ্রনাথ আসিবার ফলে বাংলা নাটক তাহার পরিপূর্ণ আভিজাত্য এবং গৌরব লাভ করিল। নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম কলাকৌশল এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন তাহা তাঁহার পূর্বে দেখা যায় নাই। এবং পরেও অনুসৃত হয় নাই। তাঁহার নাটক এখনো ব্যাপক সর্বজন সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ দর্শকদের মন এখনও যোগ্য ও প্রস্তুত হয় নাই। ভাবী কালের অনাগত সমাজে ইহার প্রকৃত মূল্য অনুভূত হইবে। তখন লোক সমস্বরে স্বীকার করিবে- রবীন্দ্রনাথ বাংলার শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও বটে।"[১৮(খ)] তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব-সৌকর্য নাটকীয় বিষয়ভাবনার গুণেই বিশ্বদরবারে পৌঁছে যেতে থাকে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলো অনূদিত-ভাষান্তরিত ও রূপ রূপান্তরের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়তা লুফে নেয়। ইংরেজিতে অনূদিত কিছু রবীন্দ্রনাটক হচ্ছে-

১. প্রকৃতির প্রতিশোধ-------------------------- Sanyasi
২. রাজা ও রানী ------------------------------- The king and the Queen
৩. বিসর্জন ----------- Sacrifice
৪. শারদোৎসব -------- Autumn festival
৫. মুক্তধারা ----------- The water fall
৬. রক্তকরবী ---------- Red Oleanders
৭. ডাকঘর ----------- The post office
৮. রাজা -------------- The king of the Dark chamber

বাংলা নাটক রচনায় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। শব্দনির্বাচন ও বাগভঙ্গিমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বরাবরই শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচিবোধ নির্ভরশীল। উন্নত পরিশ্রুত শিল্পীব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ স্বভাবত কারণেই

পরিশীলিত-মার্জিত ভাষা ব্যবহার করেন। এসব ভাষার সংলাপসমূহ আধুনিক জীবনবোধের সাথে গভীরভাবে সাজুয্য রক্ষা করে চলে। এবং মানবচিত্তের অন্তর্গত রূপরহস্য ফুটিয়ে তোলতে সক্ষম। এসব সংলাপ সাধারণত সংক্ষিপ্ত, পরিমিত, তীক্ষ্ণ, গতিশীল ও নিবিড়ভাবে ব্যঞ্জনাত্মক। তাছাড়া এসব ভাষাবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের সহজাত কাব্যস্বভাব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যা নাটকীয় সংলাপসমূহে একটা ভিন্নতর মাত্রা মহিমা যুক্ত করেছে। ফলে প্রতিটি শব্দের মধ্যেই যেন দূরাগত জগতের সন্ধান আবিস্কার করা সম্ভব। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাটকের ভাবকল্পনায় পাঠকসাধারণ একটা অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান পেয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যসমূহে অজস্র সংগীত ব্যবহারের মাধ্যমেও অতিন্দ্রীয় সুরলোক তৈরি করেছেন। ফলে বাঙালি জাতি তাঁর স্বত্ব-অস্তিত্বই যেন বারবার ফিরে ফিরে পায়। এসব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনীয় ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা নাটকের ভাষা একটা একঘেয়ে অনুকৃতি আছন্ন করে রাখে। সংলাপ দীর্ঘ, উচ্ছ্বাসময়, বিবৃতিধর্মী ও প্রগলভ প্রচারণায় ভরপুর। সমাসবদ্ধ দীর্ঘ শব্দের জড়িমাগ্রস্ত বর্ণনা– যা ছিল রীতিমত বিরক্তিকর। গদ্য-পদ্য সংলাপের সামঞ্জস্যহীন মিশ্রণ, কার্যকারণরহিত অহেতুক উচ্ছ্বাস, অন্তমিলযুক্ত পয়ারের ক্রমাগত প্রয়োগ ইত্যাদি অংশের বিন্যাস-বিস্তার বাংলা নাটককে একটা নিস্প্রাণ ছকসীমানায় বেঁধে ফেলে। কিছু শাস্ত্রসূত্রের অনতিক্রান্ত নিয়মনীতি বাংলা নাটককে বৃত্তাবদ্ধ করে রাখে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে এই প্রথানুগত্যের দাসত্ব-দৈন্য অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। তাঁর নাটকের সংলাপসমূহ এই শাস্ত্রনিষ্ঠ গ্লানিকর আবহ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। কোনো আরোপিত রীতি আদর্শ নয়– শুধুমাত্র মানবচরিত্রের বহুবর্ণিল উপযোগিতার আলোকেই তা রচিত হয়েছে। নাটকীয় কাহিনি, ভাব, ভাষা, চরিত্র ও বিষয়ের মধ্যে একটা চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। "সংলাপ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। শব্দচয়ন ক্ষমতার উপর সংলাপের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। একে কবিতায় বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। সুতরাং যে কোনও রচনায় শব্দ, বাক্য প্রভৃতির ব্যবহারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। রচনায় ভাব এবং ভাষার এমন চমৎকার সংগীতপূর্ণ ব্যবহার এমন আদর্শ সংযোগ শেক্সপীয়রের পর এক রবীন্দ্রনাথেই দেখা যায়।"[১৯]

কোনো প্রকার উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের বশবর্তী শিল্পকর্মের যথাযথ স্ফুরণ বিকাশ সম্ভব নয়। প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রেও তা মারাত্মক বিঘ্নরূপে প্রতিভাত হয়। মঞ্চকে উদ্দেশ্য করে নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও এ অবস্থার প্রতিরূপ প্রতিচিত্র লক্ষণীয়। মঞ্চ ও অভিনেতার নির্দিষ্ট নিয়মনীতির কারণে নাট্যকার স্বকীয় ভাবকল্পনার প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও এহেন বিরোধ-ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। খ্রিঃ পূঃ দু'শ বছর পূর্ব থেকেই সংস্কৃত নাটকের বিধিবিধান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত্রে' নাট্যরচনার এই সূত্রসমূহ উল্লিখিত রয়েছে। যা শত-সহস্র বছরব্যাপী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হয়। বাংলা নাটক রচনার সূচনালগ্নেও কিছু রীতি আদর্শের বাধ্যবাধকতা সক্রিয় ছিল। যেমন, নাটক রচনার শুরুতেই তা মঞ্চের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল রয়েছে। আর্থাৎ, মঞ্চের অবয়ব বিন্যাস ও অভিনেতাদের প্রতি লক্ষ রেখে নাটকীয় প্লট-পরিণতি নির্বাচন করা হতো। এ পর্যায়ে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। বিজ্ঞাপন দিয়ে পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে কৌলীণ্য প্রথার বিরুদ্ধে মতবাদ সৃষ্টির লক্ষ্যেই নাটকটি রচিত। বাংলা নাটকের প্রাণপুরুষ মধুসূদন দত্ত মঞ্চের উপর নির্ভরশীল হয়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করেই মূলত তাঁর নাটকসমূহ রচিত। সেখানকার সুনির্দিষ্ট মঞ্চোপকরণ, অভিনেতা ও আবহ-অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নাটকের সর্বদিক সৃষ্টি করা হতো। এমনকি এই মঞ্চের একজন বিখ্যাত অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শক্রমে মধুসূদন নাট্যকাহিনির অনেক দৃশ্য-পরিবেশ বিন্যস্ত করেন। এরকম অনেক বাধা ও নিয়ন্ত্রিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মধুসূদনকে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। এমনকি বেলগাছিয়া নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষকদের খেয়ালখুশির প্রতিও লক্ষ রাখতে হয়েছিল। ফলে এই অলঙ্ঘনীয় বাধ্যবাধকতার কারণেই মধুসূদন 'সুভদ্রা' ও 'রিজিয়া' নাটক দুটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। "ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও সমসাময়িক মঞ্চ ব্যবস্থার অনুকূল নহে বলিয়া 'সুভদ্রা-হরণ' নাটক যেমন অসম্পূর্ণ রহিল, তেমনই একই কারণে আর একটি নাটককেও মধুসূদনের পরিকল্পনাতেই বিসর্জন দিতে হইল– তাহার নাম রিজিয়া' নাটক।"[২০(ক)]

'Art for arts sake'– অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্প। শিল্পসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ কথার গুরুত্ব প্রায় সর্বসম্মতি লাভ করেছে। আনন্দ আলোয় আলোকিত উজ্জীবিত মানুষের শিল্পরচনা কোনো প্রয়োজনের সীমানায় বন্দি নয়। চিরায়ত মানবাত্মার সত্য, নিত্য, সমুন্নত ও স্বতস্ফূর্ত ভাবসমবায় শিল্পসৃষ্টির ভিত্তিবৈভব নির্মাণ করে থাকে। কিন্তু সেখানে উদ্দেশ্য আরোপের অপ্রতিভ খবরদারিত্ব মারাত্মক বিঘ্নরূপে দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, "...স্বদেশের কিংবা স্বজাতির কোনো একটি অভাব পূরণ করা, কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয় কর্মও নয়"।[২০(খ)] অথচ বাংলা নাটক জন্মলগ্ন থেকেই নানারূপ উদ্দেশ্য,

বিধিবিধান ও দায়বোধের গ্লানিকর ভারবাহীরূপে যাত্রা শুরু করে। সামাজিক দায়বোধ, পরিবেশ পরিপার্শ্ব, পরাধীন রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ, অপ্রতুল মঞ্চোপকরণ ও অভিনেতা সমস্যা- ইত্যাদি অবস্থাবিশেষ বাংলা নাটকের স্বাধীন বিকাশের পথটি বারবার কণ্টকিত করে তোলে। এই বৈরী ব্যবস্থার বিপাকে পড়েই মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকার নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। একটা অনতিক্রান্ত বৃত্তবলয় সবসময় তাঁদের সহজাত সৃজনসত্তাকে নতজানু করে দেয়। এমনকি ১৮৭২ খ্রিঃ স্বাধীন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এই ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। কারণ সেখানেও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য অভিপ্রায় নিয়ে নাট্যমঞ্চের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। এমনকি নাটক রচনার পূর্বশর্তরূপেও এই বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে দেখা যায়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এমনি অজস্র দুর্ভেদ্য ও নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাপট পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন-স্বকীয় শিল্পবোধের তাড়নায় নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কোনোরকম সংবিধান সীমায়তি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে ভারগ্রস্ত করতে পারে নি। বরং তিনি নিজেই আধুনিকতার সমূহ সূত্র-সম্ভাবনা আত্মীকরণের মাধ্যমে তা বাংলা নাটকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন। শত সহস্র বছরের শৃঙ্খলিত সংস্কারকে অস্বীকার করে তিনি বাংলা নাটকে সীমাহীন বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। নাট্যসূত্রে মানুষ নয়- বরং মানুষের অপরিসীম সম্ভাবনাসূত্রেই নাটকের আঙ্গিক উপাদান নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। এরকম একটা মন্ত্রমুক্ত আধুনিক জীবনের বহুবর্ণিল ভিত্তির উপরই রবীন্দ্রনাটক গড়ে ওঠে। এতে বাংলা নাটক একটা অফুরন্ত সম্ভাবনার প্রাণশক্তি খুঁজে পায়। যা ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক মূল্যমান-সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জন করতে থাকে। কোনোরকম বিধিবিধান নয়, সর্বমানবিক অনুভব উপলব্ধির বহুমাত্রিক অন্বেষা অবস্থিতি রবীন্দ্রনাটকের প্রাণপ্রতীতি নির্মাণ করেছে।

"তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্য নাট্যরীতির সুনিয়ন্ত্রিত বিধানের মধ্যে নির্দেশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু বন্ধন অসহিষ্ণু, মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার রীতি ও নিয়ম অতিক্রম করিয়া, নাট্য রচনা শুরু করিলেন। তাঁহার নাটকের সহিত পূর্ববর্তী, নাট্যধারার কোনো যোগ নাই। তাঁহার নাটকীয় চেতনার উৎস হইয়াছে তাঁহারই অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-রসসিক্ত মানসভূমি"।[২১] এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আরোপিত নির্দেশনার পরিবর্তে এর শিল্পসৃষ্টির দিকেই মনোনিবেশ করেন। যা কখনো মঞ্চস্থ হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। শুধুমাত্র পাঠ করেই নাট্যরস পুরোপুরিভাবে আস্বাদন করা সম্ভব। এ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের পাঠযোগ্য নাটক রচনার পথিকৃৎ পুরুষরূপে সাফল্যের দাবিদার। এসব নাটক দৃশ্যগুণ অপেক্ষা শ্রব্য ও মননশীল আবেদনে সমৃদ্ধ। চিরায়ত মানবাত্মার শিল্পসুষম বৈশিষ্ট্য দ্বারা সৃষ্ট। স্থান-কাল পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে একটা সার্বজনীন সংহতি-সমবায় এসব নাটকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। যাতে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাটকও স্থান করে নেয়। জর্জীয় যুগের ইংরেজি নাটক ও ইউরোপের অধিকাংশ নাটকের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মঞ্চবিরহিত পাঠযোগ্য ও শিল্পসমৃদ্ধ হওয়ায় এসব নাটক বিশ্বমানবাত্মার চিরন্তন সম্পদরূপে গৃহীত হয়েছে।

যেমন ইবসেনের 'A dolls house.' মেটারলিঙ্কের Blue Bird. এবং গলস্ওয়ার্দি ও শেক্সপীয়রের অনেক নাটকই এই ধারায় অবিস্মরণীয় সংযোজনরূপে বৈশ্বিক মর্যাদা লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথেরও সগৌরব সম্পৃক্ততা কোনোক্রমেই বিস্মৃত হবার মতো নয়। বরং তাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে একক মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করা যায়।

বাংলা নাটকের এই সৃষ্টিপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ নাট্যমঞ্চ ঘিরে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি প্রচলিত নিয়মনীতি অস্বীকার করেই স্বকীয় ভাবভাবনার প্রয়োগ ঘটান। আবার কখনো দেখা যায়, এও তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি। অবচেতন মনেই যেন প্রচলিত রীতি আদর্শকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আবার কখনোবা সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকেই স্পষ্ট করে তোলেন। তবে সবক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব সৃজনসৃষ্টি বাংলা নাটকের অবয়বকে স্বতন্ত্র মহিমা দান করেছে- এতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব নাট্যরচনা, অভিনয়, মঞ্চব্যবস্থা, যাত্রাপালা- ইত্যাদির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, সে-সময়কার নাট্যমঞ্চ ও অভিনয়কলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করা যেতে পারে। উনবিংশ শতকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় বাংলা নাটকও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সান্নিধ্যে গড়ে ওঠে। বিশেষত, শেক্সপীয়র নাটকের রীতি-আদর্শ অনুসরণ করেই বাংলা নাটক পরিপুষ্টি লাভ করে। বাংলা নাটক রচনা, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, অভিনয় পদ্ধতি- ইত্যাদি প্রায় সব ব্যাপারেই শেক্সপীয়র নাটককেই অনুসরণ করা হয়। এ সময় শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ অবলম্বনে কলকাতায় প্রচুর নাট্যমঞ্চ গড়ে ওঠতে থাকে। যেমন- 'দি প্লে হউজ', (১৭৭৫), 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার, 'দি নিউ প্লে হাইজ, 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার', 'চৌরঙ্গি থিয়েটার' 'সাঁশুসি থিয়েটার' প্রভৃতি। এসব থিয়েটারে প্রতিনিয়ত বিদেশি

নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হতো। ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এসব মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীও ছিল তারাই। তবে বাঙালি দর্শকসাধারণও এসব নাট্যমঞ্চে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করেছে। এবং পরবর্তীতে তারা নাট্যরচনা ও মঞ্চাভিনয়ের ব্যাপারে দারুণভাবে উৎসাহ বোধ করেন। ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এসব মঞ্চে পৃথিবীবিখ্যাত সব নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। যা বাঙালিদের মধ্যে নাট্যরচনায় বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করে। এখানে শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট', 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'তৃতীয় রিচার্ড', 'চতুর্থ হেনরী' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটকের নিয়মিত অভিনয়ে তৎকালীন বাঙালি নাট্যকারগণ বাংলা নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত হন। "বিলাতি স্টেজ অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলিতে এখন যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না।"[২২]

পাশ্চাত্য রীতি আদর্শে গঠিত মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও পরিকল্পিত। নাটকের আবহ-আবেশ তৈরির জন্য সেখানে অনুরূপ সাজসজ্জার ব্যবস্থা থাকত। যেমন, আলোকসম্পাত, দৃশ্যগঠন, নেপথ্যবিধান, আসনব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যাপারগুলো বেশ আড়ম্বরের সাথে সম্পন্ন করা হতো। মহত্তম ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের সংঘাত সৃষ্টির উপযোগী উপকরণ রচনায় স্বভাবতই জৌলুস-জাঁকজমক পরিবেশের আশ্রয় নেয়া হতো। মঞ্চের অবয়ব আকৃতিও ছিল বেশ সুগঠিত ও সংহত। এই মঞ্চের তিনদিকই আবদ্ধ আবেষ্টনের মাধ্যমে একদিকে দর্শকসাধারণের জন্য খুলে রাখা হতো। পেছন দিকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রবেশের জন্য একাধিক দরজার ব্যবস্থা থাকত। মূল দরজার পাশাপাশি অন্যান্য দরজা দিয়ে প্রেতাত্মাজাতীয় অশরীরী ছায়াচরিত্র আসাযাওয়া করত। মঞ্চের পেছন দিকে নাটকে অংশগ্রহণকারী নট-নটীদের সাজসজ্জা ও প্রস্তুতির জন্য আলাদা একটি কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। অভিনয়ের মাঝে মাঝে কণ্ঠ, যন্ত্রসংগীত ও স্বগতোক্তির ব্যবহার অনিবার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই নাটকের ভাব, ভাষা, কাহিনি, পরিণতি, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শকসাধারণ ও আবহ উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা হতো। এ ছাড়া কখনো কখনো মঞ্চে শোভাযাত্রা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করা হয়। এসব মঞ্চ ছিল অত্যন্ত চাকচিক্যময়। দর্শকদের মধ্যে একটা সম্মোহসৃষ্টির জন্য এও ছিল অন্যতম কৌশল। এ ছাড়াও কখনো কখনো মঞ্চে অতি নাটকীয়তার (melodrama) আশ্রয় নিতে দেখা যায়। বিশেষত নাটকীয় কাহিনি-চরিত্রগুলো অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যেই অনুরূপ প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন, এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চেই এর প্রবণতা অধিক হারে লক্ষ করা যায়। এসব মঞ্চে ভাঁড়ামি, মারামারি, কুস্তি, তলোয়ার খেলা, খুন ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শকদের উজ্জীবিত রাখা হতো। চরিত্রগুলোও অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি, অস্থিরতা, কারুণ্যসিক্ত সংলাপ, উচ্চহাস্য, অহৈতুক উৎকণ্ঠা ইত্যাদি উপস্থাপনার মাধ্যমে নাট্যাভিনয়কে আকর্ষণীয় করতে চাইতেন। এসব অসঙ্গত-উৎপাত অনেক সময়ই নাটকীয় ভাবপরিণতিকে বিকৃত পথে নিয়ে যায়।

এলিজাবেথীয় বা শেক্সপীয়রের মঞ্চাভিনয়ই একসময় অনর্থ বাগাড়ম্বড়ের মাধ্যমে নিস্প্রাণ পণ্যপদার্থে পরিণত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকের অভিনয় ছিল অতিশয়িত, আবেগবহুল, কবিত্বপূর্ণ, বাস্তবতারহিত ও রোমান্সের রঙিন কল্পনায় ভরপুর। অভিনেতাগণ এরই ভাবাতিশয্যে অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এতে মননশীল শিল্পসৌকর্যের দিকটি নাট্যকারদের কাছে উপেক্ষিত হতে থাকে। তাৎক্ষণিক বাহবার প্রলোভনে মানবিকতার চিরায়ত বোধুবদ্ধিসম্পন্ন নন্দনকলা থেকে নাটকগুলো যেন ক্রমান্বয়ে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চের এই স্বরূপ-নির্মিতি ও বাহুল্য বিস্তার বাংলা নাটককেও পেয়ে বসে।

রবীন্দ্রনাথ নাট্যভাবনায় মঞ্চ ও অভিনয়শিল্পের চিন্তায় পাশ্চাত্য রীতি আদর্শকে গ্রহণ করেন। এই ভাবাদর্শের অনুকাঙ্ক্ষা তিনি অনেকটা জন্মসূত্রেই প্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই তাঁদের ঠাকুরবাড়ির পরিবারে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। কাব্য, সংগীত, রাজনীতি, চিত্রকলা, শিক্ষা, ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে নাট্যচর্চাও অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই এসব নাটকের অভিনয়দর্শনে গভীরভাবে আকর্ষণ অনুভব করেন। তিনি বলেন, "বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের শখ ছিল।"[২৩] পারিবারিক আবহ অনুষঙ্গই তাঁকে ক্রমান্বয়ে অনুরূপ চিন্তাচেতনার অধিকারী করে তোলে। তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও একটি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হতো। এই মঞ্চটিও পাশ্চাত্য অবয়ব-আদর্শ অনুসরণ করে গড়ে ওঠেছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মের পরপরই এই মঞ্চাভিনয়ের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। তিনি এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে, খুব যখন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক-একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

সম্মুখের বৈঠকখানাবাড়িতে আলো জ্বালিতেছে, লোক চলিতেছে, দ্বারে বড়ো বড়ো গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কী হইতেছে ভালো বুঝিতাম না, কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম।”[২৪]

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্যমঞ্চটি পাশ্চাত্য পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। মূলতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যয় প্রমুখ ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এই মঞ্চটি পরিচালিত হয়। এখানে যতসব বিখ্যাত নাটকসমূহ এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় মঞ্চস্থ হতে থাকে। যেমন, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১), প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬১), রামনারায়ণের ‘নবনাটক’, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘এমন কর্ম আর করব না’ ও ‘মানময়ী’। রবীন্দ্রনাথের ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’, বির্সজন’, ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ প্রভৃতি নাটক জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চে অভিনীত হতে থাকে। এসব নাটকের অভিনয়ক্রিয়া অত্যন্ত সাড়ম্বরে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এমনকি অভিনয় ও নাটক পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সপ্রাণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এতে তাঁর বিস্ময়কর অভিনয়প্রতিভা ও এর প্রতি নিজের অকুণ্ঠ ভালবাসা প্রদর্শিত হয়। যেমন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেন, “নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বে জ্যোতিদাদার ‘এমন কর্ম আর করব না’ প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম।”[২৫]

এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘মানময়ী’ নাটকের মদন ও স্বরচিত ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’র বাল্মীকি চরিত্রে অভিনয় প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজের লেখা ‘বির্সজন’ ও ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ নাটকের অভিনয়ে অবতীর্ণ হন। ‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয়ে তিনি ‘রঘুপতি’ ও ‘জয়সিংহ’ চরিত্রে অভূতপূর্ব অভিনয়ক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। অতঃপর বৈকুণ্ঠের খাতা’র অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর কলকাতাস্থ অভিনয় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জোড়াসাঁকোতে মঞ্চ ও অভিনয় পরিকল্পনায় পুরোপুরিভারে বিদেশি মঞ্চকৌশল অনুসরণ করা হয়। যথাসাধ্য বাস্তবসম্মত দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে একটা চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা হতো। এ অবস্থায় বাহ্যিক চাকচিক্য ও জৌলুসপূর্ণ আয়োজনের প্রতিই অধিকতর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অন্তর্গত অনুভাবনার প্রতিনিধিস্থানীয় চারুসজ্জা সেখানে নিতান্তই উপেক্ষিত। একটা সাময়িক মোহমত্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’তে ১৮৯১ সালের স্যাভয় থিয়েটারের অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনায় অনুরূপ মঞ্চসজ্জার প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া ১৮৯০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ইউরোপ প্রবাসের অভিজ্ঞতায় বলেন, “আজ লাইসীয়ম নাট্যশালায় গিয়েছিলুম। স্কট রচিত ‘ব্রাইড অফ লামারমুর’ উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গি অদ্ভুত। তৎসত্ত্বেও তিনি কী এক নাট্যকৌশলে ক্রমশ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।”[২৬]

রবীন্দ্রনাথ মূলত নাটকের আবহ-অনুষঙ্গ, উপকরণ, উপাদান, মঞ্চ-অভিনয়, ভাব-বিষয় ও অন্যান্য ব্যাপারে শেক্সপীয়র নাটককেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ছেলেবেলায় গভীর মনোযোগের সাথে শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করেন। যা তাঁকে সারাজীবনই বিভিন্নভাবে অধিকার করে থাকে। তাঁর অজস্র রচনা সম্ভারের মধ্যেও শেক্সপীয়রের ভাবানুভাব বারবার উঁকি দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’ প্রসঙ্গে বলেন, “আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ‘খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।”[২৭] এই ম্যাকবেথ নাটকের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই অনুভূত হতে দেখা যায়। তাছাড়া পাশ্চাত্য নাটকের উচ্ছ্বাসমুখর দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনবাস্তবতা তাঁর অনেক নাটকেরই প্রাণপ্রতিমা নির্মাণ করেছে। ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ নাটকের সঙ্গীত রচনায়ও বিদেশি প্রভাব লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “.... দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি।”[২৮]

রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্ন নাট্যসাধনায় কখনো কোনো নির্দিষ্ট নীতি-আদর্শ আকড়ে থাকেন নি। অবিরাম পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সবকিছুই যাচাই-বাছাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পাশ্চাত্য নাটকের মোহমত্ত রূপপ্রকৃতিও একসময় তাঁর জীবনে মোহভঙ্গের সঞ্চার করে। এ পর্যায়ে দেখা যায় তিনি ‘মালিনী’ (১৮৯৬) নাটক রচনাকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাটকের অবয়ব উপদান দ্বারা অধিকতর হারে প্রভাবিত হন। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ‘মালিনী’ নাটকের ভূমিকায় বলেন, “শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।”[২৯] এ সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রানী’ (১৮৮৯) এবং ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) নাটকের মধ্যেই শেক্সপীয়র নাট্যপ্রভাব সর্বোচ্চ রসস্ফূর্ততায় বিকাশ লাভ করে। নাটক দু’টির

পঞ্চাঙ্কবিভক্তি, মূল কাহিনির সাথে উপকাহিনি, চরিত্রগত প্রবৃত্তির সংঘাত ও বহুবিস্তৃত কাহিনির জটিল পরিণাম ভাবনায় শেক্সপীয়র নাটককেই অনুসরণ করা হয়। এ ছাড়া নাটক দু'টির চরিত্র পরিকল্পনায় শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের প্রচ্ছায়া লক্ষণীয়। যেমন, 'রাজা ও রানী' নাটকের কুমারসেন ও বির্সজন নাটকের 'জয়সিংহ'র উপর হ্যামলেট চরিত্রের প্রভাব রয়েছে।

'রাজা ও রানী' নাটকের রানী রেবতী লেডি ম্যাকবেথের মতোই প্রলোভনমত্ত কুপ্রবৃত্তি দ্বারা দারুণভবে তাড়িত হতে থাকে। সে স্বামী চন্দ্রসেনকে সিংহাসন অধিকার করার জন্য নানা উপায়ে প্রলুব্ধ করে। এবং সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী কুমারসেনকে বঞ্চিত করার জন্য স্বামীর কানে কুমন্ত্রণা দেয়। কুমারসেনের ধ্বংস কামনা করে রেবতী উচ্চারণ করে–

> "যেতে দাও মহারাজা। কী ভাবিছ বসি?
> ভাবিছ কী লাগি? যাক যুদ্ধে, তার পরে
> দেবতাকৃপায় আর যেন নাহি আসে
> ফিরে।"[৩০]

তাছাড়া 'রাজা ও রানী' নাটকের উপকাহিনিতে ইলা ও কুমারসেনের প্রণয়কাহিনি রোমিও জুলিয়েটের কাহিনিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয় কাহিনিতে একটা অপ্রতিহত নিয়তিপ্রভাব তাড়া করে ফেরে। এবং ভুল বুঝাবুঝির কারণে উভয় প্রেমের মধ্যেই ট্র্যাজিক পরিণতি নেমে আসে। 'রাজা ও রানী' নাটকের মূল চরিত্র পরিকল্পনায়ও 'ওথেলো' নাটকের সাদৃশ্য আবিষ্কার করা যায়। এই নাটকের মূল চরিত্র বিক্রমদের ও ওথেলো নাটকের ওথেলো প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে থাকে। এবং শেষ পর্যন্ত উভয় চরিত্রই স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে হাহাকার করে ওঠে। এ ছাড়াও 'রাজা ও রানী' নাটকের পুরো অবয়ব উপাদান জুড়েই শেক্সপীয়র নাটকের আদর্শ অনুরণিত হতে দেখা যায়। "পৌরুষকঠোর, বীর্যদীপ্ত প্রচণ্ড আবেগচালিত বিক্রমদেবচরিত্র তো খাঁটি শেক্সপীয়র চরিত্রের প্রবল ও বেগবান ধর্মে জীবন্ত। চন্দ্রসেন ও রেবতীর উপরে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথের প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে ক্ষুধার্ত জনতার কথোপকথন coriolanus নাটকের প্রথম দৃশ্যের বিদ্রোহী জনতার কথাবার্তার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।"[৩১]

'মালিনী 'নাটকের প্লট পরিকল্পনায় শেক্সপীয়র নাটকের ভাবানুষঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে। প্রীতির বন্ধনে স্নেহের সুষমায় লালিত রাজতনয়া মালিনী অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। পিতা মাতার সাথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের বিঘ্নসংকুল বাধাবিপত্তির ঘেরাটোপে মালিনী ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। অবশেষে একটা করুণ পরিণতির অনিবার্য আবহ নাটকীয় কাহিনিকে পরিসিক্ত করে তোলে। অনুরূপ প্লটপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শেক্সপীয়রের প্রায় নাটকেই লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের ভ্রান্তিজনিত হাস্যরস সৃষ্টিতে শেক্সপীয়রের 'দি কমেডি অব এররস' এর প্রচ্ছায়া রয়েছে। এ ছাড়া শেক্সপীয়রের 'লাভস লেবার্স লস্ট"-এর সাথে 'চিরকুমার সভা'র চরিত্র পরিকল্পনায় গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। 'চিরকুমার সভা'র বিপিন, শ্রীশ ও এদের কৌমার্যব্রত গ্রহণের ব্যাপারটিও শেক্সপীয়র থেকে গৃহীত বলে মনে হয়। এ ছাড়া শেক্সপীয়র রচিত 'The Merchant of Venice-এর একাধিক প্রণয়-প্রণয়িনীর সাথে চিরকুমার সভা' ও 'শেষ রক্ষা' নাটকের চরিত্র পরিকল্পনায় বেশ মিল রয়েছে। এ দু'টি নাটকেও জোড়া প্রেমিক প্রেমিকার দৃশ্যচিত্র অত্যন্ত সরস ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র নাটকগুলো পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় গড়ে তোলেন। এর সৃষ্টিপ্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেন, "য়ুরোপে শারাড (charade) নামক এক প্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়।"[৩২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাপন নানাভাবে বিপর্যস্ত হতে থাকে। প্রকাশক্ষমতায় অনুভবের মাধ্যমগুলো মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। শিল্প সাহিত্যের সৃজনপ্রবণ প্রবৃত্তির মধ্যে এর ছায়াপাত ঘটে। এ পর্যায়ে শিল্পস্রষ্টাগণ বাধ্য হয়েই নানারকম রূপক প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে। সাংকেতিক ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের প্রকাশ করতে থাকেন। এই প্রকাশ পদ্ধতিই একসময় পাশ্চাত্য সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদে রূপান্তর লাভ করে। পরবর্তীকালে ইউরোপে এই অভিব্যক্তিবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে আর, ইউ, আর কাইজার এর 'গ্যাস', টুলারের 'ম্যান এ্যাণ্ড দি মেসেস', মার্কিন নাট্যকার ওনিল-এর 'হ্যারী এ্যাপ', 'মোসিট্রেডওয়েল এর 'মিচেল', জন হওয়ার্ড লোসন-এর 'রোজার ব্লোমার' ও 'প্রসেসন্যাল' এবং এলমার রাইস-এর 'দি এডিং মেসিন', 'সাবওয়ে' প্রভৃতি নাটকগুলো

অভিব্যক্তিবাদের ছাঁচে লেখা। বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথই অভিব্যক্তিবাদের আলোকে নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই ধারায় তিনি 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ', 'রথের রশি', 'কালের যাত্রা' প্রভৃতি নাটকগুলো গড়ে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নাটক ও মঞ্চ পরিকল্পনার প্রয়োগরীতিতে পাশ্চাত্য আদর্শকে পরিহার করে চলেন। তাঁর এই পরিবর্তিত মনোভাব শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক নাটকগুলোতেই অধিকতরভাবে ফুটে ওঠেছে। এ সময় তিনি অনেকটা স্থিতধী, শান্ত-সংযম, সংস্কৃত-সংহত ও মননশীল সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। ফলে আত্মগত অনুশীলনের মননসমৃদ্ধ শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে মঞ্চ ও অভিনয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন।

"... বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয়ে তাঁহার কলিকাতাস্থিত নাট্যজীবন ও অভিনেতৃজীবনের যে শুধু সমাপ্তি ঘটিল তাহা নহে পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও মঞ্চকলার প্রভাবও তাঁহার জীবনে শেষ হইয়া আসিল। শান্তিনিকেতনের নাট্যসাধনা ও নাট্য-প্রয়োগরীতির মধ্যে তাঁহার যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার চেতনা ইতিমধ্যে তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছে।"[৩৩]

শান্তিনিকেতন পর্যায়ের নাট্যসাধনায় রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই যেন ভিন্ন পথের অনুসারী। বাংলা নাটকে বাহ্যিক আড়ম্বর আয়োজনের চেয়ে অন্তর্গত চিত্তপ্রকৃতির আবেদন ফুটিয়ে তুলতে চান। প্রকৃত শিল্পের সৌকর্য সুষমার মধ্যে চিৎপ্রকর্ষের একটা গভীর সংযোগ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকেও অনুরূপ একটা শৈল্পিক মহিমা আরোপ করতে প্রয়াসী হন। তিনি ১৯০২ খ্রিঃ রচিত 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে বলেন,

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে। তবে অভিনয়ের চারিদিকি হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।"[৩৪]

পাশ্চাত্য মঞ্চের অনুকরণে অতিরিক্ত সাজসজ্জাকে রবীন্দ্রনাথ উৎপাত বলে মনে করতেন। তিনি এর পরিবর্তে নাটকের ভাবপ্রবাহজনিত প্রাণের অভিব্যক্তিতে অধিকতর বিশ্বাসী। 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "চিত্রপটের প্রয়োজন নেই আমার দরকার চিত্তপট–সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।"[৩৫] 'তপতী' (১৯২৯), নাটকের ভূমিকায় তিনি এই কথাটি অত্যন্ত প্রবলভাবে ব্যক্ত করেন। দৃশ্যপটের ব্যবহারকেও তিনি নাটকীয় রস আস্বাদনে উপদ্রব বলে মনে করেন। এমনকি দৃশ্যের অদলবদল উঠানামা অংশকে নাটকীয় কাহিনিতে প্রক্ষিপ্ত বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়। তিনি সপ্রসঙ্গ আলোচনায় বলেন, "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ... নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত। এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা। ... অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ... এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো– নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা। দেয়।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে 'জোড়াসাঁকো', 'সত্যেন্দ্রনাথ ভবন', ও 'ভারতসঙ্গীত সমাজ' মঞ্চের অভিনয়ে আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকৌশলকে গ্রহণ করেছেন। অভিনয়ে প্রচণ্ড তেজস্বিতা ও আবেগবহুল কণ্ঠ-সংলাপ প্রয়োগ করা হতো। বাহ্যিক সম্মোহ-সংলাপ প্রয়োগ করা হতো। এসব বাহ্যিক সংরাগ ছড়িয়ে দর্শক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করার কৌশল অবলম্বিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলেন,

"রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ, এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না কারিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়।"[৩৭] রবীন্দ্রনাথ নাট্যমঞ্চের বাহুল্য বাগাড়ম্বরের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে শেষপর্যন্ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'নাট্যশাস্ত্র' বর্ণিত মতামতকে আধুনিক নাটকের জন্য উপযোগী বলে উল্লিখিত হয়। 'রঙ্গমঞ্চ' (বঙ্গদর্শন, নবপর্যায় পৌষ, ১৩০৯) নামক প্রবন্ধে 'নাট্যশাস্ত্র' বর্ণিত মতামতকেই অধিকতর উপযোগী বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এরূপ আমি বোধ করি না।"[৩৮]

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় মঞ্চাভিনয়ের রূপপ্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। এসব মঞ্চে সংস্কৃত নাটকসমূহ অত্যন্ত বাধ্যবাধক পরিবেশে প্রদর্শন করা হতো। বিশেষ কোনো ধর্মীয় ও রাজরাজাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এসব নাটকের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আসনসংখ্যাও সুনির্দিষ্ট ও নির্বাচিত। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও অত্যন্ত কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ নিষ্ঠা বজায় ছিল। সংস্কৃত নাট্যমঞ্চ কতকগুলো অনতিক্রান্ত সূত্র-সংস্থান দ্বারা নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যে একটা শৃঙ্খলিত বিধিব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আসন বিন্যাসের ব্যাপারে চরম বৈষম্য-বিভাজন লক্ষণীয়। আসন সংখ্যা ছিল সুনির্বাচিত ও নির্ধারিত। এতটুকু এদিক সেদিক হবার কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি আসনেই সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভক্ত করা হতো। এগুলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ ছিল অবধারিত। মঞ্চের পেছন দিকে একটি নেপথ্যগৃহের ব্যবস্থা থাকত। এখান থেকেই নাটকের ভাব, ভাষা, আবহ, দৃশ্য, ঘটনা, চরিত্র ও অন্যান্য পরিস্থিতি অনুযায়ী শব্দ, কোলাহল, চিৎকার ইত্যাদি শোনানো হতো। মঞ্চের পশ্চাতে বিভিন্ন চিত্রিত যবনিকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোনোরকম দৃশ্যপটের উঠানামা ছিল না। এতে অভিনয়, নাটকের পাত্রপাত্রী, দর্শক, নাটকীয় আবহ ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক বজায় ছিল।

নাট্যাচার্য ভরত মঞ্চকে 'শৈল ও গুহাকার' রূপে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। যাতে সেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া নাটকে ব্যবহৃত সংগীত ও কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য বাধামুক্ত করার কথা বলেন। এবং এই দিকের প্রতি লক্ষ রেখেই মঞ্চসজ্জাকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি নেপথ্যগৃহের মাধ্যমে নাটকীয় পাত্রীপাত্রদের সাজসজ্জার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন। মঞ্চের পশ্চাৎ দিকের দেয়াল থেকে যন্ত্রবাদকদের আসনগ্রহণ এবং যবনিকা ব্যবহারের কথা বলেন। এই যবনিকার মাধ্যমেই নাটকের শুরু-শেষ এবং বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে পার্থক্যসীমা বোঝানো হতো। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে সূত্রধর সবরকমের দায়দায়িত্ব পালন করত। চরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা-নির্বাচন, অভিনয়ের পূর্বে নাট্যমণ্ডপে বলিদান, মন্ত্র উচ্চারণ, যাগযজ্ঞ পরিচালনা, যবনিকা উত্তোলন, অভিনয়ক্রিয়া শুরু- ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সূত্রধরের মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হতো। এই সূত্রধরকে সর্ববিদ্যাবিশারদ হিসেবে নাটকীয় কাহিনিতে গড়ে তোলা হয়। এবং এর মাধ্যমেই অভিনয় পদ্ধতির মধ্যে কঠোর বিধিবিধান আরোপ করতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ শৈশবকাল থেকেই সংস্কৃত নাটকের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। বিশেষত বড় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মাধ্যমেই তিনি সংস্কৃত নাটকের প্রতি আগ্রহান্বিত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি অসংখ্য সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, মঞ্চাভিনয় ও প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্যসঙ্গী হিসেবে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অত্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ভাষায় উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন,

"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম- তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।"[৩৯]

এসব আলোচনার মাধ্যমে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ আগ্রহও রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সার্বক্ষণিক সঙ্গীরূপে সংস্কৃত নাটকের রূপপ্রকৃতি তাঁর মননশীল চিত্তে বিস্তৃত হতে থাকে। যা পরবর্তী জীবনে নাট্যরচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্তরূপ ধারণ করে। এবং তাঁর জীবনব্যাপী নাট্যসাধনার পরতে পরতে এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো নাটকেই সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক ও উপকরণ সরাসরি গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'ফাল্গুনী, বসন্ত' ও 'শেষবর্ষণ' নাটকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। 'ফাল্গুনী' নাটকের উপস্থাপনারীতিতে সংস্কৃত নাটকেরই প্রথাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশে সাধারণত সূত্রধরের আগমন ঘটে। এই সূত্রধরের সাহায্যে নাটকের কাহিনি, উদ্দেশ্য, অভিনয় ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকে সূত্রধরের স্থলে কবিশেখর দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া গীতিনাট্য 'বসন্ত' ও 'শেষবর্ষণ-এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ কাহিনি উপস্থাপনায় সংস্কৃত নাট্যরীতি প্রয়োগ করেন। যেমন,

"রাজা। ওহে থামো তোমরা, একটু থামো, আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও-না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভালো বুঝতে পারি নে।
কী লিখছে? 'শেষ বর্ষণ'।
নটরাজ। হাঁ মহারাজ।
রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো।"[৪০]

রবীন্দ্রনাথ চরিত্র পরিকল্পনায়ও অনেকস্থলে সংস্কৃত নাটকের দ্বারস্থ হয়েছেন। সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যিক ধারায় সাধারণত 'বিদূষক' ও 'কঞ্চুকী' জাতীয় চরিত্রের উপস্থাপনা লক্ষণীয়। এসব চরিত্র নাটকীয় কাহিনিতে পরিহাসপ্রিয়, বিশ্বাসভাজন, লোভী, স্ত্রৈণ ও নিরক্ষর ব্রাহ্মণরূপে চিত্রায়িত হয়ে থাকে। ঘটনার দ্বন্দ্ব সংঘাতময় একঘেয়ে পরিবেশে বর্ণবৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষে এসব চরিত্র আমদানি করা হয়। এতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নাটকীয় পরিবেশ সরস, সজীব, প্রাণবন্ত ও উচ্ছ্বাসমুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের 'দেবদত্ত' চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নাটকে দেবদত্ত ও তার স্ত্রী নারায়ণীর কথাবার্তায় অনুরূপ স্বরূপবৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে,

"দেবদত্ত। প্রিয়ে, বলি ঘরে কিছু আছে কি?
নারায়ণী। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাকলেই আপদ চোকে।
দেবদত্ত। ও আবার কী কথা!
নারায়ণী। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক জুটিয়ে আন, ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।
দেবদত্ত। আমি সাধে আনি?হাতে কাজ থাকলে তুমি থাক ভালো, সুতরাং আমিও ভালো থাকি। আর কিছু না হোক, তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে।
নারায়ণী। বটে? তা আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানত। তা, কে বলে আমার কথা শুনতে–
দেবদত্ত। তুমিই বল, আবার কে বলবে? এক কথা না শুনলে দশ কথা শুনিয়ে দাও।"[৪১]

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত নাটকের পাশাপাশি লোকনাট্যের ধারাও প্রচলিত ছিল। অনাদিকাল থেকেই গ্রমাবাংলার বিভিন্ন উৎসবের অংশ হিসেবে এসব নাটক মানুষের মনকে উজ্জীবিত রাখে। নৃত্যগীত-সমন্বিত যাত্রা-পাঁচালি কথকতা পালাগান বা নাট্যগীত অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ পরিবেশে অভিনীত হতো। এসব অভিনয়ে মঞ্চরীতির কোনো বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা হয় নি। একেবারে খোলা মঞ্চে হাজার হাজার দর্শকের সামনে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে তা উপস্থাপন করা হয়। কোনোরকম নিয়মরীতির আরোপিত ব্যবস্থা এই নাটকীয় পরিস্থিতিকে বিঘ্নিত করতে পারে নি। এ পর্যায়ে গ্রামবাংলায় অনুষ্ঠিত যাত্রাপালার মঞ্চাভিনয়ই যুগ যুগ ধরে টিকে আছে। উন্মুক্ত প্রান্তরে খোলা মঞ্চের এই নাট্যাভিনয়ে ঐতিহ্যিক বাংলার একটা প্রাণময় সম্পদের সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রনাথ যাত্রাপালার এই মঞ্চাভিনয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। বাংলা নাটকের অভিনয়ে এই প্রয়োগরীতি বেশ উপযোগী বলে উল্লিখিত হয়। এমনকি তিনি নিজেও তাঁর বহু নাটকে এর আঙ্গিক-অনুষঙ্গ প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে বলেন,

"যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।"[৪২]

রবীন্দ্রনাথ এর মাধ্যমে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারটি অনাড়ম্বর, সহজ-সরল, উন্মুক্ত-উদার ও শাস্ত্রসূত্রবিরহিত পরিবেশে সম্পন্ন হওয়ার কথা বলেন। তাছাড়া এতে ভারতীয় নাট্য ঐতিহ্যের সাথেও রবীন্দ্রনাথের একটা গভীর অন্বয় অনুরাগ লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিকভাবে জন্মের পরপরই যাত্রাগানের আবহ আবেষ্টনীর মধ্যে বেড়ে ওঠেন। সমকালীন কলকাতার 'নূতন যাত্রা'র সর্বপ্লাবী স্রোতধারা ঠাকুরবাড়ির পরিবেশকেও নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে যায়। এসব যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির লোকজন বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ দেশীয়যাত্রার অনুসরণে পালাগান রচনা করতেন। এবং অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে এসব পালাগানের অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন হতো। তাছাড়া পেশাদার যাত্রাদল ভাড়া করেও ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিতভাবে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রসঙ্গক্রমে এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মুখরিত ভাষায় বলেন "আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তার, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ পাড়ায় ও পড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে

বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন- কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে।"[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সাল থেকে ঋতুকেন্দ্রিক গীতিনাট্য ও নৃত্যনাটের মধ্যে যাত্রারীতির আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এসব নাটকে যে কোনোরকম দৃশ্যপট, কারুকাজ, কৃত্রিমতা, এমনকি মঞ্চ ব্যবহারের কথাও অস্বীকার করেন। শুধুমাত্র নাট্যভাবানুযায়ী কিছু পশ্চাৎপট ব্যবহারের মাধ্যমে অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের কাহিনিবিন্যাসে লোকনাট্যের প্রভাব লক্ষণীয়। এসব নাটক সাধারণত অতিনাট্যিক ক্রিয়াকৌশল দ্বারা ভারাক্রান্ত। তিনি 'নৃত্যনাট্য' রচনায় নৃত্যের ব্যবহারে যাত্রাপালার শরণাপন্ন হন। তবে তা তিনি পরিশ্রুত রুচির দ্বারা আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রহণ করেন। কারণ এ যাবৎকাল যাত্রায় ব্যবহৃত নৃত্য ছিল অশ্লীল, স্থূল, কুরুচিপূর্ণ, গ্রাম্য ও বিকৃত ভাঁড়ামিতে ভরপুর। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই নৃত্যের মধ্যে আধুনিক মননশীল নন্দনকলার প্রয়োগ ঘটান। যাতে যাত্রার এই স্থূল ও গ্রাম্য নৃত্য পরিশীলিত-ভদ্রজনোচিত বাঙালি সমাজে সমাদৃত হতে থাকে। তাঁর এই সাফল্যসিদ্ধির পেছনে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যিক লোকনৃত্যই ক্রিয়াশীল রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো গীতিনাট্যকে সরাসরি পালাগান বলে আখ্যায়িত করেন। নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যপটের ব্যবহারেও যাত্রার প্রভাব লক্ষণীয়।এসব নাটকের দৃশ্যভিত্তিক বিভাজন-বিন্যাস প্রচলিত ধারায় রচনা করা হয় নি। তিনি অঙ্ক গর্ভাঙ্কের বিভক্তি ভুলে খোলাখুলি মঞ্চে অভিনয় করার পক্ষে মতামত প্রদান করেন। যেমন, 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যের মন সংকীর্ণ হয় না।" [৪৪] মঞ্চে দৃশ্যপটের ক্রমাগত ব্যবহারকে তিনি নাটকীয় রস গ্রহণে অনর্থপাত মনে করতেন। বরং যাত্রার খোলাখুলি মঞ্চে অনুষ্ঠিত অভিনয়কে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়েছেন। এবং তা জনমনের জন্য একটা আন্তরিক সামীপ্য-সহযোগ বলেও তিনি মনে করেন। "দৃশ্যপট সমন্বিত রঙ্গমঞ্চে যাত্রা অভিনীত হত না- উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শক ও শ্রোতার সঙ্গে অভিনেতার কোন ব্যবধান নেই- মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রায় লোকচিত্তের তৃপ্তি একটি বিশেষ দিক।"[৪৫]

রবীন্দ্রনাটকে গানের বাহুল্য ব্যবহারে এদেশের প্রাচীন যাত্রাপালার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাঁর কিছু কিছু নাটকতো শুধুমাত্র গানে গানেই রচিত হয়েছে। এসব নাটকের অন্যসব উপকরণ উপদান সংগীতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য নাটকের প্রাণপ্রতিমা নির্মাণের জন্যও সংগীতের একটা অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি চিত্তের সহজাত গীতিপ্রাণতার কথা ভেবেই সংগীতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যা লোকনাট্যের ঐতিহ্যিক প্রাণপ্রবাহ বেয়ে রবীন্দ্রনাথকে বাংলা নাটক রচনায় গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এরকম প্রয়াস-প্রবর্তন বাংলা নাটকের পূর্বে ও পরে আর দেখা যায় নি। এখানে তিনি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই বাংলা নাটকের সামর্থ সম্ভাবনা আবিস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ও প্রথিতযশা নাট্যকারদের পথ পরিহার করে নিজেই একটা সৃজনমুখর পথ গড়ে তোলেন। প্রথাসিদ্ধ পথে মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকার বেশ সাফল্যের সাথে বিচরণ করেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ এঁদেরই প্রতিষ্ঠিত পথ ত্যাগ করেন এবং অভিনব পথপরিক্রমার এক নিরীক্ষাক্ষেত্রে বাংলা নাটককে স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক, দৃশ্য ও অন্যান্য উপাদান ব্যবহারে প্রচলিত ধারাকে পরিহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব চিন্তারই প্রতিফলন লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন নাটকে অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের ব্যবহারই প্রয়োগ করেন নি। যা তিনি কেবলমাত্র কতকগুলো গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করেছেন। আবার কোথাওবা শুধু দৃশ্য ব্যবহার করেই পুরো নাটক সমাপ্ত করেছেন। আবার দেখা যায় অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক-দৃশ্য ব্যবহার না করেও নাটক সমাপ্ত করা হয়েছে। যেমন, 'গৃহপ্রবেশ', 'নটীর পূজা', 'শেষ বর্ষণ' ইত্যাদি। এ ছাড়া 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রভৃতি নাটকের দৃশ্য ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবহার পরিলক্ষিত নয়। 'গুরু', 'অরূপরতন' 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটককে সংখ্যার সাহায্যে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্লট পরিকল্পনায়ও প্রথানুগত্য সংস্কারে বিশ্বাসী নন। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রম ও বৈপ্লবিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। এক উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সার্বজনীন বিষয়ভাবনাই তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছে। ফলে সমকালীন সমাজবাস্তবতার নির্মম নিরিখে তিনি অনেক গঞ্জনার শিকারে পরিণত হন। যেমন, 'বিসর্জন' ও 'অচলায়তন' নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য তাঁকে অনেক অবমাননা অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। 'বিসর্জন' নাটকে প্রতিমা পূজার

বিরুদ্ধে বিষোদগার ও প্রতিমার গোমতি জলে নিক্ষেপের ব্যাপারটি হিন্দুসংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এ ছাড়া মন্দিরে বলিপ্রথা ও পূজাপদ্ধতির অসারত্ব প্রতিপন্ন করায় ধর্মপ্রবুদ্ধ হিন্দু সম্পদায় রীতিমত ফুঁসে ওঠে। 'চিরকুমার সভা' প্রহসনের বিষয়বস্তুও তৎকালীন সমাজে বেশ আলোড়নের ঝড় তোলে। এর সাথে সে-সময়কার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে এই প্রহসনটি তাঁদের উপর ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ বলে ধরে নেওয়া হয়। অচলায়তন নাটকের বিষয়বস্তুতে আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড কটাক্ষ নিহিত রয়েছে। যাতে এটি শিল্পসফল ও জনপ্রিয় নাট্যসৃষ্টি হয়েও বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য 'বশীকরণ'ও হিন্দুসমাজকে কটাক্ষ করে রচিত বলে অনেকে মনে করেন। এ ছাড়া তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকগুলো বাংলা নাট্যধারায় সম্পূর্ণরূপে ব্যতিক্রম। এসব নাটকের বিষয়বস্তু এক অন্তর্মুখী মননশীল ভাবভাবনার ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। কোথাও কোথাও এক অতিন্দ্রীয় ভাবলোকের প্রকৃতিদত্ত রসরহস্য দ্বারা নাটকীয় কাহিনি, চরিত্র, আবহ, উপাদান ও পরিণতি পরিচালিত। একটা অসংজ্ঞেয় অবস্থিতির মাধ্যমে মানুষ, প্রকৃতি ও স্রষ্টার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটে। প্রচলিত নাটকের প্লট, চরিত্র, আবহ, উপাদান, ভাষা, অলংকার ও পরিণতি এখানে একেবারেই উপেক্ষিত। এভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাটকের নানামাত্রিক ব্যতিক্রম বিস্তার আবিষ্কার করা সম্ভব। যা কোনোমতেই প্রচলিত বাংলা নাট্যধারার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে নি। সবক্ষেত্রেই রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বকীয় সৃষ্টিসৌকর্য পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যধারায় রবীন্দ্রনাটককে বিশেষ কোনো শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। বরং রবীন্দ্রনাটককে রবীন্দ্রপ্রতিভারই সবিশেষ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। যা কেবলই সৃষ্টিশীল মানবাত্মার চিরন্তন অনুভবের মধ্যে টিকে থাকার স্পর্ধা করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার ক্ষেত্রে সমকালীন পরিপার্শ্ব প্রেক্ষাপট দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সমসাময়িক সমাজবাস্তবতা তাঁর নাটকের প্রবাহ-প্রতীতি এবং অন্বয় অনুষঙ্গ গড়ে তোলে। উনবিংশ ও বিংশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন-সংস্কার ও আলোড়ন-অন্বেষা এসব নাটকের ভিত তৈরি করে দেয়। তবে কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রসৃষ্টিতে তা একটু ভিন্নতর মাত্রাযোগে উপস্থাপিত ; তিনি সবকিছুই আত্মগত অনুভবের পরিশ্রুত রুচিমাফিক গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাঁর প্রায় সব নাট্যসৃষ্টির মধ্যেই সহজাত কাব্যিক ব্যঞ্জনার অনুরণন লক্ষণীয়। একটা অনুভববেদ্য মননশীল অলঙ্করণ ও পরিচর্যায় এসব নাটক গড়ে ওঠেছে। প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতার স্থূল বৈষয়িক বর্ণনার ব্যাপ্তি ও বিস্তার একেবারে নেই বললেই চলে। প্রথাবদ্ধ নাট্যকাঠামোও তিনি অনুসরণ করেন নি। সব মিলিয়ে প্রচলিত নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাটক কিছু ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যযোগে চিহ্নিত হতে পারে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এসব নাটকে রবীন্দ্রস্বভাবের কাব্যিকতা নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তথাপি এর মধ্যে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদ, পরাধীনতা, পররাজ্য লোলুপতা, শাসন-শোষণ ইত্যাকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ বছর বয়সে প্রথম নাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) রচনা করেন। এ সময়ে (১৮৭৮-১৮৮০ খ্রিঃ) তিনি বিলাতে বৃহত্তর সমাজবাস্তবতার সান্নিধ্যে সময় কাটান। সেখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য জীবনপ্রবাহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ ঘটে। বিশেষত সংগীতের নানামাত্রিক স্বরূপ-প্রকৃতি অনুধাবন করার সুযোগ পান। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের মাধ্যমে এর সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব করে তোলেন। এই নাটকে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সুরের মধ্যে কিছু সমন্বয়সূচক পদ্ধতির সংগীত ব্যবহার করেন। এখানে কিছু বিলাতি ও আইরিশ সুরের প্রয়োগ-পরীক্ষা লক্ষ করা যায়।

469959

রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা প্রসঙ্গে বলেন, "বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া"।[৪৬] এর ফলে বাংলা নাটকে একটা আন্তর্জাতিক আবহ-অন্বেষা প্রযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ খ্রিঃ 'মায়ার খেলা' নামে আরেকটি গীতিনাট্য রচনা করেন। এই নাটকের মাধ্যমে তিনি চিত্রবিচিত্র সুরের পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এর সাথে সমকাল-প্রভাবিত রাজনীতি ও সংস্কৃতির গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকায় বিচরণ করতে থাকেন। সবখানেই তাঁর সশরীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব অব্যাহত ছিল। ১৮৮৬ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন ও ছাত্র সম্মেলনের জন্য তিনি সংগীত রচনায় ব্যস্ত। গান রচনার এই মুখরিত সুরের মাদকতা নিয়েই 'মায়ার খেলা' নাটক গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস অবলম্বনে 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৫) নাটক রচনা করেন। এই নাটকের প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মাধ্যমে সমকালীন রাজনীতির গভীর প্রচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের মাধ্যমে স্বকীয় সুদৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেন। এবং তৎকালীন সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা স্বচ্ছ প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে সক্ষম হন। 'প্রতাপাদিত্য' চরিত্র নিয়ে তখন পুরো ভারতবর্ষ মেতে ওঠে। ঐতিহাসিক এই বীরচরিত্র ঘিরে অনেকেই প্রতাপাদিত্য উৎসব শুরু করেন। এমনকি ভক্তির অর্ঘ নিবেদনের জন্য প্রতাপাদিত্য পূজাও চালু করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৩০ খ্রিঃ সরলা দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এর কথা স্মরণ করা যায়। এ পর্যায়ে শুধু প্রতাপাদিত্য নয়, সেসময় অনেক জাতীয় বীরত্বপূর্ণ চরিত্র-আদর্শ দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। পরাধীন বাঙালি জাতির সামনে অতীত, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শবান জাতীয় চরিত্রসমূহ তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাঙালির গৌরবময় ঐতিহ্য- সংস্কৃতি মনে করিয়ে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ। এবং এর মাধ্যমে একটা উজ্জীবন মন্ত্র জাতির দেহপ্রাণে সঞ্চারিত হতো। যা স্বাধীনতাকামী বাঙালিচিত্তে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করত। এ সময় প্রতাপাদিত্য উৎসবের পাশাপাশি আরো কিছু দেশাত্মমূলক আয়োজন-অন্বেষা লক্ষণীয়। তাছাড়া তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসবের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রতাপাদিত্য চরিত্রটি জাতির এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে নির্বাচন করেন। এ সময় স্বাধিকার আন্দোলনের মত্ততায় বাঙালি জাতি মেতে ওঠে। মুক্তিকামী কিছু চরমপন্থী দলের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এসব মুক্তিপাগল ভারতীয়দের উপর দমন-পীড়ন চালাতে থাকে। চারিদিকে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। যেমন, আলিপুরে বোমা হামলা, শত শত নেতাকর্মীকে কারাগারে প্রেরণ, জুলুমনির্যাতন, হত্যাকাণ্ড, ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুদণ্ড- ইত্যাদি সরকারি দমন- দণ্ডপীড়নে সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এ সময় দেশের বাইরে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিক অসন্তোষ– আন্দোলন ভারতবর্ষেও আছড়ে পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে গান্ধীজীর নেতৃত্বে শত-সহস্র ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বারবার তাঁরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিশেষত, 'Transvaal immgrant's Restriction Bill'-এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীদের আন্দোলন, গ্রেফতার, ভারতবর্ষে প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা ভারতবর্ষের মধ্যেও আলোড়নের ঝড় তোলে। এবং এদেশেও স্বদেশী আন্দোলনের প্রচণ্ড স্রোতধারা বইতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এসব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি রচনা করেন। তিনি নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটির প্লট-চরিত্র গড়ে তুলেছেন। ইতিহাসের সঠিক সত্যস্বরূপ চারিত্র্য-চিন্তন উদঘাটন করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখানো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তী কালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটকটি শান্তিনিকেতন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচনা করেন। সেখানকার পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবেই এটি রবীন্দ্রকল্পনায় গৃহীত। শারদীয় ঋতু উৎসব উদযাপনের লক্ষ নিয়ে এর প্লট পরিণাম নির্মাণ করা হয়। ঋতু-উৎসব পালন রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার অন্যতম অনিবার্য অংশ। এর মাধ্যমে শিশুদের প্রকৃতির রাজ্যে নিবিড়ভাবে অন্বিষ্ট করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সান্নিধ্যে খোলা আকাশের নিচে আত্মগত বিকাশের পথটি উন্মুক্ত করা হতো। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রদানের অন্যতম লক্ষ্যও ছিল তাই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি যখন এই শান্তি নিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম, তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তের আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে। বিশ্বের চারি দিকটার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুন যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইঁট কাঠ পাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের

গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে।"[৪৮] রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাভাবনার উদ্দেশ্য অভিপ্রায় 'শারদোৎসব' নাটকে লক্ষণীয়।

এই নাটকের প্রধান উৎসব হিসেবে 'পুঁথি-পোড়ানো-উৎসব-ই প্রাধান্য পেয়েছে। নাটের গুরু সন্ন্যাসী বলছে '... চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।' সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।"[৪৯] এই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার মাধ্যমে নাটকীয় পরিণতিতে প্রকৃতিবিশ্ব স্থাপন করা হয়। একটা আত্মিক সংযোগের মাধ্যমে ছেলের দল, সন্ন্যাসী, ঠাকুরদা ও শারদীয় নিসর্গ একাকার হয়ে ধরা পড়েছে। নাটকে সন্ন্যাসী বলতে থাকেন, "দেখতে পাচ্ছ কি শারদা বেরিয়েছেন? দেখতে পাচ্ছ না? দূরে, দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না! সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলে প্রথমতম শিখরটির কাছে। যেখানে প্রতিদিন ঊষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে- সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো,... ।"[৫০]

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা 'শারদোৎসব' নাটকের প্রতীক-প্রতীতির মধ্যেমে অভিব্যক্ত হয়। যা ছিল মূলত তথাকথিত শিক্ষার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। এ শিক্ষা সমকালীন ব্রিটিশ প্রবর্তিত বাস্তবতাবর্জিত, পুঁথিগত ও কেরানী তৈরির শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনেও এহেন শিক্ষগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। এবং সারাজীবন এই শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যান।

'শান্তিনিকেতন' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাস্বপ্ন অভিব্যক্তি লাভ করে। 'শারদোৎসব' নাটকের মাধ্যমে এই শিক্ষাদর্শের অনেকখানি রূপপ্রকৃতি অনুভব করা সম্ভব। এই নাটকটি রচনার সময় জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক বৈপ্লবিক আন্দোলন-পদক্ষেপ সংঘটিত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের যাবতীয় শিক্ষা সংস্কারমূলক নিয়ম-নীতি ভারতীয়দের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। অনুরূপ একটা সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শারদোৎসব নাটক রচনার মাধ্যমে এই বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন। "... কবি শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়টিকে মনোমত রূপদান করিতে চাহিলেন। এই সময়েই ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে আসেন। ক্ষিতিমোহন আসিয়াই আশ্রমের সকল কাজে কবির সহায়ক হইলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যুগে কবি যে সব পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই এখন তিনি ক্ষিতিমোহন, বিধুশেখর প্রমুখের সহায়তায় বাস্তবে পরিণত করিতে উদযোগী হইলেন।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটক রচনার পেছনে সমকালীন সমাজবাস্তবতা অত্যন্ত গভীরভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এখানে মূলত সংস্কারসর্বস্ব বাঙালি জাতির বন্ধ্যাত্ম বন্দিদশার চিত্র অত্যন্ত সরস ভঙ্গিতে চিত্ররূপ লাভ করে। 'অচলায়তন' নাটক রচনাকালীন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বহুমাত্রিক সামাজিক কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিশেষত সমাজ-সংস্কার ও সমাজ পুনর্গঠন কর্মে তাঁকে সর্বস্ব নিয়োগ করতে দেখা যায়। এ সময়ে তিনি ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে একটা সংস্কারমূলক চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। আবার নতুন করে, আধুনিক সমাজজীবনের উপযোগী করে সবকিছু গড়ে নিতে হবে। এই ভাঙা-গড়া, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ, সংস্কার-গড়াবার, সংঘাত-সমম্বয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ- প্রভৃতি ভাবভাবনা 'অচলায়তন' নাটকের ভিত রচনা করেছে।

এ সময়ে দীর্ঘ সংগ্রাম-সংক্ষোভ পেরিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পরিণতির পথে এগিয়ে যায়। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক ঘোষণায় বঙ্গচ্ছেদ রহিত করা হয়। এর ফলে অখণ্ড ভারতের সংহতি-সংস্কৃতি স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসে। সবার মধ্যেই দেশ-মাতৃকার কল্যাণব্রত নররূপে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সবকিছুই পুনর্গঠনের মাধ্যমে গড়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ উৎসাহ-অনুপ্রাণনার কাছে নিজেকে নিবিড়ভাবে সঁপে দেন। এ সময় তিনি পল্লীসংস্কারের নানামুখী হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ববাংলার 'শিলাইদহ', পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজের সূত্রপাত করতে থাকেন। যেমন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, কৃষিখামার স্থাপন, ধানভানার কল আনার উদ্যোগ, স্কুল প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের ছাতা তৈরি শেখানোর চিন্তা, কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ- ইত্যাকার সামাজিক কাজে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেন। জাতিগত অস্তিত্বের চালিকাশক্তি গ্রামবাংলার উন্নয়নই ছিল তাঁর মূল লক্ষ। বিশেষত কৃষকদের যাবতীয় কর্মপদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে তা আরো গতিশীল ও ফলপ্রসূ করতে চান। এই চিন্তায় তিনি তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ ও জামাতাকেও নিয়োজিত করেন। তাঁর এই ব্রতসাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই এগিয়ে আসেন। দেশের অধিকাংশ স্থানে এর পদ্ধতি-প্রয়োগ অনুসৃত হতে থাকে। পাশাপাশি এ সময় সারাদেশেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন-বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধিকারপ্রমত্ত আন্দোলন-আয়োজন অনেক

ক্ষেত্রেই বিকৃতভাবনায় চরম আকার ধারণ করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ কিছু সম্প্রদায়-সংগঠন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেতে ওঠে। 'অচলায়তন' নাটকেও এই সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপট আবিস্কার করা সম্ভব। এখানেও একটা ভাঙা-গড়া, আন্দোলন- বিক্ষোভ, পুনর্গঠন-পরিবর্তন লক্ষণীয়। এবং নাটকীয় পরিণতিতে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে অচলায়তনের নতুন ভিত্তি বেশ সাড়ম্বরে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। "যদিও নাটকের মধ্যে এই প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস ও ভাঙচুরের ব্যাপারটা নেপথ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে ... অচলায়তনে দাদাঠাকুর তো রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মন্ত্র দিলেন। এই বিপ্লবে শুধু ভাঙন নাই- নতুন সৃষ্টি ও মুক্তির বাণীও আছে।"[৫২]

'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পাশাপাশি উৎপীড়িত প্রজাসাধারণের চিত্র অঙ্কন করেন। পররাজ্যলোভী সরকারের শোষণ বঞ্চনার ফলে সেখানে দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, অতিরিক্ত কর আদায়, কর-বন্ধ আন্দোলন,- ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক সংঘটিত হতে দেখা যায়। নাটকের এই প্লট প্রবাহের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের দৃশ্যচিত্রই বারবার আবিষ্কার করা সম্ভব। এবং অধিকৃত-শোষিত-বঞ্চিত শিরতরাইবাসীদের যাবতীয় দুর্দশাগ্রস্ত জীবনচিত্র যেন পরাধীন ভারতীয়দের অনুকরণেই রচিত হয়েছে। তাদের যাবতীয় জীবনযাপন প্রণালী তৎকালীন ভারতীয়দের সাথে গভীর ভাবে সাদৃশ্য বহন করে চলে। তারা উগ্র জাতীয়তার বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্ব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময়কালীন ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলনের চিত্রও এখানে পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 'মুক্তধারা' নাটকে তৎকালীন ভারতের সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকখানিই মূর্ত হয়ে ওঠে।" "... দেশের রাজনৈতিক সমস্যার ভিন্নতর সমাধানের ইঙ্গিতসহ মুক্তির ভিন্নতর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি লিখলেন তাঁর অন্যতম প্রতীকধর্মী নাটক 'মুক্তধারা' (১৯২২)। এই নাটকের রাজনৈতিক পটভূমি হলো উত্তরকূট পর্বতাঞ্চলের রাজা কর্তৃক সমতলভূমি শিবতরাই-এর প্রজাদের উৎপীড়ন ও শোষণ।

এই নাটকের প্রতীকী অর্থব্যঞ্জনা রাজপুত্র অভিজিৎকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। তাঁর মুক্তি ও ন্যায়নীতির প্রতি গভীর ভালবাসা, মানসিক প্রশস্ততা, উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে যন্ত্র ও বস্তু পৃথিবীর উপর আত্মিক ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির উপস্থিত লক্ষ্য অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেল ভারতীয় জনসমষ্টি।"[৫৩]

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উৎকট দৃশ্যরূপ ফুটিযে তুলেছেন। বিশেষত, ইউরোপের পুঁজিসর্বস্ব আগ্রাসী আত্মকর্তৃত্ববাদ এর প্লট-পরিবেশ নির্মাণ করেছে। বল্গাহীন অর্থলোলুপতার দাসানুদাস পুঁজিপতিদের অনুকরণে যক্ষপুরীর রাজাকে উপস্থাপন করা হয়। এই নাটক রচনাকালীন পর্বে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশ ভ্রমণ করেন। এবং সেখানকার নির্বিচার অর্থলুব্ধ আগ্রাসী পুঁজিবাদের নির্মম বাস্তবতা কবিকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। এর মধ্যে মন ও মননশীলতার কোনো মূল্য নেই। শুধুমাত্র অর্থসর্বস্ব গাণিতিক হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে সবকিছুর অবস্থান নির্মিত হয়ে থাকে। 'জাপান-যাত্রী' রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মনোভাব ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, "আমার এই জানলায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে এই যা দেখছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্ত মাংসের নয়। এক দিকে আমার জানলা, আর-এক দিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শহর। চীনেরা যে রকম বিকটমূর্তি ড্র্যাগন আঁকে- সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিত- এই দরকার নামক দৈত্যটা।"[৫৪]

'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাসজাতীয় জড়বৎ কিছু প্রাণির এক রূপকথার রাজ্য চিত্রিত করেন। যাদের নিজস্ব কোনো চলৎশক্তি নেই। এক অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্র-সূতার টানে প্রতিমুহূর্তে চালিত। এতে তিলার্ধ-বিসর্গ পরিমাণও নড়চড় হবার কোনো সুযোগ নেই। এই যন্ত্রবৎ জড়িমাগ্রস্ত রূপকথার রাজ্য আসলে সমকালীন ভারতবর্ষেরই প্রতিচিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে স্বকীয়-স্বাধীন-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিসত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই। এমনকি বাক-স্বাধীনতা বা নিজেকে প্রকাশ করারও অধিকার সেখানে বিলুপ্ত হয়েছে। এতো পরাধীন ভারতবর্ষেরই সমাজচিত্র। ব্রিটিশ সরকার সংস্কারসাধনের মাধ্যমে ভারতীয়দের যাবতীয় স্বত্ব-অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত প্রেস এ্যাক্ট আইন, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, শিক্ষা-সংকোচন নীতি- প্রভৃতি প্রয়াস পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যায়। ইংরেজ সরকার সিডিশন বিল জারির মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। এতে সর্বসাধারণের মতপ্রকাশের একটা মারাত্মক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। এই বিলটি পাশ হবার পূর্বদিনেই রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামক প্রবন্ধটি টাউনহলে পাঠ করেন। এতে মানুষের

কণ্ঠস্বাধীনতা হরণের ব্যাপারটি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষিত হয় । এবং বাক্যহীন, রুদ্ধপ্রাণ অবস্থায় মানুষের কিরকম দুর্ভোগ হতে পারে– তাই রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেন । 'তাসের দেশ' নাটকের আবহ অন্বেষার মধ্যেও অনুরূপ ভাবানুষঙ্গ চিত্রিত হয়ে ওঠে । এই নাটকেও মূর্তিবৎ তাসজাতীয় প্রাণিদের জড়িমাগ্রস্ত পুত্তলিবৎ জীবনে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই । কেবলই জড়খণ্ডের মতো নিষ্প্রাণ নড়াচড়ায় গড়াগড়ি মাত্র ।

'রাজা ও রানী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়বিলাসী দুর্বলচিত্ত রাজা বিক্রমদেবের চিত্র অঙ্কন করেন । রাজার ইন্দ্রিয়সর্বস্ব লীলাবিহারের জন্য রাজ্য জুড়ে ক্ষুধা, দুঃখ, দারিদ্য, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । আর্ত পীড়িত প্রজাসাধারণের মধ্যে নিরতিশয় দুঃখের অমানিশা নেমে আসে । এরই ফাঁকে পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে । এই অনুপ্রবেশকারী উপনিবেশবাদকে ভারতের মাটিতে ইংরেজশক্তির প্রতিভূরূপে অনুমিত হয় । অন্তর্দ্বন্দ্ব-অনাসৃষ্টি, বিভেদ-বৈষম্য, কলহ-পরানুগ্রহ ও অরাজক-অবস্থাপূর্ণ ভারতবর্ষে খুব সহজেই ইংরেজজাতি প্রবেশ করতে সক্ষম হয় । রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকে সমকালীন সমাজবাস্তবতার অনুরূপ একটা দৃশ্যপট তুলে ধরেন ।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ- ১৪১১, কলকাতা, পৃ: ৮০
২. বাংলা নাটক নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ, ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, প্র-প্র, ১৯৮২, কলকাতা, পৃ: ১৮
৩. সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস, ড. দুলাল ভৌমিক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ: ১৩

৪. বাংলা নাটক নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ, ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, প্র-প্র, ১৯৮২, কলকাতা, পৃ: ২৯
৫. নাট্যকলার ক্রমবিকাশ, ইসমাইল মোহাম্মদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৭, পৃ: ১
৬. নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ-১৯৬৩, কলকাতা, পৃ: ৪৯
৭. Cargacarya viniscaya in a volume with other works entitled 'Bauddha Gan-o-Doha' by the vangiya Sahitya parisat of Calcutta in 1323 B.E (1916 A.D.), Page-21
৮. প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, সাইমন জাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৭, পৃ: ৫ থেকে উদ্ধৃত।
৯. ঐ, পৃ: ১১ থেকে উদ্ধৃত।
১০. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ২২-২৩
১১. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ওয়াকিল আহমদ, পুনর্মুদ্রণ-২০০৬, ঢাকা-১১০০, পৃ: ২৫৪।
১২. ঐ, প্র: ২৫৪-৫৫ থেকে উদ্ধৃত।
১৩. হারানো দিনের নাটক, সম্পাদনা পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ: ১৫১ থেকে উদ্ধৃত।
১৪. ঐ, পৃ: ৫৩১ থেকে উদ্ধৃত।
১৫. ঐ, ভূমিকা, পৃ: ত্রিশ থেকে উদ্ধৃত।
১৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬, কলকাতা, পৃ: ১২৫।
১৭. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ২২৩।
১৮. (ক) রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক নাট্য, শেখর সমাদ্দার, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ: ৯।
    (খ) বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ : ২৬০
১৯. রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, প্রথম খণ্ড, অশোক সেন, পৃ: ৪১।
২০. (ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ: ২৩৩-৩৪
    (খ) প্রবন্ধ সংগ্রহ, সবুজ পত্রের মুখপত্র, প্রমথ চৌধুরী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃ: ৪১
২১. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ২৫৮।
২২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ-১৪০১, কলকাতা, পৃ: ৯১।
২৩. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৪৮৪।
২৪. ঐ, পৃ: ৪৫৩-৫৪
২৫. ঐ, পৃ: ৪৮৪
২৬. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৮৪৬
২৭. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৫১
২৮. ঐ, পৃ: ৪৮২
২৯. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩১৩
৩০. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৪৮৪
৩১. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ৪২।
৩২. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৫৩
৩৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ২৬৩
৩৪. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৮১
৩৫. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৮৭
৩৬. র-র, একাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৫৭

৩৭. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৫৬
৩৮. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৭৯
৩৯. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৫৭
৪০. ঐ, পৃ: ২০৫
৪১. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৫৯
৪২. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৮০
৪৩. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ছেলেবেলা, পৃ: ৭১৭-১৮
৪৪. র-র, একাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৫৭
৪৫. বাংলা নাটক নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ, ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, কলকাতা, পৃ: ১৮৮
৪৬. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৮২
৪৭. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬০৩
৪৮. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৬৫
৪৯. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৭৮
৫০. ঐ, পৃ: ৩৯২
৫১. ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, নেপাল মজুমদার, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃ: ৩১৬।
৫২. ঐ, পৃ: ৩৩২
৫৩. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার প্রথম প্রকাশ-১৯৮২, কলিকাতা, পৃ: ২৫২-৫৩
৫৪. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪২১

চতুর্থ অধ্যায়
রবীন্দ্র নাটকের পরিচয়

নিরীক্ষা-নিরত রবীন্দ্রপ্রতিভা বরাবরই নব নব শিল্পের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই মননধর্মিতা লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যের যাবতীয় শাস্ত্রসূত্র তিনি নিবিড়ভাবে আত্মস্থ করতে প্রয়াসী হন। এবং যে কোনোরকম ঐতিহ্য-অনুষঙ্গ উপলক্ষ করেই নাট্যশিল্পের বহুবিচিত্র অবয়ব অস্তিত্ব গড়ে তোলেন। সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়াবলিও সেখানে নানা ভাবে জায়গা করে নেয়। এই বহুমাত্রিক সৃজন-গড়ন রবীন্দ্রনাটককে বিভিন্ন অবয়ব আঙ্গিকে নির্দেশিত করতে সক্ষম। এ পর্যায়ে সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের নাটকসমূহ বিভিন্ন শিরোনাম অভিধায় চিহ্নিত করতে প্রবৃত্ত হন। যা সাধারণত গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, তত্ত্বনাট্য, ঋতুনাট্য, সমাজনাট্য ও প্রহসন নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

গীতিনাট্য মুলত গীতিকেন্দ্রিক নাট্যসৃষ্টি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। বাঙালিপ্রাণের সহজাত গীতিপ্রাণতা এই নাটককে অধিকতররূপে মনোগ্রাহী করে তোলে। এর সাথে দেশীয় লোকনাট্যের ঐতিহ্যিক গীতিরসধারা প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছে। এসব নাটকে গীতিমাধুর্যের সুর ও ছন্দ প্লট-পরিণতি সম্পন্ন করে দেয়। অবিরল গানের গতিরাগে নাটকীয় কাহিনি বর্ণিত হয়। এতে গদ্য-পদ্য সংলাপের বৈচিত্র্য-বিভাগ একটা সম্মোহ ভাবনা তৈরি করে দেয়। তবে প্রায় ক্ষেত্রেই গানের আধিক্য লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে নাটকীয় কাহিনি শুধুমাত্র গানে গানে রচিত হতে থাকে। মূলত অনুরূপ প্রয়োগ প্রবণতাই গীতিনাট্যে প্রাণপ্রতীতি নির্মাণ করেছে।

গীতিনাট্য বাংলার ঐতিহ্য আত্মকৃতির পথ বেয়ে আধুনিক যুগেও নানামুখী সমৃদ্ধি অর্জন করে। অনাদিকাল-বাহিত প্রাচীনতম বাংলার যাত্রা-পাঁচালী ও কথকতার সাথে এর গভীর সাজুয্য রয়েছে। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ধারায় এসব গীতিনাট্যের সর্বাধিক বিকাশ লক্ষ করা যায়। তবে উনবিংশ শতকের বহুবিচিত্র সাহিত্যশাখার ক্রমোন্নত সময়েও এসব নাটক সুসংহত হওয়ার সুযোগ পায়। এবং বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে থাকে "ইয়ুরোপীয় অপেরার আদর্শ-অনুসরণে বাংলার সেই গীতিনাট্য উনিশ শতকের শেষদিকে এক নতুন রূপ নিল। তাকে কেউ বলেছেন নতুন যাত্রা। সখের যাত্রা বা গীতিনাট্য।"[১] রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যের এই সমন্বয় সম্ভাবনার মূল ভাবটি আত্মস্থ করতে সমর্থ হন। এবং স্বকীয় শিল্পসৃষ্টির তাড়নায় একটা নবতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির মাধ্যমে গীতিনাট্য রচনায় হাত দেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলো বাংলা নাট্যধারায় ঐতিহ্যিক, যুগোপযোগী ও যুগোত্তীর্ণ শিল্পসুষমায় অভিষিক্ত হয়েছে। ফলে সাহিত্যধারায় গীতিনাট্যশাখা একটা অমিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ পায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খ্রিঃ গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনা করেন। পরবর্তীতে আরো দু'টি গীতিনাট্য প্রকাশিত হয়। 'কালমৃগয়া' ১৮৮২ খ্রিঃ এবং 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি ১৮৮৮ খ্রিঃ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্পের আদলে গড়ে ওঠে। মঞ্চ, অভিনয় ও দর্শক শ্রোতার সমন্বয়ে নাটক দুটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেন নি।

বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত দস্যু সর্দার বাল্মীকির কবিত্ব শক্তিতে উত্তরণের কাহিনি অবলম্বনে বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত। এটি বহুল ব্যবহৃত আখ্যান সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বকীয় সৃজনক্ষমতার স্বাক্ষর রাখেন। কাহিনি ও অনুষঙ্গ উপাদান অনেকটাই তিনি প্রয়োজনমাফিক অদল-বদল করে নিয়েছেন। এই পরিবর্তিত নাট্যবস্তু অবলম্বনে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের প্লটপ্রবাহ গড়ে ওঠে। যা মূলত গানে গানে অভিব্যক্ত হতে থাকে। নাটকের সংলাপগুলো সুরের পাখায় ভর করে পাঠকসাধারণের মন ছুঁয়ে যায়। সুরকে প্রাধান্য দিয়েই নাটকীয় পরিবেশকে ব্যঞ্জনাত্মক করে তোলা হয়েছে। বয়সের উচ্ছ্বাসমুখর প্রাবল্যে সুরের একপ্রকার পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ থেকেই বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সপ্রসঙ্গ আলোচনায় নাটকটি সম্পর্কে বলেন,

"য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে-ইহা সুরে নাটিকা: অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই। ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র- "... হার্বার্ট' স্পেন্‌সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না- কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেনসরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন। আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমানসংগত রীতিমত সংগীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ-ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে- ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা- কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকিপ্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই; তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"[২]

একটি ক্ষীণ কাহিনিবস্তু অবলম্বনে 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) নাটকটি রচিত। গীতিময় সুষমার অবিরাম প্রস্রবণে নাটকীয় দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা, গতিবেগ ও পরিণতি দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ পায় নি। গানের মোহময় আবেশে পুরো নাটকের পরিবেশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কল্পনাপ্রবণ রবীন্দ্রপ্রতিভার সহজাত কাব্যিকতা এখানে বারবার উঁকি দেয়। যা বস্তুনিষ্ঠ নাট্যরস সৃষ্টিতে মারাত্মকভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 'মায়ার খেলা' নাটকেও অনুরূপ ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষণীয়। তবে সংগীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' নাটকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। এ অর্থেই এটিকে সার্থক গীতিনাট্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। এখানকার সংগীতগুলোর মধ্যেও সুষম সমন্বয়ের একটা অপূর্ব মাধুর্যমহিমা পরিদৃষ্ট হয়। যা সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি নির্দেশ করতে সক্ষম। "গীতিনাট্যের গানগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম একটা স্বতঃস্ফূর্তির ভাব লক্ষ করা গেল। স্বতঃস্ফূর্তির ভাব বলতে বোঝাতে চাইছি,সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সৃজনী শক্তির প্রকাশ।বাল্মীকিপ্রতিভার গানের মধ্যে বিশেষ কোন ঢং চোখে পড়ে না। সুরগুলো যেন স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মায়ার খেলা গীতিনাট্যে আগাগোড়া গানগুলির মধ্যে একটি সমধর্মিতা বা ঐক্য (যা গেয়ে দেখবার বিষয়) রয়েছে।"[৩] রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'মায়ার খেলা' নাটক সম্পর্কে বলেন, "... মায়ার খেলা বলিয়া আর একটা গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে। গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।"[৪] এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সুরের বহুবর্ণিল আবহ তৈরি করেছেন। যাতে কাহিনিগত শৈথিল্য-সংকট নাটকীয় পরিবেশকে বিঘ্নিত করে চলে। অনেক সময় তা পূর্বাপর সম্পর্করহিত ফাঁপা শূন্যতায় ভাসতে থাকে। এতে নাটকীয় চরিত্রের অনুভবনিষ্ঠ উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব নয়। নাটক রচনা করতে গিয়ে এই ক্রটিবিচ্যুতির মর্মপীড়ায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিচলিত হন। এ-জন্যে তিনি 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের কাহিনিকে আলাদাভাবে সরল গদ্যে উপস্থাপন করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। নাটকটির প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তিনি ঘোষণা করেন "এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পরপৃষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।"[৫]

'মায়ার খেলা' নাটকের কাহিনি মূলত অমর শান্তা ও প্রমদা চরিত্রের ত্রিভূজ প্রেমের স্বরূপ-প্রকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে। শান্তা প্রাণমন সমর্পণের মাধ্যমে অমরকে কাছে পেতে চায়। অথচ অমর বারবারই হাতের কাছের এই সহজলভ্য প্রেমকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য মনে করে। সে কেবলই সুদূরের প্রত্যাশী। দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণে নিরুদ্দেশ যাত্রীর মতো মানসী প্রিয়াকে খুঁজে বেড়ায়। কোনোক্রমেই যেন সুস্থিত হওয়ার অবকাশ নেই। এ অবস্থার কোনো এক উতরোল মুহূর্তে প্রমদার উপবনে প্রমদাকেই মানসী প্রিয়ারূপে খুঁজে পায়। কিন্তু প্রমদার চঞ্চল ও রহস্যময় জটিল প্রেমকে অমর কখনো আপন করে ভাবতে পারে নি। অবশেষে প্রমদাকে প্রত্যাখ্যান করে অমর শান্তার কাছেই ফিরে আসে। শানাই উৎসবের মিলন মাধুর্যে উভয়ের প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। এবং শেষপর্যন্ত প্রমদাই অমর ও শান্তাকে মিলনমালা পরিয়ে দেয়-

"প্রমদা। এই লও, এই ধরো, মালা তোমরা পরো

এ খেলা তোমরা খেলো-সুখে থাকো অনুক্ষণ ।”[৬]

'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) নাটক রচনার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কাব্যনাট্য রচনায় সাফল্য দেখিয়েছেন। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সবকটি শিল্পময় বৈশিষ্ট্য এখানে বিদ্যমান। ইতোপূর্বে কোনো নাটকেই রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ণাবয়ব দর্শনদৃষ্টি চোখে পড়ে না। একটি বিশাল ক্যানভাসে পূর্বাপর-সম্পর্কপরিণত জীবনের রূপময় বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়। বস্তুনিষ্ঠ জীবনবাস্তবতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মনন মুখরতা রাজা ও রানী নাটককে সার্থক করে তোলে। পাশ্চাত্য রীতিতে গঠিত পঞ্চমাঙ্ক নাটকের স্বয়ংসংগত সংস্থানের মধ্যে নাটকটি বিকাশ লাভ করেছে।

'বিসর্জন' (১৮৯০) রবীন্দ্ররচিত বহুল আলোচিত সমালোচিত ও প্রশংসিত নাটক। এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি বলে অনেক সমালোচক মতামত প্রদান করেন। নাটকীয় শিল্পকৌশল, বিষয়বস্তু ও মঞ্চ সাফল্যের কারণে এটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই নাটকের দুই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। এ ছাড়াও বহুমাত্রিক কারণে 'বিসর্জন' নাটক তৎকালীন সমাজে ব্যাপকভাবে আলোড়নের ঝড় তোলে। নাটকটির বিষয়বস্তুতে শাশ্বত ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি ও বলিপ্রথার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। যা ধর্মপ্রণত ভারতবর্ষে দারুণভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ছাড়া নবপ্রবুদ্ধ পাশ্চাত্য শিক্ষার উদার মনুষ্যত্ববোধ ও প্রগতিবাদের জয়গানই ছিল এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য। যাতে সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় একটা বিমিশ্র আত্মবোধন পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়োপযোগী উপকরণ উপাদানও এর জনপ্রিয়তা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। ভাষাভঙ্গিমা, বাগবৈদগ্ধ, সংলাপ, চরিত্রচিত্রণ, আকস্মিকতা, কৌতূহল, আবহ- ইত্যাকার অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ 'বিসর্জন' নাটককে বিস্ময়কর মঞ্চসাফল্য এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো নাটকে এতটা মঞ্চসাফল্য পরিলক্ষিত হয় নি। চিত্তধর্ম ও তথাকথিত সমাজধর্মের মধ্যে মুহূর্মুহু দ্বন্দ্বসংঘাতই নাটকটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। যা প্রতিমুহূর্তে দর্শকসাধারণের মনকে আবিষ্ট করে রাখে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে পরিণামচিন্তায় নাটকটির মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জয়গানই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মানুষ তার নিত্যতার সত্য-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ স্নেহসিক্ত মানবী অপর্ণা চরিত্রের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের পরিসমাপ্তিতে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন–

“রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল-জননী আমার
এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা
জননী অমৃতময়ী
অপর্ণা। পিতা, চলে এসো।”[৭]

কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) একটি পৌরাণিক আবহ-আখ্যান অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের অন্তর্গত অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাহিনি এই নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে এর মধ্যে একটা দূরাগত আমেজ-আহবান ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যা রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বভাবগত রোমান্টিক প্রবণতার সাথে সাজুয্য বহন করে। এতে চিত্রাঙ্গদায় নাটকীয় বস্তুধর্মিতা অপেক্ষা কাব্যিক সৌন্দর্য-সুষমা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চিত্রাঙ্গদার আদিগন্ত অবয়ব জুড়ে কাব্যের অনুষঙ্গ-অলঙ্কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, চিত্রকল্প ও সুষমামণ্ডিত ভাববিন্যাস এই নাটককে গড়ে তুলেছে। গীতিকবিতার সুললিত সুরমাধুর্য এই নাটকের মধ্যে একটা সম্মোহভাবনা তৈরি করে। ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব অন্বয়-অনুরণন দ্বারা চিত্রাঙ্গদা নাটকের প্রাণ-প্রতীতি নির্মিত। ফলে রবীন্দ্রনাথের সহজাত কাব্যিকতা তাঁর নাট্যধর্মকে প্রতিমুহূর্তে বিঘ্নিত করে চলে। উচ্ছ্বাসমুখর সংলাপ রচনার ফলে চরিত্রগুলো অভিনয়সাফল্য হারিয়েছে। যা অতিমাত্রায় বর্ণনাবহুল হওয়ায় মঞ্চাভিনয়ে মারাত্মকভাবে উপদ্রবরূপে দেখা দেয়। তাছাড়া ঘটনাসংস্থান, চরিত্রবাস্তবতা, স্থান-ঐক্য, কাল-ঐক্য ও আবহ কল্পনায় 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যধর্মের অনুকূল নয়। এ অর্থে 'চিত্রাঙ্গদা' পাঠযোগ্য কাব্য অথবা পাঠ্যনাটক হিসেবেই অধিক সার্থকতা লাভ করেছে। এতসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বলা যায়– রবীন্দ্রনাথ নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই 'চিত্রাঙ্গদা' রচনা করেন। কাব্য উপলক্ষ হিসেবে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাহিনি নিয়ে একটা মননধর্মী প্লট তৈরি করা হয়। যাতে নাট্যিক গুণাবলি অনেক পরিমাণে হ্রাস পেলেও আলাদা কিছু ব্যঞ্জনাত্মক পরিবেশ যুক্ত হতে দেখা যায়। যাতে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্যবোধ খুব সহজেই চোখে পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের মহিমময় স্বরূপ-প্রকৃতি ও ঐতিহ্যিক অনুভবের পালা 'মালিনী' (১৮৯৬) নাটক। রবীন্দ্রনাথ মালিনী চরিত্রের মাধ্যমে এই প্রতিপাদ্য বিষয় বক্তব্য তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি চিরায়ত ব্রহ্মণ্যধর্মের অসারত্ব তুলে ধরা হয়। আচারসর্বস্ব এই ধর্মের ফাঁক ও ফাঁকিকে তিনি চিরদিনই প্রত্যাখ্যান করেন। 'মালিনী' নাটকেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষণীয়।

ধর্ম কখনো বাইরের আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আত্মপ্রবুদ্ধ মননশীল চেতনার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ভক্তি বিশ্বাস ও সত্য-নিত্য মেলবন্ধনের মাধ্যমে যেখানে যোগসূত্র রচিত হয়। এই ধর্মই মানুষের কাঙ্ক্ষিত জীবনদর্শনের পরিচায়করূপে গৃহীত। এরকম একটা দর্শনদীক্ষায় তাড়িত হয়েই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বাণীর সাধনা করেছেন। 'মালিনী' নাটকেও তাঁর অনুরূপ মানসপ্রবণতা আবিষ্কার করা সম্ভব। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জীর্ণতাকে বুদ্ধপ্রবর্তিত সর্বতোমুখি মানবপ্রেমের বন্ধনে অভিষিক্ত করা হয়। আচারপরায়ণ ধর্মজীবনে বাঙালিপ্রাণ চিরদিনই প্রকৃত জীবন থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই লেখনী ধারণ করেছেন। উদার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বমানবতার সম্প্রীতি-সুষম অবস্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর ধর্মসাধনা নিবেদিত। রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈচিত্র্য-বহুল সাফল্য সিদ্ধির পেছনেও এই ধর্মপ্রাণনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ জন্যে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসে সুস্থিত হতে পারেন নি। মানবতার প্রশ্নে যে-কোনো ধর্মেরই অংশবিশেষ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আবার অন্যদিকে মানবতা-লাঞ্ছিত যে কোনোরকম ধর্মভাবকেই পরিহার করেছেন। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সত্য ও নিত্যতার আলোকে বিধৌত মানবধর্মের অনুসারী ছিলেন। 'মালিনী' নাটকে এই মানবধর্মেরই জয়গান 'মালিনী' চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের প্রতিটি চরিত্র একটা বিশেষ তত্ত্বের বাহকরূপে বিচরণ করতে থাকে। ফলে চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যবোধ এখানে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। আবর্তিত ছক-পথে চালিত হওয়ার কারণে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনুপস্থিত। তাছাড়া সন্ন্যাসী চরিত্রের একটানা অবিরাম স্বগতোক্তি বর্ণনায় ক্লান্তিকর একঘেয়েমি উৎপাদন করে। আত্মসংবৃত এসব সংলাপের দূরাগত উচ্ছ্বাসমুখরতা নাটকীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাহত করে চলে। এ অর্থে নাটকীয় প্রধান গুণ, যা নৈর্ব্যক্তিক বস্তুবাদের ঘাত-প্রতিঘাত তা প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে অনুপস্থিত। ফলে এটি মঞ্চাভিনয়ের উপযোগিতা হারিয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক ভাবোচ্ছ্বাসের কাব্যিক ব্যঞ্জনায় নাটকীয় কাহিনিটি অভিব্যক্তি লাভ করেছে। কোনো অতীন্দ্রিয় স্বর্গ-সুরলোকে বিহার করে নয়– বরং প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতাকে স্বীকার করেই মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে। এরকম একটা দর্শনবোধে তাড়িত হয়েই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের কাহিনি গড়ে ওঠে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেন, "এই কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া, একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব-কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সান্ন্যাসী ইহাই দেখিল– ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লাইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি "সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"[৮]

প্রকৃতিপ্রাণতা রবীন্দ্র শিল্পসৃষ্টির প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত। প্রকৃতি তাঁর হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায় উচ্চারিত। এমনকি প্রকৃতির সাথে তিনি একাত্ম-অভিন্ন হয়ে সময় কাটিয়েছেন। এ কথা নিজেও বহুবার অকপটে স্বীকার করেন। 'ছিন্নপত্র' রচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথের এই মানসিকতা সর্বোচ্চ হারে লক্ষণীয়। এ ছাড়া তাঁর রচিত অজস্র গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস স্মৃতিকথা ইত্যাদি জুড়ে প্রকৃতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে আছে।

'বর্ষা' রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু। কিন্তু 'শরৎ' প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁর আগ্রহ একেবারে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। 'ছিন্নপত্র' 'বর্ষা ও শরৎ', 'পঞ্চভূত' জীবনস্মৃতি' ইত্যাদি গ্রন্থের সিংহভাগ জুড়েই শরতের প্রাণবন্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। "শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে। আনন্দগান গারে হৃদয় আনন্দগান গারে।"[৯] অথবা 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলির/ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলির/শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে/বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে/আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।"[১০] শরৎ-প্রকৃতির এই মোহময় বর্ণনাবিভা রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ছিন্নপত্রের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্-তল থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল, ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের

গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকেল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আম বাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবারমুখে নারকেল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণে এবং গভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।”[১১]

জীবনের বহুধা বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃজনপরিক্রমার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের শরৎপ্রকৃতি বারবার উঁকি দেয়। তিনি আশৈশব আপন প্রাণের অব্যক্ত আনন্দের সহচররূপে শরৎ ঋতুর শরণাপন্ন হন : তিনি বলেন, “আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।”[১২] অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শরৎ-প্রকৃতির প্রাণময়তাকে আপন প্রাণের প্রতিফলন বলেই মনে করেছেন।

“... আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক, সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ- সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা-বোঝাই-করা শরৎ-আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।”[১৩] রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় শারদীয় ঋতু-উৎসব উদযাপনের জন্যেই ‘শারদোৎসব’ নাটক রচিত। নাটকীয় চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা উৎসবের আয়োজন-অন্বেষা পরিলক্ষিত হয়। আশ্রমের শিক্ষার্থী বালকদের ছুটির আনন্দ পালনের উদ্দেশ্য নিয়েই ‘শারদোৎসব’ রচিত হয়েছিল। অনেকে এটিকে ছুটির নাটকও বলে থাকেন। তবে এর মাধ্যমে ঋতু প্রকৃতিকে মানবমনে অন্বিষ্ট করে বৃহতের সন্ধান প্রদানই ছিল মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃতির অনিবার্য অংশ হিসেবে মানবমনে সৌন্দর্য, ঔদার্য, শুদ্ধতার মহত্ত্ব, সত্যতা, নিত্যতা- ইত্যাকার গুণাবলি সতত বিরাজমান। কিন্তু প্রাত্যহিকতার জড়িমাগ্রস্ত সীমাবদ্ধতায় মানুষ তা বিস্মৃত হয়। কিন্তু এর মধ্যেও প্রকৃতিবিশ্বের সাথে একাত্ম অনুভাবনায় মানুষ সেই নিসর্গ-সংসর্গ ফিরে পেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এরকম একটা ভাবতরঙ্গে উজ্জীবিত হয়েই ‘শারদোৎসব’ নাটক রচনা করেন। যা তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থী বালকদের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রয়াসী হন। তিনি এই নাটকের উদ্দেশ্য অনুভব সম্পর্কে বলেন’, “ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। কেবল একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে– ‘বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।’”[১৪] “...বিশেষ বিশেষ ফুলে ফলে হাওয়ার আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ আছে। মিলন ঠিকমত ঘটিলেই অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে, সেই মিলন নিজেকে কোনো-না কোনো উৎসব আকারে প্রবেশ করে।”[১৫] ... মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে-রসে জাগিয়া উঠিতেছে।”[১৬]

‘শারদোৎসব’ নাটকের বাহ্যিক ঘটনা চরিত্রের আড়ালে কিছু গুহ্যতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকে দেখা যায় ছুটির অবসরে ছেলের দল শরৎপ্রকৃতির উৎসব আনন্দে যোগ দেবার জন্য বেরিয়েছে। এদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যোগ দেয় সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদা। সন্ন্যাসী আবার বেতসিনী নদীর তীরে পুঁথিপত্র পোড়াবার উৎসব করার জন্য উদ্যত হয়। এতকিছুর মধ্যে বালক উপনন্দ আপন মনে গুরুর ঋণশোধের জন্য পুঁথি লেখার কাজে ব্যস্ত। এসব বাহ্যিক ঘটনা শারদোৎসব’ নাটকে মুখ্য হলেও অন্তরসত্য হিসেবে কিছু দর্শনভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সমসাময়িক ও লৌকিক জীবনভাবনার কিছু প্রত্যয়বোধ এখানে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, প্রকৃতি-বিমুখ প্রাণহীন পুঁথিগত শিক্ষার বিরুদ্ধে এই নাটকের প্রাণ-প্রতীতি অত্যন্ত সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ। এবং মানবজীবনের অন্যতম মূলীভূত জীবনদর্শন– দুঃখের দহন আঘাতে জীবনের ঋণশোধ ও মুক্তি। যা উপনন্দ চরিত্রের মাধ্যমে বাণীমূর্তি লাভ করেছে।

‘রাজা’ (১৯০৯) নাটকটি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম অনুভবের প্রতীকী প্রকাশরূপে বিবেচ্য। জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনসাধনার আকুতি-আর্তি ও পরিপার্শ্ব-পরিণতি এর মূল আখ্যান হিসেবে পরিগণিত। বিষয়, কাহিনি, চরিত্র, আবহ, ভাষা– ইত্যাদি মিলিয়ে ‘রাজা’ নাটকটির মধ্যে একটা অসাধারণত্ব রয়েছে। এ সময় তিনি আত্মসমাহিত ভাব পরিমণ্ডলে

বিচরণ করতে থাকেন। ফলে অন্যান্য রচনাকর্মের সাথেও এই নাটকের সাদৃশ্য আবিস্কার করা সম্ভব। 'রাজা' নাটক রচনাকালীন পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'খেয়া' গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা রচনা করেন। সেসব রচনায় স্রষ্টা সৃষ্টির সম্বন্ধ সংযোগ, বিচ্ছেদ-বিরহ, অভিসার-অন্বেষা, মিলন-মাধুর্য বহুমাত্রিক রূপক অলঙ্কারের আধারে বর্ণিত। যা 'রাজা নাটকেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে 'রাজা' নাটকের একটি অভিনয়যোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেখানে নাটকটিকে 'অরূপরতন' নামে অভিহিত করা হয়। এই নামের মাধ্যও 'রাজা' নাটকের অন্তর্গত রূপরহস্য অনেকটা উপলব্ধি করা সম্ভব। রাজা ও অরূপরতন মূলত একই অর্থে ব্যবহৃত। এই রাজা, অরূপরতন বা অদৃশ্য স্রষ্টার সাথে মিলন সাধনার বহুরূপী অধ্যায় অনুষঙ্গ নিয়েই 'রাজা' নাটক রচিত। মানবজীবনে অনন্ত-অখণ্ড ও অদৃশ্য অরূপরতন আশা করে সাধনা করে যাওয়াই প্রধান ব্রত। যা 'রাজা' নাটকে মর্মগত সত্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে পরমাত্মারূপী অন্ধকার ঘরের রাজার সাথে জীবাত্মা-সদৃশ রানী সুদর্শনার বহুবর্ণিল মিলনসাধন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি অন্যান্য ঘটনাচরিত্রও এরই পরিপোষকরূপে চিত্ররূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কাব্য 'খেয়ার' 'শুভক্ষণ' কবিতায়ও এই আঁধার ঘরের রাজার পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

আচারসর্বস্ব ধর্মকর্মে প্রাণহীন কিছু জীবনবৃত্তকে অবলম্বন করে 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটক রচিত। নাটকীয় চরিত্রগুলোর চলন-বলন, আচার-আচরণ, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রতীতি-পরিণতি– সবই ধর্মের নির্মম নিগড়ে বন্দি। স্বকীয় স্বাধীনতার কোনো অবকাশ বা সুযোগ নেই। মন্ত্রবৎ প্রাত্যহিক জীবনের আবর্তন অভ্যাসের জড়িমায় সবাই ভেসে চলে। যন্ত্রবৎ মন্ত্রোচ্চারণের জড়মূর্ত খোলসে তাদের বসবাস।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এহেন ধর্মরাজক তন্ত্রমন্ত্রের ঘোর বিরোধী। তিনি মানুষ এবং মানুষের মনকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। "মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।"[১৭] অচলায়তনের মূল কাহিনি একটা প্রাচীনতম আয়তনিকের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এখানে দিনরাত কেবল তন্ত্রমন্ত্রের সতর্ক পাঠদান অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কোনোরকম প্রশ্ন, কৌতূহল, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, উপলব্ধি বা স্বকীয় ভাবভাবনার সুযোগ নেই। শুধুমাত্র মুখস্থসর্বস্ব কর্মকাণ্ডের যান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে প্রবৃত্ত হতে হবে। সবাই নিয়মানুবর্তিতার দাস। এহেন অদ্ভুত শিক্ষায়তনটি পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত। উঁচু প্রাচীর দিয়ে আচ্ছাদিত। এখানকার তন্ত্র-মন্ত্র ও নিয়মাবলির রক্ষক মহাপঞ্চক অবিচলিত দৃঢ়তায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। এ অবস্থায় সুভদ্র নামের এক বালক উত্তর দিকের জানালা খুলে ফেলে। সবাই মিলে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে পঞ্চক ও আচার্য প্রতিবাদ করে। এবং তারা প্রাণধর্মের চেতনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। পঞ্চক অবারিত জীবনের অনাবিল উচ্ছ্বাসমুখর আনন্দে গেয়ে ওঠে–

"আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণ ধারা
যেমন বাঁধনহারা।"[১৮]

পরিশেষে সুভদ্র পঞ্চক ও আচার্যের প্রাণগত বিদ্রোহ একীভূত আকার ধারণ করে। যা দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে রীতিমত একটা বিপ্লবে রূপ নেয়। এক সময় এই সম্মিলিত শক্তিই অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলে। সেখানে কর্মপাগল শোণপাংশু ও ভক্তিপ্রবণ দর্ভক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং প্রাচীন ও নবীন পন্থীদের সমন্বয়ে আয়তনের নতুন ভিত রচিত হয়। প্রগতি ও স্থিতিশীল সমবায়ে একটা অসাম্প্রদায়িক শিক্ষায়তনের যাত্রাপথ উন্মোচিত হয়ে ওঠে।

'ডাকঘর' (১৯২২) রবীন্দ্ররচিত প্রচারবহুল ও জনপ্রিয় একটি নাটক। অনুবাদের রূপ-রূপান্তর সুবাদে এটি দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিষয়ের সহজবোধ্যতা, ঘটনার সরলীকরণ রসমাধুর্য, গীতিমধুর ভাবানুষঙ্গ, কাব্যিক ঐকতান, চরিত্রের অনাবিল স্নিগ্ধরূপ, নাটকীয় ব্যঞ্জনা– ইত্যাকার ভাবসম্পদে ডাকঘর নাটকটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অভিনয়সাফল্যে এটি দর্শক-সাধারণনন্দিত অনুরাগে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। কাহিনি বর্ণনায় শৈশবের অনাবিল রূপমাধুর্যের প্রতিচ্ছবি কেবলই উঁকি দিয়ে যায়। যা সার্বজনীন মানবহৃদয়ের স্নিগ্ধ শুভ্রতায় অভিষিক্ত হয়েছে। মানুষের ক্রমপরিণত বিস্মরণ বিচ্ছিন্নতায় শৈশবের সুকুমার সুখস্মৃতি এই নাটকের মাধ্যমে কথা কয়ে ওঠে। মুগ্ধ

ও সুপ্ত মননীশলতার মাধ্যমে মানুষ যেন বারবার নিজেকেই খুঁজে খুঁজে পায়। এতসব বৈশিষ্ট্যবিস্তারে 'ডাকঘর' রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে একটা সবিশেষ আসন তৈরি করে নেয়।

'ডাকঘর' নাটকের প্রধান চরিত্র রুগ্ন, শান্ত, অসহায়, বালক অমল। সে কেবলই বন্দি অবস্থায় রাজ্যের সব রঙিন কল্পনায় নিমগ্ন হয়ে থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের নানা আয়োজন ও প্রকৃতিবিশ্ব অমলকে সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে এতে দর্শক ও পাঠকসাধারণ যেন আত্মপ্রতিকৃতির অবয়ব দেখতে পায়। অমলের সুখদুঃখ আপন করে সবই এক সহজাত অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। বালক অমলের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, অপ্রাপ্তি- হতাশা ও করুণমধুর ট্র্যাজিক পরিণতি সবই এক সর্বজনীন অনুভববেদ্য চেতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। যা দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে ফলে একটা বিশ্বজনীন চেতনার শিল্পময় সংস্থিতিই 'ডাকঘর' নাটকের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে "গীতাঞ্জলির যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গীতাঞ্জলির মতই এ দেশীয় সমাজ অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্যে পাঠকসমাজেই অধিক প্রীতিকর। প্রায় প্রত্যেক ইউরোপীয় ভাষায়ই অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়েছে। এবং আশাতীত সমাদর লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন নাটক পাশ্চাত্ত্যে সমাজে এত সমাদর লাভ করেনি।"[১৯]

'ডাকঘর' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের খেয়া-গীতিমাল্য-গীতালি-চৈতালি (কাব্য), 'ধর্মের অধিকার' (প্রবন্ধ) 'জীবনস্মৃতি' (আত্মকথা) ও 'ছিন্নপত্র' (শিলাইদহ) রচনাকালীন পর্বে লিখিত হয়েছে। এ সব রচনার অন্তর্গত রূপপ্রকৃতির সাথে 'ডাকঘর' নাটকের অনুভবসাধর্ম লক্ষণীয়। পরমাত্মার আনন্দ-অংশ থেকে সৃষ্ট জীবাত্মাসমূহ বিশ্বসৌন্দর্যের মাধ্যমে পরমাত্মার কাছে প্রত্যাবর্তন– রবীন্দ্রদর্শনের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। 'ডাকঘর' রচনাকালীন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সৃষ্টিতে অনুরূপ ভাবপ্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। 'ডাকঘর' নাটকেও এই তত্ত্বদর্শনের একটা নান্দনিক বোধবোধি ফুটে ওঠেছে। এই নাটকে বালক অমলের অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা, অনির্দেশ্য সুদূরের প্রতি আকর্ষণ, বিশ্বসৌন্দর্যের বৈচিত্র্যবিভায় আসক্তি, রাজার চিঠির জন্য ডাকঘরের প্রতি প্রতীক্ষা– পরিণামে করুণমধুর পরিসমাপ্তিতে মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণই ডাকঘর নাটকের কাহিনি হিসেবে গৃহীত।

'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটক রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবভাবনার আবেদন নিয়ে রচিত। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তবে সবসময় এমনকি জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত প্রবলভাবে রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। তবে কস্মিনকালেও তিনি রাজনীতির নেতৃত্ব-মোহে অভিলাষী ছিলেন না। দেশে বিদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহই [illegible] নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে যায়। এবং এ-সম্পর্কিত নানামুখী–ভাবনা প্রতিক্রিয়া তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে তুলে ধরেন। বিশ্বমানবতার সমুন্নত আদর্শ-অভিপ্রায় যেখানে পদদলিত করা হয়েছে– সেখানেই তিনি তাঁর উচ্চকিত সৃজনশক্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন। তবে তা ছিল অত্যন্ত শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত ভাষায় দীপ্যমান। এ ক্ষেত্রে তিনি কোনোপ্রকার সাম্প্রদায়িক বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির হীন স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হন নি। শুধুমাত্র মানবিক ঔদার্যের সপক্ষে বিশ্ববিবেকের সত্যশিখা জ্বালিয়ে তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে কখনো তিনি আপোসরক্ষায় সহজ পথের পথিক নন। "চিরদিন সোজা সরল ভাষায়ই হোক অথবা ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্য দিয়েই হোক তিনি দেশের ও দশের স্বার্থ যেখানে বিপন্ন, যেখানে অবিচার, যেখানে ভুল তার আলোচনা সমালোচনা করেছেন, নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং এ কাজে তা যতই অপ্রীতিকর হোক বিদেশী শাসক সম্প্রদায় ও দেশী নেতা কারোকে রেহাই দেননি।"[২০] নাটক স্বভাবতই প্রত্যক্ষ জীবন সংঘাত ও মননশীল দ্বন্দ্ব-দীর্ণ আবহ নিয়ে রচিত হয়। বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রত্যক্ষ উপস্থাপনায় নাটক দর্শকসাধারণের মাধ্যমে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। 'মুক্তধারা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জীবনবাস্তবতার এক রাজনৈতিক পটভূমি তুলে ধরেন।

'মুক্তধারা' নাটকে দেখা যায়, উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ শিবতরাইবাসীদের পদানত করে রাখার জন্য নানারকম হীনকৌশল অবলম্বন করে। শাসন-শোষণ, অতিরিক্ত কর-প্রদানে বাধ্য করা, মুক্তধারা জলস্রোতের উপর বাঁধ নির্মাণ– সবই প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য। এ সবই মূলত সমকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠির প্রতিফলিত রূপ। একদিকে রাজার নানারকম কূটকৌশল অন্যদিকে শিবতরাইবাসীদের জীবনে দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, কর-বন্ধ আন্দোলন, হাহাকার, অনাহার লেগেই আছে। এ সব ঘটনার আড়ালে পররাজ্যলোভী ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্গত সত্যস্বরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব অন্যদিকে হতভাগা শিবতরাইবাসী শোষিত বঞ্চিত ভারতীয়দের সকরুণ জীবনভাষ্যরূপে প্রতিফলিত। এসব সমস্যার

সমাধানে রবীন্দ্রনাথ কোনো সশস্ত্র বিপ্লব বা সমাধানে বিশ্বাসী নন। মুক্তধারা' নাটকে নায়ক অভিজিতের প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে সেখানে মনুষ্যত্বের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়। এবং যা নাটকটির পরিণামী দিকনির্দেশক হিসেবে পরিকল্পিত।

মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রাণপ্রবাহের প্রতীক মুক্তধারাকে রাজা বন্দি করেছে। যা মানবিক প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দবোধের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায়। যন্ত্ররাজ বিভূতির এই কীর্তিতে সবাই আত্মপ্রসাদজনিত অহংবোধে তৃপ্ত। যান্ত্রিক সভ্যতার এই নির্মম বলয়বৃত্তে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাতে হবে। যা যন্ত্র বা সশস্ত্র আঘাতের মাধ্যমে কখনো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র প্রাণের মহান উৎসর্গই যান্ত্রিক সভ্যতাকে বিচলিত করতে পারে। এবং সেখানকার সুপ্ত মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত চেতনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। 'মুক্তধারা' নাটক রচনার মূলে রবীন্দ্রনাথের মনে এরকম একটি মননশীল ভাববোধ ক্রিয়াশীল রয়েছে।

কালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' সম্পর্কে বলেন, "... প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙ্গেছে যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে– কেননা যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে– তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। ... প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে।"[২১]

'রক্তকরবী' (১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের বহুল-মঞ্চায়িত দর্শক-শ্রোতা-নন্দিত জনপ্রিয় একটি সাংকেতিক নাটক। ঘটনা-সংস্থান, নাটকীয় চমৎকারিত্ব, মননশীল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমকাল-সমবায় ও আবহ-অনুষঙ্গ সৃষ্টির কারণে নাটকটি বহুজনগ্রাহ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। মানুষের স্বতঃউৎসারিত প্রকৃতির কাছে চির নন্দিত ও বন্দিত যৌবনের জয়গান রক্তকরবীর প্রতিপাদ্য বিষয়। পাশাপাশি সমকালীন সমাজের পুঁজিসর্বস্ব অর্থলোলুপ মানবাত্মার স্বরূপ-প্রকৃতি চমৎকার বাগভঙ্গিমায় বর্ণিত হয়েছে। ফলে একটা নাগরিক আবহ-আমেজ নাটকটির পুরোভাগে ছড়িয়ে রয়েছে। নাটকীয় উপকরণ-উপাদান শমীবৃক্ষের ন্যায় অন্তর্গত দাহ্য দহনে একটা দুর্নিবার প্রাণপ্রবাহে দানা বেঁধে ওঠেছে। যাতে সমকালীন যুগকে ধারণ করে যুগন্ধর শিল্পমহিমায় অভিষিক্ত হয়েছে। তবুও সত্য-নিত্য চিরায়ত মনুষ্যপ্রাণের দীপ্তশিখা নাটকের শেষ পর্যন্ত জেগে থাকে। সবপ্রকার সীমায়তি অস্বীকার করেও অনির্বাণ মানবাত্মার বহ্নিশিখা অস্তিত্ব ঘোষণা করে থাকে। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা রক্তকরবীর আবেদন ক্ষুণ্ন করতে পারে নি। প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত চিরযৌবনের প্রতিভূ নন্দিনী ও রঞ্জনকে নাটকে পরিণামী-নির্দেশক হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অর্থগৃধ্নু পাশবিক লুব্ধতাকে মানবিক মহিমায় অভিষিক্ত করে একটা চিরন্তন মাধুর্য আরোপ করা হয়। ফলে অন্যসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও 'রক্তকরবী' শিল্পসুষমার অনন্য আবেদনে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ইউরোপ-আমেরিকার অন্তর্গত মনন মনস্বিতার দ্বারা 'রক্তকরবী' নাটক গঠিত। এ সময়ে কবি ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহ ভ্রমণ করতে থাকেন। এবং সেখানকার উগ্র জাতীয়তা, লুব্ধ আগ্রাসী নীতি অর্থলোলুপ ব্যক্তিপ্রসার, ধ্বংসাত্মক দমননীতি ও মানবসমাজের অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে আঁৎকে ওঠেন। সেখানে ধনৈশ্বর্য সংগ্রহের উন্মত্ত-অন্ধ নেশায় মানুষ যন্ত্রবৎ জীবনের পূজারি। অথচ মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিন্দুবিসর্গ মূল্য নেই। সব রকমের মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের শৈথিল্য দেখা দেয়। বিত্তসর্বস্ব অর্থগৃধ্নু মানবাত্মা নিঃসঙ্গ-নির্মম শেকলে বন্দি। সারাক্ষণ হাহাকার আর্তচিৎকারের পরেও প্রাণকণিকার সন্ধান মেলে না। 'রক্তকরবী' নাটকেও অনুরূপ একটা আবহ আখ্যান চিত্রিত হয়ে ওঠে। 'রক্তকরবী' নাটকে বর্ণিত রাজার রাজত্বে প্রজাসাধারণ দিনরাত যন্ত্রের মতো কাজ করে। রাজার অলঙ্ঘনীয় আদেশ ও বিধিবিধানের বাইরে কোনো জীবন নেই। প্রাণপাত পরিশ্রমের মাধ্যমে পৃথিবী খোদাই করে তাল তাল স্বর্ণ আহরণ করাই একমাত্র কাজ। দিনরাত শুধু এরই পোষকতা- প্রয়োজন ছাড়া জীবনের অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই। মানবিক ও মনুষ্যত্ববোধের ইচ্ছেগুলো এখানে মকররাজের খেয়ালের কাছে গুমরে গুমরে কাঁদে। এমনকি এখানকার প্রজাসাধারণও গাণিতিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। যেমন, ৭১ট, ৬৯ঙ, ৪৭ফ ইত্যাদি। তাছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন বাসস্থান সংখ্যার সাহায্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। "গোঁসাই। বাবা, দন্ত-ন পাড়া যদিও এখনো নড়নড় করছে মূর্ধন্যণ-রা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে।"[২২]

'রক্তকরবী' নাটক রচনাকালীন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর উৎকট চেহারা প্রত্যক্ষ করেন। এদের আত্মপ্রসারের অমানবিক পাশবিক দমননীতি মানুষের সব শুভবোধ দারুণভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। জড়িমাগ্রস্ত যন্ত্র-জিঘাংসা মানুষের নান্দনিক মনন সৃজনকে শঙ্কিত করে তোলে। 'রক্তকরবী' নাটকে এ অবস্থারই শিল্পময় অভিব্যক্তি

প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই নাটকে ব্যবহৃত গাণিতিক সংখ্যাকে রবীন্দ্রনাথ অসুরিক শক্তির দুর্বহ গ্লানি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। "এ দেশে (আমেরিকার) এখন আমি বৃহদায়তন দুর্গকারায় বাস করছি। ... এখানে প্রতিদিন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারছি, সংখ্যাদৈত্যের এই বোঝা বয়ে বেড়ানো মানবাত্মার পক্ষে কি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো। এই দৈত্যটা অনবরতই মানুষকে ছুটে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে না।"[২৩]

'ফাল্গুনী' (১৯১৫) নাটকে প্রথাগত নাট্য-সংঘটন অনুপস্থিত। এর কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, ভাবদ্বন্দ্ব, পরিবেশ ও পরিণতি নাটকের শাস্ত্র-সূত্র মেনে চলে নি। প্রায় সবই একটা তত্ত্ববাহি একমুখি উদ্দেশ্য প্রবাহে ভেসে চলেছে। কাহিনি ও অন্যান্য অনুষঙ্গ এরই অনুসারী হয়ে রূপাভিব্যক্তি লাভ করে। নির্মোহ-নিস্পৃহ আবেশের শিল্পময় অভিব্যঞ্জনা প্রায় নেই বললেই চলে। বস্তুনিষ্ঠ মননধর্মিতায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সার্থক নাটকের ভিত্তিভূমি তৈরি করে থাকে। যা ফাল্গুনী' নাটকে খুব একটা পরিদৃষ্ট নয়। অথচ উদ্দেশ্যমূলক আত্মবশ-অনন্বয় নাটকটির শিল্পসৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নাটকে ইক্ষাকুবংশীয় রাজার আদেশে কবিশেখর 'ফাল্গুনী' পালা রচনা করেন। এর মাধ্যমে রাজার বার্ধক্য-জ্বরা-মৃত্যু- সম্পর্কিত একটা সমাধান ব্যক্ত করা হয়। অনাদি-অনন্ত জীবনস্রোতে এই খণ্ডিত-পার্থিব জীবনকে অন্বিত করাই কবির মূল উদ্দেশ্য। পাকাচুল দেখে ভীতসন্ত্রস্ত রাজা একটা সমাধানের উপায় খুঁজে পান।

জন্মমৃত্যু পেরিয়ে একটা অখণ্ড জীবনস্রোত নিরন্তর বয়ে চলেছে। সেখানে চিরন্তন যৌবনস্রোতে মানুষের সব দৈন্য-পীড়া, খণ্ড-ক্ষুদ্র, পার্থিব-সীমায়িত জীবনকে গ্রহণ করে নেয়। এতে আদিকালের জীবনস্রোতে মানুষের অবিরাম ছুটে চলার তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ গতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মৃত্যু কখনো জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। জীবন ও মৃত্যু অনাদিকালের জীবনস্রোতে বিভিন্ন অবস্থার পর্যায়ক্রমিক রূপ-রূপান্তর মাত্র।

> "রাহুর মতন মৃত্যু
> শুধু ফেলে ছায়া
> পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত।"[২৪]

মানুষ অমৃতের সন্তান হিসেবে পরিগণিত। জন্ম-মৃত্যু কখনো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং তা মহাকালের অভিযাত্রায় কতিপয় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এরকম একটা দর্শনদীপ্ত প্রত্যয়-প্রকাশ ইক্ষাকুবংশীয় রাজার সামনে তুলে ধরা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে- মৃত্যুভয়ে ভীত রাজার বৈরাগ্য ভাবনাকে চিরায়ত যৌবনের সাথে অন্বিষ্ট করা। মৃত্যু সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ জীবনানুভব সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। "মৃত্যুকে যখন শুধু সংহাররূপে দেখি তখন আমাদের সে মিথ্যাদৃষ্টি কেননা সে দৃষ্টিতে মহাকালের খণ্ড রূপটুকুই গোচর হয়। আর যখন মৃত্যুকে দেখি নূতন জীবনের ধাত্রীরূপে তখন আমাদের দৃষ্টি কালের পটে নির্মুক্ত। ফাল্গুনীতে আদ্যিকালের বুড়োর (অর্থাৎ শীতের জড়তার ও জরার জীর্ণতার) রূপকে এই ইঙ্গিতই নিহিত। মানবজীবনের আরম্ভ জন্মে নয়, অবসানও মৃত্যুতে নয়।"[২৫]

'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' নাটিকা দু'টো কালের যাত্রা' (১৯৩২) শিরোনামাযুক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়। এসব নাটকের অন্তর্গত ভাবসত্য এবং উদ্দেশ্য-আদর্শ মূলত একই। প্রতীকী কিছু ব্যঞ্জনা বিস্তারের মাধ্যমে নাটকীয় গূঢ়তত্ত্ব মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রচলিত নাট্য বিবেচনায় একটির মধ্যেও অনুরূপ উপাদান নেই। শুধুমাত্র একটা ক্ষীণ-কাহিনিসূত্র অবলম্বন করে কিছু উপদেশ তত্ত্বাকারে বিবৃত। চরিত্রগুলো এরই কৃত্রিম কায়ারূপে ভারিক্কি চালে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞাজনোচিত প্রতিনিধিরূপে এসব চরিত্র প্রতিমুহূর্তে ভারগ্রস্ত। সেখানে শিল্পসৌকর্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-প্রণোদনা অনুপস্থিত। শিল্পসৃষ্টির মূল শক্তি চরিত্রসমূহের নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক সংলাপ রচনার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। অথচ নাটক দু'টোতে আপ্তকথার কচকচানি মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। তাছাড়া নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টির কোনো সচেতন প্রয়াস পরিলক্ষিত নয়। অথবা পরিবেশ সৃষ্টিতেও নাট্যকারের কোনো দৃষ্টি নেই। তত্ত্বমূলক ভাবভাবনা প্রদানের জন্যেই এসব অনুষঙ্গ- উপাদান ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এবং শিল্পসৃষ্টি হিসেবে মর্যাদা মহিমা হারিয়ে ফেলে। তবে কিছু শাণিত সংলাপ, তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন চরিত্র ও ব্যঞ্জনাত্মক বক্তব্যে নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নাটকটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচনা করেন। এখানে একটি ছোট কাহিনিতে কিছু রোমান্স রঙিন নাটকীয়ত্ব পরিলক্ষিত হয়। স্বপ্ন কল্পনায় রূপকথার আবহে নাটকীয় পরিণতি এগিয়ে গেছে। নাটকীয় প্লট-সংঘটন বলতে তেমন কিছু নেই। রাজপুত্র-সদাগরপুত্রের বৈচিত্র্য-সন্ধান, সমুদ্র-যাত্রা, জাহাজডুবি ও শেষে

দ্বীপরাজ্য তাসের দেশে আশ্রয় গ্রহণ। এসব কাহিনির মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনুপস্থিত। শুধুমাত্র কাহিনি বর্ণনার প্রতিই অধিকতর ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে চরিত্রগত মননশীলতার স্পর্শ-অনুভব খুব একটা নেই।

'তাসের দেশ' নাটকে ব্যক্তি ও পরিবেশগত অবস্থানের নির্বিশেষ জীবনবৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট নয়। এর ফলে নাটকীয় শিল্প-সৌকর্য' প্রতি মুহূর্তে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তবে নাটকের পরিণতি পর্যায়ে সরস নাটকীয় চমৎকারিত্ব বেশ চোখে পড়ার মতো। পরিশেষে তাসজাতীয় প্রাণিগুলোর মধ্যে জীবনস্পন্দন অনুভূত হলেও তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। মনে হয় পূর্বপরিকল্পিত ভাবতত্ত্বের বাহকরূপেই এদের ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট করা আছে। এ অবস্থায় 'তাসের দেশ' নাটকটি শিল্পসৃষ্টির সুষমা সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ঋতু প্রকৃতিকে মানবমনে অন্বিষ্ট ও প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এরই ধারাবাহিক অংশের কোনো এক সময়ে তিনি ঋতুনাট্যসমূহ রচনা করেন। আদি-অনাদিকাল ধরেই মানুষ ও নিসর্গ-প্রকৃতি অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তার বন্ধনে বিজড়িত। একটি বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয়। প্রকৃতিপ্রাণ কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এরকম একটা জীবনানুভূতি লালন করেন। এবং তিনি নিজেও জন্মমুহূর্ত থেকেই প্রকৃতিনিষ্ঠ সমবায়-সামীপ্য উপলব্ধি করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষ জন্ম-জন্মান্তরের চিরায়ত সম্পর্কে সম্পর্কিত। "... এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। ... আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন– তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম।"[২৬] রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিনির্ভর অনুপ্রাণনা তাঁর যাবতীয় সৃজনকর্মে লক্ষণীয়। বিশেষত, ঋতুনাট্যগুলো এরই প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রয়াসে রচিত। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের ভাবনাচিন্তা-শিক্ষাভাবনাও প্রকৃতি-নির্ভর ছিল। তিনি শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি-সান্নিধ্যে শিক্ষা দিবার একটা উপযোগী পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। এ শিক্ষার অন্যতম অংশ ছিল ঋতু উৎসব। এ ছাড়া বৃক্ষরোপণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব, বাগান পরিচর্যা, চাষাবাদ পদ্ধতি– ইত্যাদি কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতিলগ্ন করে গড়ে তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এবং এর মাধ্যমে ঔদার্য আদর্শের চেতনায় মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করা হতো। যা ছিল রবীন্দ্র শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা। শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও প্রকৃতিকে একাসনে বসিয়ে মানুষ হওয়ার মন্ত্র উচ্চারণই ছিল এই শিক্ষার অন্তর্নিহিত সত্য। "আমি যখন এই শান্তি নিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চার দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে।"[২৭] রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিপ্রাণ প্রয়াস-প্রবৃত্তি তাঁর পুরো অস্তিত্ব জুড়ে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ সূত্রে তাঁর যাবতীয় সৃজনকর্মের মূলেও অনুরূপ ভাবভঙ্গিমা প্রাণ সঞ্চার করেছে। এ পর্যায়ে রবীন্দ্ররচিত ঋতুনাট্যগুলোতে প্রকৃতি পরিবেশের প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলো বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রম ও স্বকীয়-স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। এসব নাটকের উপস্থাপনারীতিতে সংস্কৃত নাট্য-বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অন্য কোনো প্রচলিত নাট্যনির্দেশনা অনুসৃত হয় নি। তবে রবীন্দ্রস্বভাবের সহজাত কাব্যিক ব্যঞ্জনা প্রতিটি নাটকে প্রাণরস সঞ্চার করেছে। ভাবলোকের সুদূরপ্রসারী স্বরগ্রামের গীতমাধুর্য এসব নাটকের মধ্যে একটা সম্মোহভাবনা তৈরি করে দেয়। যাতে পাঠকসাধারণ প্রকৃতিলগ্ন ভাবতন্ময়তার মাধ্যমে নিজেকে পরিসিক্ত করার সুযোগ পায়। এবং আত্মিক শুদ্ধতার মাধ্যমে সমুন্নত মানুষরূপে গড়ে ওঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলোর বক্তব্যবিষয় মূলত সংগীতনির্ভর ভাবতন্ময়তার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং সংগীতের পাশাপাশি নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা তা অভিব্যঞ্জনা লাভ করে। নৃত্যের বর্ণভঙ্গিম আবেদন ও রসমাধুর্য বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সংগীতের অতীন্দ্রিয় ছন্দবোধ, প্রকৃতির নিঃসীম গূঢ়লোক এবং নৃত্যের সৌষম্যবোধ দর্শক-শ্রোতা-শিক্ষার্থী সাধারণের

মনকে একটা মানবিক ঔদার্যে উন্নীত করে দেয়। বিশেষত ঋতুপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এসব নাটক অন্যান্য সবাইকে প্রতিমুহূর্তে আবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম।

“এই ঋতুনাট্যগুলিতে একজন ভাবব্যাখ্যাতা আছে, তা ছাড়া অন্যান্য রসজ্ঞ দর্শকও আছে, তাহাদের সম্মুখে প্রকৃতি-প্রতিনিধিরা সংগীতে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে– বিভিন্ন ঋতু, বাদললক্ষ্মী, শরৎশ্রী, সুন্দর, নদী, বনভূমি, দখিনহাওয়া, বেনুবন, আম্রকুঞ্জ, বকুল, মাধবী, করবী, মালতী প্রভৃতির প্রবেশ ও প্রস্থান আছে– গানে তাহাদের কথা ব্যক্ত হইতেছে।”[২৮] রবীন্দ্রনাথ এসব ঋতুনাট্য জীবনের প্রায় শেষ দশ বছর ধরে রচনা করেন। এ পর্যায়ে তাঁর লিখিত ঋতুনাট্যগুলো হচ্ছে– ‘বসন্ত’ (১৩২৯), ‘শেষবর্ষণ’ (১৩৩২), ‘নবীন’, (১৩৩৭), ‘নটরাজ– ঋতুরঙ্গশালা’ (১৩৩৮) ও ‘শ্রাবণগাথা’ (১৩৪১)।

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ দিয়ে নাটক রচনা শুরু করলেও নৃত্যনাট্য রচনার মাধ্যমে তা পরিসমাপ্তি লাভ করে। এতে রবীন্দ্র শিল্পচর্চায় একটা ঐক্য-পরিণত সুষমাবোধ পরিলক্ষিত হয়। “গীতিনাট্য-রচনার পর থেকে কবি স্বতন্ত্রভাবে কাব্য নাটক সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুশীলন করেছেন সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি একটি আধারে মেলবার জন্যেই এগিয়ে গিয়েছে যেন তাঁর অজ্ঞাতসারে। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কবি বুঝলেন যে, একমাত্র নৃত্যনাট্যই হচ্ছে সেই শিল্পরূপ, যার মধ্যে কথা সুর নৃত্য ও অভিনয়ের ছন্দ মিলতে পারে একটি অবিচ্ছেদ্য একক ছন্দে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চা শেষ পর্যন্ত অবিভাজ্য ছন্দোময়তায় উত্তীর্ণ হল।”[২৯]

নৃত্যনাটকে সাধারণত সুক্ষ্মশরীরী কাহিনিসংস্থান শিল্পময় ভাবব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা হয়। ভারতীয় কলারাজ্যে নৃত্য আদি, অকৃত্রিম ও চিরায়ত ধারায় বহমান। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যের একটা সবিশেষ ভূমিকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। নাট্যসৃষ্টিতে নাচ, গান ও অভিনয়ের অপরিহার্য অবস্থানের কথা স্বীকার্য। কিন্তু বাংলা নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম শিল্পসম্মত নৃত্যনাট্য রচিত হয়। “রবীন্দ্রনাথের পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বাংলা দেশে প্রথম নৃত্যনাট্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি রচনা করার পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের রূপগুলি দেখেছিলেন।”[৩০] সনাতন ভারতবর্ষীয় জীবনে নৃত্য ছিল স্থূল, অসংযত, স্বেচ্ছাচার ভাবের বাহক ও অশ্লীল পালা কথকতায় ব্যবহৃত। আপামর জনসাধারণও নৃত্যকে অনুরূপ ভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম নৃত্যকে নান্দনিক চেতনায় কাব্যিক অবয়ব আবহে উপস্থাপন করেন। তিনি নৃত্যের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব, অতীন্দ্রিয় গীতিমাধুর্য, পরিশীলিত রসধারা, শাণিত সংলাপ ও শৈল্পিক রুচিবোধ আরোপ করেন। এবং নাটকীয় কাহিনীর রূপাভিব্যক্তি দ্বারা নৃত্যকে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পন্ন করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম পর্বে আদিগন্ত জীবনের অতলস্পর্শ গূঢ় ভাবনা ও দার্শনিক ভাবসমবায় এসব নৃত্যনাট্যে তুলে ধরেন। শান্তিনিকেতনে নৃত্যবিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য এসব নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু বিষয় ভাবনার কারণে এসব নৃত্যনাট্য দেশ-কাল-নিরপেক্ষ একটা সার্বজনীন রূপরেখায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ফলে বাংলা ভাষাভাষী ছাড়া অন্যান্য জাতির মধ্যে নৃত্যনাট্যগুলো ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এবং বিপুল জনপ্রিয়তার মাধ্যমে মঞ্চসাফল্য লাভ করে। এ ক্ষেত্রে নৃত্যের রূপময় ভঙ্গিমায় প্রত্যক্ষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে নাট্যরস গৃহীত হয়ে থাকে। সেখানে ভাষাগত সমস্যা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত নৃত্যনাট্যসমূহ হচ্ছে– ‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’, (১৯৩৬), ‘নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮), ‘শ্যামা’ (১৯৩৯), ‘নটীর পূজা’ (১৯২৬) ও ‘শাপমোচন।”

সমাজসংলগ্ন অবস্থিতি-অন্বয় ছাড়া কোনো সাহিত্য সৃষ্টিই টিকে থাকতে পারে না। আশ্চর্যরূপে সমাজ-সচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিভিন্ন রচনায় সমাজসত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাব্যিক আবহের একটা রহস্যময় রসমাধুর্য ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তবে কখনো কখনো নির্মম বাস্তবতার সমূহ সমাজ সংঘাত তাঁকে প্রচণ্ডভাবে তাড়িত করেছে। এ পর্যায়ে কিছু নাট্যসৃষ্টিতেও তিনি সবিশেষ সাফল্যের দাবিদার হতে পারেন। সামালোচকগণ এসব নাটককে সামাজিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৩১৬), ‘গৃহপ্রবেশ’ (১৩৩৩), ‘শোধবোধ’ (১৩৩৩), ‘নটীর পূজা’ (১৩৩৩), ‘চণ্ডালিকা’ (১৩৪০) ‘বাঁশরী’ (১৩৪০), ও মুক্তির উপায় (১৩৪৫)।

বাংলা সাহিত্যে প্রহসন রচনার একটা প্রাণবন্ত প্রবাহ রবীন্দ্রপূর্ব যুগেও অব্যাহত ছিল। এর মধ্যে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) প্রথম সার্থক প্রহসন রচয়িতা হিসেবে প্রশংসার দাবিদার। তাঁর ‘একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন দু’টো এ ধারায় সবিশেষ সংযোজন হিসেবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়াও অনেক প্রথিতযশা লেখক প্রহসন রচনায় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নাট্যসৃষ্টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে রচিত। বিশেষ গোষ্ঠিবদ্ধ প্রয়োজন-প্রতিভূ অথবা সামাজিক নকশারূপেই এসব প্রহসন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সেখানে শিল্পসৃষ্টির সার্বজনীন আবেদন অনেকক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। অনেক সময় এসব প্রহসন বিদ্বেষপ্রসূত ভাবাবেগের একচোখা প্রবণতার বাহকরূপে রচিত হয়েছে। যা অনেকসময়ই নিস্প্রাণ জড়পুত্তলিকারূপে পাঠকসাধারণের বিরক্ত উৎপাদন করে। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক চেতনার শিল্প-সংরাগ উপলব্ধিতে প্রহসন রচনা করেন। "রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপহীন, স্বচ্ছ, অনাবিল,হাস্যরসের প্রবর্তক।"[৩১] এসব প্রহসন উদার নির্মল ও অসাম্প্রদায়িক বৃহতের ভাবনায় উজ্জ্বল। এবং নিটোল হাস্যরসের প্রভায় সবাইকে সমানভাবে কাছে টানতে সক্ষম। কোনোরকম হীন-উদ্দেশ্য নয় বরং শিল্পসৌকর্যের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সৃষ্টিই ছিল মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ সবসময় অন্তর্গত ভাবভাবনার দর্শনদীপ্ত চেতনার সুদক্ষ রূপকার ছিলেন। হৃদয়গত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার। এবং এ ব্যাপারে তিনি বরাবরই স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। এ সুবাদেই তিনি কাব্যিক রসবোধের ছন্দায়িত লীলাবিলাস ফুটিয়ে তোলেন, যা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রতিম গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এরকম প্রতিভা বরাবরই প্রহসন রচনায় বিঘ্নস্বরূপ হিসেবে দেখা দিয়ে থাকে। কারণ প্রহসন সাধারণত মস্তিস্কপ্রসূত বুদ্ধির চাতুরি দ্বারা নির্মিত। সেখানে চটুল রসস্রোতের ঠুনকো প্রবাহে কাহিনি-চরিত্র ভেসে চলে। রবীন্দ্রনাথ প্রহসনের অনুরূপ চারিত্র্যধর্ম ফুটিয়ে তুলতেও সমানভাবে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এবং আশ্চর্যরূপে সাফল্য সম্ভাবনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এ পর্যায়ে তিনি প্রহসনকে জীবনের গভীর জীবনবোধ থেকে সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। এবং যা কর্মপ্রবণ জীবনের চলমান স্রোতসাগরে উপাদেয় উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বর্ণবহুল জীবনের পরিক্রমায় প্রহসন সতত সহচররূপেই পরিগণিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসন রচনায় পরিশীলিত রুচিবোধ, মার্জিত শব্দচয়ন, তীক্ষ্ণ পারদর্শিতা, অপূর্ব বাগবৈদগ্ধ্য বা Wit, নির্মল Humour;' আশ্চর্য সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। যা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের প্রহসনগুলোতে খুব একটা পরিদৃষ্ট নয়। "রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের প্রধান গুণ-ইহার সুতীক্ষ্ণ সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জনাময় সংলাপ। ইহা অপরূপ আলো-অন্ধকারময়, শত ঝঙ্কার মুখরিত অভিনয়-আসরের ন্যায় আমাদিগকে আবিষ্ট, বিভ্রান্ত করিয়া রাখে, ক্ষণে ক্ষণে অচিন্তনীয় অভাবনীয় শব্দের অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ চমৎকৃত করিয়া তোলে, কিন্তু এই অভিনয়ে বেরসিক ও অর্বাচীনের প্রবেশাধিকার নাই।"[৩২] প্রহসন রচনায় সাধারণত কাহিনি-সংঘটন মুখ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। চরিত্র ও অন্যান্য অনুষঙ্গ এর পোষকতা করে মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্র প্রহসনে কাহিনির অকিঞ্চিৎকরতা লক্ষণীয়। সেখানে ব্যঞ্জনাত্মক শব্দ ও অপূর্ব বাকশিল্প মিলনমধুর পরিসমাপ্তিতে গীতরাগ সঞ্চার করে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্ররচিত 'চিরকুমার সভা' প্রহসনের কথা উল্লেখ করা যায়। "চিরকুমার সভার হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে এর অপূর্ব বাগ-বৈদগ্ধ্য দ্বারা, ঘটনা-সংস্থাপনা দ্বারা নয়।"[৩৩] এ পর্যায়ে তাঁর রচিত প্রহসনগুলো হচ্ছে–

'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯), 'বৈকুণ্ঠের খাতা (১৩০২), ও 'চিরকুমার সভা', নাটক; ১৩৩২)।

–০–

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, প্রথম প্রকাশ– ১৯৬৫, দ্বিতীয় প্রকাশ– ১৯৮৪, কলিকাতা, পৃ: ২১
২. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৮৩
৩. রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, দ্বিতীয় প্রকাশ– ১৯৮৪, কলিকাতা, পৃ: ১০২
৪. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৪৮৩
৫. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪১৫
৬. ঐ, পৃ: ৪৩৭
৭. ঐ, পৃ: ৫৯৮
৮. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৫০০
৯. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গীতাঞ্জলি, ৩৮–সংখ্যক কবিতা, পৃ: ৩৩
১০. ঐ, পৃ: ১৮৬
১১. ছিন্ন পত্র, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ- ১৪১১, কলকাতা, পত্র নং- ৩৫, পৃ: ৮৯
১২. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৫১১
১৩. ঐ, পৃ: ৫১১
১৪. ভানুসিংহের পদাবলীতে প্রকাশিত চিঠি, ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯ শারদোৎসব গ্রন্থ পরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃ: ৯৭
১৫. গ্রন্থ পরিচয়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৯
১৬. গ্রন্থ পরিচয়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯০
১৭. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, অচলায়তন, পৃ: ৩১৬
১৮. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, অচলায়তন, পৃ: ৩১৬
১৯. রবীন্দ্র-নাট্য ধারা, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৩, কলিকাতা, পৃ: ৩৩৭
২০. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র, ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃ: দশ, প্রসঙ্গ কথা– শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন (শাস্ত্রী) থেকে উদ্ধৃত।
২১. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ: ৭৪৩ থেকে উদ্ধৃত।
২২. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রক্তকরবী, পৃ: ৩৬৮
২৩. মলিনা রায় অনূদিত, রবীন্দ্র এণ্ড্রুজ পত্রাবলী, বি-ভা, কলি-১৯৬৭, পৃ: ৫৯। কবির নিউইয়র্ক থেকে লেখা ১৩.১২.১৯২০ ইং তারিখের পত্রাংশ।
২৪. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শেষলেখা, পৃ: ১১৫
২৫. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চম সংস্করণ- ১৯৮১, কলকাতা, পৃ: ২১২
২৬. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৪৫
২৭. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ: ২৬৫
২৮. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ়- ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ৪০২
২৯. রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৬৫, কলিকাতা, পৃ: ১৩-১৪
৩০. রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, পৃ: ১২৫ থেকে উদ্ধৃত প্রথম প্রকাশ কবিপক্ষ ১৩৭৯, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ- ১৩৮৪, কলিকাতা।
৩১. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ৩৮৮
৩২. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ২৯৯
৩৩. রবীন্দ্র-নাট্যধারা, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ- ১৩৭৩, কলিকাতা, পৃ: ২৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি

'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) নাটকে জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের রাজ্যরক্ষার কাহিনী মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। এই রাজ্যে বিদেশি কাশ্মীরী কর্মচারীদের অত্যাচার ও প্রজা নির্যাতনের চিত্র এবং এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নাট্যসংঘটন নিষ্পন্ন হয়েছে। এবং এর ফলেই নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত উৎকর্ষ লাভ করার সুযোগ পায়। পরিণামে মোহান্ধ রাজা বিক্রমদেবের যুদ্ধ যাত্রা, রানী সুমিত্রার প্রজাপ্রীতি ও গৃহত্যাগ, কুমারসেন-ইলার প্রণয়দর্শনে রাজার মোহমুক্তি, কুমারসেনের আত্মহত্যা ও সুমিত্রার মূর্ছাপতন সবই বিদেশি কাশ্মীরীদের অত্যাচারের ফলেই সংঘটিত হয়েছে। মূলত এর মধ্য দিয়েই রাজা ও রানী নাটকের প্লট সংস্থাপন ও প্রবাহ পরিণতি সম্ভব হয়ে ওঠে। এই বিদেশিদের অত্যাচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' নাটকে বলেন,

> "... যত বিদেশী কাশ্মীরী
> দেশ জুড়ে বসিয়াছে। রাজার প্রতাপ
> ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
> বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ-সম।
> বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
> কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভা মাঝে
> মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
> বসে বসে হাসে। শূন্য সিংহাসন-পার্শ্বে
> বিদীর্ণ হৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে।"(১)

জালন্ধররাজ্যের এই বিপর্যস্ত দৈন্য দশা দেখে সাম্রাজ্যবাদের শিকার পরাধীন ভারতবর্ষের চিত্রই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতকের শেষার্ধে সমগ্র ভারত জুড়ে বিদেশি ইংরেজদের শাসন-শোষণ ও লুটপাটের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করা যেতে পারে। অন্যদিকে পাশাপাশি বাঙালি জীবনে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার নিরন্তর প্রয়াস-প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে। এই উভয়বিধ রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতার দৃশ্যপট 'রাজা ও রানী' নাটকের সুবিশাল ক্যানভাসে খুব সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। এই নাটক রচনাকালীন পর্বে পুরো ভারত জুড়ে বিদেশি ইংরেজ শাসকদের রাজ্য বিস্তার, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, শাসন-শোষণ ও সাম্রাজ্যিক বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে বাঙালি জীবনে চৈতন্যোদয় সম্ভব হয়ে ওঠে। "ব্রিটিশ বিজয়ের পর কোম্পানী সরকারের সাম্রাজ্য-বিস্তার, বাণিজ্য প্রসার প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শেতাঙ্গ কর্মচারী ও ফড়িয়া-মুৎসুবিদগণের অবাধ শোষণ এবং অরাজক পদ্ধতির ভাগ্যোন্নয়ন-প্রয়াস চলেছে পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী। শাসক গোষ্ঠীর নির্যাতন ও নানারূপ ভাঙা-গড়ার মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কিছু সংখ্যক বাঙালির মধ্যে লক্ষ্য করা গেল আত্মজাগরণ-বাসনা। ইয়োরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ও জীবনবোধের স্পর্শে বাঙালির মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয়ের সূচনা প্রত্যক্ষ করা যায়।"(২) ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর এই অত্যাচারে ও বাঙালি জীবনে আত্মবোধ জাগরণের পরিপ্রেক্ষিত নিয়েই 'রাজা ও রানী' নাটকের প্লট পরিকল্পিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি সমালোচক টমসন সাহেবের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি 'রাজা ও রানী' নাটককে রূপক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এবং এই নাটকে ব্রিটিশ-শাসিত অত্যাচারের লুণ্ঠন শোষণের ইঙ্গিত আছে বলে উল্লেখ করা হয়। এমনকি এখানকার বিদেশি কাশ্মীরীদের সাথে ইংরেজ অত্যাচারের সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি পরাধীন ভারতবর্ষে বেড়ে ওঠেন। ব্রিটিশ শাসনের আধিপত্য, বিভিন্ন সংস্কার সাধন, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, লুণ্ঠন-শোষণ, রাজস্ব আদায়ের বেশিরভাগ ইংল্যান্ডে প্রেরণ, রাজকীয় বিলাসব্যসনে অপচয়- ইত্যাকার অরাজক অবস্থায় ভারতীয়দের জীবনে দৈন্য-দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মৃত্যু বিভীষিকা নেমে আসে। ঠিক এরকম একটা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এবং বলতে গেলে তিনি সারাজীবনই অনুরূপ একটা দুর্বহ

রাজনৈতিক গ্লানির মধ্যে বসবাস করেছেন। "রবীন্দ্রনাথের জন্মের তিন বছর আগে ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন আর ভারত স্বাধীন হবার প্রায় সাত বছর আগে কবি স্বয়ং দেহ রক্ষা করেছেন। ইংরেজদের ভারত ত্যাগের সময় যে আসন্ন সে ভবিষ্যদবাণী তিনি করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ দেখে যাবার সৌভাগ্য বা দেশ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়েছে তাই দেখে যাবার দুর্ভাগ্য কোনটাই তাঁর হয়নি।"(৩) অথচ যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলেন। সশরীর উপস্থিতি ও সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে তিনি ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অব্যাহত রাখেন। তাঁর অজস্র গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ জুড়ে এই প্রতিবাদের স্মারক-স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি সভা, সমিতি, সেমিনার, বক্তৃতা, বিবৃতি ও আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমেও এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ জন্মের পরপরই একটা রাজনৈতিক বাত্যা-বিক্ষুব্ধ-সংকুল পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তাঁর জন্মলগ্নে সারা ভারতবর্ষ আন্দোলন-আলোড়ন ও বিক্ষোভ বিদ্রোহে একেবারে উত্তাল। যেমন, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৪), 'সিপাহী বিদ্রোহ' (১৮৫৭), 'নীল হাঙ্গামা' (১৮৫৯), 'নীলদর্পণ প্রকাশ' (১৮৬০), 'হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা' (১৮৬৭), আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বিচারপতি নরম্যান হত্যা (১৮৭১), 'শের আলী কর্তৃক ভাইসরয় মেয়ো হত্যা (১৮৭২) ইত্যাদি। এসব আলোড়িত ঘটনাপ্রবাহ কিশোর রবীন্দ্রনাথকে জন্মাবধি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। এবং ক্রমান্বয়ে এসব পরিপার্শ্বকেই তিনি তাঁর রচনার অনিষ্ট বিষয় হিসেবে বেছে নেন। এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা-সম্বলিত এই পরিপ্রেক্ষিত-ভাবনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। "কবি আবাল্য এ সকলের তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেছেন। .... দেশে শাসক-শাসিতের মধ্যে দিন দিন যে তিক্ততা বেড়ে চলেছে তার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না। কখনো দেশের লোকের উদ্দেশ্যে কখনো এদেশের ইংরেজ-শাসক বা ইংরেজ জাতিকে লক্ষ্য করে তাদের ভুল দেখিয়ে, কর্তব্যের পথের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বহু রচনা করেছেন।"(৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্র রচনার সৃষ্টি ও বিকাশ-সাধন সম্ভব হয়ে ওঠে। এ সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটক এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক সারা পৃথিবীতে নিগ্রহ-নির্যাতন ও লুটপাটের ভয়ংকর নেশায় মেতে ওঠে। এ সময়ে তিনজন বড় লাট যথাক্রমে 'লর্ড ডাফরিন' (১৮৮৪-৮৮), 'লর্ড ল্যান্সডাউন' (১৮৮৮-৯৪) এবং দ্বিতীয় লর্ড এলগিন (১৮৯৪-৯৯) 'সিকিম', 'লুসাই পাহাড় শান', 'মণিপুর', 'গিলগিট', 'আফগানিস্তান' প্রভৃতি রাজ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন করেন। এসব সাম্রাজ্যিক জিঘাংসা প্রবৃত্তি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হন। বলতে গেলে জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ইংরেজদের এসব জঘন্য অত্যাচার ও শাসন দেখে বেড়ে উঠেছেন। ফলে তাঁর বিশ্বছোঁয়া প্রতিভার প্রথম জ্বালাময়ী স্ফূরণ ঘটেছিল ইংরেজ সরকারকে ধিক্কার জানানোর মধ্য দিয়ে। এছাড়া ১৮৮৩ সনে তিনি 'টৌনহলের তামাশা' নামে একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করে সবাইকে বিস্মিত করে দেন। ঐ বছরই ২৯ ডিসেম্বর সরকার প্রস্তাবিত ভূমিসংস্কারের প্রতিবাদে বাংলার বড় বড় জমিদারগণ কলকাতার টাউন হলে মিলিত হন। এ উপলক্ষেই বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ অসমসাহসিকতার সাথে 'টৌনহলের তামাশা' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সাম্রাজ্যবাদের উৎকট আত্মপ্রসার নীতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। সুদীর্ঘ জীবনের বাঁকে বাঁকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিতে তাঁর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। তিনি সুদূর আফ্রিকার জুলুভূমি ও আফগানিস্তানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। বোয়ার বা বক্সার যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীর বর্বরতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই বর্বরতার নগ্ন রূপপ্রকৃতিকে ধিক্কার জানান। রবীন্দ্রনাথ লোয়েস ডিকিনসনের লেখা 'চিনেম্যানের চিঠি'র বক্তব্য উদ্ধার করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন। এবং এ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার কথাও বলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ জাপানি ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ন্যাশনালিজম পুস্তিকা রচনা করেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে শান্তিকামী রোঁলার 'চিন্তার স্বাধীনতা' দলিল এবং মার্কসবাদী বার্বুসের ক্লার্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় ফ্যাসিবাদ- বিরোধী মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। এতে পৃথিবীব্যাপী সশস্ত্র আগ্রাসনের স্বরূপ- প্রকৃতি অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়েছিল। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বিখ্যাত কালান্তর প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এর জন্য তিনি মানবতাবিরোধী জার্মানিকে অভিযুক্ত করেন। এমনকি জাপানে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি কবি ইয়োনে নোগুচি এবং বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে পত্র লেখেন। রবীন্দ্রনাথ স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্গের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী সরকারকে সমর্থন জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্তিম পর্যায়ে ক্রমে বিশ্ব জুড়ে এক সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডবচিত্র অবলোকন করেন । এ সময়ই তিনি সভ্যতার সংকট নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন । শুধুমাত্র আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বব্যাপী এক অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । যেমন, ১৯৩১- ৩২ সালে জাপান বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয় । ১৯৩৩ সালে বিনা বাধায় মুসোলিনী নির্লজ্জের মতো আবিসিনিয়া জবরদখল করে । ১৯৩৭-৩৮ সালে চীনের উপর জাপানি হামলা অনুষ্ঠিত হয় । এসময় জার্মান ফ্যাসিবাদের এক নগ্ন হামলায় বিশ্ববাসী আঁৎকে ওঠে ।

জার্মান পরপর অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডে হামলা শুরু করে দেয় । এবং একের পর এক দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে । এই পর্যায়ক্রমিক সাম্রাজ্যিক আত্মপ্রসারের ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ।

রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ কালব্যাপী সৃজনসাধনায় অজস্র ফ্যাসিবাদবিরোধী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন । রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রিঃ জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন । এবং সেখানকার উগ্র জাতীয়তাবাদ চিন্তাচেতনার আলোকে অজস্র সাহিত্যসৃষ্টি রচিত হয়েছে । এ পর্যায়ে রবীন্দ্ররচিত প্রান্তিক এর ১৭ ও ১৮-সংখ্যক কবিতাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য । কবিতা দুটো ১৯৩৭ সালে রচিত । এতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ- প্রতিধ্বনি লক্ষণীয় মাত্রায় ফুটে ওঠে । জার্মান ফ্যাসিবাদের শিকার অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লাভাকিয়ার দুর্গতির পটভূমিতে তিনি অজস্র সাহিত্যসৃষ্টি রচনা করেন । এবং চেক অধ্যাপক লেসনিকে আবেগদীপ্ত ভাষায় এক পত্রে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন । যা বিশ্বমানবতার জন্য এক অক্ষয় দলিল হিসেবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে । তাছাড়া এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সামাজিকভাবেও ফ্যাসিস্ট- বিরোধী কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেন । যা সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল । যেমন, চীনে জাপানিদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, বোমাবর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণে প্রয়াসী হন । ১৯৩৮ সালের ১০ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে চীন দিবস পালন করেন । এর মধ্য দিয়ে তিনি চীন রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন ।

কবি রবীন্দ্রনাথের স্ফুটনোন্মুখ কাব্য প্রতিভার উষালগ্নে ইংরেজ-অত্যাচার তাঁকে বড় বেশি ব্যথিত করে তোলে । তাঁর সৃজন বেদনার অনুষঙ্গ উপাদান গৃহীত হয়েছিল নিপীড়িত বাঙালির সমাজজীবন থেকেই । মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ করা যায় । ১৮৫৭ সনে তিনি 'চৈত্রা' মেলার নবম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন । এই কবিতায় সাম্রাজ্যিক শক্তির মনুষ্যত্বহীন নির্মম কারাগার রচনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন,

"তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক, আমরা গাব না ।
আমরা গাব না হরষ গান
এস গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান ।"[৫]

দেশীয় সংবাদপত্রের বেলায় 'ভারনুকুলার প্রেস এ্যাক্ট' বলবৎ থাকায় এ কবিতাটি সেসময় প্রকাশিত হয় নি । পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে শুভসিংহের স্বগতোক্তিরূপে কবিতাটি জুড়ে দেন । সেখানে অবশ্য বৃটিশের পরিবর্তে 'মোগল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে । এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্যায়ের বিভিন্ন কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুখোশ উন্মোচন করতে প্রয়াসী হন । যেমন, 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) কাব্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবি রূপক প্রতীকের অভিব্যঞ্জনায় বলেন, 'ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন ।... আঘাতের পর আঘাত কর ।'[৬] তাছাড়া প্রথম যৌবনের কাব্যপ্রয়াস 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)-এর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'দাসত্বের পদধূলি অহংকার করে
মাথায় বহন করে পর প্রত্যাশীরা
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন ।
যে হস্ত ভ্রাতারে তাঁর পরায় শৃঙ্খল
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে ।"[৭]

কবিতাটির মধ্যে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি মেরুদণ্ডহীন বাঙালি চরিত্রের দৃশ্যচিত্র ধরা পড়েছে । রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব ক্রমান্বয়ে বলিষ্ঠ চেতনায় রসস্ফূর্ততা লাভ করে । যা তাঁর অবিরাম সৃজন স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে । ইংরেজ

শোষণের ফলে নিষ্ক্রিয়, অথর্ব, মূঢ়, মুক বাঙালি জাতিকে তিনি বারবার সুতীক্ষ্ণ বাণী ভঙ্গিমায় জাগ্রত করতে প্রয়াসী হন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের মাধ্যমে পরাধীন ভারতের দৈন্যদশা ও নিপীড়িত বাঙালির জড়িমাগ্রস্ত তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই কাব্যের 'বঙ্গভূমির প্রতি', 'বঙ্গবাসীর প্রতি', 'আহ্বান' প্রভৃতি কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এসব সৃষ্টিপরিক্রমায় তিনি সারাজীবনই একটা বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এবং বরাবরই সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ও ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ইংরেজ কর্তৃক নাইট উপাধিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। অন্যদিকে রুশবিপ্লব ও বারবুঁজ প্রেরিত ইশতেহারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 'এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশবাদীদের এবং বস্তুত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানীদের বর্বর অত্যাচারের একটি ঘটনারও উল্লেখ ও প্রতিবাদ করতে কখনও যে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয়নি।"[৮]

উনবিংশ শতকে আধুনিকতার সেই আলোড়িত সময়ে নারী-প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গটি বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত। এটি রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার অন্যতম বিষয় হিসেবেও গৃহীত। কারণ, আবহমানকাল থেকেই বাঙালি নারী ভোগের সামগ্রী, সাজানো পুতুল, অসূর্যস্পর্শা ও পতিসর্বস্ব মানসিকতায় সমর্পিত। এহেন দৈন্যদশার প্রেক্ষাপটেই বাঙালি নারী উনবিংশ শতাব্দীতে আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। এবং নানামুখী সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নারী সমাজ ব্যক্তিত্ব সত্তায় স্বাবলম্বী হওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সময়কার বহুমাত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে নারী জাগরণের সংস্কার আন্দোলনও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। "উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সংস্কারের জোয়ার প্রবাহিত হয়েছিলো। এক্ষেত্রে অন্তত চারটি সংস্কার-আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলো সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন। এসব আন্দোলনে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশই অংশগ্রহণ করেছিলো।"[৯] আর এসব আন্দোলনের মূলীভূত সত্যতা হিসেবে নারীমুক্তির প্রসঙ্গটিই ঘুরেফিরে আসে। 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রা চরিত্রটি উনবিংশ শতকের এই নারীমুক্তি আন্দোলনেরই উজ্জ্বল প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের মাধ্যমে সে সময়কার একটা প্রবাহ-প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে সক্ষম হন।

'রাজা ও রানী' নাটকের প্রথমাংশে সুমিত্রা চরিত্রকে রাজা বিক্রমদেবের ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখানো হয়। বিক্রমদেব মনে করেন কামনার হোমানলে আহুতি দেবার জন্যই নারীর জন্ম হয়েছে–

"কথা দূর করো প্রিয়ে। হেরো সন্ধ্যাবেলা
মৌনপ্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি। তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপর কথা করি বরিষণ?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বারা রাখুক রুধিয়া।"[১০]

কিন্তু সুমিত্রা কখনো এই মোহান্ধ মত্ততায় নিজেকে সমর্পণ করেন নি। বরাবরই ব্যক্তিত্বের স্বকীয় স্বত্ব-আমিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। এবং কামনা বাসনার উর্ধ্বে একটা বৃহত্তর ভাবনায় নিজেকে স্পষ্ট করে তোলেন। রাজ্য জুড়ে প্রজাসাধারণের বিপন্নতায় তাঁর মাতৃহৃদয় হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। এমনকি রানী সুমিত্রা রাজার সংকীর্ণ কামনার মুখে প্রজাহিতৈষণী যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে। পুরুষের বেশে প্রচণ্ড বীরপনায় যাবতীয় বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সুমিত্রা রাজ্য রক্ষার চেতনায় অগ্রসর হতে থাকে। রানী দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

"সুমিত্রা। ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি-সকাতরে
প্রজার আহ্বান। ওরে বৎস, মাতৃহীন
নোস তোরা কেহ, আমি আছি– আমি আছি–
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের।"[১১]

উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অঙ্গন জুড়েই নারী-নিগ্রহ ও নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। এ সময় নারী-লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অনেক সংস্কার পদক্ষেপ গৃহীত হতে থাকে। এসব নারী নির্যাতনের চিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুভঙ্গিম ভাষায় প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময়কার সমাজে কৌলীণ্য প্রথার দুর্বহ গ্লানি অনেক পরিবারকে নিঃশেষিত করে দেয়। এই প্রথার দুর্লঙ্ঘ্য বিধিবিধানে কুলীন পাত্ররা বিয়েতে কনের পিতার নিকট থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করত। এই অর্থ যোগান দিতে গিয়ে বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস, গল্প 'দেনাপাওনা', 'কঙ্কাল', 'হৈমন্তী' ইত্যাদি ছাড়াও বহু রচনায় এই প্রথার নির্মম চিত্রভাষ্য তুলে ধরেন। এবং এই প্রথার

প্রতিবাদস্বরূপ তিনি 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'স্বর্ণমৃগ' ইত্যাদি গল্প রচনা করেন। একদিকে কৌলীণ্য প্রথায় বাল্যবিবাহ অন্যদিকে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে নারীর জীবন নরক যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়। এহেন বৈরী-বিরুদ্ধ ব্যবস্থায় নারীর কামনা-বাসনা ও অকাল জীবনপাতের দৃশ্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী সমাজকে এই দৈন্যপীড়া থেকে মুক্ত করার জন্যই 'বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ' (১৮৫৬) চালু হয়েছিল। এছাড়া সতীদাহ প্রথা সে সময়কার নারী সমাজে এক দুর্মোচ্য অমানবিক কলঙ্ক হিসেবে দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মে এই প্রথার নির্মম দৃশ্যপট তুলে ধরেন। যেমন, 'মহামায়া' গল্পটি সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠুর পটভূমিতে রচিত হয়েছে। ১৮২৯ সালে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া তৎকালীন ভারতীয় সমাজে গৌরীদান প্রথা যেন অনেকটা অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধানে রূপলাভ করে। এই প্রথার নিয়ম-কানুন প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। এর ফলে নারীকে বিয়ের অর্থ বোঝার আগেই শ্বশরবাড়ি পাঠানো হতো। সেখানে বালিকাবধূর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এবং নানারকম বিঘ্ন-বিপত্তি এসে বড় অকালেই তাদের জীবন নিঃশেষ করে দিত। এহেন সমস্যার আলোকে রবীন্দ্রনাথ 'সমাপ্তি' (১৮৯৩) গল্পের 'মৃন্ময়ী' ও 'খাতা'র 'উমা' চরিত্র অঙ্কন করেন। এবং সেখানে তাদের অশ্রুসজল বিড়ম্বনা-পরিণতি নির্দেশ করা হয়। এসব রচনায় তিনি নারীসমাজের এই নিষ্ঠুর সমস্যার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং এর ফলেই ক্রমান্বয়ে নারী সমাজের হাজারো সমস্যা নিরসনে সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে এবং পাশাপাশি নারী সমাজ আত্মবোধনের দুর্বার মন্ত্রে নিজেকে বিভিন্নভাবে সমাজের বুকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। এভাবে পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই নারী সমাজের শত-সহস্র নিপীড়ন-নির্যাতন, সংস্কার-সংগঠন, আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিবাদ-মতবাদ, পদক্ষেপ-প্রয়াস অব্যাহত থাকে। "জীবনের নানাক্ষেত্রে এখন নারী ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষা, চাকুরি, স্বাধীনতা সংগ্রাম এমনকি বিপ্লবী তৎপরতায় তারা নিজেদের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। অবশ্য তাতে রক্ষণশীলদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তারা একদা কবির 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের প্রতিও হয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ ! সে সব আপত্তি আর গোঁড়ামি গুরুত্ব লাভ করেনি। বরং নারীর অধিকারের দিগন্ত ক্রমাগত হয়েছে প্রশস্ত। তাদের শিকলকাটার যুগ এসেছে।"[১২]

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে রেনেসাঁর বরপুত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। এ সময়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা তুমুল আলোড়নের ঝড় বয়ে যায়। ইংরেজদের শিক্ষা, সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। তাছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক এমনকি ঐতিহ্য-অনুষঙ্গেও নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক, আধুনিকতার মন্ত্রগুরু ডিরোজিওর Doubt everything মন্ত্রে সারা বাংলার সচেতনমহল তখন দারুণভাবে উজ্জীবিত। সবকিছু কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই ও যৌক্তিক পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এমনকি ধর্মীয় বিধিবিধানের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। এ অবস্থায় ধর্মান্ধ বাঙালি সমাজে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উদার মানবতাবাদের অসাম্প্রদায়িক বোধবুদ্ধি প্রাধান্য পেতে থাকে। এরকম একটা আবহ-আবেষ্টনী ও হিন্দুধর্মের কঠোর আচারসর্বস্ব নিয়ম নিগড়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। অবশ্য ঠাকুর পরিবার রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু পূর্বেই হিন্দুধর্মের আচারপরায়ণ ধর্মকারা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এই পরিবার মূলত পাশ্চাত্য-প্রভাবিত উদার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মানবতাবাদের আলোকে পরিপুষ্ট হতে থাকে। তাঁরা প্রথানুগত্য সমাজের অচলায়তন থেকে নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। "এই পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, সেইসঙ্গে সমসাময়িক বিচিত্র ঘটনা, প্রয়াস ও ভাবনা সমম্বিত দেশকালই সম্ভব করে তুলল রবীন্দ্রনাথকে। বহু সীমায়তি সত্ত্বেও গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে ভারতবর্ষ এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ পুরুষের সান্নিধ্যে আসেনি। ১৭৭৪ সালে, রামমোহনের জন্মের সূত্রে ইতিহাসগতভাবে যে রেনেসাঁসের সূচনা তা আশ্চর্যভাবে সংহত হল বাঙময় হল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তিনিই হলেন এই রেনেসাঁসের প্রধানতম পুরুষ।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকে আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের প্রথানুগত্য বিধিবিধান তুলে ধরেছেন। যেমন, এই ধর্মের প্রতিমা পূজা, বলিদান প্রথা ও পুরোহিততন্ত্রকে নির্মম বাস্তবতায় উপস্থাপন করা হয়। এবং নাটকীয় পরিণতি নির্দেশনায় এই হিংস্র উন্মত্ত প্রথাকে মানবিক মহিমায় অভিষিক্ত করেন। যা উনবিংশ শতকের অন্যতম মূল্যমন্ত্র Humanism এর প্লাবনে অনেকটা পরিশুদ্ধি লাভ করে। এই মানবতাবাদের প্রভাবে তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গন যেন আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির উদার সান্নিধ্য অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য-অনুষঙ্গ এই মতাদর্শকে বেগবান করে তোলে। 'বিসর্জন' নাটকে এই মানবতাবাদের জয়জয়কার প্রবল দ্বন্দ্বসংঘাতের মাধ্যমে পরিণতি লাভ

করেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র রঘুপতি প্রতিমা পূজার ধারক-বাহক শেষপর্যন্ত সবকিছু ফেলে দিয়ে মানবিক চেতনায় অস্তিত্ব ফিরে পায়। বেদনাহত আকুল কণ্ঠে পুত্র জয়সিংহকে বলেছে–

> "ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
> কিছু নাহি চাহি। অহংকার অভিমান
> দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক। তুই আয়।"[১৪]

'বিসর্জন' নাটকের কেন্দ্রীয় সম্মোহসীমানায় মমতাময়ী মানবীয় প্রতীক 'অপর্ণা' চরিত্রটি সৃষ্টি করা হয়। ফলে কেন্দ্রীয় চরিত্র অহংপরায়ণ পুরোহিত রঘুপতি পর্যন্ত নিজেকে সঁপে দেয় এবং অনুরূপ একটা ভাবানুষঙ্গ অবলম্বন করে নাটকীয় পরিণাম নির্দেশিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, রঘুপতি প্রতিমাকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করে। এবং আজন্মলালিত এই পূজা, প্রথা ও দেবীকে অতিক্রম করে অপর্ণার মধ্যেই আশ্রয় প্রার্থনা ব্যক্ত করে থাকে। জননীরূপের প্রকৃত ভরসাস্থলরূপে অপর্ণাকে বেছে নেয়া হয়–

> "রঘুপতি। পাষাণ ভাঙিয়া গেল– জননী আমার
> এবার দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা
> জননী অমৃতময়ী।"[১৫]

'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথের ধর্মপ্রাণ চেতনার মৌল-প্রতিভাস প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যা উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটেই অনেকটা সৃষ্ট। বিশেষত, ইংরেজ ধর্মযাজকদের আগমনে এদেশের ধর্মীয় চেতনায় প্রচণ্ড আলোড়নের ঝড় বইতে থাকে। এ অবস্থায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবতার জয়পতাকা উড্ডীন হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলেই আধুনিকতার বাতাবরণ উন্মোচিত হতে থাকে। এ পর্যায়ে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)-এর মধ্যেই প্রথম আধুনিক ভারতবর্ষের মূর্তরূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যার চিন্তাস্রোত পিতা দেবেন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকেও গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি পিতার এই আদর্শ অন্বেষার মধ্যে বেড়ে ওঠতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শন ও উজ্জীবনের ধ্যানমন্ত্রটি পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই গ্রহণ করেন। পিতার প্রতিটি ধর্মকর্ম ও জীবনাদর্শ তিনি অত্যন্ত বিনম্র শ্রদ্ধায় আত্মস্থ করে নিয়েছেন। "মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মাদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া উজ্জীবিত হইয়া নবকলেবরে বিশ্বধর্মরূপে বিশ্বভারতীর মধ্যে মূর্তি গ্রহণ করে কবি সেই নবতর ধর্মের নাম দিয়েছেন মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্ম তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।"[১৬]

রাজা রামমোহন রায় শত-সহস্র সমস্যা-সঙ্কুল শ্রেণিবৈষম্য-পীড়িত পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। এক উদার সর্বমানবিক ধর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ। "বহু শতাব্দীর ব্রাহ্মণ্য আনুগত্যকে অস্বীকার করে রাজা রামমোহন রায় যে অপৌত্তলিক ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন তা সমকালীন বাংলা তথা ভারতে সৃষ্টি করেছিল এক বিরাট ভাববিপ্লব। সুদীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কার থেকে মানুষের মুক্তি, অপৌত্তলিক ঈশ্বর উপাসনা, নারী মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য। রামমোহনের মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন।"[১৭] রামমোহন রায়ের এই ভাববিপ্লবের মূলে পশ্চিমা চিন্তা ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অনুপ্রবেশ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এর ফলেই তিনি একটা উদার অসাম্প্রদায়িক বৈশ্বিক ভাবনায় নিজেকে সমর্পণ করেন। "এই পশ্চিমী প্রেরণাই আমাদের ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্ব পালন করেছে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা এর একটা বড় প্রমাণ। ... পৌরাণিক হিন্দুধর্মের জগদ্দল সংকীর্ণতা এবং অচলায়তনকে শিথিল করাই ছিল এই সমস্ত উদযোগের লক্ষ্য।"[১৮] শ্রেণিবৈষম্য পীড়িত ভারতীয় সমাজে মূলত পৌত্তলিকতাই মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করেছে। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, অহং-আত্মবিনাশ ও মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের জন্য এহেন ধর্মচেতনা অনেকাংশে দায়ি। রামমোহন রায় জীবনপণ আত্মনিবেদনের মাধ্যমে এর মূলোচ্ছেদ করতে সংকল্পবদ্ধ হন। এবং বৈশ্বিক মানবতার অসাম্প্রদায়িক প্রস্রবণে অবগাহন করে ব্রাহ্মধর্মের গোড়াপত্তন করেন। ফলে অসাম্প্রদায়িক অপৌত্তলিক মানবতাবাদই জয়জয়কাররূপে কীর্তিত হয়ে থাকে। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার অথবা স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা এদেশে বরাবরই ছিল। এবং শুধুমাত্র এর ফলেও ভারতবর্ষে বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে। ধর্মকে ব্যবহার করে যুগে যুগে পুরোহিততন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র, যাজকতন্ত্র বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে আধিপত্য বিস্তার করে চলে। উনবিংশ শতকেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার ধর্মকে রাজনীতি বিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাকে। তারা এর মাধ্যমে বাঙালি সমাজকে বিভিন্নভাবে করায়ত্ত ও বিভ্রান্ত করে তোলে। এ সময় ধর্মীয় প্রলোভনের খপ্পরে পড়ে সারা বাংলায় ধর্মান্তরিত হওয়ার হিড়িক দেখা দেয়। "... পাশ্চাত্য বণিকতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকায়, ভারতে ও চীনদেশে কী সুকৌশলে খ্রীষ্টীয়

ধর্মযাজকদের ব্যবহার করেছে ঔপনিবেশিক স্বার্থে।”[১৯] ধর্মের মুখোশ-আঁটা এই অসৎ রাজনৈতিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে রামমোহন রায় রুখে দাঁড়ান। তিনি খ্রিস্টান পাদরীদের এহেন উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। রামমোহন রায় সর্বস্ব-পণ প্রতিজ্ঞা প্রতীতির মাধ্যমে এই অপতৎপরতা রোধ করতে প্রয়াসী হন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এবং এরই আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। “ইংরেজ পাদ্রীদের অনিয়ন্ত্রিত ধর্মপ্রচার সামাজিক সংহতি ও আত্মিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে যে বিপদের সঞ্চার করেছিল তাঁর দৃষ্টিতে তাও সুস্পষ্ট ছিল। ধর্মান্তরের পথে নিজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা প্রতিরোধ করা এবং বাঙ্গালীদের আপন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন করার শুভ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৪৩)।”[২০] এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সভা, সমিতি, সেমিনার ও সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশবাসীকে ভারতীয় সংস্কৃতি রাজনীতিতে মূলীভূত হওয়ার আহ্বান জানান। “পাদরীদের বিরুদ্ধতা করিয়া রামমোহন উপনিষদ বেদান্ত সমর্থিত একেশ্বর ব্রহ্ম-উপাসনার প্রতিষ্ঠায় মন দিলেন। তিনি ঈশ কেন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ করিলেন।”[২১] এবং এসব রচনাশৈলীর মাধ্যমে ধর্মগত বিদ্বেষ-বিভাজন ও ধর্মব্যবসার হীন উদ্দেশ্য প্রতিহত করতে এগিয়ে এলেন। একদিকে ধর্মভীরু বাঙালির মূঢ়তা অন্যদিকে বিদেশি ধর্মব্যবসায়ীদের অশুভ তৎপরতা এদেশবাসীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্ষেত্রবিশেষে সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ঘটনাও ঘটতে থাকে। এমনকি উনিশ শতকে শুধু ধর্মের কারণেই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। রামমোহন রায় এমনই একটা অস্থিতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এদেশবাসীর পাশে এসে দাঁড়ান। এ অবস্থায় ধর্মপ্রচারের বহুমাত্রিক ছলাকলা অব্যাহত ছিল। “পোর্তুগীজ পাদরিরা শুধু উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করিয়া ধর্মপ্রচার করেন নাই, সেকাজে তাঁহারা বলপ্রয়োগও করিতেন। তাঁহাদের প্রলোভনে ও বলপ্রয়োগে যাহারা বশীভূত হইত এবং যাহাদের সমাজে ফিরিবার পথ একেবারে রুদ্ধ হইত তাহাদের এবং এদেশে জাত অসবর্ণ পোর্তুগীজ সন্তানদের ও ক্রীতদাসদের শিক্ষার জন্যই তাঁহাদের এই রচনার প্রচেষ্টা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বছর হইতে ব্রিটিশ পাদরিদের যে ধর্মপ্রচার তাহা অন্য ছাঁদের। ইঁহাদের ক্রীতদাস ছিল না, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাহাত্ম্যে ইঁহাদের বলপ্রয়োগের পথও ছিল না। সুতরাং বলিয়া-কহিয়া, সাধ্যমত উপকার করিয়া, বই লিখিয়া ছাপাইয়া বিতরণ করিয়া, শিক্ষা দিয়া, ইঁহারা খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্যম করিয়াছিলেন।”[২২] এভাবে মূলত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের জন্যই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এসব বিপর্যয়কর বিপত্তির মুখে রামমোহন রায় রীতিমত সংগ্রামে লিপ্ত হন। এবং তাঁর এই যুগভাবনার বীজমন্ত্র দেবেন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে থাকে।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটি ছিল উনিশ শতকীয় মানবিক বোধবুদ্ধির আলোয় পরিস্নাত এবং রাজনৈতিক অঙ্গনের অন্যতম মূলমন্ত্ররূপে গৃহীত। “ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্যে দেবেন্দ্রনাথ প্রায় দশ বৎসর নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন।”[২৩] এই ধর্ম মূলত সমকালীন যুগভাবনার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত হয়েছিল। যার অন্তর্গত ভাবভাবনা হলো– “... বিগ্রহপূজাকে বর্জন করা হবে, কারণ তা নিরাকার ঈশ্বরকে জড়বস্তুতে রূপান্তরিত করে। ... হিন্দুধর্মের বা খ্রীস্টধর্মের অবতারবাদকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কারণ ঈশ্বরের শরীরী প্রকাশ নেই।”[২৪] রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মকর্ম ও সার্বিক জীবনাচরণ অনুসরণ করেছেন। তাঁর সৃষ্টিসত্তা বিকাশে এই প্রভাব ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি প্রসঙ্গে বলেন, “সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।”[২৫] তিনি আরও বলেন, “যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত।”[২৬(ক)]

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনাদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গে বলেন, “বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন রামমোহন রায়। শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো, বঙ্গসাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম বলো, কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন... বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।”[২৬(খ)] রবীন্দ্রনাথ এরই আলোকে সারাজীবন নিজেকে গড়ে তুলেছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্ধ মূঢ়তা, অর্থহীন লোকাচার, সহিংস পৌত্তলিকতা ও কপট রাজনীতির বিপক্ষে তিনি সারাজীবন নিজের অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হন। ‘বিসর্জন’ নাটকেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় মেলে। এখানে কপট ধর্মাসক্তি ও উন্মত্ত রাজনীতিকের মুখোশ উন্মোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ সালে কুখ্যাত মিউনিক চুক্তিতে চেকোশ্লাভাকিয়ার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এবং ধর্মব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

"ওই দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।"[২৭]

এখানে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বীভৎস চিত্রভাষ্য উপস্থাপন করেন। তাছাড়া পুঁজিবাদ ও পুরোহিততন্ত্রের একাট্টা শাসন শোষণের প্রতিবাদও এই কবিতায় লক্ষণীয়। ধর্মের নামে রাজনীতির কপট আগ্রাসনকে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ধিক্কার জানিয়েছেন। যা তাঁর অজস্র সৃষ্টিসম্ভারের ভাঁজে ভাঁজে আবিষ্কার করা সম্ভব। যেমন, 'মানসী' কাব্যের 'দেশের উন্নতি' কবিতায়– 'আয় না ভাই, বিরোধ ভুলি– কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি'। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'শুচি' কবিতায় রামানন্দ-কবীরের মিলনদৃশ্য রচনায় এবং 'মানবপুত্র' কবিতায় যিশুখ্রিস্টের হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত কবি মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ কামনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে গোরা চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে একই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। "আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।"[২৮] গোরার এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব মূলত রবীন্দ্রনাথেরই আত্মকৃত চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ সবসময় এমনকি জীবনের অন্তিমেও নিজেকে ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন বলে উল্লেখ করেন। এবং সকল মন্দিরের বাইরে মানব সংসারে তিনি তাঁর পূজা সম্পন্ন করে যান। "সকল দেশই আমার এক দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানবপ্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।"[২৯]

১৯১০ সালে ২০ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লিখিত এক পত্রে বলেন, "আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করছি। ... মনে কোরো না প্রতিমা পূজা ছাড়া প্রেম হতেই পারে না– যদি সূফীদের প্রেমের সাধনার বিবরণ পড়ে থাক তবে দেখবে তাঁরা কি আশ্চর্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কি অপরিসীম প্রেমের মিলন সাধন করিয়েছেন।"[৩০] রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবেও প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে মতামত গড়ে তোলেন। এ প্রসঙ্গে একটি পারিবারিক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে বলা হয়েছে– "রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল ভট্টাচার্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত ছিল রবির জাতকর্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।"[৩১]

'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও রাজনীতির যুগপৎ সম্পর্ক-সমবায় তুলে ধরেছেন। এখানেও ধর্মের ধ্বজাধারীর কপট মুখোশের আড়ালে রাজনীতির ঘৃণ্য চক্রান্ত লক্ষ করা যায়। পুরোহিত রঘুপতি ভ্রাতৃহত্যার মতো বর্বর কাজে রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে প্ররোচিত করেছে। এই কাজের প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে ধর্মের কপট অবয়ব কাজ করে চলে। রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের উৎকট কদর্য চালচিত্র রঘুপতি চরিত্রের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজে বেড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এহেন বিকৃতচারী ধর্মলিপ্সু ব্যক্তিদের বরাবরই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং এদের চেয়েও সমাজে নাস্তিকদের প্রশংসায় তিনি মুখর হন–

"নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।"[৩২]

'বিসর্জন' নাটকে মন্দিরে বলিদান প্রথাকে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে নির্দেশিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারটি সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে বেশ আলোড়নের ঝড় তোলে। এই নিষ্ঠুর বলিদান প্রথাটি সে সময়ের প্রগতিশীল সমাজ বাস্তবতা মেনে নিতে পারে নি। এর বিরুদ্ধে নানা জায়গায় অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদের ঝড় ওঠতে থাকে। এমনকি কোথাও কোথাও তা সামাজিক আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। সমকালীন কলকাতায় কালিঘাটে বলি বন্ধ করার জন্য 'রামপ্রাণ শর্মা' নামক জনৈক রাজপুত পণ্ডিত প্রায়োপবেশন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সমর্থনের মাধ্যমে প্রশস্তিসূচক কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি পরবর্তীতে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এভাবে রবীন্দ্রনাথ নানামাত্রিক মনন মনস্বিতার মাধ্যমে উনিশ শতকীয় ভাববিপ্লবের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় রাজনীতি ও ধর্মের একটা স্ববিরোধ-সহাবস্থান লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ এরই ভাবচৈতন্যে তাড়িত হয়ে পরিশ্রুত শিল্পসৃষ্টিরূপে 'বিসর্জন' নাটকটি রচনা করেন।

'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯০) কাব্যনাট্যটি সুদূরস্থিত আবহ অন্বেষার আলোকে রচিত। পৌরাণিক বিষয় অনুষঙ্গ দ্বারা গঠিত বলে তা অনেকটাই বাস্তবের সাথে সম্পর্করহিত। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সহজাত কাব্যপ্রতিভা বিষয়টিকে আরো দূরান্বিত করে তোলে। যা অনেক ক্ষেত্রে রোমান্সের লক্ষণাক্রান্তরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এছাড়া এখানকার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প রচনায় এক স্বপ্নিল মায়াবী পৃথিবীর হাতছানি উপলব্ধি করা যায়। পৌরাণিক কাহিনিনিষ্ঠ এই প্লট-প্রতীতি অবাস্তব পৃথিবীর স্বপ্নিল কামনা-বাসনা দিয়ে ঘেরা। মহাভারতের প্রেক্ষিতে চিত্রাঙ্গদার কাহিনী, চরিত্র এবং পরিবেশ রচিত হয়েছে। অর্জুন, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, মদন প্রভৃতি চরিত্র বাঙালি সমাজে চিরদিনই একটা ভক্তিভয়মিশ্রিত সীমায়িত আসনে প্রতিষ্ঠিত। বাঙালির নিত্যসঙ্গী হাজারো দুঃখ-কষ্ট থেকে এরা অনেকটাই দূরত্ব বজায় রেখে চলে। অথবা রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি এসব দেবকল্পনায় ব্যাপকভাবে মানবমহিমা আরোপ করেন। পৌরাণিক প্রবাহ-পরম্পরার সাথে সমাজবাস্তবতার সমন্বয়-সম্ভাবনা গড়ে তোলেন। এমনকি মানবিক বোধবুদ্ধির আলোকেই তিনি যাবতীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন। এই চিন্তাটি আধুনিক বাংলা কাব্যে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্রনাথই প্রয়োগ করতে সমর্থ হন। যা যুগ সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) কাব্যকল্পনায় প্রথম প্রয়োগ করেছেন। অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) 'মেঘনাদবধকাব্য' (১৮৬১) নামক মহাকাব্যে এই মানবমহিমার জয়জয়কার তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ এরই সুযোগ্য সন্ততিরূপে বহুমাত্রিক অভিব্যঞ্জনায় তা ফুটিয়ে তোলেন। বিশেষত, সমকালীন যুগ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অন্যান্য অনুষঙ্গের মধ্যে এক বিস্ময়কর মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকেও তিনি উদ্দেশ্য-অনুভূতি, কাহিনি-চরিত্র প্রেক্ষিতে মাটি ও মানুষকে একাত্ম ভাবনায় তুলে ধরেছেন। পার্থিব জীবনভাবনার প্রাত্যহিক সমাজবাস্তবতার মধ্যে নাটকীয় পরিণাম নির্দেশ করা হয়। যা উনিশ শতকীয় যুগভবনার সমাজ-রাজনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভাবনার অনুষঙ্গরূপে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের দূরস্থিত আবহ-অবয়ব সংস্থাপিত করা হয়। বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, কামনা-বাসনা ও সমূহ বাস্তবতার আলোকে নাট্যকাহিনি পরিকল্পিত। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় অনুষঙ্গ সমাজনিষ্ঠরূপে চিত্রিত করার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। নাটকে দেখা যায়, চিত্রাঙ্গদা নারী হয়েও পুরুষালি আচরণের সমাজবাস্তবতায় সমর্পিত। এ ছাড়া ব্রহ্মচারী অর্জুনের অস্বাভাবিক জীবনের ভাবমত্ততায় বাস্তব প্রেমের কামনা-বাসনা আরোপ করা হয়। অর্জুনই প্রথম প্রেমিক হৃদয়ে মাটি ও মানুষের সমাজলগ্ন ভাবভাবনায় উচ্চারণ করেছে–

> "প্রবাস দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে
> অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া,
> অক্ষয় আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।"[৩৩]

এর ফলে বাস্তব-জীবন পরিবৃত ভাবনাই 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রের আদিগন্ত অবয়ব জুড়েও অনুরূপ চিন্তাচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকের শেষদিকে চিত্রাঙ্গদার আত্মগত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার মধ্যে এর প্রতিভাস লক্ষণীয়,

> "চিত্রাঙ্গদা। ... যদি পার্শ্বে রাখ
> মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
> যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
> আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
> আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
> পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
> দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
> পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে
> তখন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।"[৩৪]

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে চিত্রাঙ্গদার ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশের প্রবণতায় উনিশ শতকীয় নারীবাদী আন্দোলনের রূপটি লক্ষণীয়। সে-সময় সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি নারীসমাজে উজ্জীবনের মন্ত্র-মনস্বিতা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। যা পাশ্চাত্য সমাজ রাজনীতির সান্নিধ্য সাহচর্যে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বাংলা কাব্যের জড়িমাগ্রস্ত প্রাঙ্গণেও তা মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ

এই যুগভাবনায় তাড়িত হয়েই নানামাত্রিক সৃষ্টিশীল কর্মে আবির্ভূত হন। "মধুসূদনের Ovid-অনুসারী রচনা 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে-ই বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মবোধ সম্পর্কিত প্রথম রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাহারই ধারা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে পারে।"[৩৫] আধুনিকতার অন্যতম বীজমন্ত্র নারীপ্রগতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অকুণ্ঠ উপস্থাপনার মধ্যে নিহিত। যা উনবিংশ শতকের ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়নের ঝড় তোলে। চিত্রাঙ্গদা নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'চিত্রাঙ্গদা' প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মবোধচেতনায় ফুঁসে ওঠে। এবং শেষ পর্যন্ত আত্মগত স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। নাটকীয় পরিণতিতে দেখা যায়, চিত্রাঙ্গদাই বজ্রকঠিন অর্জুনকে দুর্বার আকর্ষণ আহ্বানে ধরাশায়ী করেছে। এবং সাধনসর্বস্ব বীর অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাছেই নিজের সবকিছু সমর্পণ করে দেয় –

> "অর্জুন। ... খ্যাতি মিথ্যা,
> বীর্য মিথ্যা, আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
> সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
> পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি। বিশ্বের ঐশ্বর্য
> তুমি।"[৩৬]

নারীর এমন সার্বভৌম আত্মমর্যাদার চিন্তা-চেতনা রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত। এরই ধারাবাহিকতায় 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি সবিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে সমকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনীতি ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। "১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেত ভ্রমণ করেন এবং সেখানকার স্ত্রী স্বাধীনতা দেখে চমৎকৃত হন। ইতিপূর্বে বিলেতে বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি অধিকার আইন (১৮৮২) পাশ হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি স্বীকৃত হয়েছে। মিলের বিখ্যাত রচনা 'সাবজেকশান অব উইমেন' (১৮৬৯) কবির অগ্রজ ইতিমধ্যেই অনুবাদ করেছেন এবং দেশে নারী মুক্তি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল ক্রমাগত শক্তিশালী।"[৩৭] এ আন্দোলনের ঢেউ রবীন্দ্রনাথকেও নিবিড়ভাবে আলোড়িত করেছিল। বাঙালি সমাজে নারী চিরদিনই পতিসর্বস্ব জীবনের পরগাছা মাত্র। এদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব-অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। সেখানে পতি বরাবরই স্বামী বা প্রভু। আর নারী শুধুমাত্র বংশধর রক্ষার যান্ত্রিক অবলম্বনরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃজন-মনন কখনো এহেন মানসিকতাকে গ্রহণ করতে পারে নি। তিনি সবসময় নারীকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের আলোকে অবলোকন করেছেন। তাঁর এই প্রেরণার মূলে পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতির অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে। "নারী পুরুষের অবহেলার বস্তু নহে। নারী সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার মূলে পাশ্চাত্য প্রেরণাই যে কার্যকরী হইয়াছে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে নারীর আত্মবোধ সম্পর্কে যে ধারণা এ দেশে সৃষ্টি হইয়াছিল 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রে তাহাই স্থানলাভ করিয়াছে।"[৩৮]

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক ছাড়াও আরো অসংখ্য রচনাকর্মে নারী সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর প্রাথমিক কাব্যপ্রয়াস 'বনফুল' (১৮৮০) এর মধ্যেই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে নায়িকার বিবাহ-নিরপেক্ষ ভালোবাসায় সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া তাঁর গল্প 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮), 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' (১২৯৮), 'শাস্তি' (১৩০০), 'দিদি' (১৩০১), 'মানভঞ্জন' (১৯২৯); উপন্যাস 'চোখের বালি' (১৯০৩), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'বাঁশরী' (১৯৩৩); সমকালীন কাব্য 'মানসী' (১৮৯০)-র 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম' ইত্যাদি কবিতা, নাটক 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'সতী' এর মধ্যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদার প্রতিফলন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। এ সব সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ রাজনীতির বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করা সম্ভব। বিশেষত, 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মূল চরিত্র চিত্রাঙ্গদার মধ্য দিয়ে তা গভীর অনুব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

'মালিনী' নাটকের কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, ভাবানুষঙ্গ, শব্দচয়ন– ইত্যাদি একটা সবিশেষ ভাবাবেশে পরিচালিত হয়েছে। সযত্ন নাট্যসৃষ্টির সজ্ঞান উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় এখানে অনুপস্থিত। প্লট-সংঘটনটি নাটকীয়ত্ব সৃষ্টির পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সুযোগ থাকলেও নাট্যকার অকালেই এর মূলোচ্ছেদ করেছেন। কবিত্বময় ভাবালুতার কারণেও তা অনেকস্থলে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। সর্বোপরি, একটা তত্ত্বকথার প্রতিষ্ঠা-প্রণয়নে রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। চরিত্র ও কাহিনীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিবাদ-বৈপরীত্য একেবারেই অনুপস্থিত। যা আদর্শ নাট্যসৃষ্টির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অথচ 'মালিনী' নাটকের প্লট-প্রবাহ জুড়ে শৈথিল্য সীমায়তি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় এর কাহিনীকে স্বপ্নঘটিত বলে উল্লেখ করেছেন।

কাহিনী চরিত্রগুলো ক্ষীণ ভাবলেশহীন অবস্থায় অনুবর্তন ক্রিয়াকলাপে সমর্পিত। এবং এরই প্রতিভূরূপে প্রধান চরিত্র 'মালিনী' অঙ্কিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির 'কীটে-কাটা ধর্ম ও জীর্ণ শাস্ত্রভার'-এর মধ্যে মালিনীর নবধর্ম গণজোয়ার সৃষ্টি করে। প্রথমত এই ধর্মের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হলেও পরিশেষে সবাই এর মধ্যেই সমর্পিত হয়। রাজা, রানী, সুপ্রিয়, প্রজাবৃন্দ এমনকি একমাত্র বিদ্রোহী চরিত্র ক্ষেমঙ্করও মালিনীর নবধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বন্ধু সুপ্রিয়ের নিকট অকপট স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বলেছে–

> "এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে
> কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিয়ে যেতে
> স্বর্গপানে? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
> জন্মে নি কি স্বপ্নাবেশ? অপূর্ব সংগীতে
> বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
> সহস্র বংশীর মতো- সর্ব সফলতা
> জীবনের যৌবনের আশাকল্পলতা
> জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
> মঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
> এক নিমেষের মাঝে ...।"[৩৮]

মালিনী-প্রচারিত এই নবধর্ম ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার জন্য শান্তির ললিত বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে। এমনকি তার প্রণয়পুরুষ, হৃদয়ের ধন সুপ্রিয়ের হত্যাকারী বিদ্রোহী ক্ষেমংকরের জন্যও ক্ষমার-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। মালিনী দীপ্তকণ্ঠে বলে থাকে– 'মহারাজ, ক্ষমো, ক্ষেমংকরে।'

'মালিনী' নাটকের এই সর্বতোমুখী নবধর্ম মূলত উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-প্রবুদ্ধ মানবধর্ম। যা ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় সমাজজীবনে দারুণভাবে আলোড়নের ঝড় তোলে। ফলে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিতে একটা ভাববিপ্লবের বার্তা-বহ্নিশিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসকদের অন্তর্গত রাজনৈতিক দর্শনে এর সাজুয্য-সহাবস্থান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই ইংরেজ আগমনকে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন, "ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক্ করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।"[৩৯] এই চিন্তাচেতনার মূলে– মানবিকতা, ব্যক্তিচেতনা, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, সমাজচেতনা, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, মৌলিকতা, মুক্তবুদ্ধি, নাগরিকতা ও নারী স্বাধীনতা রয়েছে। যা উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্নিহিত সত্যতারূপে গৃহীত। তবে সবকিছু ছাপিয়ে মানবতাবোধই এর প্রাণপ্রতীতিমূলে উদ্দীপনা সঞ্চার করে চলে। "দেব-দেবী নয়, ঈশ্বর নয়, অলৌকিক বা অতিলৌকিক কোনো কিছুই নয়। বাস্তব মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ– যে মানুষ ধূলোয় লুটোয়, আবার আকাশকেও অতিক্রম করে। কোনো ভাবাত্মক বা আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, নিতান্ত শাদামাঠা অর্থে, এই মন্ত্রটি হল : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"[৪০] 'মালিনী' নাটকের অন্তর্মূল-সত্য হিসেবে এই মানবধর্মই ক্রিয়াশীল রয়েছে। নাটকটির যাবতীয় নাটকীয়ত্ব শেষপর্যন্ত মানবধর্মের সর্বপ্লাবী সাম্যস্রোতে এসে মিশে গেছে। যা পরিণতিতে একটা বিশ্বজনীন অভিব্যক্তিতে পাঠসাধারণের মনকে চমৎকৃত করে তোলে। ভারতবর্ষীয় বাঙালি জীবনে ইংরেজ রাজনীতি ও এই মানবিক বোধবুদ্ধি সমার্থক বলে মনে করা হয়। ফলে এদেশের অনেক মনীষী ইংরেজ আগমনকে আশীর্বাদরূপে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়া অনুরূপ ভাবপ্রবণতার মূলে তৎকালীন কিছু সামাজিক বিপ্লবের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। যেমন, প্রসঙ্গক্রমে সে সময়কার আলোড়ন সৃষ্টিকারী ধর্মবিপ্লবের প্রবল স্রোতধারা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সমকালীন সমাজজীবনে সংস্কারাচ্ছন্ন অমানবিক ধর্মাচারের ভিত কেঁপে ওঠে। বাঙালি জীবনের ধর্মীয় অনাচার ও কূপমণ্ডুকতা পাশ্চাত্য জাতির উদার-অসাম্প্রদায়িক ছোঁয়ায় নবতর ছন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। সেখানে মানবতাবোধের একটা পরিস্নাত-পরিশুদ্ধ রূপাবয়ব গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' আলোচনা অংশে তৎকালীন সমাজবিপ্লবের মূলে ধর্মকেই চিহ্নিত করেছেন। তাছাড়া এই ধর্মচেতনার মূলে সমকালীন কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলিও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। 'ফরাসী বিপ্লব' (১৭৮৯), 'শিল্প বিপ্লব' (১৭০০-১৮৩০), 'সমাজবাদী বিপ্লব' (১৮৭১) তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁ (১৪৫৩-১৮৩০) বাঙালি জীবনের দেবসর্বস্ব মধ্যযুগীয় মন্থরতা বিলীন করে সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করেছে। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, শিল্প

বিপ্লবের যন্ত্রসভ্যতা, সমাজবাদী বিপ্লবের স্বকীয় চেতনাবোধ- বাঙালি জীবনে নতুন মূল্যবোধের জন্মপ্রক্রিয়া সম্ভব করে তোলে। এছাড়া সমকাল-বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা আবিস্কার ও আন্তর্জাতিক চেতনাসমৃদ্ধ কিছু গ্রন্থ বাঙালি জীবনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে যায়। মার্কস-এর 'Capital' (1867), দস্তয়েভস্কির 'Crime and Punishment' (1866), টলস্টয়-এর 'War and Peace' (1869), ইবসেনের 'Dolls House' (1866) প্রভৃতি গ্রন্থ জড়মূর্ত বাঙালি জীবনে উজ্জীবনের মন্ত্র-মুক্তি সম্ভব করে তোলে। এসব গ্রন্থের যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিকতা, মানবিক আত্মবিশ্লেষণ, নির্মম বাস্তবতা, আত্মজৈবনিক জিজ্ঞাসা, মনন ও মনস্বিতাসম্পন্ন জীবনবোধ বাঙালি সমাজকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করেছিল। "উনবিংশশতকী কোলকাতায় উদ্ভূত রেনেসাঁস তো ইংরেজী শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ফল। য়ুরোপের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান আর আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবই বাঙালীদের প্রেরণার প্রত্যক্ষ উৎস এ সঙ্গে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর ব্যক্তিত্বও তাদের প্রভাবিত করেছিল। বলেছি এজুরাই (ইংরেজী শিক্ষিতরাই) এই রেনেসাঁসের স্রষ্টা। এঁরা ছিলেন কোঁতে, বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, রুশো, ভল্টেয়ার, হব্‌স্‌, লক, এ্যাডাম স্মিথ প্রভৃতি দার্শনিকের ভক্ত।"[৪১] এছাড়া তৎকালীন সমাজজীবনে দেশীয় কিছু রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বাঙালি জীবনে আত্মবোধের নবচেতনা দান করে।

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কাপড়ের কল স্থাপন (কাজ আরম্ভ ১৮৮৫ খ্রিঃ), রেলপথ স্থাপন (১৮৫৩), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল হাঙ্গামা (১৮৫৯), কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭) প্রভৃতি ঘটনাবলি প্রবহমান বাঙালি সংস্কৃতিকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছিল। সংস্কার-নিমগ্ন এদেশীয় সমাজজীবনে এসব আলোড়িত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নবপ্রবুদ্ধ চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলে। যা রবীন্দ্রনাথ আত্মগত শিল্প-সৃজন আলোকে তাঁর রচনাসৃষ্টিতে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

'মালিনী' নাটকের প্রকরণ পরিচর্যায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সমাজসত্যকে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হন। নাটকের কাহিনীটি মূলত রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের 'মহাবস্তুবদান' এর ক্ষীণ ভিত্তির উপর রচিত। তবে এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভাবকল্পনায় যুগোপযোগী প্রভাব প্রচ্ছায়া লক্ষণীয়। এখানকার ক্ষেমংকর, সুপ্রিয় চরিত্র এবং তাদের বন্ধুত্ব ও পরিণাম ভাবনাটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এছাড়া কাহিনীর অন্তর্গত সত্যতার মধ্যেও অদল-বদল পরিলক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে তৎকালীন সমাজবাস্তবতার আলোকে মানবিক মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে সমর্থ হন। এবং বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাস ও নির্বাণলাভের মতো বৈরাগ্য-বায়বীয় দিকটি পরিহার করে চলেন। "বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই ভাবের প্রেরণা থাকিলেও ইহাই বৌদ্ধধর্মের সর্বস্ব নহে; ইহার অতিরিক্ত আরও আরও অনেক কিছু লইয়া বৌদ্ধধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম হইতে কেবল ইহার করুণা ও মৈত্রীর আদর্শটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুক্তিবহির্ভূত আচার কিংবা ইহার নির্বাণ এবং বৈরাগ্যের ভাবকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। ... উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ মানবিকতার চেতনায় তাঁহার নবধর্ম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শনের মানবিকতাবাদের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে।"[৪২]

'মালিনী' নাটকে অঙ্কিত কিছু চরিত্রচিন্তনের মধ্যেও সমকালীন সমাজ-রাজনীতির প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতির সর্বপ্লাবী হিল্লোলে এ সময় পুরো ভারতবর্ষ নড়েচড়ে বসে। তখন বাঙালি জাতি আত্মবোধনের জাগরণমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তারা নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মূলানুগ মৃত্তিকায় ফিরে যাওয়ার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। 'মালিনী' নাটকের কিছু চরিত্রচিত্রে এদেশীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি লক্ষণীয়। নবধর্মে প্রবুদ্ধ মালিনীর কর্মকাণ্ডে তার জননী শাশ্বত বাঙালি নারীর করুণ আর্তি নিয়ে উপস্থিত। সংসারধর্মই নারীর পরম ধর্মসাধনা বলে উল্লেখ করা হয়। সেখানে একজন উৎকণ্ঠিত মায়ের বাৎসল্যস্নেহের গভীর অনুরাগ অতীব মমতার সাথে ঝরে পড়েছে–

"... শিবপূজা করো দিনযামী,
বর মাগি লহো, বাছা, তাঁরি মতো স্বামী।
... ... রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।"[৪৩]

এর ফলে বাঙালির গর্বিত ঐতিহ্য ও সমকাল সমাজ-সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এ ছাড়া মালিনী নাটকে রাজার মধ্যেও বাঙালি সমাজের পিতৃসত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের সর্বত্রই রাজার এক দোলাচল মনোবৃত্তি স্পষ্ট

হয়ে ওঠে। রাজা প্রতিনিয়ত প্রজাসাধারণ ও মালিনীর মঙ্গল কামনায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন। মালিনীর গৃহত্যাগ সংবাদে রাজা একজন দায়িত্বশীল পিতার মতোই আর্তকান্নায় মুষড়ে পড়েন –

> "... গেছে চলে?
>
> ... ...
> প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
> কোলের কন্যারে মোর। রাজ্যে ধিক থাক।
> ধিক ধর্মহীন রাজনীতি।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটক রচনাকালীন পর্বে অন্যান্য রচনায়ও অনুরূপ ভাবভাবনা প্রয়োগ করেন। 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩) থেকে 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই সমাজমনস্বিতা চোখে পড়ে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'এবার ফিরাও মোরে', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'বসুন্ধরা', 'আহবানগীত', 'প্রাণ' ইত্যাদি কবিতায় কবি মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই আকর্ষণ-অম্বেষা 'মালিনী' নাটকেও পরিলক্ষিত হয়। 'মালিনী' প্রসঙ্গক্রমে বলেছে– 'ওগো পিতা, আজ আমি হয়েছি সবার'। এখানে ধর্মীয় বোধবুদ্ধি শেষপর্যন্ত মানবিকতার মধ্যে উত্তরণ ঘটে। যা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় ধর্মীয় আন্দোলনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং সমকালীন সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলেও এই সত্যটি গভীরভাবে অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে। সর্বোপরি সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের যাবতীয় প্রাঙ্গণ জুড়ে মানবতাবোধই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা, তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। ... আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।"[৪৫] রবীন্দ্রনাথ মূলত এই ভাবদর্শনের উপর দাঁড়িয়েই বিশ্বজনীন মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। 'মালিনী' নাটকের মালিনীর চরিত্রেও অনুরূপ জীবনবেদ মহিমান্বিত হওয়ার সুযোগ পায়। যা ঊনবিংশ শতকের যাবতীয় সংস্কার-আন্দোলন তথা সমাজ রাজনীতির অন্তর্গত সত্য হিসেবে পরিগণিত।

"শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটকে অন্তর্নিহিত ভাবদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাচেতনা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। যা ছিল সমকালীন ব্রিটিশ রাজনীতি ও দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার নানা ক্রটিবিচ্যুতির আলোকে রচিত। বিশেষত, বঙ্গভঙ্গের সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তুমুল একটা ভাঙাগড়ার পদক্ষেপ গৃহীত হতে থাকে। "বঙ্গভঙ্গের ফলে এদেশে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। ১৩১২ সালের মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়। স্কুল বিভাগের গঠনতন্ত্র রচনার ভার পরে রবীন্দ্রনাথের উপর। তিনি 'শিক্ষাসমস্যা' (১৩১৩) প্রবন্ধে স্বমত ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত শিক্ষারীতির ক্রটি, যান্ত্রিকতা, দেশের সাথে যোগহীনতা দেখান।"[৪৬] এই অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার মূলে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হীন রাজনীতির অপপ্রয়োগ লক্ষ করেছেন। এ শিক্ষায় ব্রিটিশ রাজনীতির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। পরাধীন বাঙালি জাতিকে মেরুদণ্ডহীন ও ক্ষণভঙ্গুর করে রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানা দিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাকমিলান কোম্পানির রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমনভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।"[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' নাটকে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা ভাবব্যঞ্জনা তুলে ধরতে সক্ষম হন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে বালকদলের ছুটি, পুঁথিপোড়ানো উৎসব ও অবাধ হাস্যখেলার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ– সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট প্রতিবাদরূপে প্রতিভাত হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শিক্ষাপদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এই শিক্ষার সাথে সারাজীবন মতপার্থক্য অনুভব করেছেন। জীবনের প্রভাতবেলা প্রাথমিক শিক্ষাপর্বে তিনি স্কুলশিক্ষায় নির্মম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। যা তাঁকে জীবনভর দারুণভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে। এবং এর ফলেই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, তিনি পদে পদে শত-সহস্র প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে শান্তিনিকেতনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী

শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ও পরে শিক্ষা নিয়ে এতবড় Experiment আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই। এ জন্যে অনেক বিপত্তির মধ্যে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর গহনা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল। মূলত শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়-স্থাপন থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাদর্শ রূপাবয়ব পেতে শুরু করেছে।

সমকালীন বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষাকার্যক্রমের যাবতীয় উদ্দেশ্য-অন্বেষা কিছু হীন স্বার্থপরতার নিকট সমর্পিত। সাম্রাজ্যিক শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সেখানে জীবন ও শিক্ষার মধ্যে ছিল আকাশ পাতাল পার্থক্য। জীবনসম্পৃক্ত শিক্ষা থেকে ভারতীয় জনগণকে বঞ্চিত করে রাখা হতো। তাদের পরাধীন-পদানত ও অথর্ব করে রাখার একটা ঘৃণ্য প্রয়াস বেশ জোরেশোরে অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ভারতীয় শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদেরও নানাভাবে বৈষম্যমূলক বিভক্তিতে ঠেলে দেয়া হয়। এবং পাশাপাশি বৃটিশ সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের পরিবর্তে শিক্ষাসংকোচন নীতি গ্রহণ করে। এতে বৃহত্তর ভারতবাসী দারুণভাবে শিক্ষাবঞ্চনার শিকারে পরিণত হতে থাকে। ১৮৯৬ সালে ঔপনিবেশিক প্রশাসন নিয়োগ সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষকদের বেতনভাতা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে ফেলে। তাছাড়া ১৮৯৭ সালে এশীয় বংশোদ্ভব শিক্ষার্থীদের ভর্তি ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে প্রথমত কোনো হিন্দু সদস্য গ্রহণ করা হয় নি। এই কমিশনের মাধ্যমেই কলেজসমূহের বেতন-ভাতা অত্যন্ত ব্যয়বহুল করা হয়। এতে করে নিম্নবিত্ত মানুষজন পুরোপুরিভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে ছিটকে পড়ে। এছাড়াও সব কলেজগুলোতে উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগের একচ্ছত্র ক্ষমতা কমিশন নিজেই সংরক্ষণ করে। ফলে সবদিক থেকেই ভারতীয় জনগণ সুষম শিক্ষার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন মন্তব্য করেন– সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই সরকারি নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক। এভাবে ব্রিটিশ সরকার নানারকম অশুভ তৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা সংকীর্ণ সীমায় অবরুদ্ধ করে ফেলে। যা মূলত ভারতীয় জনগণকে শিক্ষাবঞ্চিত করে রাখার জন্যেই গৃহীত হয়ে থাকে। এ অবস্থায় বৃহত্তর গণমানুষ শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে বরং নানারকম ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে। সীমিত আকারে যাওবা শিক্ষাধারা চালু ছিল– তা নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, পুঁথিসর্বস্ব ও জনবিচ্ছিন্ন। এবং সেখানে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার একটা বিকৃত-খণ্ডিত আধিপত্য বজায় ছিল। পূর্ণাবয়ব ভারতবাসী সমূহ অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে থাকে। "বিশেষ করে আধুনিক কালে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার যে চর্চা আমরা করেছি, প্রথমাবধি এবং মূলত তা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ একটি শিক্ষা। এই শিক্ষা নিতান্ত মুষ্টিমেয় মানুষকেই শুধু আলোকিত করে নি– গভীরতর বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারেও নিক্ষিপ্ত করেছে– সেই বিচ্ছেদ কী নিদারুণ ভয়ংকর, তা তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই সমূহ প্রতিভাত হয়ে এসেছে। ... রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, তাতেই তার সীমাবদ্ধতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে– 'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হলো এনলাইটেড, আলোকিত, সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ।"[৪৮] এই শিক্ষার অন্তঃসারশূন্য বিশুষ্ক ধারাপ্রবাহ বালক রবীন্দ্রনাথকে নিদারুণভাবে যন্ত্রণাদগ্ধ করে তোলে। পরবর্তীতে তিনি এর বাস্তবতা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের অধ্যয়ন-প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।"[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ সমকালীন শিক্ষার এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এরই আলোকে প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ-উদ্দেশ্য নিয়ে সারাজীবন অনুসন্ধান চালিয়েছেন। শারদোৎসব নাটকেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। এখানে তিনি শিক্ষা ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত মনন বিকাশের ব্যাপারটি একাকাররূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। যা ছিল তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রীতিমত বৈপ্লবিক প্রতিবাদ। সে সময় শিক্ষাপ্রণালি ইটপাথরের খাঁচায় বন্দি জীবনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তাতে জীবনের সার্বিক উপলব্ধিসমূহ অনুপস্থিত। শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য– জীবনের শিল্পসম্মত অনুশীলন এখানে প্রায় নির্বাসিত। পাঠ্যপুস্তকের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের সশঙ্ক অবস্থান গ্রহণ করতে হতো। পাশ মার্কের বৈতরণী পার হওয়ার জন্যেই সবাই সবসময় তটস্থ। এমনকি সংস্কৃতিচর্চাকেও এ ক্ষেত্রে বাহুল্য বলে মনে করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে, পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীত বাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন, সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার

করব। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি।"[৫০] এছাড়া সমকালীন শিক্ষার এই রূঢ় বাস্তবতার পাশাপাশি শিক্ষকদের আচরণেও তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। শিক্ষকদের নির্মম ব্যবহারের ফলে অনেক শিক্ষার্থীকে অকালেই ঝড়ে পড়তে হয়। যা রবীন্দ্রনাথের নিকট ভীষণভাবে পীড়াদায়ক ছিল। শিক্ষকমশায়ের রূঢ় আচরণে আতঙ্কিত শিক্ষার্থী প্রসঙ্গে তিনি বহুবার সমাচলোচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমবায়ে একটা নির্মম পরিবেশের চিত্র 'গিন্নি' গল্পে তুলে ধরেছেন। এছাড়া 'স্বর্ণকুমারী দেবী' (১৮৫৫-১৯৩২) ১৩০০ সালের 'ভারতী'তে 'সেকালের পাঠশালা' প্রবন্ধে বলেন, "পাঠশালার ছেলেরা গুরু মহাশয়কে যমের মত ভয় করিত।"[৫১] বিদ্যালয়ের এমনই আতঙ্কিত পরিবেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে যেত। মানসিক চাপের মুখে ভীতিপ্রদ পরিবেশে তাদের মন গোড়াতেই অথর্ব হয়ে পড়ত। যা কিছু ছিল, তা শুধুমাত্র মুখস্থসর্বস্ব বিদ্যার একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন অনুবর্তন মাত্র। সেখানে সৃজন-মনন-বিকাশ বা আত্মস্থ উপলব্ধির কোনো আনন্দ নেই। গৎবাঁধা মুখস্থ বুলির পৌনঃপুনিক উচ্চারণে শিশুমন কেবলই প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হয়েছিল। সেখানে সৃজনশীল আনন্দের ধারাপাত ও আত্মশক্তি বিকাশের পথটি ছিল একেবারেই অবরুদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "... বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে। কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনই একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"[৫২]

রবীন্দ্রনাথ ষোলো বছর বয়স থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্নভাবে শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে তিয়াত্তর বছর বয়সে আত্মগত মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন, "শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" এর জন্য তিনি সারাজীবনই সভা, সমিতি, সেমিনার ও রচনাসৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর প্রথম শিক্ষাবিষয়ক গদ্যরচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য' সমালোচনা নিবন্ধটির কথা উল্লেখ করা যায়। এখানেই তিনি প্রথম সমকালীন শিক্ষাকার্যক্রম নিয়ে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। ১৮৭৬ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "... বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই।"[৫৩]

উনবিংশ শতকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঐ সময়কার শিক্ষায় ধর্মীয় অধ্যাত্ম ভাবনা বা ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতিরও দারুণ অভাব লক্ষণীয়। শুধুমাত্র ক্লাসরুমের অবরুদ্ধ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের নিষ্প্রাণ ও পঙ্গু করে তোলা হতো। রবীন্দ্রনাথ এহেন অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেই শিক্ষাসংক্রান্ত রচনা ও শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন-বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। রবীন্দ্র-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বাস্তবসম্মত উপযোগিতায় গড়ে তোলা হয়েছিল। এখানে ঋতু উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব ইত্যাদির পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়। ফলে ব্যবহারিক শিক্ষা ও আত্মিক শুদ্ধতায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতি, ভগবান ও মানুষ– এই তিনের সমন্বয়ে সুষম শিক্ষাপদ্ধতির উপায়-উপযোগ গড়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উন্মুক্ত-উদার নিসর্গ প্রকৃতির সান্নিধ্যে তিনি শিক্ষার্থীদের মননশক্তির উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব শিক্ষাভাবনার মূলে কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলি গভীরভাবে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেন। এবং সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা অবলোকন করে বিস্ময়াবিষ্ট হন। 'রাশিয়ার চিঠি' নামক প্রবন্ধে তাঁর এই অভিজ্ঞতা-অনুভব ও আত্মগত উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন। 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকারান্তরে স্বদেশের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ। এ অভাব হচ্ছে লোকশিক্ষার অভাব, আর এ ত্রুটি হচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকারী শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি।"[৫৪] রাশিয়ার শিক্ষা ও এর স্বরূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা-অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে।"[৫৫] রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতিকে আত্মস্থ করেই তিনি ভারতীয় শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন। 'রাশিয়ার চিঠি'-নামক প্রবন্ধে তাঁর এ সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এসব আলোচনায় পাশ্চাত্য ও রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোকপাত তুলে ধরা হয়। এবং এ পর্যায়ে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিরও অন্তর্গত দৈন্যদশা নিবিড় পর্যবেক্ষণের

মাধ্যমে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "য়ুরোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যক্তির লাভকে, ব্যক্তির ভোগকে নিয়ে। তারই মন্থন-আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর পৌরাণিক সমুদ্রমন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুই'ই উঠছে। কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে অধিকাংশই পাচ্ছে না। ... এখানে প্রত্যেকের শিক্ষায় সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারণের কাজে সফল করতে চায়।"[৫৬] সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার এই শিক্ষাব্যবস্থার মূলে আছে সার্বজনীন গণশিক্ষা। এই সর্বানুগ জনশিক্ষার ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথকে শিক্ষাসংস্কারে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ পর্যায়ে তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (ভাষণ, ডিসেম্বর ১৯৩২, পুস্তিকা, ১৯৩৩), 'শিক্ষার বিকিরণ' (ভাষণ ও পুস্তিকা ১৯৩৩), 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' (বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪২), 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) প্রভৃতি রচনায় জনশিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

পূর্ববঙ্গে পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনার সুবাদেই রবীন্দ্রনাথ জনশিক্ষার সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এখানকার নিরক্ষর-নিরন্ন মানুষের দৈন্যদশা তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে অবলোকন করতে সক্ষম হন। যা শুধুমাত্র গণশিক্ষার মাধ্যমেই নিরসন করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত নদীমাতৃক গ্রামবাংলার সাথে একাত্মভাবনায় জীবনযাপন করেন। "জামিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া তিনি হাসিকান্না সুখদুঃখ-ভরা মানুষকে তাহার যথার্থস্থানে দেখিতে পাইলেন। উত্তরবঙ্গে বাস করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল– মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন।"[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাংলার সাথে নিবিড় আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়েই 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন। "শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটির ভাষা, অনুষঙ্গ ও উপমা-ইমেজ প্রভৃতি সযত্নে পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাবিষয়ক এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণমূলক রচনাটির প্রেরণা-উৎস নিশ্চিতরূপেই গ্রামবাংলা। পল্লীগ্রাম ও পল্লীর জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যাপক ও গভীরভাবে দেশের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।"[৫৮] এই প্রবন্ধটি সমকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ আলোড়নের ঝড় তোলে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণমূলক ও বাস্তবভিত্তিক আলোচনায় তৎকালীন রাজনীতিক-চিন্তানায়কগণ সচকিত হয়ে ওঠে। "শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধটির বিশিষ্টতার অন্যতম প্রধান কারণ, রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত ও পৌষ ১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাধনায় প্রকাশিত এই রচনাটি প্রসঙ্গে সমকালীন তিনজন প্রধান চিন্তানায়কের লিখিত সমর্থন পাওয়া যায়। এই তিনজন মনীষী হলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দ মোহন বসু। ... রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার এই প্রাথমিক খসড়া থেকে অনুভব করা যায়। তাঁর আলোচনা ও বিশ্লেষণে তদানীন্তন দেশকাল পাত্র-নির্ভর একটি যুগভাবনাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"[৫৯]

পল্লীবাংলার মূঢ়, ম্লান, মূক, খেটে-খাওয়া মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা-দারিদ্র্য অবস্থা রবীন্দ্রনাথকে জনশিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মূলত সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই তাঁর এই চিন্তাচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষার মাধ্যমে এসব গণমানুষকে একটা সমুন্নত জীবনের অধিকারী করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। তাঁর ধারণা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে অর্থনৈতিক মুক্তি-অর্জন কখনো সম্ভব নয়। 'কালান্তর' গ্রন্থের 'সমাধান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়।"[৬০] জনশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই মস্কোয় ট্রেড ইউনিয়ন ভবনে সংবর্ধনার উত্তরে মুগ্ধ-অভিভূত রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দারিদ্র্য, মহামারী, সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর যন্ত্রশিল্পে আমাদের পশ্চাৎপদতা অর্থাৎ যা কিছু আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে সে সবই শুধু শিক্ষার অভাবের ফল"। (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০)।

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসঙ্গতিতে প্রচণ্ড মর্মপীড়া অনুভব করেন। সাধারণ গণমানুষ কখনো এহেন শিক্ষা পদ্ধতির সাথে অন্তরের সামীপ্য অনুভব করতে পারেন নি। এদের অনতিক্রান্ত দারিদ্র্য দৈন্যদশার সাথে কবি একাত্মতা অনুভব করেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, একমাত্র শিক্ষাই এই অবজ্ঞাত জাতি সম্প্রদায়কে মর্যাদার আসনে উন্নীত করতে পারে। এ প্রসঙ্গেই তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার নানা ক্রটিবিচ্যুতি নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা জনবিচ্ছিন্ন। জীবনের সাথে অন্বিষ্ট না হলে শিক্ষা কখনো পূর্ণাবয়ব মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। এছাড়া প্রকৃত শিক্ষার রসোপলব্ধিতে মাতৃভাষার মাধ্যম অপরিহার্য। আত্মগত বিকাশের সুষম পথটি প্রশস্ত হওয়ার সুযোগ পায়। অথচ ব্রিটিশ শাসিত শিক্ষাব্যবস্থায় নানারকম কৃত্রিম বিঘ্ন-বিপত্তি তৈরি করা হতো। যা মূলত ব্রিটিশ রাজনীতির অন্যতম প্রতিপাদ্য-প্রক্রিয়া– এতে কোনো সন্দেহ নেই। সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার এহেন ক্রটি-বিচ্যুতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে। নিশ্চয় ইহার মধ্যে

সেই চেষ্টা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলো ছিল ইংরেজি। ... তাহা কিছুই বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেঁয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না।"*

'রাজা' (১৯১০) নাটকে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মলীলার বিলাস-বলয়ে আবগাহন করেন। তথাপি এর মধ্যেও সমাজ রাজনীতির কিছু সত্যস্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। কারণ, দেশ-কাল-বিবর্জিত কোনো সৃষ্টিই মানুষের সমাজে টিকে থাকতে পারে না। মাটি ও মানুষকে স্বীকরণ ও অঙ্গীকার করেই সৃষ্টিসম্ভার অমরত্ব লাভ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিস্ময়কর সমাজ সচেতন কবি-ব্যক্তিত্ব বরাবরই দেশকালের নিরিখে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। এ পর্যায়ে তাঁর বহুধা-বিচিত্র জীবন পরিক্রমার মধ্যে 'রাজা' নাটকটির কথা উল্লেখ করা যায়। 'রাজা' রচনাকালীন পর্বে তাঁর সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম-অনুষঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অন্তর্মুখী ভাববিন্যাসের সৃষ্টিসম্ভার– 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪), 'গীতালি' (১৯১৪) প্রভৃতি কাব্য এবং 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালা এ সময়ে রচিত। এতসব অধ্যাত্ম-আত্মলীন সৃষ্টি প্রাচুর্যের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে সমাজ সচেতন ছিলেন।

'রাজা' নাটকের ব্রহ্মমহিমা বাদ দিয়ে এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চিত্রগাথা আবিষ্কার করা সম্ভব। এখানকার অরূপভাবনা, অদৃশ্য রাজা এবং ঠাকুরদা চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্র কাহিনী বাঙালি সমাজের প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত। তাছাড়া বালিকাবধূ সুদর্শনার বিভ্রান্তি-বিভ্রাট, সুরঙ্গমার অনুগত বিশ্বস্ততা, কাঞ্চীরাজের বাস্তববাদিতা, সুবর্ণের রাজাবেশী কপটতা, রোহিণীর কুটিলতা– সবই বাঙালি জীবনের নিজস্ব বোধবুদ্ধির আলোকে রচিত। সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজের চরিত্রে সমকালীন দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ রাজনীতির রূপ-প্রকৃতি চিত্রিত হয়ে ওঠে। সুদর্শনাকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে সপ্তরাজার যুদ্ধবিগ্রহ তৎকালীন ভারত রাজনীতিরই অন্তর্গত চরিত্র নির্দেশ করে। কন্যা সুদর্শনার স্বামীগৃহ পরিত্যাগে অভিমানহত পিতা কান্যকুব্জরাজ বলেন– "নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না, আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি। সে আমার ঘরের মধ্য শনিকে সঙ্গে নিয়ে আসছে।"[৬১] রাজার এসব কথাবার্তা ও আচরণের মাধ্যমে সমকালীন সমাজ রাজনীতির অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি আবিষ্কার করা সম্ভব।

'রাজা' নাটকের কেন্দ্রীয় দর্শন ভাবনা রানী সুদর্শনা চরিত্রকে ঘিরেই রসস্ফূর্ততা লাভ করেছে। 'রাজা' নাটকের প্রধান চরিত্র বালিকাবধূ সুদর্শনার মোহমত্ত বিভ্রান্তি ও সত্যদর্শন প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গৃহীত। বাল্যবিবাহের নানা বিপত্তি ও কুফল পরিণতি সুদর্শনা চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের প্রকোপে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসে। আট বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ও গৌরিদান প্রথা রক্ষার অনিবার্য বিধান অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ, বিয়ে বোঝার আগেই মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হতো। এবং সেখানে গিয়ে তারা নানারকম নির্মম বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রায় ক্ষেত্রেই এসব বালিকাবধূর জীবনে তীব্র কষাঘাত ও বেদনাঘন করুণ পরিণতি নেমে আসত। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রচনাসৃষ্টির মাধ্যমে এই নির্মম সামাজিক প্রথার প্রকৃতিচিত্র তুলে ধরেন। 'হৈমন্তী' (১৯১৪) গল্পে এই প্রথার ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া 'খাতা' (১৮৯৩) গল্পের 'উমা' ও সমাপ্তি' (১৮৯৩) গল্পের মৃন্ময়ী চরিত্রের মধ্যে বালিকাবধূর করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কন্যার বয়স দশ বছর পেরিয়ে গেলেই পিতার দুশ্চিন্তা ও কন্যাকে গৃহবন্দি করার চিত্র 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৮৯৪), 'অতিথি' (১৮৯৫) গল্পে লক্ষ করা যায়। এছাড়া বাল্যবিবাহের বিড়ম্বনার কথা রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যের 'নারীর উক্তি', 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় তুলে ধরেছেন। 'বধূ' কবিতায় বালিকাবধূ বলেছে– "আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে, অবাক হয়ে সবে কারণ খোঁজে।" 'পলাতকা' (১৯১৮) কাব্যের 'নিষ্কৃতি' কবিতায় এ প্রসঙ্গে কবির চমৎকার বাগভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায়–

"মা কেঁদে কয়, 'মঞ্জুলী মোর ওইতো কচি মেয়ে,
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে?– বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।
বাপ বললে, 'কান্না তোমার রাখো
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে

---

* র, র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ- ৪২১-২২

জান না কি মস্ত কুলীন ও যে।”[৬২]

এসব চরিত্র তৎকালীন সমাজজীবনে বেশ বিপত্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। যা রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থান করে দেখার সুযোগ পান। ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের ভাইদের বধূরাও সব বাল্য বয়সে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এগার বছর বয়সী মৃণালিনী দেবীকে বিয়ে করেন। এসব বাল্যবধূর অসহায়ত্ব-অনুভবের চিত্রগাথা নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'সুদর্শনা' চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলেন। রানী সুদর্শনা বিবাহ প্রসঙ্গে বলে– “... আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি।”[৬৩] তারপর সুদর্শনার বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি ও বিপর্যস্ত হওয়ার কাহিনী সমকালীন সমাজবাস্তবতার প্রতিচ্ছবিরূপে গৃহীত। যা আমাদের সুস্থ জীবনধারাকে রীতিমত শঙ্কিত করে তোলে। “বস্তুত বালিকাবধূর দুঃখ আমাদের সমাজে একটি লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনা।”[৬৪]

উনবিংশ শতকে বাঙালি নারীর এহেন দৈন্যদশা নিরসনকল্পে নানামুখী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ব্রিটিশ সরকার ও এদেশীয় কিছু প্রগতিশীল মনীষী এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। তবে মজ্জাগত সংস্কারের কারণেই তা অনেক ক্ষেত্রে রোধ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গৃহবধূরা দিনের আলোয় স্বামীর সম্মুখে যাতায়াত করত না। এছাড়া সামাজিক সংস্কার ও শাশুড়িদের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণেও বালিকাবধূদের দুর্দশা বেড়ে যেত। অথবা অতিরিক্ত মেলামেশায় পুত্রহারানো ও কাজের বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থেকেও বালিকাবধূদের দূরে সরিয়ে রাখা হতো। “... সুদর্শনাকে সমাজের একজন মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের গৃহবধূরূপে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাকে ঘিরে যে সমাজ রয়েছে, সে সমাজ বহু পুরাতন, যখন সহধর্মিণীর সঙ্গে দিবাভাগে স্বামীর সঙ্গে কথা বলাও, সমাজের আচারমতে, লজ্জার বিষয় ছিল। অথবা এ কথাও মনে করা যেতে পারে যে, চরম আদর্শবাদী বা চরম উদাসীন স্বামীর ঘরে নিতান্ত পরিবেশজাত কারণেই সহজাত কামনা বাসনা, আবেগ-অভিমানভরা নাজুকহৃদয়া বালিকাবধূর (সুদর্শনাও রাজার বাল্যবিবাহিতা পত্নী) মনে তার আপাত-উদাসীন স্বামীর প্রতি এমন একটা প্রতিকূল মানসিকতা দানা বেঁধে উঠতে পারে।”[৬৫] এছাড়া সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে রাতের আঁধারে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন হলেও ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই স্বামী কর্মক্ষেত্রে চলে যেত। 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা চরিত্রের মাধ্যমে তারও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়।

নারী সমাজের এই শত-সহস্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য তৎকালীন সমাজে নানারকম আন্দোলন-বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। ১৮৬০ সালে মেয়ের বিয়ের বয়স ১০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Act) অনুমোদন করা হয়। এতে কনের বয়স বারো বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল। এসব উদার মানবিক বোধবুদ্ধিজাত সংস্কারের মূলে বৃটিশ প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্যতম ভিত্তি হলো নারী স্বাধীনতা। এরই আলোকে ইংরেজ সরকার বিভিন্ন উপায়ে নারীর স্বাভাবিক-স্বাধীন জীবনযাপন উন্মুক্ত করে দেয়। এছাড়া দেশীয় কিছু প্রগতিপন্থী মনীষী এই প্রয়াস পদক্ষেপে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। এবং নানামুখী ব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ড গড়ে ওঠে। “ভারতবর্ষে আইন করে বাল্যবিয়ে বন্ধ করার আন্দোলন প্রথম শুরু হয় মহারাষ্ট্রে। আন্দোলনের সূচনা করেন সমাজ-সংস্কারক বৈরামজী মালাবারী (১৮৫৩-১৯২২)। এরপর বাঙলায় অনেকেই এই আইনের স্বপক্ষে কথা বলতে থাকেন। এক পর্যায়ে আইন করে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করে দেয়ার প্রস্তাব করেন রায় সাহেব হরবিলাস স্যর্দা। এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ১৯২৮ সালে। কমিটি (যোশী কমিটি)-তে একজন ব্রিটিশ মহিলা ডাক্তারসহ সকলেই ছিলেন ভারতীয়। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়ঃ

“অকাল মাতৃত্ব একটি কদাচার এবং একটি গুরুতর অন্যায়। ... যদি সতীদাহ বন্ধ করার জন্য আইনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে অকালমাতৃত্ব বন্ধ করার জন্য মানবের মঙ্গল এবং সামাজিক ন্যায়ের খাতিরে বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করার আরও প্রয়োজন আছে।”

স্যর্দা আইনে চৌদ্দ বছরের কম বয়স্কা বালিকার বিয়ে আইনত দণ্ডনীয় করা হয় ১৯৩০ সালের এপ্রিল থেকে। ১৯৪৯ সালে এই আইনে সংশোধনী এনে ঐ বয়সসীমা এক বছর বাড়িয়ে করা হয় পনেরো বছর।”[৬৬] এসব নানামাত্রিক উদ্যোগ আয়োজনের সাথে ব্রিটিশ সরকার ও রাজনীতির গভীর সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। অনবরত পরাধীন ভারতবর্ষের অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অনাচার-কুসংস্কার, বিপর্যয়-পরাজয়, গ্লানিকর-হানিকর সমূহ সর্বনাশা পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই একটা আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন। সুষম স্বপ্ন-আদর্শ, নান্দনিক বোধবুদ্ধি ও সমুন্নত জীবনোপলব্ধি প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করা সম্ভব। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। 'রাজা' নাটকে তাঁর অনুরূপ একটা আভাস-ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেছে। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রদর্শনে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশেষ কিছু দিক পরিলক্ষিত হয়। 'রাজা' নাটকে দেখা যায় যাবতীয় বিপ্লব-বিদ্রোহ, সন্দেহ-অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্র-সংঘাত ও বিপত্তি বিপর্যয়ের মধ্যেও অদৃশ্য

রাজা সুষম অবস্থানে অটল রয়েছেন। যে-কোনো পরিস্থিতি বা আঘাত আক্রমণের মুখেও সে প্রতিহিংসাপরায়ণরূপে কাউকে শাস্তি প্রদান করেন নি। এক উদার অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক ভাবসমবায়ে সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। এমনকি চরম বিক্ষোভ-বিদ্রোহ বা বিনাশ ভাঙনের মুহূর্তেও স্বকীয় অটল আদর্শের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে দীপ্যমান। এবং অত্যন্ত মৃদু-নম্র আদর্শভিত্তিক ও মানবিক বোধবুদ্ধির আলোকে সব সমস্যার সমাধান পথে এগিয়ে যান। এরূপ রাজার রাজ্যেই শুধুমাত্র শান্তিসুখের সুষম আদর্শ ও প্রকৃত গণতন্ত্র বজায় থাকতে পারে। প্রতিটি নাগরিক অবাধ, মুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে। অথবা এরকম রাজ্যে বর্ণবৈষম্য বা আচারসর্বস্ব কৃত্রিমতার কোনো বালাই নেই। পরাধীন ভারতীয় জীবনে এরকম একটা আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই তাড়িয়ে বেড়ায়। 'রাজা' নাটকের 'রাজা' চরিত্র সেই কাঙ্ক্ষিত রাজ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় বলেই অনুমিত হয়। নাটকটির সর্বত্র এই কঠোর-কোমল শাসক-রাজার উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়। অজিতকুমার চক্রবর্তী এই রাজাকে 'ডেমোক্রেটিক ভগবান'[৬৭] বলে অভিহিত করেন। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংলাপের মাধ্যমেও এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা অনুভব করা সম্ভব :

ক. 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'

খ. 'ঠাকুরদা। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না– সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।"

গ. 'কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কিরকম। রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই।'

ঘ. 'সুবঙ্গমা। দূরে নয় যা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ, তিনি কাছেই থাকবেন।

গণতন্ত্র বলতে ব্যক্তির সর্বময় স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কর্ম, চিন্তা, অধিকার থেকে শুরু করে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অন্বিষ্ট করা হয়। আধুনিক রাজনীতির অন্যতম মূলমন্ত্র এটি। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথ বেয়েও তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এবং দেশে দেশে নানামাত্রিক আবহ-অনুষঙ্গ নিয়ে এই বিপ্লব-বিদ্রোহ সংঘটিত হতে থাকে। ভারতীয় জীবনধারায় উনবিংশ শতকে এর সর্বোচ্চ স্ফূর্তি- বিকাশ লক্ষ করা যায়। বিশেষত, ইংরেজদের আগমন- শাসন ও সান্নিধ্য সহযোগের ফলে তা আরো বেশি বেগবান হয়ে ওঠে। এর ফলে পরাধীন ভারতীয়গণ স্বাধিকারপ্রমত্ত ভাষা ভঙ্গিমায় নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। ক্ষেত্রবিশেষে এই আন্দোলন- সংগ্রাম বিক্ষুব্ধ-বিকৃত পথেও ধাবিত হতে দেখা যায়। কখনোবা তা সহিংস ও সশস্ত্র প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি কখনো উগ্র জাতীয় বোধ বা সহিংস পথে আন্দোলন সংগ্রামের পক্ষপাতী নন। বরং নান্দনিকতার আদর্শিক বোধবুদ্ধির আলোকে তা পরিচালনার পক্ষে মতামত প্রদান করেন। যন্ত্রকে যন্ত্র অথবা অস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে কখনো প্রতিরোধ করতে চান নি। বরং অহিংস, আদর্শভিত্তিক ও পরমত সহিষ্ণুতার মাধ্যমে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মতাদর্শের ভিত্তিতে সবকিছু মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশা প্রাপ্তি অনেক স্থলেই সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা বিচ্যুত- ভয়ংকর পথে পরিচালিত হয়েছে। যেমন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন সংগ্রামও এক সময় সহিংস- সশস্ত্র পথে রূপলাভ করে। তাছাড়া স্বাধীনতা- সংগ্রাম থেকে শুরু করে দেশীয় প্রায় আন্দোলনই হিংসাত্মক ও বিধ্বংসী পথে সংঘটিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কখনো এহেন প্রয়াস প্রবৃত্তিকে সমর্থন করতে পারেন নি। বরং তীব্র ভাষা- ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ করেছেন। এবং এর অন্তর্গত স্বরূপ- প্রকৃতি উন্মোচন করতে প্রয়াসী হন। এ প্রসঙ্গে এর একটা সমাধানকল্পে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, একমাত্র ব্যক্তিচরিত্রের যথাযথ সমুন্নতির ফলেই এর একটা সমাধান সম্ভব হতে পারে। মানুষের আত্মগত উপলব্ধির ক্রমাগত উন্নতি ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের সর্বময় বিকাশ অপরিহার্য। এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, ধর্ম, পরিবেশ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাকার ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেন। একজন ব্যক্তি চরিত্রের সুষম সমুন্নতির ফলেই তার দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ড সুষম হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ধ্যান-ধারণা থেকেই সারাজীবন তাঁর যাবতীয় কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। এবং এ সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনা বা গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা দানা বেঁধে ওঠে। ফলে আধুনিক Democracy বা গণতন্ত্রবোধ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ভিন্নতর মাত্রা- মহিমায় ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি রাজার মধ্যেও এই গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এক অদৃশ্য রাজার রাজ্যে তিনি সবাইকে রাজার সমতুল্য রূপে দৃশ্যায়িত করেছেন। এতে ব্যক্তিচরিত্রের সর্বময় মুক্তি ও স্বাধীনতার কথাই বারবার ঘোষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নাট্যসৃষ্টি নয়– সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও নিজের এই গণতন্ত্রবোধ প্রকাশ করেছেন। এবং

স্বকীয় মতামত প্রদানে এতুটুকুও পিছপা হন নি । এমনকি তাঁর এই অবস্থান- অস্তিত্ব ভারতীয় রাজনীতি ছেড়ে বিশ্বরাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল । অর্থাৎ বিশ্বরাজনীতির পরিমণ্ডলে যখনই যেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন হয়েছে- তখনই তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করেছেন । তাঁর এই উচ্চারণ জীবনের শুরু থেকে একেবারে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন গণতন্ত্রের পক্ষে নিজের উচ্চকিত অবস্থান তুলে ধরেন । যেমন, চীনের বিরুদ্ধে জাপানি আক্রমণ, ইতালির আবিসিনিয়া দখল, ইউরোপে ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী জার্মানির আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ- ইত্যাকার ঘটনার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় নিজের অবস্থান তুলে ধরেন । এছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ায় নানামুখী পদক্ষেপ দেখে মুগ্ধ হন- অথচ সেখানকার একনায়কতন্ত্র দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেন নি । যা তিনি বারবার স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন । তাছাড়া তিনি মার্কিনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও নিজস্ব চিন্তাচেতনা তুলে ধরেন । এবং এই গণতন্ত্রের অন্তর্গত স্বরূপ- প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হন । সেখানকার রাষ্ট্র পদ্ধতিতে জনগণ মনের প্রতিফলন নেই বলেও তিনি মতামত দিয়েছেন ।

তাছাড়া পরাধীন ভারতের যাবতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সচেতন অংশগ্রহণ ছিল । সভা, সমিতি, সেমিনার ও লেখালেখির মাধ্যমে তাঁর এই প্রবণতা লক্ষণীয় মাত্রায় ফুটে ওঠে । ব্রিটিশ শাসকবর্গ বারবার এদেশীয় জনমনের ভাষা স্তব্ধ করতে চেয়েছিল । তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল । যেমন, মহারাষ্ট্রে সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় বেশ কিছু নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল (১৮৯৭) । এ পর্যায়ে জননেতা তিলক ও তার সহযোগীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন । এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন । তিনি সর্বাত্মকভাবে এই স্বাধিকারপ্রমত্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন । এসব আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নানাভাবে আইনগত পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল । যেমন, কুখ্যাত ‘সিডিসন বিল’ ও ‘দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রণয়ন করা হয় । ভারতীয় জনগণের কণ্ঠধ্বনি চিরতরে স্তব্ধ করার জন্যই এহেন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল । এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠরোধ নামক প্রবন্ধ রচনা করেন । এবং এর তেজোময় ভাষাভঙ্গিমার মাধ্যমে প্রতিবাদ- প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে ।

এছাড়া অন্যান্য কিছু চরিত্রের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় মেলে । যেমন, লোভী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা সুবর্ণ এবং কাঞ্চীরাজের মধ্যে রাজনৈতিক কৌটিল্য ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষণীয় । এদের প্রতিটি হাবভাব, চলাফেরা, ফন্দিফিকির ও পরিণাম-পরিণতি বাস্তবভিত্তিক নির্মম রাজনীতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে আমাদের সচকিত করে তোলে । তাছাড়া দাসী সুরঙ্গমার অতীত জীবনের পাপপঙ্কিল অধ্যায় এহেন রাজনীতি-সম্পৃক্ত সমাজজীবনের একটি পরিচিত দৃশ্য । যা আবহমানকাল থেকেই এদেশীয় ঐতিহ্যে মূর্ত হয়ে ওঠেছে । “মাতৃহীনা সুরঙ্গমার নীতিভ্রষ্ট বাপ আত্মজাকে পাপ কাজে নামিয়েছে- রাজানাট্যের এ ঘটনা অতি পুরাতন তথা অতি প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক অনাচার । যা আজও সমাজদেহের একস্তরে দুষ্টক্ষতের মতো বিদ্যমান ।”[৬৮]

রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা আনুপূর্বিক রসরহস্যের অভিব্যঞ্জনায় ভাস্বর । তথাপি এর মধ্যেও ‘অচলায়তন’ নাটকটি আশ্চর্যরূপে ব্যতিক্রম মর্যাদার অধিকারী । সমকালীন জীবন, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ‘অচলায়তন’ নাটকটি কেন্দ্র করে তুমুল সমালোচনার ঝড় ওঠে । রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো নাটক নিয়ে এতটা আলোড়ন লক্ষ্য করা যায় নি । কারণ, এই নাটকের বক্তব্য-ভাষায় সনাতন ভারতীয় সমাজভাবনা যেন একটা ভাঙনের মুখে আঁৎকে ওঠে । কুম্ভকর্ণের অলস নিদ্রায় নিদ্রিত ভারতবাসী অচলায়তনে আপনার স্থবিরক বিনাশী চিত্ররূপ দেখে জাগরণমন্ত্রে উজ্জীবিত হয় । এর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য জীবন ও রাজনীতির প্রাণবান-প্রবাহ মূর্তরূপ ধারণ করে থাকে । সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে এদেশের ধর্মকর্ম, জীবনাচরণ, সমাজসহিংসতা- প্রায় সবই রেনেসাঁর মন্ত্রসূত্রে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে গিয়েছিল । সে-সময়কার একটি বৈপ্লবিক সমাজসত্যকে অঙ্গীকার করেই ‘অচলায়তন’ নাটক রচিত হয়েছিল । সমালোচকগণ নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । এদের মধ্যে ‘অক্ষয়কুমার সরকার’ ও ‘ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়’ এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে এসব বাকবিতণ্ডার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন । সমালোচকদের অভিযোগ ছিল- ‘অচলায়তন’ নাটকে হিন্দুসমাজের ধর্মকর্ম ও জীবনাচরণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে । এবং এই ধর্মের তন্ত্র-মন্ত্র ও পৌনঃপুনিক আবর্তিত জীবনকে তীর্যকবাণে জর্জড়িত করে শোচনীয় পরিণাম নির্দেশ করা হয়েছে ।

‘অচলায়তন’ নাটকের আয়তনটি সমকালীন ভারতীয় সমাজেরই দৃষ্টান্তস্থল হিসেবে গৃহীত । এই সমাজের প্রাত্যহিক জীবনযাপন বরাবরই তন্ত্রমন্ত্র ও আচারসর্বস্ব মানসিকতায় সমর্পিত । শ্রেণিবৈষম্যের কারণে এখানকার প্রতিটি সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক । এই নাটকেও দেখা যায়, উঁচু দেয়ালের সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তি

তৈরি করা হয়েছে। আয়তনের বাইরে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শোণপাংশু ও দর্ভক সম্প্রদায়। এবং আয়তনের মধ্যে মন্ত্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণে সবাই প্রাণপাত সাধনা করে যাচ্ছে। জীবনের অন্য কোনো সহজ-স্বাভাবিক-সুন্দর দিকের প্রতি চোখ মেলে তাকাবার অবসর বা সুযোগ নেই। নাটকের বিদ্রোহী চরিত্র পঞ্চক এই দুর্বোধ্য মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণে বারবার আত্মবঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়। এহেন পরিবেশে মানসিক বিকারগ্রস্ত পঞ্চক উচ্চারণ করেছে : "ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর রসত্বানি।" এছাড়া ধ্বজাগ্রকেয়ূরী, শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন ও চক্রেশমন্ত্র ইত্যাদির গোলকধাঁধায় পঞ্চক পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু জীবন জিজ্ঞাসুরূপে কোনো আলোকিত পথের সন্ধান পায় নি। অবশেষে পঞ্চক বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আয়তনের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে। এতে শাস্তিস্বরূপ আয়তনের বাইরে তাকে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। আচার্যকেও অনুরূপ শাস্তির দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। এছাড়া উত্তরদিকের জানালা খুলে ফেলায় সুভদ্রের জন্য কঠিন প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারণ করতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ইংরেজজাতির আগমনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। ধর্ম, অর্থ, সমাজ, রাজনীতি–প্রায় সবক্ষেত্রেই একটা আমূল পরিবর্তিত ধারা সম্ভব হয়ে ওঠে। সেখানে সবকিছুই উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের আলোকে গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। "উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁর যুগ। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফলে মানুষের মন থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা দূরীভূত হয়ে বাংলার মানুষ যুক্তিবাদ, জীবন জিজ্ঞাসা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। ইউরোপীয় রেনেসাঁর মত আমাদের নবজাগরণী এত বিশাল ও ব্যাপক না হলেও আমরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনবোধ ও অসাম্প্রদায়িক মানব প্রেমে উদ্ভাসিত হই।"[৬৯] এমনকি বাঙালির সনাতন ধর্মকর্মও নানামুখী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। এ অবস্থায় ইংরেজ জাতির আগমন ও 'অচলায়তন' নাটকের অন্তর্গত ভাবদর্শনের মধ্যে অনেকেই সাজুয্য খুঁজে পেয়েছেন। আচারপরায়ণ আয়তনে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে প্রাচীর ভেঙ্গে কর্মপাগল শোণপাংশুদের অনুপ্রবেশকে ইংরেজদের সাথে তুলনা করা হয়।

"... অচলায়তনে যেমন যৌবনের দূত বিদেশী শোণপাংশুগণ ... বিদেশী ইংরেজ আমাদের স্থবির দেশে আসিয়া যে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে। খুব সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে সে ভাবটি কবির মনে কাজ করিতেছিল।"[৭০] শোণপাংশু ও আয়তনিকদের দ্বন্দ্ব মূলত বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্গত সত্য স্বরূপরূপে পরিগণিত। প্রগতিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিনিয়ত ভারতীয় রাজনীতিকে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ করে তোলে। এবং ভারতবর্ষের মন্থর একঘেয়ে সমাজে বিদেশী-বিভাষী ইংরেজ জাতির আগমনের ফলেই তা সংঘটিত হতে থাকে। "শোণপাংশুদের অচলায়তনে আক্রমণের মধ্যে আমাদের দেশে ইউরোপীয় শক্তির প্রথম সংঘর্ষের ব্যঞ্জনা আছে।"[৭১]

সমুদ্র-পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ বিশ্ব পৃথিবীর প্রাণধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। যুগ যুগব্যাপী যেখানে নানা জাতি ধর্মের আগমন ঘটে। বিশেষত, ঊনবিংশ শতকে এখানে পশ্চিমা জাতির বৈপ্লবিক অনুপ্রবেশ সংঘটিত হতে থাকে। এবং এরা কর্মমার্গী জাতি হিসেবে এদেশীয় সমাজ রাজনীতিতে একটা আদিগন্ত পরিবর্তনধারা সূচনা করে। 'অচলায়তন' নাটকে এরই প্রভাব-প্রচ্ছায়া লক্ষণীয়। সেখানে গুরুরূপী প্রগতিশীল কর্মমার্গী জাতি অচলায়তনে প্রবেশ করে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই নাটকটির আলোচনায় অনুরূপ ভাবানুষঙ্গের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন, যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন এবং যেখানে তপ্ত বালু-বিছানা খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে; ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই খাটে। অবশ্য এই সর্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।"[৭২] 'অচলায়তন' নাটকের দাদাঠাকুর চরিত্রটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় অনেকটা ব্যক্ত হয়েছে। এই চরিত্রটি তিনি সর্বকলুষমুক্ত প্রগতিবাদী আদর্শিক ভাবভাবনার আলোকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে তাঁর সুষম রাষ্ট্রধর্ম ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা আবিস্কার করা অসম্ভব নয়। দাদাঠাকুর এক সময়ে বলেছেন, "অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।"[৭৩] এ কথার মাধ্যমে রবীন্দ্রদর্শনের প্রগতি ও স্থিতধী ভাবনার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আদর্শ রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ মতাদর্শই অধিকতর উপযোগী বলে তিনি মনে করতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি তাঁর মানসভূমি বিশেষভাবে উর্বর করে তোলে। ভারতীয় তথা আয়তনিকবাসী অলঙ্ঘনীয় হাজারো সংস্কারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-

সান্নিধ্যই স্বকীয় সত্তা ফিরে পেতে সাহায্য করেছিল। এ অবস্থায় সদা হাস্যোজ্জ্বল সর্বজনপ্রিয় দাদাঠাকুর নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

সমকালীন ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে পুঞ্জিভূত শাস্ত্র পুঁথি, বিধিবিধান, বিচিত্র গণ্ডি, মন্ত্রতন্ত্রের গুঞ্জনধ্বনি, অলীক অহংকার, অপ্রতিভ ধর্মাসক্তি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ইত্যাদি এদেশীয় মানুষকে অক্টোপাসের মতো সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যা 'অচলায়তন' নাটকে নির্মম সত্যস্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, একজটা দেবীর কাল্পনিক ভয় ও আটান্ন প্রকার আচরণবিধির দাপটে জীবন কেবলই অথর্ব ও বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় গুরুরূপী দাদাঠাকুরের আগমনে উনিশশতকীয় মানবমহিমা সঞ্চারিত হয়। এবং পরিশেষে আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সুষম অবয়ব-অনুষঙ্গই 'অচলায়তন' নাটকের পরিণতি নির্দেশ করে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাকামী ভারতীয় রাজনীতির উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। "এই নাটকটিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বাংলাদেশের উদার পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত' সম্প্রদায়ের সমাজ-মানসের রূপ-রূপকের আশ্রয়ে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।"[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ এই সমাজ বাস্তবতার প্রতিনিধি-প্রতিভূরূপে 'অচলায়তন' নাটকে স্বকীয় ভাবদর্শন প্রয়োগ করতে সমর্থ হন। এখানে সমকালীন রেনেসাঁর প্লাবনে ভেসে-যাওয়া গতানুগতিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ততার মধ্যে চিত্রিত করা হয়। এবং সেখানে আধুনিক যুগভাবনার বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্তন করেন। "মিথ্যা অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙিয়া উত্তর-পশ্চিম পূর্ব দক্ষিণ হইতে উন্মুক্ত বাতাস, জ্ঞান মহাগুরুর রূপ ধরিয়া সবেগে সজোরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়াছে। অচলায়তন গড়িয়া তুলিলে এই ভাবেই তাহা ভাঙিয়া পড়ে। ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম, ইহাই ভারতবর্ষের, বাংলাদেশের ইতিহাস, এই ঐতিহাসিক শিক্ষাটি, এই সজ্ঞান বোধটি অচলায়তনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[৭৫] এখানে পাশ্চাত্য জাতির গতিশীল জীবন-চাঞ্চল্য শোণপাংশুদের রূপকাবহের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অনির্দেশ্য কর্মপাগল শোণপাংশু ইউরোপীয় জাঁতির প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত। ইউরোপীয় জাতি-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে কর্মপাগল শোণপাংশুদের তৎপরতা মনে করিয়ে দেয়। সপ্রসঙ্গ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এমনি করে কেবলমাত্র করে যাওয়া চলে যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ।"[৭৬] এই সাদৃশ্য সমবায়ের ভিত্তিতে 'অচলায়তন' নাটক প্রসঙ্গে সমকালীন সমাজ-ভাবনা সবিশেষ আলোচনার দাবিদার। একটা সুসঙ্গত সমাজ ভাবনা ও রাজনীতির দিকনির্দেশনাও চিহ্নিত করা সম্ভব। যা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে নিজস্ব মতামত স্পষ্ট করে তোলেন। "রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা বা ভাবনার আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত নাটকের কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না এই অর্থে যে তাঁর জীবনের একরকম প্রায় শেষ অবধি এই ধারণা দৃঢ় ছিল যে অচলায়তনের মতো এই সমাজদেহে যা অচল বা অনড় তারই বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংহতির মধ্যেই আমাদের জাতির গ্লানি মুক্তির পূর্ণ সম্ভাবনা নিহিত।"[৭৭]

'অচলায়তন' রচনাকালীন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় পাশ্চাত্য রাজনীতি-সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এদেশীয় সমাজজীবনে একটা পরিবর্তনের ঝড় বইতে শুরু করে। বিশেষত, ইউরোপীয় সর্বমানবিক-উদার চেতনাবোধের সাথে ভারতীয় ধর্মজিজ্ঞাসায় দ্বন্দ্ববহুল পরিস্থিতি তৈরি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এরই প্রেক্ষাপটের আলোকে 'অচলায়তন' নাটক রচনা করেন। তিনি সমকালীন সমাজ বাস্তবতার তাগিদে সর্বমানবিক সমন্বয়সূচক ব্রাহ্ম ধর্মের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন সমাজের মজ্জাগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আচার সর্বস্বতার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন। যার প্রতিচ্ছবি 'অচলায়তন' নাটকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে 'ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা (১২ মাঘ, ১৩১৭, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পঠিত কবির ভাষণ) প্রবন্ধে নিজস্ব মতামত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পাশ্চাত্য জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় জীবনদর্শনের একটা তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল।"[৭৮]

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র বা রাজনীতির আলোকে 'অচলায়তন' নাটক রচনা করেন নি। মূলত সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে একটা উদার-অসাম্প্রদায়িক ও সুষম সমাজ রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অনুরূপ চেতনাবোধ থেকেই তিনি 'অচলায়তন' নাটকের প্লটসংঘটন গড়ে তোলেন। তবে ধর্মের অনতিক্রম্য বৈষম্য-বিদ্বেষ

সর্বভারতীয় রাষ্ট্র সমাজের একটি পরিচিত দৃশ্য। বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান বা অন্য কোনো সম্প্রদায় নয়– সর্বভারতীয় ধর্মরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বরাবরই একটা বিভেদ-বৈষম্য অব্যাহত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে... অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।"[৭৯] তবে নাটকটির সার্বিক দিক বিবেচনা করে বলা যায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের প্রভাবই এর মধ্যে অধিক পরিমাণে লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জীবনাচরণও নানারকম রূপক প্রতীকের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে ধর্মের বিকৃত ও মন্ত্রমত্ত অসাড় জীবনের চিত্ররূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। তবে মন্ত্রের কার্যকারিতাও স্বীকার করা হয়েছে। "অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। ... কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে।"[৮০] রবীন্দ্রনাথের এরূপ মন্তব্য থেকেই 'অচলায়তন' নাটকের অন্তর্গত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা সম্ভব। তবে এই নাটকের উপকরণ-উপাদান অনেকটাই বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে গৃহীত। নাটকটির মূল কাহিনী, তন্ত্রমন্ত্র, ক্রিয়াপ্রকরণ, নামধাম– প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মপদ্ধতির সাথে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। অচলায়তনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর-বেষ্টিত পরিবেশ ওদন্ত-পুরী, নালন্দা ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া এই নাটকে উল্লিখিত একজটা দেবী হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তন্ত্রেই আরাধনা করা হয়ে থাকে। এবং ধারণী মন্ত্র, ব্রত ও প্রায়শ্চিত্তের বিধিবিধান ভক্তিবাদী সমাজের লৌকিক প্রতিফলন বলে অনুমিত হয়। তবে সবকিছু মিলিয়ে সমকালীন হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম ও রাষ্ট্র সমাজের চিত্রই 'অচলায়তন' নাটকে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। আচারসর্বস্ব ধর্মীয় প্রবণতায় সমাজজীবন রীতিমত মুখ থুবড়ে পড়ে। এবং এরই প্রভাবে পুরো রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিজস্ব গতিপথ হারিয়ে ফেলে। উনবিংশ শতকের শেষপাদ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতীয় রাজনীতিতে এরই প্রভাব-প্রচ্ছায়া গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকে। যা ইংরেজ শাসকদের উপস্থিতিতে আরো বেশি তীব্র আকার ধারণ করে। বিশেষত, হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রসংস্কারের প্রেক্ষাপটে সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দেশ করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য। "অচলায়তনের ভিতর দিয়া যে সমাজের রূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মুখ্যতঃ হিন্দুসমাজ নহে এবং যে ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহাও হিন্দুধর্ম নহে; তাহা সম্পূর্ণ বৌদ্ধ সমাজ এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম, যে.যুগে বৌদ্ধধর্ম একান্ত আচার-সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল, সেই যুগের বৌদ্ধ সমাজের কথাই তিনি তাহার নাটকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক হিন্দু সমাজই যে তাহার লক্ষ্য ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"[৮১]

'অচলায়তন' নাটকের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো স্থান-কাল বা ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা তাড়িত হন নি। আয়তনিক গড়ে তোলার ব্যাপারেও কোনো রাষ্ট্রকাঠামো বা রাজনীতির নীতি-আদর্শ পরিদৃষ্ট নয়। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা ভাববাদী-আদর্শ রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক চেতনাবোধ নীরবে-নিভৃতে প্রাণসঞ্চার করেছে। তিনি প্রগতি ও স্থিতধীসম্পন্ন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতি। এবং এর ফলেই ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রগতির সমন্বয়ে সুষম সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠতে পারে। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই নিজস্ব জীবনাদর্শ দ্বারা পরিচালিত। তবে তাঁর এই ভাবতাড়িত আইডিয়াও বাঙালি সমাজজীবনকে অবলম্বন করেই স্ফূর্তিলাভ করেছে। এই নাটকের উপকরণ, নাট্যক্রিয়া সমকালীন নানাবিধ সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। ধর্মের জটিল আবর্তনের ঘূর্ণিপাকে অবরুদ্ধ ভারতবাসীর দৈন্যদশাই অচলায়তন নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যা তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে অতীব বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করেন, "... দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ, অন্ধ আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।"[৮২]

'ডাকঘর' (১৯১২) নাটকটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটা অন্তর্লীন ভাববিলয় পর্বে রচনা করেন। এর কাহিনী, চরিত্র ও প্লটসংঘটন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। নাটকটির আদিগন্ত অবয়ব জুড়ে অতিন্দ্রীয় রসরহস্যের ভাবব্যঞ্জনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তথাপি সমকালীন সমাজ সত্য ও বাস্তব পৃথিবীর প্রাত্যহিকতা নাটকটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। সাধারণ জীবনের সহজ-স্বাভাবিক লৌকিকতা এই নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। যা আমাদের পরিচিত সমাজ বাস্তবতার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। "একটি বাস্তব পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই নাটকে একটি সঙ্কেত ব্যক্ত

হয়েছে । যদিও অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অরূপ ও অসীম এই নাটকের লক্ষ্য তবু সমগ্র পরিবেশটি প্রত্যক্ষ বাস্তব । মর্তমুখীনতা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত । নাটকটির ভাবঘন, একটিমাত্র দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে, কোথাও কোনো ছেদ নেই, নিবিড়তায় ভরপুর ।"[৮৩]

'ডাকঘর' নাটকের প্রধান চরিত্র অমল দত্ত । সে মাধবদত্তের অতি আদরের পোষ্যপুত্র । একমাত্র এবং পোষ্য বলেই চোখে চোখে ও বুকে আগলে রাখার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় । তাও আবার অমল অসুস্থ । কবিরাজের নির্দেশ– 'এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ ।' এ অবস্থায় অমলকে বন্দি ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে । কিন্তু সুদূরের প্রত্যাশী অমল দিনরাত জানালার কাছে বসে থাকে এবং রাজ্যের সব বিচিত্র দৃশ্য দেখে দেখে স্বপ্ন কল্পনায় আচ্ছন্ন । পরিশেষে রাজার চিঠি প্রাপ্তির প্রত্যাশায় শয্যাশায়ী অমল মৃত্যুর পরপারে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে । একটি সম্ভাবনাময় শিশুর অকাল মৃত্যু পরিণতি নাটকটিকে ঘিরে সকরুণ অভিব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে । যা 'ডাকঘর' নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে ।

সমকালীন সমাজের অন্যায় খবরদারিত্ব ও শাসনের ফলে অমলের মতো একজন নিরপরাধ অসহায় রুগ্ন শিশুর জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে । উপযুক্ত শিক্ষা, আনুকূল্য ও যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সে বঞ্চিত । সামাজিক বিধিবিধান কঠোর নিয়মনীতি ও শাসনের নামে শঙ্কা-ভীতি তার জীবনকে পঙ্গু করে তোলে । এভাবে প্রতিনিয়ত অজস্র শিশুজীবন অন্যায় নির্দেশনায় শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে চিরতরে হারিয়ে যায় । তারা সুশিক্ষার সুষম অনুভব-উপলব্ধির মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত । তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষানীতি ও সাম্রাজ্যিক আগ্রাসন অভিপ্রায়ই এর জন্য দায়ি । বিশেষত, ব্রিটিশ সরকারের আত্মপ্রসার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা এহেন বিরূপ-বৈরী পরিবেশ তৈরি করে দেয় । অগণিত সম্ভাবনাময় শিক্ষাজীবন বড় অকালেই নিঃশেষিত হয়ে যায় । 'ডাকঘর' নাটকের অমল চরিত্রটি এরই প্রতীক প্রতিভূরূপে দৃশ্যরূপ লাভ করেছে । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা তথা শিশুশিক্ষার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাস্তব পদক্ষেপ কার্যক্রমের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য । যা সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজনীতি ও শিক্ষানীতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাবন করা হয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী শিশুশিক্ষা নিয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । প্রবল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিঘ্নবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেন । যা ছিল পুরোপুরিভাবে অভিনব সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে পরিচালিত । রবীন্দ্রনাথ খোলা আকাশের নিচে একটি গাছতলায় চার পাঁচজন শিশু শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেছিলেন । যা ছিল সমকালীন ব্রিটিশ রাজত্বে রীতিমত বিস্ময়কর ও ধৃষ্টতার শামিল । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো দমে যাওয়ার মতো পাত্র ছিলেন না । তিনি প্রবল উদ্যমে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিবেশে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এই অভিনব শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন । যা শিশুমনের সাথে নিসর্গ প্রকৃতির অবাধ মুক্ত মেলবন্ধনের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে ওঠে । কোনো প্রকার শাসন খবরদারিত্ব বা মানসিক চাপ প্রয়োগের বালাই নেই । বরং হয়ে-ওঠার একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ সেখানে বজায় ছিল । এই শিক্ষাভাবনার বিস্তৃত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিভিন্ন সময়ে অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন । প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব ।"[৮৪]

... ...

"শিশুর কাছে বিশ্ব খুব করে আছে, আমরা বয়স্কেরা সে কথা ভুলে যাই । এইজন্যে, শিশুকে কোনো ডিসিপ্লিনের ছাঁচে ঢালবার জন্যে যখন তাকে জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের নিজের বানানো বলের মধ্যে বন্ধ করি তখন তাকে যে কতখানি বঞ্চিত করি তা নিজের অভ্যাসদোষেই বুঝতে পারি নে । ... বিশ্বের সঙ্গে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ এই উপায়ে সেটাকে কঠোর শাসনে শিশুকাল থেকেই নষ্ট ও বিকৃত করে দিই ।"[৮৫]

'ডাকঘর' নাটকের অমল চরিত্র বালক রবীন্দ্রনাথের প্রতিকল্পরূপেই চিত্রিত হয়েছে । তাঁর শৈশবজীবনের অবরুদ্ধ ভাবকল্পনা ও বন্দি জীবনের অন্তর্গত রূপরহস্য একাকার হয়ে ধরা পড়েছে । যা সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সম্ভবপর হয়ে ওঠে । " রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষানীতির কথা যদিও বলেননি, কিন্তু পরোক্ষভাবে এ আভাস অনুপস্থিত নয় । এবং অমলের জীবন পরিণাম বিবেকবান মানুষদের সেদিকেও দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে ।"[৮৬]

রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সারাজীবন নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর বহুভঙ্গিম নান্দনিক ভাবভাবনার অন্যতম সৃষ্টি 'ডাকঘর' নাটক। এখানে অমল চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রকল্পিত শিক্ষাদর্শ অনেকটাই অনুধাবন করা সম্ভব। 'ডাকঘর' নাটক রচনাকালীন পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' রচনা করেন। এখানে তিনি শৈশবকালীন বন্দি জীবনের চিত্র সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। যা অমল চরিত্রের সাথে গভীরভাবে সাজুয্য বহন করে। 'ডাকঘর'-এর বালক অমলের গৃহবন্দি জীবনের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের গৃহবন্দি জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। (তুঃ ছেলেবেলায় বাস্তব জগৎ থেক দূরে ছিলুম বলেই তখন থেকে চিরদিন আমি সুদূরের পিয়াসী, 'জীবনস্মৃতি' পৃ- ২০০)। ডাকঘরের অমল এবং 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর বাহিরে'র রবীন্দ্রনাথ বড়ো একাত্ম, রবীন্দ্রনাথের শৈশবের শ্যামের গণ্ডি যেন অমলের কবিরাজের নিষেধের গণ্ডিরই বিকল্প।"[৮৭] ছেলেবেলা শিশু রবীন্দ্রনাথ অমলের মতোই অবরুদ্ধ জীবনযাপন অতিবাহিত করত। এ অবস্থায় মনের অদম্য কৌতূহল ও রঙিন কল্পনাবিহ্বলতা তাঁকে সবসময় উন্মনা করে রাখে। রাজ্যের সব ভাবভাবনাও জানালার ফাঁক-ফোকড় দিয়ে নিসর্গ-প্রকৃতি শিশু রবীন্দ্রনাথকে মায়াবী হাতছানি বুলিয়ে যায়। ভৃত্যদের কঠোর নিয়ম শাসনের মধ্যে তাঁর দিন কাটত। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেন, "বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। আমাদের এক চাকর ছিল। ... সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।"[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়েও নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হন। তাঁর নর্মাল স্কুলের স্মৃতি অত্যন্ত করুণ ও মর্মবহ। এখানকার নিস্প্রাণ শিক্ষার দুর্বহ অভিজ্ঞতা তাঁকে পরবর্তীকালে শিশুশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং অমলের মতো প্রতিবাদী প্রতীকী চরিত্রসৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। স্কুলের ছকে-বাঁধা বাধ্যবাধকতায় প্রাণহীন শিশুশিক্ষাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপদ্ধতি ছিল অমানবিক। এহেন নির্মম বাধ্যবাধকতার কারণেই অমলের মতো অনেক সম্ভাবনাময় শিশুশিক্ষার্থী বড় অকালে ঝরে পড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্ররচিত 'খাতা' গল্পের 'উমা' চরিত্রটির সৃষ্টি–স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানেও দেখা যায়, উমার স্বাধীন শিক্ষা চিন্তা, লেখাজোখা ও সৃজনশীল ভাবপ্রবণতা বৈরী পরিবেশের জন্য মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রচণ্ড পারিপার্শ্বিক বিঘ্ন-বিপত্তি ও সংস্কারের কাছে সম্ভাবনাময়ী উমা নিদারুণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। উমা তার প্রিয় খাতাটির মাধ্যমে স্বকীয় চিন্তাচেতনার স্বাধীন স্বপ্নগুলো মেলে ধরে। অথচ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীতি-সংস্কার ও প্রথাবদ্ধ সমাজ বাস্তবতা উমার সৃষ্টিশীলতাকে বড় অসময়ে স্তব্ধ করে দিয়েছে। উমার প্রিয় খাতাটির প্রতি এই নিষ্ঠুর সমাজমানসের লোলুপ দৃষ্টি পড়তে দেখে সে আঁৎকে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক বর্ণনার আলোকে বলেন, "বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয় দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।"[৮৯] সৃজনসৃষ্টির অন্তরায়স্বরূপ এই প্রতিবন্ধক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকেও শৈশবজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিবেশেও তিনি এহেন পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। "ইস্কুলের সঙ্কীর্ণতর পিঞ্জর মনকে যেন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। তাহার উপর কোন কোন শিক্ষকের নিষ্ঠুর বচনে এবং সহপাঠীদের নিকৃষ্ট কথাবার্তায় ও আচরণে গৃহকোণলালিত সুদর্শন বালকটির শুচি ও রুচি ও কোমল মন ক্লিষ্ট হইত।"[৯০]

রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন, "ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। ... অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। ... শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে। তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।"[৯১] এহেন শিক্ষা-বৈরী পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশমান সৃজনসত্তা পলে পলে ভারাক্রান্ত হতে থাকে। এর জন্য মূলত তৎকালীন পররাজ্যগ্রাসী শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অশুভ তৎপরতাই দায়ি। যা 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রের মাধ্যমে অনেকটাই নাটকীয় বাগভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। অমল অবাধ মুক্ত জীবনে প্রাণের সহজ বিকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সে যেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি নীরব প্রতিবাদ। যাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিক ভাবানুরাগের আত্মগত অনুভবের অপরিসীম দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যসৃষ্টির মধ্যে মুক্তধারা অধিকতর সমাজসম্পৃক্ত রাজনীতি ও বাস্তবানুগ বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিস্নাত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংঘটিত ভারতবর্ষের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ-দৈন্যদশা, আন্দোলন-অন্বেষা, আগ্রাসন-

আধিপত্য ইত্যাকার বিষয়াবলি ‘মুক্তধারা’ নাটকের প্লট রচনায় সহায়তা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসন ও তাদের শোষণ-দমন, নিপীড়ন-নির্যাতন, পরাধীন ভারতবাসীর বঞ্চিত জীবনের নিত্যসঙ্গী বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট, কর-বন্ধ আন্দোলন ইত্যাদি ‘মুক্তধারা’ নাটকে অভিব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া পাশ্চাত্যের উৎকট যন্ত্রসভ্যতার নিষ্পেষণ ও মানবতার দহন-দীপ্তি ‘বিভূতি’ অভিজিৎ চরিত্রের মাধ্যমে রসস্ফূর্ততা লাভ করেছে। নির্যাতিত জনসাধারণ শিবতরাইবাসীর পক্ষে ধনঞ্জয় বৈরাগীর শান্তিপূর্ণ আন্দোলন তৎকালীন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত।

‘মুক্তধারা’ (১৯২২) নাটকটি রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কিছু নাটকের মতোই নামান্তর রূপান্তরের মাধ্যমে রচনা করেন। এর কাহিনীবীজ তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘বৌঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮১) থেকে গৃহীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে এই উপন্যাসের প্লট অবলম্বনে রবীন্দ্ররচিত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক ‘প্রায়শ্চিত্ত’ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের ছায়া অবলম্বনে ‘মুক্তধারা’ নাটক রচনা করেন। এবং পরবর্তীতে কিছুটা অদল-বদল করে রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারাকে চার অঙ্কবিশিষ্ট ‘পরিত্রাণ’ (১৯২১) নাটকে রূপান্তরিত করেন। একাধিকবার এভাবে পরিমার্জন ও শোধন-বর্ধন হলেও নাটকটির মূল বক্তব্য একই। তবে সব মিলিয়ে ‘মুক্তধারা’ নাট্যকাঠামোটি দর্শকনন্দিত ও সর্বজন পরিচিতি লাভ করেছে। আলোচ্য অধ্যায়ের রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে মুক্তধারার নাট্যসংস্থাপনকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

‘মুক্তধারা’ নাটক রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেছেন। এবং সেখানকার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক, জাতীয়তা-সাম্রাজ্যবাদিতা ও বেপরোয়া আত্মপ্রসারের চণ্ডনীতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। বিশেষত, সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি, উৎকট জাতীয়তাবোধ, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের মানববিধ্বংসী প্রয়োগ– ইত্যাকার পরিস্থিতি অবলোকন করেন। এসব পরিপার্শ্ব-প্রবাহ মুক্তধারা নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। শুধু তাই নয়, ‘মুক্তধারা’ নাটকের উপাদান অনুষঙ্গের মধ্যে এরই প্রতিভাস-প্রতিরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যন্ত্রশিল্পের বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও এর মানববিধ্বংসী প্রভাব-পরিণতি ‘মুক্তধারা’ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। বিজ্ঞানের নানামুখী আবিস্কার অন্বেষাকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন স্বাগত জানিয়েছেন। অথচ এই আবিস্কারের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগকে কখনো মেনে নিতে পারেন নি। “রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিতার কাছে জ্যোতিষ (astronomy) পড়িয়াছিলেন। গৃহশিক্ষকের কাছেও বিজ্ঞানের পাঠ লইয়াছিলেন। বিজ্ঞানে তাঁহার বরাবর কৌতূহল ছিল। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া বিষয়ে তিনি ঔৎসুক্য পোষণ করিতেন। আইনস্টাইন-প্লান্কের আপেক্ষিকবাদ ও আণবিক গণিত-জ্যোতিষবিদ্যার প্রসার অনেক দূর বাড়াইয়া দিলে রবীন্দ্রনাথেরও কৌতূহল বেশি করিয়া জাগিয়াছিল। নিজের লব্ধ জ্ঞানটুকু তিনি সাধারণ পাঠককে দিবার জন্য ‘বিশ্বপরিচয়’ লিখিলেন (আশ্বিন, ১৩৪৪)।”[৯২] রবীন্দ্রনাথ নবজাতক (১৯৪০) কাব্যের ‘কেন’ ও ‘প্রশ্ন’ কবিতায় বৈজ্ঞানিক ভাবভাবনার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে বিজ্ঞানকর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ-করা প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ধ্বংসাত্মক কুশ্রীতাকে কখনো গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ‘পক্ষীমানব’ কবিতায় বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের মতো ধ্বংসাত্মক চিত্র তুলে ধরেন,

> “যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি।
> স্থল জল যত তার পদানত
> আকাশ আছিল বাকি
>
> … … …
>
> আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
> কর্কশ স্বরে গর্জন করে
> বাতাসের জর্জরি।
>
> … … …
>
> ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
> আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
> জাগাইল বিভীষিকা।”[৯৩]

সমকালীন যন্ত্রসভ্য রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে রবীন্দ্রনাথ কখনো একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেন নি। যন্ত্রের পূজক হয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত আত্মিক শুদ্ধতাকে পদদলিত করে চলেছে বলে তিনি মনে করেন। এতে মানুষের শ্রেষ্ঠতম উপাদান মনুষ্যত্ববোধ বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার মিলন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়া

তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক হানাহানির পেছনে এই যন্ত্রই দায়ি বলে তিনি মতামত দেন। "যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দৌরাত্ম্য আর-কিছুই হতে পারে না তার পরিচয় বর্তমান যুদ্ধে দেখতে পাচ্ছি। কলিযুগের কলদৈত্য স্বর্গের দেবতাদের নির্বাসিত করে দিয়েছে।"[৯৪] রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ে বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াকে একটা সার্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। সর্বসাধারণের সাথে মঙ্গলসূত্রে সম্পর্কিত বিজ্ঞানচর্চাকেই তিনি গ্রহণ করার পক্ষপাতী। "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌঁছায়। সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয় সেখানেই তার ভয়ংকর পতন।"[৯৫] অথচ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আজ গোষ্ঠিগত কল্যাণে নিয়োজিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা পর্বতসম বিভেদ-বৈষম্য তৈরি হয়েছে। ফলে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় রাজনীতির মহত্তম বিধিব্যবস্থা রক্তাক্ত, বিকৃত ও কলুষিত হয়ে পড়ছে। হিংস্রতার লোলজিহ্বা পাশবিক ক্ষুধার সাথে সর্বত্র ধাবিত হচ্ছে। "বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগাম বাঁধছে। তাতে করে লোভের শক্তি হয়ে উঠছে প্রচণ্ড, তার আকার হয়ে উঠছে বিরাট। যে ঈর্ষা হিংসা মিথ্যাচারকে সে বিশ্বব্যাপী করে তুলছে তাতে করে য়ুরোপের রাষ্ট্রসত্তা আজ বিষজীর্ণ। ... তার বুদ্ধি তার ইচ্ছা তখন কলের পুতুলের মতো চালিত হয়, এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ।"[৯৬]

রবীন্দ্রনাথ ১৩২৩ সালে জাপান এবং ১৩২৭-২৮ সালে এক বৎসরের বেশি ইউরোপের সর্বত্র সময় অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা ও সেখানকার রাজনৈতিক রূপপ্রকৃতি মুক্তধারা নাটকের প্লটসংঘটন গড়ে তুলেছে। সমরোত্তর ইউরোপের অন্তর্বাহী রাজনীতি ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বরূপ-প্রকৃতি এখানে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেখানকার কদর্য-কুৎসিত যন্ত্রসভ্যতা ইতোমধ্যেই সারা পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে। ফলে সমাজব্যবস্থা নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক সমালোচক বলেন, "আমাদের কালে স্বদেশ ও স্বাজাত্যাভিমান মানুষকে কিরূপ অন্ধ ও স্বার্থলোলুপ করিয়া তুলিয়াছে, জড়-যান্ত্রিকতা মানুষের প্রাণকে লইয়া তাহার মনুষ্যত্ব লইয়া কিভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে, মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত যন্ত্র কি করিয়া মানুষের মস্তিষ্ককে ছাড়াইয়া যাইতেছে, এ সমস্তই আধুনিক সমাজ-মনকে অল্পবিস্তর আলোড়িত করিতেছে। মুক্তধারা এই আলোড়নের কাব্যময় রূপ।"[৯৭] মানুষের তৈরি এই যন্ত্রই মানুষকে বল্গাহীন আত্মনিপীড়ক গ্লানির মধ্যে পুড়িয়ে মারছে। পাশবিক লোভের হিংস্রতায় সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মননশীলতার সুষম সৌকুমার্য নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফেরে। উৎকট জাতীয়তাবাদের বিকৃত রাজনীতির অশুভ ছায়া সর্বত্র বিস্তৃত হতে থাকে। এতে আর্থ-সামাজিক জীবনব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রবাহ-পরিণতি পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৬ সালের ১২ ভাদ্র শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ' উৎসবে পঠিত 'হলকর্ষণ' প্রবন্ধে বলেন, 'কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ড বেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গনে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। ... ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠেছে কণ্টকিত।"[৯৮]

'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রসভ্য জীবনের অশুভ রাজনীতির চিত্রগাথা অঙ্কন করেছেন। যন্ত্ররাজ বিভূতি এই সর্বগ্রাসী সভ্যতার প্রতিনিধি। রাজা রণজিৎ এই হীনমন্যপ্রসূত রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত। রাজার আদেশেই বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করার জন্য জলস্রোতের উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়। মুক্তধারার উপরে নির্মিত এই লৌহযন্ত্রের বাঁধ শিবতরাইবাসীকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তারা জলকষ্টের মাধ্যমে দলিত-শোষিত ও প্রচণ্ড দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এই যন্ত্রশক্তির বলেই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ ও রাজনীতি সারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে চলে। 'মুক্তধারা' নাটকে মূলত এরই প্রতীক-প্রতিভাস মূর্ত হয়ে ওঠে। নাটকের শুরুতেই দূর আকাশের 'অভ্রভেদী' লৌহযন্ত্রের মাথাটা পরিদৃষ্ট হয়। এটি আসলে শক্তিমদমত্ত উত্তরকূটবাসীর অহংপ্রতীক-এর ব্যঞ্জনারূপেই নাটকে চিত্ররূপ ধারণ করেছে। 'মুক্তধারা' নাটকে অঙ্কিত নাগরিকদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে এই লৌহযন্ত্রটির স্বরূপবৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। "সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ঐ চূড়াটা এখনো জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে। দিনের বেলায়ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে অন্ধকারেও রাত্রিবেলার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।"[৯৯] এই বীভৎস যন্ত্রবাঁধ-এর মাধ্যমে শিবতরাইবাসীর প্রাণের স্রোত মুক্তধারাকে রুদ্ধ করা হয়। বিভূতি বহু প্রাণের বিনিময়ে বহু বছরের চেষ্টায় এই বাঁধ তৈরি করেছে। এই শক্তির অহংকারেই গর্বিত উত্তরকূটবাসী দেবতার আসনে যন্ত্রকে বসিয়েছে। এবং এই যান্ত্রিক সভ্যতাকেই তারা ভাগ্য বিজয়ের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে। এর ফলেই যন্ত্র ও জীবনের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দেয়। যা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্র ও রাজনীতির অন্তর্গত শক্তি ও ভিত্তিস্বরূপ। 'মুক্তধারা' নাটকে জীবনের প্রতিভূরূপে মুক্তধারার সন্তান 'অভিজিৎ' চরিত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিভূতির শক্তি-দর্পিত চরিত্র স্পর্ধার মাধ্যমে প্রকাশ পেলেও অভিজিৎ বিনম্র আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সঁপে দেয়। বৃহত্তর মানবতার কল্যাণে তার প্রাণ উৎসর্গীকৃত। সে মুক্তিপথের যাত্রীরূপে মুক্তধারার মরণ ফাঁস উন্মুক্ত করেছে। সে বলেছে– "জন্মকালের ঋণ শোধ যাত্রীরূপে মুক্তধারার মরণ ফাঁস উন্মুক্ত করেছে। সে বলেছে– "জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।"[১০০]

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎকট জাতীয়তাবাদের জিঘাংসা প্রবৃত্তি 'মুক্তধারা' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। পররাজ্যলোভী উত্তরকূট রাজ্যের রাজা রণজিৎকে এই শক্তির প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত করা হয়। এবং প্রজাসাধারণের মধ্যেও পাশ্চাত্য রাজনীতির উগ্র জাতীয়তাবোধ লক্ষণীয়। তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হিসেবে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। রাজা রণজিৎকে লক্ষ্য করে ধনঞ্জয় বৈরাগী বলেছে– "যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না। আমার উদ্‌বৃত্ত অন্ন তোমার ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। ... যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে।"[১০১] এসব সংলাপের মাধ্যমে রাজার অন্তর্গত স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব। যা মূলত পররাজ্যগ্রাসী রাজা ও রাজনীতির অন্তর্নিহিত স্বভাব চরিত্রকেই মনে করিয়ে দেয়।

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ঔপনিবেশিক প্রভুত্বশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে রূপাভিব্যক্তি লাভ করেছে। পাশ্চাত্য জাতির পররাজ্যলোলুপ হিংস্র মানসিকতা দিয়ে চরিত্রটি গড়ে তোলা হয়। মুক্তধারার বাঁধ ও নন্দিসংকট উপনিবেশবাদের সহায়ক উপাদানরূপে এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এই উভয় অর্গলই মূলত দাসত্বের শৃঙ্খলকে চিরস্থায়ী করে রাখার একটা ব্যবস্থা মাত্র। এতে পরাধীন ভারতবর্ষের মর্মদাহ ও ব্রিটিশ শাসনের নির্মমতা খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখানকার রাজা রণজিৎ ও উত্তরকূটবাসী ব্রিটিশ উপনিবেশের ছায়া অবলম্বনে গৃহীত। অন্যদিকে শিবতরাইবাসী ও তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের চিত্র পরাধীন ভারতবাসীর অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছে। রাজা রণজিতের নির্মম, একপেশে ও আধিপত্যপ্রবণ কথাবার্তায় ব্রিটিশ প্রশাসনের স্বরূপ-স্বভাব উন্মোচিত হয়ে পড়ে। "রণজিৎ। ... দু'বছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।"[১০২] মন্ত্রীর সাথে রাজার কথোপকথনকালে রাজার প্রশাসন-পদ্ধতি লক্ষ্য করার মতো– "রণজিৎ। তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নীচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।"[১০৩] এছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের রীতি-পদ্ধতি ও কূটকৌশলের কথাও রাজার মুখে অবগত হওয়া যায়। "রণজিৎ। যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।"[১০৪]

উত্তরকূটের জনগণ বরাবরই উগ্র স্বাজাত্যবোধের অহমিকায় অন্ধ। অহংবোধের তাড়নায় অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠেছে। এরা শিবতরাইবাসীকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখে। এমনকি তারা নিজেদের মধ্যেও পরস্পরের কাছে সন্দেহের ফলে বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, এরা কোনোপ্রকার মূল্যবোধের ধার ধারে না। তাদের এই স্বার্থকেন্দ্রিক পরশ্রীকাতর উন্মাসিকতার মূলে আছে বিশেষ ছাঁচের শিক্ষানীতি। যা তাদের শৈশবকাল থেকেই বিশেষভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে অবজ্ঞাত-অত্যাচারিত ও শোষিত শিবতরাইবাসী কানঢাকার দল, কানমলার দল। উত্তরকূটবাসীদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা, "ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।"[১০৫] অর্থাৎ, এরা শাস্ত্র ও শস্ত্র দ্বারা আক্রমণের ব্যাপারে সমানভাবে পারদর্শী। এতে দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা চেতনাই এদের মনকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফেরে। রবীন্দ্রনাথ অতীব নিখুঁত বাস্তবতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তরকূটবাসীর চরিত্র চিত্রিত করেন। উত্তরকূটের লোকেরা যন্ত্র দানবের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। সম্ভবতঃ কবি তাঁর প্রভুশক্তিকেই এখানে রূপায়িত করেছিলেন। শিবতরাইয়ের লোকেরা তদানীন্তন পাক ভারতের দলিত পিষ্ট জনগণ অথবা সারা বিশ্বের লাঞ্ছিত সমাজ, উত্তরকূটের বিরুদ্ধে শিবতরাইয়ের সংগ্রামে তদানীন্তন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।

'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূটের বিরুদ্ধে শিবতরাইয়ের সংগ্রাম তৎকালীন ভারতের অহিংস আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যায়-অবিচার, শাসন-শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধিকার চেতনা বিক্ষোভ বিদ্রোহ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। শিবতরাইয়ের নেতা ধনঞ্জয় বৈরাগী মহাত্মা গান্ধীর অবিকল অনুকৃতি হিসেবে চিত্রিত। ১৯২২ সালে সারা ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখনই 'মুক্তধারা' নাটক রচিত হয়। এ সময়েই মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে অহিংস আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। রাজসম্মান, খেতাব, অফিস-আদালত, আইন-পরিষদ ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের মাধ্যমে এই সংগ্রামী কর্মসূচী যাত্রা শুরু

করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর সবরকম আন্দোলনের প্রধান শর্ত ছিল– অহিংস অসহযোগ। শ্রেণি সমন্বয়ের সুষম সহাবস্থানকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। আত্মগত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেন, শ্রেণি বৈরীতা (class antigonism) মানুষের জীবনে কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে গভীরভাবে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। "মহাত্মার সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ অভিভূত– তাকে তিনি অন্তরে বাহিরে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেখানে মহাত্মা 'অধিনেতা' তাঁর বাণী 'ভয় নেই'। জাতির দুঃখবরণকে তিনি স্বীকার করে নেন নিজে দুঃখবরণের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেও। সেখানেই পরাধীন ভারতের এই দুই মনীষীর মানসিক সামীপ্য– একাত্মবোধ।"[১০৬] রবীন্দ্রনাথ 'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থের 'গান্ধীজী' প্রবন্ধে বলেন, "... তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠা করে তুলেছে, এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তার সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো– এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ।"[১০৭] প্রেমের সতত সহযোগ ও মানবিক বোধের অবিনাশী শক্তি এর পেছনে অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে। এই মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন রাজনৈতিক জীবনদর্শন দ্বারাই মহাত্মা গান্ধী বিশ্বপ্রতিম দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হন। এতে কোনো প্রকার জাতপাত বা বিভেদ বৈষম্যের বালাই নেই। "এই শক্তির প্রভাবেই বিষম হয় সুষম, বিচ্ছিন্নতা এসে সমাপ্ত হয় মিলনে, মানুষের সমস্ত প্রয়াস সংবদ্ধ হয় কর্মে, সুপ্ত আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে। ফলে কারোকে পর ভাবতে হয় না। Ways আর means-এর মধ্যেও আসে না মেরু ব্যবধান। আসুরিক শক্তিতে নয়, বাক-সর্বস্বতায় নয়, কল্যাণে প্রেমেই আমাদের সিদ্ধি। 'যারা নম্র তারা জয়ী হয়' এ কেবল সুবচন নয়, মহাত্মা তাঁর বাণী ও কর্মের মধ্যে এইভাবেই সেতু সংস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।"[১০৮] রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর এই অনন্যসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বরাবরই বিস্ময়াবিষ্ট ছিলেন। এবং এই চরিত্রের আলোকেই তিনি ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র অংকন করেছেন। অকুতোভয় সত্যসন্ধানী অহিংস ধনঞ্জয় বৈরাগী মহাত্মা গান্ধীরই প্রতিকৃতিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। "ধনঞ্জয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস। আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।"[১০৯] এই ন্যায়নিষ্ঠ, অন্যায়ের প্রতিবাদী, সর্বজনপ্রিয় ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রমননে একাত্ম অনুভবে মর্যাদার আসন দখল করে নিয়েছে। প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা ও বিরুদ্ধ শক্তির মুখেও এঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ন ছিল। যা রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও বিক্ষোভ-বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে আদর্শিক-অবস্থিতিরূপে গৃহীত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সবসময় বিপ্লবী তৎপরতায় এরূপ আত্মিক শুদ্ধতার অহিংস জীবনীশক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। যা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম রাজনৈতিক দর্শনবাদরূপেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, 'গোড়া' (১৯০৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪), উপন্যাস 'না মঞ্জুর গল্প' (১৯২৫), 'সংস্কার' (১৯২৮) ও 'শেষ কথা' (১৯৩৯) গল্পে সহিংস রুদ্র সংগ্রামের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের কিছু রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ 'মুক্তধারা' নাটক রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে শিবতরাইবাসীর করবন্ধ আন্দোলন সমসাময়িক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি আলোড়িত ঘটনা। তৎকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে (১৯২১) সালে মেদিনীপুরে করবন্ধ আন্দোলন সংঘটিত হয়। এই আন্দোলন সংগ্রামও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং এই আন্দোলন অতীব শান্তিপূর্ণ ও সুসংঘটিত হয়েছিল যে, সেখানে শতকরা পাঁচ ভাগ রাজস্বও আদায় করা সম্ভব হয় নি। এছাড়া 'মুক্তধারা' নাটকে শিবতরাইবাসীদের দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবন তৎকালীন রাজনৈতিক আধিপত্য আগ্রাসনেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ব্রিটিশ শাসকদের লাগামহীন লুটপাট ও এদেশীয় পণ্য ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলেই ভারতবর্ষে বারবার মহামারী-দুর্ভিক্ষ আঘাত হানতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক অনাচার ও সাম্রাজ্যিক শাসন-শোষণ ভারতীয়দের জীবনব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে তোলে। এতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনপ্রদীপ বড় নির্মমভাবে নিঃশেষিত হয়েছে। "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাতটি দুর্ভিক্ষে পনেরো লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশটি দুর্ভিক্ষ এবং প্রায় দু'কোটি মানুষের মৃত্যুর কথা জানা যায়।"[১১০]

'মুক্তধারা' নাটকে অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে জলসমস্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, ভারতবর্ষ জলের দেশ হলেও জলাভাবও এদেশের সমাজজীবনকে বারবার বিপন্ন করে তোলে। ফলে বিভিন্ন সময়ে এদেশের মানুষকে আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। এমনকি তা ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেও গৃহীত হতে দেখা যায়। এতে সরকার বাহাদুরও নানা ছলচাতুরি ও রাজনৈতিক কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের গ্রামবাংলায় অবস্থানকালে বাঙালি জীবনে জলের কষ্ট মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি শিলাইদহ,

পতিসর, সাহজাদপুর ও প্রত্যন্ত এলাকার পল্লীতে বসবাস করার সময় সেখানকার জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেন । এ সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল । গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না । তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবাল । কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে, আগুন নিবারণ করতে হল । ... আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না ।”[১১১] এহেন জলকষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন বৃটিশ রাজত্বে বহুবার আন্দোলন-বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে । সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন ও আশ্বাস-আয়োজন সাহায্য-সমাধান সমানতালে চলতে থাকে । কিন্তু তবুও যেন জনজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে না । ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর এই জল সমস্যা ও আন্দোলন সংগ্রামের মুখে নানাপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে । এবং কখনো কখনো তা পুঁজি করে রাজনৈতিক বাহবা আদায়ের হীন চেষ্টায় লিপ্ত । রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহুবার এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন । এবং সভা, সমিতি ও বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে তুলে ধরতে সক্ষম হন । “গবর্মেন্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন– মনে করুণ, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না– তাহার ফল কী হইল । তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তা লাভ কল্যাণলাভের সূত্রে দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল ।”[১১২]

‘রক্তকরবী’ (১৯২৬) আধুনিক বস্তুসর্বস্ব জড়বন্দনা ও মনুষ্যত্বের আত্মবিধ্বংসী পটভূমিকার উপর রচিত । ইউরোপের লুব্ধ-সংগ্রহী পুঁজিবাদ যক্ষপুরীর রাজা ও রাজনীতির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । যা রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে ইউরোপ পরিভ্রমণের ফলে অনুধাবন করার সুযোগ পান । সেখানকার ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের সীমাহীন অর্থগৃধ্নু মানসিকতা ‘রক্তকরবী’ নাটকের প্রাণপ্রতিমা নির্মাণ করেছে । এবং তাদের যান্ত্রিক জীবনের শূন্যগর্ভ করুণ পরিণতি নাটকীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের মাধ্যমে চিত্রিত হয়ে ওঠে । বিশেষত, সমকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির অন্তর্গত চারিত্র্যচিন্তন এখানে আবিষ্কার করা সম্ভব । তাদের যন্ত্রবৎ জীবনযাত্রা, ছকে-বাঁধা বস্তুকল্পনা, একঘেয়ে মানসিকতা, শিল্পকারখানার বিষজর্জর দূষিত পরিবেশ, মানবাত্মার স্বকীয় মর্যাদার অস্বীকৃতি, লোভাতুর নখরদন্ত বিস্তার, বস্তুপুঞ্জের শবসাধনায় প্রাণপাত পরিশ্রম, তাদের অসহায় হৃদয়াকুতি– ইত্যাকার বিষয়াবলি ‘রক্তকরবী’ নাটকে শিল্পসুষম ভাবনায় তুলে ধরা হয়েছে । এহেন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনে প্রেম বা সৌন্দর্যের সুকুমার প্রবৃত্তি নির্বাসিত । জীবনের সহজ-সুন্দর ও সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশের কোনো নিশ্চয়তা নেই । বুরোক্রেটিক শাসন-পদ্ধতি, ধনতন্ত্রের উৎকট সংগ্রহশীল চিন্তা সেখানে সামাজিক জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করে দেয় । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অজস্র রচনা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের মতামত স্পষ্ট করে তোলেন । যেমন, ‘শিক্ষার মিলন’ ও ‘পঞ্চভূত’ প্রবন্ধে তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন । এ ছাড়া ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় পুঁজিসর্বস্ব রাজনীতি ও বণিক সভ্যতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় অবস্থান তুলে ধরেন । ধনলিপ্সার অপরিমিত মোহমত্ততা মানুষের সর্বপ্রকার মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে । যা রবীন্দ্রনাথ বরাবরই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করেছেন । এবং অত্যন্ত যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ণয় করা হয় । তিনি বলেন, “এখনকার সমস্ত সভ্যতাই ধনের পরাশ্রিত (parasite) । তাই শুধু ধনের অর্জন নয়, ধনের পূজা প্রবল হয়ে উঠেছে । অপদেবতার পূজায় মানুষের শুভবুদ্ধিকে নষ্ট করে, আজ পৃথিবী জুড়ে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে । মানুষ মানুষের এত বড়ো প্রবল শত্রু আর কোনোদিন ছিল না, কারণ ধনলোভের মতো এমন নিষ্ঠুর এবং অন্যায়পরায়ণ প্রবৃত্তি আর নেই । আধুনিক সভ্যতার অসংখ্য বাহুচালনায় এই লোভই সর্বত্র উন্মথিত এবং এই লোভপরিতৃপ্তির আয়োজন তার অন্য সকল উদ্যোগের চেয়ে পরিমাণে বেড়ে চলেছে ।”[১১৩] রবীন্দ্রনাথ কখনো পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক তৎপরতাকে সুনজরে দেখেন নি । তিনি সবসময় ব্যক্তিচরিত্রের আত্মিক শুদ্ধতা ও সুস্থ-স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ধারায় জাতির কল্যাণ নিহিত বলে মনে করেন । আত্মসমালোচনা-আত্মগঠন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিজীবনের ক্রমোন্নত পবিত্রতায় সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি সমুন্নত হতে পারে । অন্যদিকে জড়সর্বস্ব যান্ত্রিক বন্দনারীতি মানবিক বোধবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে দেয় । মানুষের আত্মগত বিবেক-মর্যাদাবোধ লোপ পেতে থাকে । এর ফলেই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ আসন গেড়ে বদ্ধমূল হবার সুযোগ পায় । একচেটিয়া বুর্জোয়া রাজনীতির অশুভ প্রভাব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দৃঢ়মূল হয়ে পড়ে । রবীন্দ্রনাথ বরাবরই এহেন পরিপার্শ্ব পরিস্থিতির অবসান কামনা করেছেন । “পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক তথা পুঁজিবাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা শুধু যে নেই, তা নয় । তিনি বিকল্প পথের সন্ধান করছেন । বুর্জোয়া সভ্যতা, সংস্কৃতি ক্রমশ দেখা যায়, বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কেও তাঁর আস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে ।”[১১৪]

এ পর্যায়ে ভারতীয় সমাজ রাজনীতির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানকার রাষ্ট্রকাঠামো বরাবরই গ্রামীণ সভ্যতার উপর নির্ভরশীল। সেখানে প্রতিটি গ্রামের সমাজজীবন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের এই স্বতঃপ্রণোদিত উৎপাদন ও ভারসাম্য ব্যবস্থা পুরো রাজ্য জুড়েই বজায় ছিল। "বহু কথিত একটি বাক্য, 'বাংলাদেশ একটি গ্রাম'। সত্যতা আছে এই কথাতে। বাংলাদেশের নগর এখনও দৃষ্টিগ্রাহ্য কিংবা উল্লেখযোগ্য নয়। নাগরিক আরও বেশি নয়। বাংলাদেশ জুড়েই গ্রাম, শহরেও তার ছায়া, শহরের মানুষের মধ্যেও তার ছাপ।"[১১৫]

অথচ এদেশে ইংরেজ আগমনের ফলে গ্রাম বাংলার সুসংহত অবকাঠামো বিলুপ্ত হতে থাকে। এদের সাম্রাজ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, শিল্পবিপ্লব ও রেনেসাঁর জোয়ারে পুরো ভারতবর্ষ নবরূপে অবয়ব পেতে শুরু করে। বিশেষত, পুঁজিনিরুদ্ধ শিল্পবাণিজ্য এদেশীয় ঐতিহ্যধারায় একটা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। রক্তকরবী নাটকে ঐতিহ্যিক গ্রামবাংলার একটা বিপর্যয়কর অবস্থা দৃশ্যরূপ লাভ করেছে। এতে দেখা যায়, সুষম গ্রামবাংলার একটা ধারাবাহী কাঠামো ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ছে। ইংরেজ বণিকবৃত্তির পুঁজিনিরুদ্ধ প্রবণতায় দেশীয় রাজনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। শিল্প বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য যাত্রাপথে সবাই শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। পুঁজি কেবলই ক্ষমতাদর্পিত কেন্দ্রমূলে জড়ো হতে থাকে। যা রক্তকরবী নাটকের প্রাণপ্রতিমা নির্মাণ করেছে। এবং নাটকের পরিণামী ভাবভাবনায় গ্রামবাংলার প্রতি একটা সম্মোহ ভাবনা নির্দেশ করা হয়।

"মার্কসের মতে, ব্রিটিশ শাসনের পুঁজিবাদী উপনিবেশবাদী স্বার্থ ভারতের ঐ চিরন্তন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পুরো কাঠামো ধ্বংস করে ফেলে। কিন্তু তার বদলে সেখানে নতুন ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি। ফলে ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ দুরবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। মার্কস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ভারতে কৃষি ও কুটিরশিল্প ধ্বংসের বর্বরতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন (আহমদ রফিক, প্রসঙ্গ বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ, কাকলী প্রকাশনী ২০০১ ঢাকা, পৃঃ ১৬ থেকে উদ্ধৃত)

এই পল্লী সমাজের দুর্গতি-দৈন্য রোধকল্পে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পল্লী উন্নয়নকল্পে তিনি এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ গড়ে তোলেন। যা তাঁর পল্লী প্রকৃতি প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন।

"ইংরেজ আমাদের পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। আমাদের মৃত্যু ঐ নীচের দিক থেকে, সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা। এইখানেই প্রাণ সঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি (পল্লী প্রকৃতি)। শহরসভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের যাবতীয় অস্তিত্ব কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। যা 'রক্তকরবী' নাটকের প্রাণপ্রতিমা গড়ে তুলতে গভীরভাবে সহায়তা করেছে। "যে দেশে (যেমন, রক্তকরবী রচনাকালীন ভারতবর্ষে) পুঁজি স্বল্প, সে দেশে পুঁজি নিবদ্ধ প্রযুক্তি যদি চালু করা হয়, তাহলে পুঁজি কেবলই জড়ো হতে থাকে বড়ো বড়ো শহরের কল-কারখানায় এবং গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে দূরে সরে আসে, ফলে শহরের ধনী এবং গ্রামের গরীবদের মধ্যে জীবনযাত্রার মান এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধার তারতম্য ঘটে। স্বভাবতই একদিকে গড়ে ওঠে নাগরিক সভ্যতাপুষ্ট নতুন এক অভিজাত শ্রেণী, যারা প্রচুর পায় বলেই প্রচুর ভোগ করে। ... অপরদিকে বিরাট অনুন্নত গোষ্ঠি, যারা দরিদ্র হওয়ার দরুণই ধনীদের ধন সংগ্রহের এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জীবন্ত উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।"[১১৬] এর ফলেই পুঁজিপতিরা সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে পড়ে। এবং এদের কেন্দ্র করেই পুরো সমাজ ও রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়া সারা ভারতবর্ষ ও বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার মূলেও এহেন পুঁজিসর্বস্ব রাজনীতি বিশেষভাবে দায়ি। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সভ্যতায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক মতামত প্রদানে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'দেশী ও বিদেশী', 'পূর্ব ও পশ্চিম', 'রাশিয়ার চিঠি', 'সমবায় নীতি' ইত্যাদি প্রবন্ধে এ সম্পর্কিত আলোচনার সাক্ষাৎ মেলে। এছাড়াও রবীন্দ্ররচিত অজস্র শিল্পসৃষ্টির মধ্যে পুঁজিবাদের বস্তুপূজা ও নাগরিক সভ্যতায় বেড়ে ওঠা অপতৎপরতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। যেমন, 'চিত্রা' কাব্যের 'নগরসংগীত' কবিতায় নগর জীবনের বিপন্নবিধ্বংসী চিত্র তুলে ধরা হয়। কবি বলেন,

"কোথা গেল সেই মহান শান্ত
নব নির্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বল নীল বসন প্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী।
আকাশ আলোকপুলকপুঞ্জ
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ

কোথা সে গভীর ভ্রমরকুঞ্জ।"[১১৭]

বস্তুপূজার নিষ্প্রাণ হীন প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বর্জন করতে বলেছেন। এতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বৃহত্তর জনজীবনে মানবিক বোধবুদ্ধি বিলুপ্ত হতে থাকে। এতে নীতিনির্ধারণী রাজনীতিও মুক্ত নয়। এ অবস্থায় জাতীয় জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসাটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ চীন, জাভা, পারস্য ও অন্যান্য দেশে এর ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করেন। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতার মূলেও এই বস্তুপূজার হীনজঘন্য প্রয়াস-প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ 'আফ্রিকা' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত রূপচিত্র অত্যন্ত কাব্যিক ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ একে অন্যের পরিপূরকরূপে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পুঁজিসর্বস্ব বস্তুপূজা সাম্রাজ্যবাদী আত্মপ্রসার প্রসঙ্গে বলেন, "কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না- যেমন করিয়াই হউক আগুন ধরাইতে হইবে।"[১১৮]

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ধনতান্ত্রিক শহরসভ্যতার নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। নাটকের পটভূমি হিসেবে যক্ষপুরী রাজা ও তার রাজ্য, রাজত্ব এবং রাজনীতির অন্তর্গত রাজনীতির স্বরূপ-প্রকৃতি উপস্থাপিত হয়। এবং এই উদ্দেশ্যে-অভিপ্রায় সাধন করার জন্যই তিনি বহুভঙ্গিম রূপক প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে দেখা যায়, এই রাজ্যে প্রজাসাধারণের পৃথক কোনো স্বকীয়-সত্তা নেই। শুধুমাত্র রাজার জন্য প্রয়োজনসর্বস্ব যাপিত জীবনে পাতাল খোদাই করে তালতাল সোনা উদ্ধার করাই কাজ। ঐশ্বর্যের পাহাড় ও ক্ষমতার অন্ধ আকুতি ছাপিয়ে রাজা-রাজ্যের নিঃসীম অসারত্ব প্রকটিত হয়ে ওঠে। নন্দিনীর ভাষায়, "নন্দিনী। অদ্ভুত তোমার শক্তি, যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিন্তু আশ্চর্য হইনি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চূড়ো করে সাজাচ্ছিলে। তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। ... আচ্ছা রাজা, বলো তো পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?"[১১৯] এতসব ঐশ্বর্যের মধ্যেও শক্তিমত্ত রাজার কোনো মানসিক স্বস্তি নেই। কেবলই শূন্যতা ও হাহাকার তাকে সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায়। এক পর্যায়ে তারুণ্য ও প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক নন্দিনীর কাছে নিজের বিশুষ্ক জীবনের অসহায়ত্ব তুলে ধরেন। সামান্য প্রাণকণিকার কাছে তার যাবতীয় দৈন্য-জড়ত্ব হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নেপথ্যচারী রাজাকে আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে শুনি- "আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি- তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে। তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে। ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।"[১২০] এর মাধ্যমে আধুনিক নগর জীবনের অন্তঃসারশূন্য চিত্ররূপ ধরা পড়ে। ধনলিপ্সার সীমাহীন লোভ-লালসা প্রতিমুহূর্তে মানুষের শুভবোধকে পদদলিত করে চলে। যা আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষত, ইউরোপীয় রাজনীতিতে এহেন পুঁজিসর্বস্ব প্রবণতার যান্ত্রিক মানসিকতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। "যন্ত্র দানবের স্তূপীকৃত স্বর্ণের এই নিঃস্ব রিক্তরূপ কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আমেরিকা ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে। সোনার চোখ ধাঁধানো তারা অন্ধ।"[১২১] মূলত এই পরিপার্শ্ব-প্রেক্ষাপট নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটক রচনা করেন। মকররাজ রাজ্যের খোদাইকর শ্রমিকদের যান্ত্রিক জীবনেও কোনো মানবিক পরিচয় নেই। তারা বিভিন্ন রকম গাণিতিক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। অথচ রাজার পাহাড়সম ঐশ্বর্য-বিত্ত এদের ঘর্মবিন্দু ও রক্তবিন্দুর উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের দিনরাত কর্মপ্রবাহ, গতিবিধি, জীবনাচরণ, বাসস্থান ও অন্যান্য অনুষঙ্গ আধুনিক নগরজীবনেরই বিশ্বস্ত রূপ। "শ্রমিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, ... ফ্যাক্টরী-সংলগ্ন স্থানে শ্রমিকদের বাসস্থান দান, নানা ব্লকে সেই অঞ্চল বিভক্ত, সারি সারি তাহাদের বাসা, তাহারা যাহাতে শান্ত থাকে এবং কোনো প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করে তাহার জন্য সদা সতর্কদৃষ্টি ও নানা কৌশল প্রয়োগ, ইহাদের বাসস্থানের নিকটে মদের দোকানের অবস্থিতি, তাহাদের মতিগতি জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্য বহুপ্রকারের কর্মচারীর ব্যবস্থা প্রভৃতি- ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিচিত চিত্র।"[১২২] এছাড়া 'রক্তকরবী' নাটকে মোড়ল সর্দারদের নির্মম আচরণ ও শ্রমিকদের বিদ্রোহ-বিপ্লব আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল নাগরিক জীবনের অনবদ্য চিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। যা সমকালীন ভারত ও বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত হতে থাকে।

'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর জীবনব্যবস্থা ও শাসনপদ্ধতি আমলাতান্ত্রিক। এখানকার নাগরিক জীবন কৃত্রিম, বিকৃত, নামহীন, গোত্রহীন, কলে ছাঁটা ও লেবেল আঁটা। শুধুমাত্র বস্তুপূজায় নিমগ্ন সভ্যতার উন্মাদনায় অস্থিচর্মসার মানুষের অনিঃশেষ নিবেদনে তা পরিপুষ্ট লাভ করেছে। '... যেখানে মানুষ অথবা তার মনুষ্যত্বের আর কোন স্বীকৃতি নেই। এক

অপ্রতিরোধ্য লোভের তৃষ্ণা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে; এই তৃষ্ণা তীব্রতায় যেমন দুর্বার, মানবিক ও শুভবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে তেমনি ভয়াবহ।"[১২৩] এসব খেটে-খাওয়া সহজ সরল মানুষের জীবন মুনাফাখোর লাভের ইন্ধনরূপে ব্যবহার করেছে। রক্তকরবী নাটকে এরকম শোষণ নিষ্পেষণের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। নগর সভ্যতার অমানবিক চাপে গ্রামবাংলা ও সেখানকার তরুণ সমাজ পিষ্ট হতে থাকে। এসব চিত্র দেখে নন্দিনী বলে ওঠে, "নন্দিনী। ও কী, ঐ-সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ঐ তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা গায়ে তেমনি শক্ত। ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়-চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই! ওদের এমন দশা কে করলে? ঐ-যে দেখি শক্‌লু, তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনূ-প, শকলু- এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি। তোমাদের নন্দিন, ঈশানীপাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, বঙ্কু যে! আহা! আহা! ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মত চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। ... গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল।"[১২৪]

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটক রচনা-প্রসঙ্গে গ্রামবাংলার এক সুসংহত রূপমাধুর্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। এবং এই গ্রামসভ্যতার ধ্বংসসাধনে আধুনিক নগর রাষ্ট্র ও রাজনীতির অপপ্রয়াসই দায়ি বলে তিনি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'র ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রামায়ণের রূপক ব্যাখ্যা করে এর মধ্যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব আছে বলে উল্লেখ করেন। এবং এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে কৃষি সভ্যতা ও যান্ত্রিক সভ্যতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়ে ওঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধু মহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাস-বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো।"[১২৫]

'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর মকররাজকে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিসর্বস্ব শোষণজীবী রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এখানে তাকে রাক্ষসরাজ রাবণের সাথে সাদৃশ্যকল্পনায় ফুটিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি যক্ষপুরীর দলিত-মথিত-ক্লিষ্ট নগর জীবনের সাথে ফসলে ফসলে ভরপুর কর্ষণজীবী গ্রামীণ সভ্যতার চিত্রকল্পও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক জীবনের ভারবাহী গ্লানিকর প্রাত্যহিকতায় পৌষালি পার্বণের নিবিড় পটভূমিকা স্থাপন করেছেন। সংগীতের অপরূপ সুরমাধুর্যের মোহমায়ায় নাটকের পাত্রপাত্রী একাত্ম-অনুভবে সেদিকেই ভেসে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকের সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঔৎসুক্য-কৌতূহল, পরিণাম-নির্দেশক পল্লীবাংলার রূপবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেন। ফলে নাটকটি সমাপ্ত হওয়ার পরেও দূরাগত আহ্বানে গ্রামে ফিরে যাবার একটা সুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে–

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।"[১২৬]

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' নাটকে সচেতনভাবেই আধুনিক শহর সভ্যতার পাশাপাশি গ্রামবাংলার ঐতিহ্যিক ধারাপাত দৃশ্যায়িত করেন। প্রসঙ্গত তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যন্ত্রসভ্যতার পাশে বিপর্যস্ত পল্লীর হৃদগৌরব উদ্ধারের লক্ষ্যে নানামাত্রিক উপায়ের কথা উল্লিখিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে শান্ত-সৌম্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশুদ্ধ গ্রামবাংলার মধ্যেই ভারতীয় সভ্যতার উৎস বলে উল্লেখ করেন। এবং এরই কার্যকর উজ্জীবনে আধুনিক উপায়-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদ, কুটির শিল্প, সামাজিক উন্নয়ন ও অন্যান্য হিতকর কর্ম সম্পাদন করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের কালিগ্রাম পরগণায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ কৃষি শিল্প স্থাপনার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ইচ্ছারই প্রতীকী অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। 'রক্তকরবী' নাটকের ঘটনাস্থল যক্ষপুরী। প্রকৃতপক্ষে এ নাট্যে এর কোনো ভৌগোলিক অবস্থান নেই। যন্ত্রবাদ ও ধনবাদ অধ্যুষিত নগর জীবনের যে অব্যবস্থিত রূপ, যক্ষপুরী তারই প্রতীক। যক্ষপুরীর বিপরীত বৃত্তে পৌষালি ভরা মাঠের রূপকল্পটি সাংগীতিক ব্যঞ্জনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে কবি মাটির তলাকার সোনার নেশা থেকে সোনালী ধানের নেশার দিকে যক্ষপুরীর মানুষের মন ফিরিয়ে নেবার প্রয়াস নিয়েছেন।"[১২৭]

'রক্তকরবী' নাটকে একনায়কতান্ত্রিক রাজা ও রাজনীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দৃশ্যগোচর হয়। তবে এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ ব্যক্ত করেন নি। নাটকের পরিণামচিন্তায়ও এর কোনো ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় নি। রাজা তার

ধ্বজাদণ্ড ও ক্ষমতার প্রচণ্ড অহংকার চূর্ণ করে প্রজাদের সাথে মিলিত হন। অথচ যেখানে কোনো সুস্পষ্ট রাজকাঠামো বা রাজনীতির নীতি-আদর্শ উল্লিখিত হয় নি। রাজার চিত্তগত দ্বন্দ্ব-দৈন্য ও টানাপোড়েন আত্মশুদ্ধির পথে উত্তরণই বক্তব্যবিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ধনতান্ত্রিক রাজ্যব্যবস্থার বৈষম্যমূলক অবস্থিতির বিরুদ্ধে তাঁকে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। তিনি মনের শুদ্ধতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া সমবায় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ মিলনমাধুর্যের সম্প্রীতি রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অপরিহার্য বলে মত প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার-কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে।”[১২৮]

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণকালে ধনগরিমার ইতরতার অভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবং সেখানকার সমবায়ভিত্তিক সাম্যবাদী প্রচেষ্টার সম্মিলিত কর্মপ্রয়াস তাঁকে দারুণভাবে মুগ্ধ করে। যা তিনি পুঁজিনিরুদ্ধ বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ উপযোগী হতে পারে বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “... যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করে তোলবার মূল উপায় হচ্ছে ধন-অর্জনে সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করা। তাহলে ধন টাকা-আকারে কোনো একজনের বা এক সম্প্রদায়ের হাতে জমা হবে না; কিন্তু লক্ষপতি ক্রোরপতিরা আজ ধনের যে ফল ভোগ করবার অধিকার পায় সেই ফল সকলেই ভোগ করতে পারে। সমবায়-প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে।”[১২৯] ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এই হল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাভাবনা। তবে সমবায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা তিনি প্রদান করেন নি। তবে এই ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনেরও পক্ষপাতী নন। তবে ‘রাশিয়ার চিঠি’ নামক প্রবন্ধে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগ ও স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দেয়ার পক্ষে মতামত দেন। এবং সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে পাওয়া চাই’ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। ফলে, এভাবেই ‘সম্পত্তির সমত্ব লুব্ধতায়, প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না’ বলে তিনি মনে করতেন। তবে, সবকিছু মিলিয়ে সমবায়নীতিই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শনে মূলীভূত সত্য হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। “তাঁর কাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমবায়ভিত্তিক হতে হবে কারণ তাঁর মতে সমবায়নীতি মনুষ্যত্বের মূলনীতি– এই নীতির অভাবেই পৃথিবীজোড়া অশান্তি। রবীন্দ্রনাথের মতানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, ধনভোগ করবার সুযোগ থাকবে (মানুষের মনে ধনভোগ করবার ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দখল করে মেরে ফেলা যায় না– সমবায়নীতি, রবীন্দ্রনাথ)। ভোগোপকরণের বৈচিত্র্য থাকবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সমবায় প্রথায় উৎপাদন থাকবে, রাষ্ট্রীয় প্রয়াসের তুলনায় ব্যক্তিপ্রয়াসের প্রাধান্য থাকবে আর থাকবে উদ্বৃত্ত অবকাশ যা তাঁর মতে মনুষ্যত্বচর্চার (সমবায়নীতি-রবীন্দ্রনাথ) পক্ষে অপরিহার্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্জিত কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রিত কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না বলে মনে করবার কারণ আছে।”[১৩০] মূলত সমবায় রীতি পদ্ধতিতে মানুষের আত্মগত শুভবোধের উদ্বোধন করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল কাম্য। কারণ, তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড মূলত ব্যক্তি মানুষের প্রতি বিনম্র ভালোবাসায় প্রোজ্জ্বল। আত্মিক শক্তির পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণই মূল লক্ষ্য। যেমন, ‘রক্তকরবী’ নাটকে রাজার চিত্তে প্রেম-সৌন্দর্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই প্রাণগত প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমেই বিভেদশূন্য সমবায়নীতি সম্প্রীতিলগ্ন এক মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় জনসমাজের রাষ্ট্রকাঠামো মোটামুটিভাবে একই ধারায় পর্যবসিত। সামন্তবাদী প্রথায় শ্রেণিবৈষম্য ও ভূস্বামীর একাধিপত্য সর্বত্র বজায় ছিল। সেখানে জনগণ-ভিত্তিক ব্যক্তিচরিত্রের স্বীকৃতি নিতান্তই উপেক্ষিত। “এ সমাজ ছিল মোটের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মনির্ভর পল্লী সমাজে (Village communitics) বিভক্ত। গ্রামের উৎপাদনেই মোটের উপর গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হত; বাইরের সামান্য জিনিসই আনা নেওয়া চলত। ... ভারতের অন্যত্র যেমন যেমন বাঙলা দেশেও তেমনি এই পল্লীসমাজ ছিল কৃষি-প্রধান সমাজ। ... অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যত্রের মতো বাঙলায়ও এই উৎপাদনের প্রধান অংশ যেত গ্রামের উচ্চবর্গের সেবায় (যেমন রাজপুরুষ, রাজসেবক, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন গুরু করণ প্রভৃতি), সামন্ত গোষ্ঠির নানা স্তরের ভূ-স্বামীর হাতে।”[১৩১] এই অনতিক্রান্ত বৃত্তব্যবস্থাই বাঙালির জনজীবনকে শত-সহস্র বছরব্যাপী আচ্ছন্ন করে রাখে। “স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের মতোই উপমহাদেশে বিশেষ ধাপের সমান্তবাদও অতি প্রাচীন। ঠিক কত প্রাচীন তা বলা সম্ভব নয়। একের পর এক বিভিন্ন রাজবংশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, শত শত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সে সব পর্যায়ে তবু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কোন হেরফের হয়নি।”[১৩২] এর ফলেই পুরো বাংলায় শ্রেণিবৈষম্যের অনড়-অবস্থান নানাপ্রকার শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে। সামন্ত প্রভুদের জুলুম নির্যাতনও ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। আর অন্যদিকে গণমানুষের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ-বঞ্চনা দানা বাঁধতে থাকে। মানুষ নানা উপায়ে পথ খুঁজতে

গিয়েও কেবলই আত্মগ্লানি বাড়িয়ে তোলে। কোনোরকম পরিত্রাণের সুযোগ মেলে না। "বর্ণভেদ প্রথার অনড় বন্ধন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের অর্থনীতি তথা তার থিতিয়ে থাকা জীবনের নিশ্চিন্ততা, স্নিগ্ধতা অতিক্রম করতে পারে না বাঙালী। সামন্ত প্রভুদের অত্যাচার আর জুলুমে সমাজে নীচু তলায় যে বিক্ষোভের বারুদ ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিলো– বিদ্রোহের আকারে বিস্ফোরণ ঘটে না তার। পাল আমলের শেষের দিক ও সেন আমলের স্বেচ্ছাচার-দুর্নীতি সত্ত্বেও পঙ্গুজীবন-যাত্রার ব্যত্যয় ঘটে না। আচার-আচরণের অরণ্যে দিগভ্রান্ত গণৎকারের গণনার উপর নির্ভরশীল রক্ষণশীল স্বেচ্ছাচারী বামুন-পুরুত আর দেহবাদী উচ্চবিত্তদের স্বেচ্ছাচার অব্যাহত থেকে যায়। জমি আর মাটির টানে বাঁধা বর্ণভেদ প্রথার শেকল পরা লোকায়ত সমাজ সান্ত্বনা খোঁজে সে যুগের গুহ্য রহস্যময় ধর্মসম্প্রদায়ের মহত্তম আদর্শ– মানবতা আর সাম্য ভাবনার মাঝে। সমাজে বর্ণভেদ প্রথার ভেদ-বুদ্ধি আর গ্রামীণ জীবনের বাঁধন অব্যাহত থাকে।"১৩৩

কিন্তু আধুনিক যুগ এই শ্রেণিভাঙার চেতনা নিয়েই জয়যাত্রা শুরু করেছে। এ যুগে মানুষ প্রবলভাবে অধিকার সচেতন আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রতিমুহূর্তে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়ছে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সীমাহীন প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিচরিত্রের স্বীকৃতিই মুখ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ রাজশক্তির আগমনের ফলেই অনুরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা সারা পৃথিবীতে আছড়ে পড়ে। ইংরেজদের আগমন সুবাদে যা ভারতবর্ষকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। পাশাপাশি এ সুবাদেই এখানে আধুনিকতার বাতাবরণ উন্মোচিত হতে থাকে। স্বাদেশিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারী স্বাধীনতা, মানববাদ, বিজ্ঞানচিন্তা, শিল্পবিপ্লব– ইত্যাকার বিষয়ানুষঙ্গ ভারতীয়দের জীবনে আমূল পরিবর্তনের ঢেউ তোলে। মূলত ব্যক্তিচরিত্রের আত্মজাগরণ ও জয়জয়কারই এ যুগের মূল কথা। এতে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অনতিক্রান্ত শ্রেণিচারিত্র্য বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। পারস্পরিক ঐক্যসাধন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। নানা শ্রেণিচরিত্রে বিভক্ত জাতপাতের মধ্যে একটা সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ রাজত্বের অনুরূপ কল্যাণকামিতায় বলেন, "ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্য সাধন প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবুও সে এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাট-বাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।"১৩৪

'কালের যাত্রা' (১৯৩২) গ্রন্থের রথের রশি নাটকটির মূলে সমকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্রিয়াশীল রয়েছে। এতে শ্রেণিবিভক্তি ও এর সকারণ বিলুপ্তির ইতিহাস নাটকীয় ভঙ্গিমায় বর্ণিত হয়েছে। এবং যা মূলত ইংরেজ শাসনের সুবাদেই সংঘটিত হতে থাকে। নাটকটিতে রথযাত্রার মেলা, নারীপুরুষ সম্মিলিত জনতার সমাগম, চিরভ্যস্ত পথে রথের অচলত্ব ও জনতা সাধারণের শঙ্কা, শূদ্রদের দ্বারা সচল রথের অভাবনীয় ব্যাখ্যা– ইত্যাদি ভারতীয় জীবনে যুগযুগান্তের রাজনীতি ও আধুনিক যুগে এর ভাঙন সৃজনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। স্বয়ং রাজা, পুরোহিত, ধনপতি ও সৈনিকদের মতো উঁচু সম্প্রদায়ের হাতে রথের অচল অবস্থান ও অস্পৃশ্য সমাজস্থিত শূদ্রদের হাতে রথের গতিশীলতাকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এতকাল শুধুমাত্র সমাজের অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই একচেটিয়াভাবে রথচালনার আনুষ্ঠানিকতা করায়ত্ত ছিল। অথচ আজ অস্পৃশ্য-অবহেলিত চিরবঞ্চিত শূদ্ররাও মহাকালের আমন্ত্রণে রথচালনার দায়িত্বে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। এর কারণ হিসেবে 'কালের অপমান করেছি আমরা তাই ঘটেছে এসব অনাসৃষ্টি' বলে একজন নাগরিক মন্তব্য করেছে। কালের অপমান রোধ ও মানবিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্যেই মহাকালবিধাতা শূদ্রদের নিয়োজিত করেছেন। "কালের রথে ইতিহাস-বিধাতা মহাকাল বসিয়া আছেন। জাতি-শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সেই রথ টানিয়া লইতেছে মানুষের পরস্পর সম্পর্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলিত শক্তিতেই রথ চলিতেছে। মানুষের এই পরস্পর-সম্পর্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তিই রথের রাশি বা দড়ি। যখন সমাজে এই মানুষের কোনো এক শ্রেণী বা জাতি অন্য শ্রেণী বা জাতিকে উপেক্ষা করিয়া কিংবা বিদ্বেষ বা ঘৃণা করিয়া নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করে। তখনই এই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, পরস্পরের স্বাভাবিক সম্বন্ধটি হয় ছিন্ন। মানুষে মানুষে প্রাণের বাঁধন হইয়া পড়ে আলগা। ফলে পরিচালনী শক্তি পায় হ্রাস এবং ক্রমে ক্রমে রশিটা হইয়া যায় অকর্মণ্য। হাজার টানিলেও রথ আর নড়ে না। তখন আবার শক্তির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য জনগণ ভাগ্য-বিধাতা মহাকাল সেই স্বার্থপর, সর্বগ্রাসী, অন্যায়স্ফীত শ্রেণীর অস্বাভাবিক উচ্চতা, গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে খর্ব করিয়া, উপেক্ষিত ও পদদলিত শ্রেণীকে টানিয়া ঊর্ধ্বে তোলেন। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।"১৩৫ ভারতীয় রাজনীতিতে সেই প্রাচীনকাল থেকেই আর্য-অনার্য সংঘাত ও অস্তিত্ব সংরক্ষণের সমস্যা থেকেই শ্রেণিবৈষম্য দানা বেঁধে ওঠে। এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের

মধ্যেও যুগে যুগে বহুমাত্রিক রূপ-রূপান্তর সংঘটিত হয়। তবে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই সামাজিক বৈষম্য-বিভক্তি দারুণভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও এর সর্বগ্রাসী প্রভাব-বিস্তার রাজনীতি ক্ষেত্রে রীতিমত আমূল পরিবর্তনের ঝড় বয়ে যায়। শ্রেণি-শৃঙ্খলের অবরুদ্ধ অবস্থানে মুক্তির জয়বার্তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। অবজ্ঞাত-অস্পৃশ্য শ্রেণিসমাজ রীতিমত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যা রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকের অন্তর্গত সত্যস্বরূপ হিসেবে প্রতিভাত। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সবসময় সচেতন ছিলেন। তিনি 'রথের রশি' নাটক ছাড়াও অন্যান্য রচনায় অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁর প্রবন্ধ 'পল্লীপ্রকৃতি', 'রাশিয়ার চিঠি', 'সমবায়নীতি', 'কালান্তর', কাব্য 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পুনশ্চ', 'নবজাতক', 'জন্মদিনে'– ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে এই শ্রেণিবিন্যাস ও এর অন্তর্গত স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন।

'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই নাটকের বক্তব্য পরিকল্পনায় ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাব সক্রিয় রয়েছে। তিনি সেখানকার রাজনৈতিক বিপ্লবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এবং গণমানুষের সর্বাত্মক-সহাবস্থান তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে অবলোকন করতে থাকেন। এবং এ অভিজ্ঞতাকে জন্ম-জন্মান্তরের তীর্থ দর্শনের সাথে তুলনা করতেও কার্পণ্য করেন নি। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রেক্ষাপটে এ দেশের সামন্ত-জমিদার-বুর্জোয়া প্রথার অসারত্ব তুলে ধরেন। এবং নতুন করে সমাজ কাঠামো ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হন। 'রথের রশি' নাটকে মূলত রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাভাবনাই নাটকীয় অভিব্যঞ্জনায় চিত্ররূপ লাভ করেছে। রাশিয়া থেকে ১৯৩০ সনের ৩১ অক্টোবর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "... যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না... যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরেরতলায় গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।"[১৩৬]

'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ মূলত ভারতীয় রাজনীতির ঐতিহ্যিক দৃশ্যাবলি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং এর জন্য প্রধানত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দায়ি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সর্বজনীন শিক্ষার আত্মগত সচেতনতা ও সমৃদ্ধি শ্রেণিবৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারে। এখানে ছাঁচে-ঢালা জনবিচ্ছিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবাসীর মনকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলেছে। যা যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার মতো সবাইকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মননক্রিয়ার মানবিক সামীপ্য ও মেলবন্ধন সেখানে অসম্ভব। এর মধ্যে প্রকৃত জীবনবোধের রসস্ফূর্ত-বিকাশেরও কোনো সুযোগ নেই। "... সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হবে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"[১৩৭] রাশিয়ায় গণশিক্ষার ফলেই কৃষক-শ্রমিক-জনতার মধ্যে আত্মোন্নয়ন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। যা তাঁদের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিত। এ দৃশ্য দেখেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের দৈন্যদশা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এবং এ অবস্থার জন্য তিনি ভারতবর্ষের গণ্ডিবদ্ধ, পুঁথিসর্বস্ব ও পাশমার্কা শিক্ষাকে দায়ি করেন। তিনি বলেন, "যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করবার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে।"[১৩৮] অন্যদিকে রাশিয়ায় শিক্ষার কর্মপ্রয়াস ও সুফলকে জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আত্মগঠনের প্রক্রিয়ায় আত্মবোধকে সমুন্নত করাই এর মূল লক্ষ। "এরা পাস করবার কিংবা পণ্ডিত করবার জন্য শেখায় না– সর্বতোভাবে মানুষ করবার জন্য শেখায়।"[১৩৯] জীবনের সাথে সংগতি রেখেই যাবতীয় শিক্ষাকার্যক্রমকে সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এবং প্রতিনিয়ত অনুশীলন পরিচর্যার মাধ্যমে মনপ্রাণের সাথে তা অন্বিষ্ট করা হয়। যাতে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দলমত নির্বিশেষে সবার জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে। এতে শ্রেণিগত বিভেদ-বৈষম্য বা শিক্ষার বিভক্তিকরণের কোনো অবকাশ নেই। "সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বৈ কম ছিল না। অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি।"[১৪০]

রবীন্দ্রনাথ সমবায়নীতি-ভিত্তিক প্রতিটি প্রবন্ধেই জাতিগত বিভেদ-বৈষম্য ও এর অন্তর্গত প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তিনি মনে করেন, মানুষের মুক্তির জন্য সমবায়নীতির কোনো বিকল্প নেই। সমবায়ভিত্তির সুষম অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানুষের সব প্রকার বিকাশ সাধন সম্ভব হতে পারে। "বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা-কিছু দামি এবং বড়ো, তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে। বালি-জমিতে ফসল হয় না। কেননা, তাহা আঁট বাঁধে না, তাই

তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই, তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।"[১৪১] সমবায়নীতির প্রবক্তারূপে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতা ও মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করা। সেখানে ধনী-নির্ধন, উঁচু-নিচু বা ব্যক্তিবিশেষের কোনো প্রাধান্য থাকতে পারে না। সকলের সাথে পারস্পরিক সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব করে তোলাই উদ্দেশ্য। বিশেষ কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের একক আধিপত্যের স্থান থাকতে পারে না। কারণ, যখনই কোনো জাতির মধ্যে একচেটিয়া আত্মপ্রসারের লালসা বিস্তৃত হয়েছে– সেখানেই সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পড়েছে। যা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতরূপে সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। অথচ এই ভারসাম্যহীনতাকে ঠেকাতে পারে মানুষের মৈত্রীবোধ ও তার শ্রেয়োবুদ্ধি। তা-নাহলে সামঞ্জস্যহীন ব্যবধানবিস্তর মানবৈষম্য থেকেই বিপ্লবের বহ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়তে পারে। "এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক ধারেই সব-কিছু আছে। আর-এক ধারে কোনো কিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়।"[১৪২]

উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় শিল্পসভ্যতার জোয়ারে পল্লীবাংলার সুসংহত সভ্যতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। যা নগরকেন্দ্রিক পুঁজিনিরুদ্ধ শিল্পকারখানার মধ্য দিয়ে একশ্রেণির মানুষ রাতারাতি প্রভূত সম্পদের মালিক বনে যায়। যা এদেশীয় রাজনীতিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এর ফলেই পারস্পরিক ধনগত বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি গ্রামবাংলার সাথে কিছু নগরবাসীর দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়। এবং সেখানে বাবুগিরি ও অর্থগরিমা আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। "দেশে যখন হাল আমলের অপিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল তখন তারা বিলিতি বাবুগিরির চলন শুরু করে দিলে। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েছে।"[১৪৩] অন্যদিকে এদেশীয় ঐতিহ্যিক গ্রামীণসভ্যতা একটা বিপর্যয়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। যন্ত্রদানবের উদ্যত ফনায় গ্রামবাংলার কুটিরশিল্প ও সংহতিবোধ রুগ্ন বিষজর্জর হতে থাকে। অথচ এই গ্রামবাংলাই একসময় ভারতবর্ষের বিত্তবৈভব, ধর্মকর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। "একদিন আমাদের দেশের যা কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে। বৈদ্য– কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী ... সংস্কৃতি সম্পদ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা করেছে– পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়ো বড়ো জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না। শিক্ষা, আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।"[১৪৪] ইংরেজদের আগমনের ফলেই ব্যক্তিচরিত্রের ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে থাকে। তাদের বণিকী তৎপরতা ও হীন রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের মধ্যে অনুরূপ চেতনা সক্রিয় ছিল। এর মধ্যেও একশ্রেণির বাঙালি ইন্ধন জোগাতে লাগল। ফলে গড়ে ওঠে দালাল-ফড়িয়া-সমবায়ে উত্তুঙ্গ ঐশ্বর্যের আধুনিক সভ্যতা। পাশাপাশি গ্রামবাংলার সাথে এদের দুস্তর ব্যবধান তৈরি হতে থাকে। এমনকি ঐতিহ্যিক গ্রামীণ সভ্যতার সুসংহত রূপপ্রকৃতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। পাশাপাশি প্রচণ্ড শ্রেণিবৈষম্যের মাধ্যমে মানবিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। "মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনাপাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায়, যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।"[১৪৫] এই বিচ্ছেদ মূলত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির উৎকট লোভ ও বেপরোয়া আত্মপ্রসারের ফলেই সংঘটিত হয়েছিল। "ইংরেজ যখন এ দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে। আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই। দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।"[১৪৬]

১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'কবির সমস্যা' ও 'সমাধান' নামে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ দু'টির বক্তব্যের সাথে 'রথের রশি' নাটকের গভীর সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে তিনি যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের ভেদনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এর জন্য রবীন্দ্রনাথ মূলত বাঙালির অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতাকে দায়ি করেন। এছাড়া আধিপত্যবাদের প্রভুত্বপ্রিয় মানসিকতা সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে শৈথিল্য সৃষ্টি করে দেয়। "প্রভুত্ব জিনিসটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এইজন্য প্রভুত্বই যত কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি অন্তত বোঝা সরাইতে

না পারিলে বাঁচি না। পালকির বেহারা তাই বার বার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুত্বের বোঝা লইয়া বার বার কাঁধ বদল করিতে হয়।"[১৪৭] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্য রচনার যুগে 'সবুজ পত্রে' (১৯১৪) প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় বুর্জোয়া গোষ্ঠি ও মেহনতি মানুষের অন্তর্গত স্বরূপ-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। উভয়ের মধ্যে একটা কার্যকারণ ব্যাখ্যাসূত্র উপস্থাপন করেন। এবং এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে অবজ্ঞাত ও মেহনতি মানুষের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়–

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।"[১৪৮]

ভারতীয় রাজনীতিতে শাসনব্যবস্থা বরাবরই ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রবুদ্ধ চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যুগে যুগে ঔপনিবেশিক জাতি-সম্প্রদায় এহেন মানসিকতা নিয়েই এদেশে প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যামূলক আলোচনা সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মনে করেন এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্তন কখনো সুফল বয়ে আনতে পারে না। সমাজকাঠামো বা সংবিধান সংশোধন করেও তা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র জীবনসম্পৃক্ত সুষম শিক্ষায় আত্মগত পরিশুদ্ধি এ অবস্থায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। ব্যক্তি চরিত্রের সর্বতোমুখী সমুন্নতি সৃষ্টির মাধ্যমে মূলীভূত পরিবর্তন সম্ভব। যথাযথ শিক্ষার উদার অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ শ্রেণিবিভেদ দূর করতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাছাড়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সাথে সুগভীর অন্বিষ্ট সৃষ্টির মাধ্যমেই সমূহ কল্যাণ নিহিত। এ কথাও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। "সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্বের তপস্যা চলবে না।"[১৪৯]

প্রাকৃতিক বিধিবিধান আরোপিত হওয়ার ফলেই ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এ বরাবরই স্বতঃপ্রণোদিত গতিপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। কোনোরকম প্রতিরোধ প্রতিবন্ধক সেখানে অনাসৃষ্টিরূপেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অথবা কোনো কৃত্রিম বিধান-বিরোধ মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধকে শৃঙ্খলিত করে তোলে। এবং সমাজ দেহের নানা স্থানে অনিষ্ট-অনাচার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সামাজিক সম্বন্ধও আলগা হয়ে পড়ে। একদিকের বঞ্চিত গণমানুষের দীর্ঘশ্বাস পুরো দেশবাসীকে ভারসাম্যহীন করে ছাড়ে। "... অপমানবিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই। সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। ... আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে। যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে।"[১৫০] রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে সমাজের এই বিভেদ-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এবং তা নিরসনকল্পে গণমানুষের মুক্তির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করে নেন। যদিও জন্ম ও পারিপার্শ্বিক কারণে সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ ব্যাপারে অকপট স্বীকারোক্তি ও আক্ষেপবাণী তাঁকে উদ্বেল করে তোলে –

"আমার কবিতা, জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই যে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।"[১৫১]

অথচ তিনি সারাজীবনই সবপ্রকার আভিজাত্য অহমিকা ত্যাগ করে মাটি ও মানুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকার প্রার্থনা জানিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই একপ্রকার নির্মোহ বৈরাগ্যসাধন তাঁর এই প্রবণতায় উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আত্মগত ভাবনায় অজস্র সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "শঙ্খঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের

প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে। যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"[১৫২]

'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নাটকে রবীন্দ্রনাথ দ্বীপরাজ্যে তাসজাতীয় প্রাণির মানবিকবোধে উত্তরণের কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। রূপক, প্রতীক ও রূপকথার ঢং-এ কাহিনিটি বিবৃত। আসলে এই তাসের রাজ্য ভারতবর্ষের প্রতিরূপ হিসেবেই চিত্রিত করা হয়। যা পরিবর্তনবিমুখ, নিয়মশাসিত, গতানুগতিক, জীবনবোধহীন, সংস্কারসর্বস্ব, জীবমৃত ও স্থবিরক শাস্ত্রাচারের বেড়াজালে বন্দি। তারা জীবনবোধসম্পন্ন চিত্তচাঞ্চল্য অনর্থপাত ভেবে পারলৌকিক ধ্যানমৌনতায় আত্মসমর্পণ করেছে। প্রত্যক্ষ জীবনের চেয়ে পরোক্ষ জীবনকেই অধিকতর তাৎপর্যবহ বলে মনে করা হয়। প্রাত্যহিক জীবনে একপ্রকার অনতিক্রান্ত ছকে-বাঁধা আবর্তনই মূল লক্ষ। নাটকে ব্যবহৃত 'তাসের দেশ' মূলত ভারতীয় রাজ্যেরই প্রচ্ছায়ারূপে পরিকল্পিত– এতে কোনো সন্দেহ নেই। "তাসের দেশ-এর লক্ষ্যস্থল নিঃসন্দেহে আমাদের ভারতবর্ষ এবং আমরা এ-দেশবাসীরাই হইতেছি এই তাসদেশবাসী অদ্ভুত প্রাণী। যুক্তিহীন নিয়ম বা প্রথার দাসত্বে আমরা বিশেষত্ব-বর্জিত কলের মানুষ; আমরা বিচার করিয়া জীবনে পদক্ষেপ করি না; কেবল চিরাচরিত রীতি ও তন্ত্র-মন্ত্র মানি, পুতুল-বাজির পুতুলের মত পিছনের এক অদৃশ্য শক্তির চালনায় উঠিতেছি, বসিতেছি, নাচিতেছি। প্রাচীনত্বে অগাধ বিশ্বাস আমাদের। খাঁটি আর্যদের বংশধর বলিয়া আমরা গর্ব করি এবং আমাদের কৃষ্টি রক্ষার জন্য সতত যত্নপর আমরা।"[১৫৩]

'তাসের দেশ' নাটকে ব্যবহৃত তাসের দেশটিতে নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা বিরাজমান। এখানকার বসবাসনিরত তাসজাতীয় প্রাণীদের চলন-বলন সবকিছুই নিচ্ছিদ্র নিয়মে বাঁধা। কোনোক্রমে বিন্দু-বিসর্গ এদিক সেদিক হবার উপায় নেই। "... ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপ্টা... এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলস।"[১৫৪] একটা অচল শাস্ত্রভারবাহী প্রথার আনুগত্যে এদের জীবন সমর্পিত। অবশেষে অনতিক্রম্য নিয়মের বেড়াজালে গতিচাঞ্চল্য নিয়ে প্রবেশ করেছে। এবং সেখানকার সবাইকে মানুষ হবার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। এবং আত্মবোধসম্পন্ন মননশীল মানবিকতার দীক্ষায় সংগ্রামী হতে শিখিয়েছে। "তাসের দেশ' আমাদেরই এই জড় সনাতনপন্থী দেশ, যে-দেশের মন অলস, অনড়, নির্জীব, পরিবর্তনবিমুখ, জীর্ণ নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধা। সেই কাগজের দুরি, তিরি, ছক্কা, পাঞ্জার তাসের দেশে কোথা থেকে আসল দুই সাহস-দুরন্ত লক্ষ্মীছাড়া রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র। তারা আনল মুক্তির গান অশান্ত উদ্দাম চঞ্চলতা, নিয়মের অবাধ্যতা।"[১৫৫] তাসের দেশের এই জীবনের উদ্বোধন এদেশে ইউরোপীয় জাতির আগমনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাদের প্রগতিশীল রাজনীতি, জীবন ভাবনা ও নারী স্বাধীনতার সুস্পষ্ট প্রভাব এখানে লক্ষ করা যায়। "বিদেশী ইংরেজ আমাদের স্থবির দেশে আসিয়া যে বিরাট বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে, খুব সম্ভব প্রত্যক্ষভাবে সে ভাবটি কবির মনে কাজ করিতেছিল।"[১৫৬] নাটকে রাজপুত্রের গানে এই নবজীবনের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে–

> "রাজপুত্র। আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
> আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
> আমরা বেড়া ভাঙি।"[১৫৭]

নাটকের পরিণাম নির্দেশনায়ও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাববিপ্লবের মাধ্যমে দৃশ্যাবলি অঙ্কন করেন –

> "বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
> বাঁধ ভেঙে দাও।
> বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
> শুকনো গাঙে আসুক
> জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক
> ভাঙনের জয়গান গাও।"[১৫৮]

এই ভাববিন্যস্ততার মূলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সর্বতোমুখী জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ, মনুষ্যত্ববোধ, স্বাজাত্যবোধ, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি আবহমান বাঙালির নিঝুম দ্বীপকে প্রকম্পিত করে তুলেছে। বিশেষত, ইংরেজদের রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈশ্বিক ভাবভাবনায় তাসের দেশরূপী ভারতবর্ষ আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে। পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার মুক্তমনন বোধবুদ্ধি বাঙালি জীবনে সর্বাধিক আত্মজাগরণ সম্ভব করে তোলে। "ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতীচ্যবিদ্যাই বাঙলার এ

রেনেসাঁসের উৎস, এ শিক্ষা 'তাদের দেশে' ঘটাল ভাববিপ্লব। শিক্ষিতদের মনে জাগাল দিগন্তবিসারী আকাঙ্ক্ষা, জীবনে সম্ভাবনার দ্বার হল উন্মুক্ত, খুলে গেল সংস্কারের নিগড়-বিশ্বাসের বাঁধন।"[১৫৯] বিশ শতকের সবপ্রকার নারীবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম ইংরেজ-রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে সংঘটিত হয়। যা তাসের দেশ নাটকের অন্যতম অন্তর্গত সত্য হিসেবে অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকটি তাঁর 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রচনা করেছেন। এই গল্পটির রচনাকাল এদেশে নারীজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে পরিচিত। এ সময়েই অর্থাৎ, ১৮৯০ সনে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া সে-সময় কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কংগ্রেস রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এসব সমকালীন প্রেক্ষিত প্রচ্ছায়াই 'তাসের দেশ' নাটকের প্রাণপ্রতীতি নির্মাণ করে দেয়।

'তাসের দেশ' নাটকে সমকালীন জীবনবাস্তবতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। যা ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রগতিশীল রাজনীতি ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে বাঙালি জীবনে জাতিগত বৈষম্য ও গতানুগতিক অথর্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজমান। কোনো কিছু আশা করার আনন্দ ও বঞ্চিত হওয়ার বেদনাও এদের নেই। এক যান্ত্রিক জীবনের গৎবাঁধা বুলির চক্রাকার বৃত্তে প্রাণপাত করাই এদের একমাত্র কতর্ব্যকর্ম। "... এ যে জীবমৃতের খাঁচা, নিয়মের জারকরসে জীর্ণ এদের মন।"[১৬০] এখানে প্রতিমুহূর্তে এক সশঙ্ক বিধিবিধানের খড়গ ঝুলে থাকে। বিন্দুমাত্র ক্রটিবিচ্যুতিতে প্রায়শ্চিত্তের কঠোর শাসনদণ্ড নেমে আসে। এরই মধ্যে মানুষ হওয়ার উজ্জীবনমন্ত্র ও বিপ্লবের সূত্রপাত দৃশ্যাবলি তৎকালীন রাজনীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। সমালোচকের ভাষায়, "দ্বীপটিতে বিরাজ করছে আশ্চর্য স্তব্ধতা, পরিপূর্ণ শান্তি ও সম্ভোগ। পথে ঘাটে সকলেই সংযত। কোন উৎসাহ নেই। কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ও বিশ্রাম। কবি শুধু সামাজিক জীবনের জড়তার কথাই এখানে বলেননি, রাজনৈতিক প্রসঙ্গও এখানে ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"[১৬১]

'তাসের দেশ' নাটকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির প্রচ্ছন্ন ভাবব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিপাগল জনতা সেসময় স্বাধিকারচেতনায় মরিয়া হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার একের পর এক দমনমূলক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকে। এতে অগ্নিগর্ভ ভারতবাসী মুক্তিকামী চেতনাকে অনেকটা আত্মস্থ করেই নিশ্চল জীবনধারায় নিজেকে সঁপে দেয়। অথবা অনেকটা বাধ্য হয়েই এ অবস্থাকে মেনে নিতে হয়। 'তাসের দেশ' নাটকের ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রীও আরোপিত বাধ্যবাধকতার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। "তাসের দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিদ্যমান। কেননা এখানে আত্মচেতনার স্পন্দন নেই, নেই আত্মবোধের প্রবণতা ও আবেগ। রাজ্যের এই শান্তিরক্ষার মূলে একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল বিশেষ সক্রিয় আছে বলে মনে করা অযৌক্তিক নয় (আমাদের ভদ্র সমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই)।"[১৬২] এ সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুক্তিপিয়াসী জনতাকে দমন করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। 'সিডিশন বিল', 'ম্যাকেঞ্জি বিল' প্রণয়নের মাধ্যমে সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা সংশোধনের মাধ্যমে 'সিডিশন বিল' প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এছাড়া জননেতাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য ১৯০৭ সালে সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে। এর ফলে অনুমতি ব্যতিরেকে যে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজন পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। "১৯০৮ সনের জুন মাসে বিধিবদ্ধ আইনের জোরে সরকার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করার অপর্যাপ্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ... প্রেস আইনের দাপটে ৩৫০টি ছাপাখানা এবং ৩০০ টি সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত হয় এবং আনুমানিক ৫০০ টি বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।"[১৬৩] এছাড়া 'অস্ত্র আইন', 'রাউলাট আইন', 'পাঞ্জাবের মার্শাল আইন' ও 'মর্লি-মিন্টো' সংস্কার আইন (১৯০৯) ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা স্পৃহাকে নৃশংসভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। এ সময়কার পরাধীন শৃঙ্খলিত ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "হায় দাসত্বের শৃঙ্খলে জীবনযাপন করতে তোমাদের লজ্জা হয় না। ... মৃত্যুবরণ করো কিন্তু ইংরেজদের হত্যা কর। অথর্ব হয়ে দিনযাপন করো না বা এভাবে পৃথিবীর বোঝা বৃদ্ধি করো না।"[১৬৪]

রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকটি তৎকালীন ভারতের অবিসংবাদিত নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেন। এতে সমকালীন রাজনীতি ও এই নাটকের অন্তর্গত সাজুয্য-সহাবস্থান ভেবে দেখার মতো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন যৌবনের মূর্ত প্রতীক, স্বাধীনতার সেবক। রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' উৎসর্গ করার মাধ্যমে মূলত তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।"[১৬৫] এসব কথার মাধ্যমে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের অবদান-অবস্থান নির্দেশিত করা হয়েছে। সে সময়কার পরাধীন ভারতীয় জীবনে সুভাষচন্দ্র জাগ্রত পৌরুষ ও নবযৌবনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তিনি মুক্তিপাগল মানুষের স্বাধীনতার চেতনায় আদর্শ পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সুভাষচন্দ্রই ভারতবাসীকে পরাধীনতার

দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার করতে পারেন, যেখানে এই ভারতবর্ষ তাসের দেশের মতোই নিশ্চল জড়মূর্ত পাষাণে অবরুদ্ধ রয়েছে। এই নাটকে উপস্থাপিত পটভূমি ও সমকালীন ভারতীয় জীবন রাজনীতির মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। "লাল-কাল উর্দিপরা তাসগুলি নিয়মের আবর্তে ঘুরিতেছে, কিন্তু প্রাণের ছন্দে চলিতেছে না। তাহাদের চাল আছে কিন্তু চলন নাই। তাহারা চ্যাপ্টা, ভিতরে হাওয়া নাই বলিয়া তাহারা আগাইতে পারে না। তাহারা অতিমাত্রায় গম্ভীর এবং ব্রহ্মার হাই হইতে উৎপন্ন বলিয়া মাটির সহিত সম্পর্ক তাহাদের খুবই কম। রূপক অত্যন্ত স্পষ্ট। গৃহবদ্ধ ও গম্ভীর লোকেদের প্রতি কবির মনোভাব কি তাহা আমরা বার বার জানিয়াছি। এই নাটকেও সেই মনোভাব রূপকের ছদ্মবেশে ও বিদ্রূপের ভূষণে প্রকাশিত হইয়াছে। নামগুলি তাসের হইলেও লোকগুলি যে আমাদের দেশেরই তাহা বুঝাও কষ্টকর নহে।"[১৬৬] কিন্তু এই জড়িমাগ্রস্ত তাসের দেশও একদিন নবজীবনের ছোঁয়ায় ময়ূরের নাচ ও ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এর পেছনে তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র ও তাঁর প্রগতিশীল রাজনীতিকে সক্রিয় বলে মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে (তখন কংগ্রেসের সভাপতি) ঘিরে ভারতবর্ষের স্বপ্ন-স্বাধীনতা ও আত্মজাগরণের উদ্দীপনায় বিভোর হয়েছিলেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের মানবিক আদর্শের সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বৃহত্তর ভারতবাসীর প্রতি অকৃত্রিম দরদ ভারতীয় ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথকে সুগভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় হৃদয়ের অর্ঘ নিবেদন করেছেন। যা ছিল ভারতীয় জাতিসত্তার সুগভীর প্রাণমূল থেকে উৎসারিত। "যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তাহা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয় আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা চাই এক নতুন সমাজ ও এক রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। ... এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"[১৬৭]

রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন সৃজন সৃষ্টির মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের উদার মানবিক বোধবুদ্ধিকে অভিষিক্ত করেন। তাঁর বিভেদ-বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে তিনি সবসময় অভিনন্দন জানিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র জাতীয় জীবনে প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরিতে এই উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। যেমন, 'কনগ্রেস' (কালান্তর, ১৯৩৯), 'দেশনায়ক' (১৯৩৯), 'মহাজাতি সদন' (১৯৩৯) ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের জাতীয় প্রবক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার আলোকে তাঁকে স্বাধীনতার মুক্তিদূত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। "... সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে বাংলার অগ্নিগর্ভ ইচ্ছার জীবন্ত বিগ্রহ হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। দেখেছিলেন বাংলার যৌবন এই নেতার পাশে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করছে।"[১৬৮]

রবীন্দ্রনাথ 'শোধবোধ' (১৯৩৩) নাটকের কাহিনি সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতির একটা সবিশেষ আবহ অনুষঙ্গকে অবলম্বন করে গড়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্য রাজনীতির সান্নিধ্যে এদেশীয় সমাজের আত্মবিস্মৃতি, অন্ধ-অনুকরণ, ফ্যাশন-সর্বস্বতা ও নকল সাহেবিয়ানা নাটকটিতে কেন্দ্রীয় ভাববস্তু হিসেবে গৃহীত। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী মিঃ লাহিড়ী পরিবারের মিস নেলীর মাধ্যমে এই যুগধর্মের প্রচ্ছায়া অঙ্কিত। অন্যদিকে এই পরিবারের যোগ্য হতে গিয়েই সতীশ ও মিঃ নন্দী নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। এর মধ্যে সতীশ চরিত্রটি বিলাতি সংস্কৃতির আদলে নির্মিত। সে মা ও মাসীর বাড়াবাড়িরকম স্নেহছায়ায় নিজেকে সারাক্ষণ পোষাক পরিচর্যায় ব্যস্ত রাখে। এই সতীশ চরিত্রটি ঘিরেই নাটকের অন্যান্য চরিত্রসমূহ আপন আপন ভাষা খুঁজে পায়। এর মধ্যে পোশাক-প্রসঙ্গটি ঘুরে ফিরে বারবার বিভিন্ন চরিত্রের মুখে উচ্চারিত। এ ছাড়া পাশ্চাত্য জীবনাচরণের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কিছু কিছু চরিত্র অন্ধের মতো পালন করেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে নাটকীয় অভিব্যঞ্জনার মাধ্যমে এসব দৃশ্যকে তির্যক ভাষায় উপস্থাপন করেন। এবং এসবের কুফল-পরিণতি নির্দেশ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। "... সেই টেনিস-কোর্ট, সেই Propose করা, engaged হওয়া, সেই Courtship-এর রীতি, সেই birthday তে present করা, কৃত্রিম বিনয়পূর্ণ অতি সুললিত আলাপ প্রভৃতি কবির ব্যঙ্গ-দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে।"[১৬৯]

উনবিংশ শতকে ভারতীয় রাজনীতিতে একটা ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যায়। এদেশে একটা অতি-উৎসাহী শ্রেণি পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, ডিগ্রি-খেতাব, লেজুড়বৃত্তি ইত্যাদি মোহমত্ততায় গা ভাসিয়ে দেয়। এছাড়া তাদের রাজনৈতিক দর্শনের সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ এই সম্প্রদায়কে দারুণভাবে পেয়ে বসে। ইংরেজদের অনুকরণে পালিত এসব গোষ্ঠি ও এদের আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল বিকৃত। তবুও সাধারণ বাঙালি সমাজ অনেকক্ষেত্রেই এদের চটকদার চালচলন দেখে আকর্ষণ অনুভব করত। "উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই ভ্রষ্ট-আদর্শ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সাধারণ বাঙালী

সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ছিল। ধন, বিলাতী ডিগ্রীর বিদ্যা ও পদমর্যাদায় তাহারাই ছিল সকলের লক্ষ্যের বিষয়, তাহারাই বিবেচিত হইত সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণি বলিয়া। ইহাদের অধিকাংশই ছিল বিলাত-ফেরত হিন্দু বা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের অনেকে ঐ শ্রেণীর লোকদের রুচি, তাহাদের বিলাস-ছন্দিত জীবন-যাত্রা অতিমার্জিত আচার-ব্যবহার, শিক্ষিতা ও সুবেশা নারীদের সংকোচহীন চাল-চলন ও আকর্ষণীয় হাবভাব প্রভৃতি দেখিয়া উত্তেজিত কল্পনায় ঐ জীবনাদর্শের প্রতি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত এবং ঐ আদর্শে পৌঁছিয়া জীবন সার্থক করিতে চাহিত।”[১৭০]

এদের এই নির্লজ্জ সাহেবিয়ানার কারণে সে সময় একটা সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। বিজাতীয় রাজনীতির বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ অনেক ক্ষেত্রে Social Conflict প্রচণ্ড আকারে দানা বেঁধে ওঠে। স্বকীয় অবস্থান-অস্তিত্ব ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি ভুলে অনেকেই বিকারগ্রস্ত পথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো সুস্থ ও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বরাবরই অনুকরণের পরিবর্তন অপেক্ষা প্রয়োজনমাফিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। নিজেদের মূলধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, “প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তি স্বাস্থ্যের অনুকূলে নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ... যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সাহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহাকে বলে অনুকরণ করা। ... কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না। ইহা নিশ্চয় এবং যে দুর্বলচিত্তগণ ইহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে। ইহাতেও সন্দেহ নাই।”[১৭১]

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা ঠাকুর পরিবারে অব্যাহত ছিল। শত-সহস্র প্রতিবন্ধকার মধ্যেও এই ধারাপরম্পরা অব্যাহত রয়েছে। এবং এরকম একটা পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব একটা ভুবন তৈরি করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।”[১৭২] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠাকুর পরিবারের স্বভাববৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “দেশীয়তা দেশীয়ভাবকে রক্ষা করা ঠাকুর-পরিবারের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত নানাভাবে দেশীয় শিল্প, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদকে একটি বিশেষ দেশীয় রূপ দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবিয়ানার অনুকরণ তাঁহাদের পরিবারের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও উদগ্র জাতীয়তা বা হিন্দুয়ানি তাঁহাদের ধর্মসাধনার পরিপন্থী।”[১৭৩] বিজাতীয় সংস্কৃতির মোহ-প্রলোভনে ভেসে যাওয়া উচ্ছৃখল সম্প্রদায়কে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিদ্রূপ করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর আলোচনা-সমালোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিভিন্ন রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। প্রবন্ধ ‘নকলের নাকাল’, ‘কোট ও চাপকান’ এবং কবিতা ‘কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ’ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। “১৯১২ অব্দে যখন বিলাত যাইতেছেন তখনো আলোয়ার মহারাজার পোশাকের প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৯ শ্রাবণ) এই পরিচ্ছদের দেশীয়তা কবির মতে আত্মশক্তি ও আত্মসম্মানের অন্যতম পরিচায়ক।”[১৭৪] ‘নকলের নাকাল’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নকল সাহেবিয়ানাকে তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। অন্ধ অনুকরণে নকলধারী ব্যক্তিদের ময়ূরপুচ্ছরূপী কাক হিসেবে অভিহিত করা হয়। অর্জিত প্রাপ্তি ছাড়া প্রক্ষিপ্ত যে কী সীমাহীন বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে এখানে তা-ই বর্ণিত হয়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত ও ভিন্নজাতের বস্তু কখনো নিজের করে পাওয়া সম্ভব নয়। নিজের বলে দাবি করলেও তা বিকৃত ও হাস্যকর রূপ ধারণ করে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “দুই-চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানানসই করিয়া পারিতেও পারে। কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না। কারণ ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই, এমন অবস্থায় সমস্ত কাক সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সংবরণ করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত

হইয়া পড়িবে।' ... আজকাল ইংরেজি সাজ কিরূপ চলতি হইয়া আসিতেছে এবং যতই চলতি হইতেছে ততই তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।”[১৭৫]

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতকের এহেন ফ্যাশন-তোষণ ও বিজাতীয় রাজনীতি-সংস্কৃতিকে কঠোর ভাষায় প্রতিহত করতে চেয়েছেন। আত্মগত অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মগত সমুন্নতির বাইরে এসব প্রবৃত্তিকে তিনি বিপদজনক বলে চিহ্নিত করেন। যা সমকালীন ব্রিটিশ রাজনীতি-প্রসূত বলেই অনেকটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। 'শোধবোধ' নাটকের সতীশ চরিত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ সে সময়কার পরিপার্শ্ব পরিস্থিতিকেই রূপায়িত করেছেন। বিশেষত, ইংরেজ প্রভাবিত রাজনীতি ও সংস্কৃতিই এই চরিত্রসৃষ্টিতে গভীরভাবে অনুপ্রাণনা জুগিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) নাটকটিকে সমকালীন সমাজ রাজনীতির প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আলোকে রচনা করেছেন। নাটকে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্য প্রথাকে অবলম্বন করা হয়। এর সাথে তৎকালীন সমাজ রাজনীতির সাদৃশ্য-সমবায় ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হতে দেখা যায়। অস্পৃশ্য সমাজের চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতির চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা ও আত্মগত উপলব্ধির যথাযথ মূল্যায়নই 'চণ্ডালিকা' নাটকের দর্শনগত ভাবনা এবং উদ্দেশ্য। এ পর্যায়ে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও মানবিক মহিমা জাগ্রত করে দেয়। এবং এক পর্যায়ে জন্মগত সংস্কারে আত্মধিকৃত চণ্ডালকন্যা মনুষ্যত্ববোধের চেতনায় আত্মগৌরব লাভ করে।

সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন আন্দোলন' সবিশেষ উল্লেখের দাবিদার। এই অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলন সেসময় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ পর্যায়ে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, মিছিল, সমাবেশ, অনশন ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসব ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভা, সমিতি, সেমিনার, লেখালেখি ইত্যাদি সৃজন তৎপরতার মাধ্যমে তাঁকে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এমনকি এই আন্দোলন সংগ্রামের পক্ষে তিনি অনশনব্রত পালন করেন। এবং বহুমাত্রিক সৃষ্টিচিন্তার মাধ্যমে অস্পৃশ্যবিচারের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতামত তুলে ধরতে সক্ষম হন। শত বিপত্তি বাধার সম্মুখেও তাঁর এই বৈপ্লবিক অভিযান অব্যাহত থাকে। সপ্রসঙ্গ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, “রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন। পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসব সভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব। এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু'চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্নের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন। এতে বিস্মিত হলেম।”[১৭৬] স্বামী বিবেকানন্দও এই অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে দেশে বিদেশে নানামুখী তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। “হিন্দু সমাজে প্রচলিত অস্পৃশ্যতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি বলতেন, হিন্দুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতেই নাই, ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে।”[১৭৭]

এসব আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথকে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই বর্ণভেদ-ব্যবস্থা অনড় অবস্থিতির মাধ্যমে প্রবহমান ছিল। যা পাশ্চাত্য-রাজনীতির উদার মানবিক বোধবুদ্ধির আলোকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। এর ফলেই নানামুখী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে যতীন সরকার বলেন, “... ১৯২৩ সালেই সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনেই অস্পৃশ্যতাকে হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যারূপে চিহ্নিত করা হয়। এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, 'হিন্দুসমাজের অন্তর্গত কোনো জাত'ই জল-অনাচরণীয় থাকতে পারবে না (বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার ঃ নিম্নবর্গে ও নিম্নবর্গে, দৈনিক ভোরের কাগজ, সাময়িকী, ঢাকা, ৯ জুলাই ১৯৯১)। ... তাঁর তথ্যানুসারে, ১৯২৫ সালে ফরিদপুর অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতের পরাধীনতার জন্য তা স্বরাজলাভের প্রধান অন্তরায় হিসেবে দায়ী করেন অস্পৃশ্যতার পাপকে। গান্ধিজীর উপস্থিতিতে

সম্মেলনে অঙ্গিকার করা হয় যে, এখন থেকে সবাই নিম্নবর্ণ বা নীচুজাত নামে পরিচিত সদনের হাতে জল গ্রহণ করতে শুরু করবে।”[১৭৮]

উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য রাজনীতির শিক্ষা-দীক্ষা, রেনেসাঁ-অন্বেষা, মানবতা-উদারতা, ভারতীয় জীবনযাত্রাকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারসর্বস্ব বাঙালি সমাজ তা গ্রহণ করতে পারে নি। বরং তারা অন্ধ মোহমত্ততায় এই প্রাচীন ধর্ম কর্মকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এ অবস্থার চিত্ররূপ প্রদান করতে গিয়ে নানা ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, “এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল– সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল। অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না।”[১৭৯]

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রগতিশীল চিন্তায় ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি নবচেতনায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। “বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে প্রাকব্রিটিশ যুগে কোন ‘মবিলিটি’ বা গতিশীলতা ছিল না– বর্ণাশ্রম দ্বারা গোটা সমাজ ছিল শৃঙ্খলিত। ইয়োরোপের জঙ্গম শক্তির স্পর্শে সেখানে গতিশীলতা জাগল। ... জন্মগত আভিজাত্য আর বর্ণগত-শ্রমবিন্যাস দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। পাশ্চাত্যশিক্ষা, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জন্মগত আভিজাত্যের স্থানে প্রাধান্য লাভ করল অর্জিত আধিপত্য, বর্ণাশ্রমের স্থানে মানুষের সামনে এসে দাঁড়াল যুক্তিনির্ভর মানবতা।”[১৮০] রবীন্দ্রনাথ এই নবপ্রবুদ্ধ চেতনাপ্রবাহকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তিনি কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। “... রবীন্দ্রনাথ 'Mahatmaji and the Depressed Humanity' (১৯৩২) নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন এবং এই পুস্তিকার উপস্বত্ব বিশ্বভারতীর ‘সংস্কার সমিতি’র জন্য দেওয়া হয়। সংস্কার সমিতি বিষয়ে রবীন্দ্র জীবনী থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি–

‘শান্তিনিকেতনের জীবনধারার সহিত একদা ইহার নিবিড় যোগ ছিল। ... বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে এই সমিতির উদ্দেশ্য বিবৃত হয়।

১। কাহাকেও আমরা সামাজিকভাবে হীন মনে করিব না। অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকে আমাদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কোনো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও জাতি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিবে না।”[১৮১]

‘চণ্ডালিকা’ নাটকে মূলত সমকালীন রাজনীতির রেনেসাঁ-প্রসূত মানবতাকেই প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ও তার মায়ের কথোপকথন থেকেই এ কথার সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতির মা তাকে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলে –

“অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোনতাও নেই কোনোখানে। অশুচি তুই, তোর অশুচি হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াস নে বাইরে, যেখানে আছিস সেইখানটুকুতেই থাক সাবধানে। এই জায়গাটুকুর বাইরে সর্বত্র তোর অপরাধ।”[১৮২] এ কথার উত্তরে প্রকৃতি গেয়ে ওঠে–

“ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আর ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।”[১৮৩]

প্রকৃতির এই গানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মানবমহিমার জয়গান ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের চিত্র প্রতিভাত হয়ে ওঠে। “চণ্ডালিকা নাটকের মূল কথাই অসংকোচে মানবাধিকারের জন্মমুহূর্তের তরতাম্য যা থেকে কারোকে কখনও বঞ্চিত করতে পারে না।”[১৮৪] রবীন্দ্রনাথ জীবনভর এই মানবিকতার পূজারি হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে যান। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে তিনি কখনো বন্দি ছিলেন না। মানুষ মননশীলতা ও মনুষত্ববোধই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্মসাধনা। তিনি অকপট বিশ্বাসের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কাব্যিক সুষমাময় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেন–

“কবি আমি ওদের দলে–
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না
পূজারি হাসিমুখে মন্দির থেকে বাহির হয়ে আসে
আমাকে শুধায়, "দেখে এলে তোমার দেবতাকে?"
আমি বলি, না।
অবাক হয় শুনে, বলে, জানা নেই পথ?
আমি বলি, না'
প্রশ্ন করে, 'কোনো জাত নেই বুঝি তোমার'
আমি বলি, না।"[১৮৫]

'বাঁশরি' নাটকের কাহিনি আধুনিক শহর সভ্যতার প্রেক্ষাপট অবলম্বনে রচিত। পাশ্চাত্য জাতির সংস্কৃতি ও রাজনীতির ছোঁয়ায় স্থবির বাঙালি জীবনে গৃহীত প্রগতি এবং পরিশীলিত বাতাবরণ নাটকটির প্লট প্রবাহ গড়ে তুলেছে। এখানকার চরিত্রগুলো এক অন্তর্বাহী মননশীল মাধুর্য দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তিক অনুভবস্নাত আধুনিকতার স্বকীয়-স্বাধীনচেতায় প্রতিটি চরিত্র বেশ ক্ষিপ্রতার সাথে হয়ে ওঠে। এখানকার তীক্ষ্ণ ধী-সম্পন্ন সংলাপ, মার্জিত রুচিবোধ মননশীল চিন্তাশক্তি, অন্তসলিলা মনোভঙ্গির বহুবর্ণিল প্রকাশ ও প্রগতিশীল ঘটনাচরিত্র নাটকটির পরিণতি-নির্দেশক হিসেবে গৃহীত। বিশেষত, কলকাতা শহরের কলেজ পড়ুয়া মেয়ে বাঁশরির সংলাপ-স্বভাব এই নাটকের প্রাণপ্রতীতি নির্মাণ করেছে। এবং অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনাসমূহ যেন এরই পরিপোষকরূপে আমদানি করা হয়। আধুনিক শহরসভ্য জীবনের রাজনীতি-সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিভূরূপেই বাঁশরি চরিত্র এখানে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেছে। যা মূলত ইংরেজদের আগমন ও তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বরাবরের মতোই সামন্তবাদী সমাজে ভারতীয়গণ কখনো নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় নি। কিন্তু আধুনিক যুগে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে ইংরেজ জাতির আগমন ঘটে। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভারতীয় জীবনযাত্রাকে সমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে বদলে ফেলে। "কালান্তর সাধন করলো ইংরেজ, কেননা তাঁরা কেবল মানুষরূপে আসে নি, এসেছে 'নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে'। মানুষ হিসেবে তারা দূরে রয়েছে, কিন্তু ইউরোপের চিত্তদূতরূপে এসেছে অতি সন্নিকটে, তাদের মাধ্যমেই ইউরোপের জঙ্গমশক্তি ভারতের স্থবিরচিত্তে আঘাত করে এবং প্রাণসঞ্চার করে।"[১৮৬] ইংরেজদের নানামুখী রাজনৈতিক প্রয়াস পদক্ষেপের কারণেই ভারতীয়দের ব্যক্তিজীবন প্রবলভাবে আলোড়িত হতে থাকে। যেমন, শিল্প বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা- ইত্যাদি কারণে এদেশবাসী দারুণভাবে অধিকারসচেতন হয়ে ওঠে। তাদের চিন্তাচেতনায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এর ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, দেশপ্রেম, নারীস্বাধীনতা, মানববাদ, মুক্তবুদ্ধি ও অন্যান্য প্রগতিশীল ভাবনায় ব্যক্তি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্ফুরণ প্রতিভাত হতে থাকে। এবং এর ফলেই ব্যক্তিচরিত্রের চাওয়া-পাওয়া-সঞ্জাত দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রচণ্ডরূপে দানা বেঁধে ওঠে। এদেশে ইংরেজদের আগমন ও তাদের রাজ্য পরিচালনা ও রাজনীতির মূলেও এই ব্যক্তিক চাহিদার দুর্দমনীয় গতিবেগ ক্রিয়াশীল রয়েছে। যা এদেশের উনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজে একটা প্রবল আলোড়নের ঝড় তোলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "আধুনিক যুগে, য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয় আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে।"[১৮৭] রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনের আগমন আবির্ভাবকে অত্যন্ত ইতিবাচক অর্থেই বিশ্লেষণ করেছেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) প্রমুখ ব্যক্তি ভারতে ইংরেজজাতির আগমনকে আশীর্বাদ হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন।

"সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে।"[১৮৮]

বাঁশরি নাটকের প্লট-সংঘটন এই আলোড়িত সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ঘিরে নির্মিত হয়েছে। এই নাটকের চরিত্রসমূহ- বাঁশরি, সোমশংকর, সুষমা সেন ও ক্ষিতিশ চরিত্র এমনই একটা সমাজ সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের চিন্তা-চেতনা, চাওয়া-পাওয়া, হাবভাব- চলাফেরা- প্রায় প্রতিটি আচরণই আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে অঙ্কিত। যেমন, বাঁশরি ও সোমশংকরের বিবাহ-পূর্ব প্রেম, কামনা-বাসনা, বিবাহ-নিরপেক্ষ প্রেমের সার্থকতা- সবই ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সম্প্রদায় কর্তৃক এই সংস্কৃতি রাজনীতি ক্ষেত্রভেদে রকমফের ঘটতে থাকে। ইংরেজগণ অনেক ক্ষেত্রেই এর মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনগণকে শোষণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। সেখানে সীমা-পরিসীমা লঙ্ঘিত হয় এবং মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ অবস্থায় অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ ঘটে। এবং ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিক্ষুব্ধ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। জীবনের অন্তিম পর্যায়ে রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধেও এর সুস্পষ্ট আভাস লক্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বরাবরই মানবিকতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ফলে তাঁকে অনেক রাজনৈতিক বৈরী-বিরুদ্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কখনো তিনি পিছপা হন নি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আত্মগত অধিকারচেতনায় তিনি বরাবরের মতোই সোচ্চার ছিলেন।

"... বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকালে পুলিশী সন্ত্রাস, প্রথম মহাযুদ্ধ কালে 'ভারতরক্ষা আইন ও ইংরাজ দমননীতির বিভীষিকা', 'রাওলাট বিল' ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অ্যাণ্ডারসনী দমননীতির ও হিজলী গুলি চালনার, আন্দামান ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে– দেশের এমনি ঘোর দুর্দিনে যখনই কবির ডাক পড়েছে, তখনই তিনি তাতে সাড়া দিয়েছেন, ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনসভায় দাঁড়িয়ে সারা দেশের নির্বাক মনের আপত্তি ও প্রতিবাদকে বাণী দান করেছেন। সারা জীবনই কবি সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। স্মরণ রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন "All India Civil Liberties Union" এর সভাপতি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ডা. নেবিনসনের আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি বিলেতের "National Council for Civil Liberties"- এর সহ সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।"[১৮৯]

বাঁশরি নাটকের ক্ষিতিশ চরিত্রটি সমসাময়িক সমাজ রাজনৈতিক আলোকে গড়ে তোলা হয়েছে। এটি একটি লেখক চরিত্র। এই লেখকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ তাঁর সাহিত্যচর্চা বাস্তবতা-বহির্ভূত ও কাল্পনিক উপাদানে ভরপুর। এ জন্যে বাঁশরি তাকে নানাভাবে ভর্ৎসনার মাধ্যমে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার আহ্বান জানায়।

"বাঁশরি ।... সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারিদিকে অনেক মানুষ আছে। অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো, ভালো করে দেখো।"[১৯০]

সাহিত্যে এই বাস্তবতা-বিষয়ক জিগির জিজ্ঞাসা তৎকালীন সমাজ রাজনীতিতে বেশ একটা আলোড়নের ঝড় তোলে। যা মূলত রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই অধিকতরভাবে বিস্তার লাভ করে। একদল হুজুগপ্রিয় অযোগ্য সাহিত্যিক রবীন্দ্র সাহিত্যকে কাল্পনিক, অবাস্তব, অতীতচারী ও রোমান্সরঙিন হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। এরা মূলত রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে কিছু একটা করার জন্য মরিয়া ওঠে ওঠে। ফলে এদের সাহিত্যে উৎকট যৌনবিলাস, খুন-জখম, রাহাজানি-লুণ্ঠন– প্রভৃতি উত্তেজনাকর বিষয়বস্তু গৃহীত হতে থাকে। এ পর্যায়ে কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬) ও প্রগতি (১৯২৭) পত্রিকা সবিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এসব পত্রিকা মূলত সমসাময়িক পাশ্চাত্য রাজনীতি ও সাহিত্যকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর জীবনের নির্মম বাস্তবতা এখানে জায়গা করে নেয়। সাম্রাজ্যলিপ্সায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্মম দারিদ্রপীড়ন, উৎকট যৌনবিলাস– ইত্যাকার সমাজরাজনীতি এসব সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উজ্জীবিত করে তোলে। তাও আবার কতটা শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত– সে কথা অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। "এঁদের আধুনিকতার সামান্যই এঁদের জীবন থেকে সমুদ্‌ভূত, সামান্যই অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া– বেশিটাই ছিল পশ্চিমি সাহিত্যের নকল, পশ্চিমের যুদ্ধোত্তর জীবনের উৎকণ্ঠা এবং সেই সাহিত্যের আধুনিকতার কঠিন অলজ্জিত অসজ্জিত সত্যকে এঁরা যে খুব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এমনও মনে হয় না। এঁদের আধুনিকতা মোটামুটি– দারিদ্র্য, যক্ষ্মা, বস্তিজীবন, যৌনতা– এই রকম কয়েকটি বাঁধা বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।"[১৯১] সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সাহিত্যবিষয়ক এই তর্কযুদ্ধে অনেকেই জড়িয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ একটা পটভূমির আলোকেই সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধটি ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে রচনা করেন। এবং পরের মাসেই 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি রচিত হতে দেখা যায়। এসব প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের নানামাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি বলেন, "সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটা দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।"[১৯২]

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ইউরোপ-আমেরিকার বিকৃতবিলাসী অশুভ রাজনীতির ঢেউ এদেশেও আছড়ে পড়ে। ফলে এখানকার শিল্প-সাহিত্য বিভিন্নভাবে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে থাকে। জীবন সেখানে প্রচণ্ড বাস্তবতার রুদ্রমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত। এ অবস্থায় ভারতীয় সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাপারটি তুমুলভাবে সমালোচনার ঝড় তোলে, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এবং সাহিত্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গেও তিনি নানামাত্রিক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথ অশ্লীলতা-প্রসঙ্গে বলেন, "যে-জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো এক শ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যিকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এইটে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থা মাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না। যেমনতরো কোনো সময় বাতাস গরম হয়ে প্রতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না। এরপর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।"[১৯৩]

রবীন্দ্রনাথ এতসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসূত্রে প্রকৃত সাহিত্যের স্বরূপ প্রকৃতি নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ভাষাভঙ্গিমায় শিল্প সাহিত্যের অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। ধোবার বাড়ির ময়লা কাপড়ের ফর্দ নিয়ে কবিতা লেখা নিশ্চয়ই সম্ভব।

বাস্তবের ভাষায় এর মধ্যে বস্তা-ভরা আদিরস করুণরস এবং বীভৎসরসের অবতারণা করা চলে। যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দুইবেলা বকাবকি চুলোচুলি, তাদের কাপড়দুটো এক ঘাটে একসঙ্গে আছাড় খেয়ে নির্মল হয়ে উঠেছে। অবশেষে সওয়ার হয়ে চলেছে একই গাধার পিঠে, এ বিষয়টা নব্য চতুষ্পদীতে দিব্য মানানসই হতে পারে। কিন্তু বিষয়-বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম নয়, রিয়ালিজম ফুটবে রচনার জাদুতে।"[১৯৪]

রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তির উপায়' নাটকে ভারতীয় সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের অসার ভাবভাবনা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এই নাটকের ভাষা, বাণীভঙ্গিমা ও প্রকাশরীতিতে প্রহসনের বৈশিষ্ট্য-বিস্তার লক্ষণীয়। হালকা চটুল ও রসাত্মক ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য সমাজকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। এতে সমাজবহির্ভূত সন্ন্যাসজাতীয় বৈরাগ্য চিন্তাচেতনাকে জীবনের পক্ষে অকার্যকর ও অনুপযোগীরূপে প্রতিপন্ন করা হয়। এবং নাটকীয় পরিণামী নির্দেশনায় তিনি সন্ন্যাসধর্মকে উপযোগী উপাদানের মাধ্যমে সমাজ সংসারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং পাশাপাশি বহুবিবাহের ফলে সংঘটিত সপত্নী সংসারের বিদ্বেষ-কলহ ও কুফল-পরিণাম হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কখনো সমাজ-সংসার-বহির্ভূত অবাস্তব কল্পনায় অসার সাধন ভজনকে গ্রহণ করেন নি। তিনি প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতার বেদীমূলে তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিসম্ভার নিবেদন করে যান। রবীন্দ্রনাথের অজস্র সাহিত্যসৃষ্টির বাঁকে বাঁকে এ কথার সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাঁর এই চেতনার মূলে তৎকালীন ইউরোপীয় রাজনীতির প্রভাব-প্রকৃতি বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। যা ইংরেজ আগমনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজজীবনে একটা দৃঢ়মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলেই রবীন্দ্রনাথ বরাবরই পুঁথি-সর্বস্ব পাণ্ডিত্য, পৌরোহিত্য, বাস্তবতা-বর্জিত ধর্মজ্ঞান ও অলীক সাধনব্রতকে বহুভাবে বিদ্রূপবাণীতে জর্জরিত করেছেন।

বাঙালি সমাজের অন্যতম অভিশপ্ত প্রথা বহুবিবাহ-পদ্ধতি অনাদিকালের ইতিহাসধারায় প্রচলিত রয়েছে। এটি এদেশীয় নারী সমাজে অমানবিক কদাচারের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যা সবসময় নারীর মনুষ্যত্ব-মূল্যায়ন চরমভাবে অবমাননা প্রদর্শন করে আসছে। এ অবস্থার দুর্বিষহ বিধিব্যবস্থা উনবিংশ শতকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। "... সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে সম্পদশালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহের বহুল প্রচলন ছিল। কুলীন প্রথার নামে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহু বিবাহ ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং উনিশ শতকে, বাংলার সম্পদশালী হিন্দুদের অধিকাংশেরই একাধিক বিবাহ ছিল।"[১৯৫] এতে নারী ছিল পণ্য সামগ্রী ও জড়পুত্তলীর মতো দারুণভাবে অবহেলিত। তাদের নিজস্ব কোনো স্বকীয় স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত ছিল না। এ অবস্থা মূলত সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে শুরু করে সেন রাজাদের কৌলীণ্য প্রথার হাত বেয়ে এদেশীয় সমাজে জেঁকে বসে। বিশেষত, সেন রাজাদের কৌলীণ্য প্রথার নামে এটি তাদের অন্যতম রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। এবং এর ফলেই যুগে যুগে অজস্র পরিবার নানাপ্রকার বিপত্তির মুখে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিল। বৈধব্য, স্বামীসুখবঞ্চনা, মাতৃত্ববঞ্চনা, পিতা-মাতার গঞ্জনা, আত্মহত্যা– ইত্যাদি গ্লানিকর পরিস্থিতি বাঙালি নারীকে কুরে কুরে নিঃশেষিত করে দেয়। বিশেষ করে অকাল বৈধব্যের প্রাদুর্ভাব বাঙালি সমাজে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। "কৌলিন্যপ্রথার যুগে বহুবিবাহের ফলে বিধবার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিলো বাঙালি হিন্দু কুলীন সমাজে। তখনকার একটি প্রবচন এরকম, 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে'। কুলীন পাত্রের অপেক্ষায় কার্যত কুলীন মেয়েরা পরিণত হয়েছিলেন বাজারের কাঁচামালে। অবাধে শতায়ু বৃদ্ধের সঙ্গে চলতে থাকে সদ্য রজঃস্বলা কিংবা শিশু কন্যার বিয়ে। এ প্রসঙ্গে ম্যালে তথ্য দিয়েছেন ঃ

'কৌলিন্যের প্রভাবে চার মাস থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত সব বয়সী, সব মেলের আইবুড়ো মেয়েকে একপাত্রে সমর্পণের ঘটনা যেমন ঘটতো, তেমনি সাত বছরের ছেলের ঘাড়েও ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সী আট নয়টি বউ চাপিয়ে দেয়া হতো। ... এমনও শোনা যায়, কোনো গৃহকর্তা পাত্রের অভাবে তার সমস্ত অবিবাহিত ভগ্নি ও কন্যাদের একই কুলীনের হাতে সমর্পণ করেছেন। (এল এম এস ও ম্যালে ইন্ডিয়ান কাস্ট কাস্টমস, ১৯৭৬)।"[১৯৬]

উনবিংশ শতকে ভারতীয় জীবনে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৈশ্বিক যোগাযোগ ও ইউরোপীয় রাজনীতির প্রভাবে ভারতীয়গণ কৌলীণ্য প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যা রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। এবং এসব সমস্যার প্রতিরূপ-প্রতিচ্ছবি তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে নানাভাবে তুলে ধরেন। এই অমানবিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) থেকে শুরু করে অনেকেই প্রবলভাবে জনমত গড়ে তোলেন। এবং একসময় তা সামাজিক আন্দোলনে রূপগ্রহণ পেতে শুরু করে। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ১৮৫৫ সালে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন ভারত সরকারের কাছে। এবং তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১) নামক পুস্তকে এই প্রথার পরিসংখ্যান ও কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়। এছাড়াও বিদ্যাসাগর নারীজাতির নানামুখী উন্নতির লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ও রাজনীতির শরণাপন্ন হন। নারী শিক্ষা তথা আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে তিনি নারীসমাজকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছেন। এছাড়া বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিঃ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়। তিনি নিজ পুত্র সন্তানকে বিধবা বিবাহ করিয়ে একটি যুগান্তরের দ্বার উন্মোচন করেন। এসব কর্মতৎপরতার মূলে সমসাময়িক ব্রিটিশ সরকার ও তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটিশ রাজনীতি প্রথমত ভারতীয় সমাজের এসব অন্তর্গত প্রথা-পদ্ধতির ব্যাপারে কর্ণপাত করে নি। কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও এহেন অমানবিক প্রথানুগত্যের অবাঞ্ছিত আবর্জনা দূর করতে প্রয়াসী হন। সামাজিক ভারসাম্যের খাতিরে মানবিক মূল্যবোধ রচনায়

তারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকেন। "প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠি প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনে আগ্রহী ছিল না। তবে হেস্টিংসের পরে কয়েকটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদনে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি চালু করা হয়। প্রাক ব্রিটিশ আমলে আইনের শাসন এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ রাষ্ট্রের অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বিচার ব্যবস্থা ১৭৯০ সালে কর্ণওয়ালিস প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীতে একই নীতি ও কাঠামো অনুসৃত ও সম্প্রসারিত হয়।"[১৯৭] এবং এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ সরকারের দূরদর্শী রাজনীতি কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। যাতে এদেশের নারী সমাজের কিছু দুর্লজ্ঘ কলঙ্কিত অধ্যায়ের অবসান ঘটে। যেমন ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা অনুসরণের ফলে শাস্তির বিধান করা হয়। এছাড়া ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ সংস্কার আইন ও ১৮২৯ সালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এসব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। যা তাঁর 'মুক্তির উপায়' নাটকের প্লট সংঘটন ও চরিত্রসমূহ থেকেও অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু এই নাটকেও বহুবিবাহের ফলে সৃষ্ট পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়কে উপস্থাপন করেন। ফলে পুরুষের বহুবিবাহজনিত শিকারে নারীর নিদারুণ অসহায়ত্ব নাটকীয় চমৎকারিত্বের মাধ্যমে দৃশ্যরূপ লাভ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৪৫০-৫১ ।

২. বাংলার জাগরণ, কাজী আবদুল ওদুদ, বি-ভা, প্র-প্র- ১৩৬৩, পৃ: ৮ ।

৩. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র- ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা, পৃ: ১১

৪. ঐ, পৃ: ১৮

৫. বালক কবির প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' দ্বি-ভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে উহা সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ হয়তো করে নাই । সূত্র : রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য- প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ- ১৩৬৭, কলিকাতা, পৃ: পৃ: ৫৯ থেকে উদ্ধৃত ।

৬. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৩

৭. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৪৯ ।

৮. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্র-প্র, ১৯৯৮ কলিকাতা, পৃ: ১৪ ।

৯. বাংলার জাগরণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রশীদ আল ফারুকী, প্র-প্র- ১৯৮৫, বা-এ, ঢাকা, পৃ: ১৪৩ ।

১০. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৪৫৬ ।

১১. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৪৫৬ ।

১২. রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ১৩৭১, পৃ: ১৪৯ ।

১৩. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র- ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ: ৪৫ ।

১৪. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, বিসর্জন, পৃ: ৫৯৩

১৫. ঐ, পৃ: ৫৯৮

১৬. শেলী ও রবীন্দ্রনাথ, ড. শীতল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ-তুলনামূলক আলোচনা, সম্পাদনা-অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র-প্র- ২০০১, ঢাকা, পৃ: ২০৯ থেকে উদ্ধৃত ।

১৭. রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা, মুহম্মদ মজির উদ্দীন, প্র-প্র- ১৯৭৮, পৃ: ৫৪-৫৫ ।

১৮. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র- ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ: ১৮

১৯. রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম, ধর্মতন্ত্র, মানবধর্ম, দেবীপদ ভট্টাচার্য, রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্র-সং- ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ২৬৭ থেকে উদ্ধৃত ।

২০. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার, প্র-প্র- ১৯৮২, কলিকাতা, পৃ: ৮ ।

২১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, সপ্তম সংস্করণ- ১৩৮৬, কলকাতা, পৃ: ৮ ।

২২. ঐ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ- ১৪০১, পৃ: ৩-৪

২৩. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (প্রথম খণ্ড), শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ- ১৩৬৭, পৌষ, কলিকাতা, পৃ: ৯

২৪. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র- ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ৪৬ ।

২৫. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৪৫

২৬. (ক) ঐ, ৪৪৩
(খ) র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, রামমোহন রায়, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৮৯-৯০

২৭. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, নবজাতক, পৃ: ১০৯

২৮. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গোরা, পৃ: ৬৬৪

২৯. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, যাত্রী, পৃ: ৪৮৩

৩০. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্র-প্র- ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ১৭৯-৮০ থেকে উদ্ধৃত ।

৩১. প্রবাসী, ফাল্গুন- ১৩১৮, পৃ: ৪৭২, র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৯১ থেকে উদ্ধৃত ।

৩২. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পরিশেষ, পৃ: ২০৬

৩৩. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, চিত্রাঙ্গদা, পৃ: ২২৮

৩৪. ঐ, পৃ: ২৪১

৩৫. রবীন্দ্র-নাট্যধারা, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা- ১৩৭৩, পৃ: ২০১ ।

৩৬. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, চিত্রাঙ্গদা, পৃ: ২২২
৩৭. রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা, মুহাম্মদ মজির উদ্দীন, প্র-প্র- ১৯৭৮, পৃ: ১৪২ ।
৩৮. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৪১
৩৯. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৫৬
৪০. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশেষ সংস্করণ- ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ: ২৮৭
৪১. নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ, প্র-প্র- ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ: ১৭১ ।
৪২. রবীন্দ্র-নাট্যধারা, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্র-প্র- ১৩৭৩, কলিকাতা, পৃ: ২১৬
৪৩. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মালিনী, পৃ: ৩১৭
৪৪. ঐ, পৃ: ৩৩০
৪৫. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মানুষের ধর্ম, পৃ: ৬৫৯
৪৬. রবীন্দ্রপ্রবন্ধ, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, হুমায়ুন আজাদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ- ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ: ১৩২-৩৩ ।
৪৭. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শিক্ষা-সংস্কার, পৃ: ৫৭৫
৪৮. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ: ৪০ থেকে উদ্ধৃত ।
৪৯. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৪৮-৪৯
৫০. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ: ৫৫ থেকে উদ্ধৃত ।
৫১. ভারতীয়, বৈশাখ, পৃ: ৩-১৪
৫২. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শিক্ষা, পৃ: ৫৬৬
৫৩. ভারতী, শ্রাবণ- ১২৪৮
৫৪. রবীন্দ্র বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ- ১৩৯৪, কলিকাতা, পৃ: ৪১ থেকে উদ্ধৃত ।
৫৫. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাশিয়ার চিঠি, পৃ: ৫৬১ ।
৫৬. ঐ, পৃ: ৫৭৫
৫৭. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ- ১৩৬৭, কলিকাতা, পৃ: ২৭৬
৫৮. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ: ৩৮ থেকে উদ্ধৃত ।
৫৯. ঐ, পৃ: ৩৩-৩৪
৬০. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬০৯
৬১. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩০১
৬২. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২০
৬৩. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৭০
৬৪. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রমথনাথ বিশী, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা- ১৩৭৮, পৃ: ৭২
৬৫. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বা-এ- ১৯৮৩, পৃ: ৯৩
৬৬. বাঙালি নারী, মাহমুদ শামসুল হক, পাঠক সমাবেশ সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি- ২০০০, ঢাকা, পৃ: ১৫০
৬৭. কাব্য পরিক্রমা, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বি-ভা, কলিকাতা- ১৩৭৪, পৃ: ৪
৬৮. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বা-এ- ১৯৮৩, পৃ: ১৯ থেকে উদ্ধৃত ।
৬৯. সামাজিক ইতিহাস ও উন্নয়ন ভাবনা, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯, ঢাকা- ১১০০, পৃ: ১৩
৭০. রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, পূর্ণাঙ্গ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ১৩৬-৩৭ ।
৭১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৮১, পৃ: ২২৬ ।
৭২. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গ্রন্থপরিচয়, অচলায়তন, পৃ: ৭৮৪
৭৩. ঐ, পৃ: ৩৪৯
৭৪. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা- ১৩৫১, পৃ: ৩২৩ ।
৭৫. ঐ, পৃ: ৩২৩
৭৬. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, কর্মযোগ, পৃ: ৫৯২
৭৭. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্র সাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃ: ১০০
৭৮. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬০৭
৭৯. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৮৫
৮০. ঐ, পৃ: ৭৮৩-৮৪

৮১. রবীন্দ্র-নাট্যধারা, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ- ১৩৭৩, পৃ: ৩৪৮

৮২. র-র, একাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পারস্যে, পৃ: ৬৪২

৮৩. রবীন্দ্র-নাট্যধারা, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ- ১৩৭৩, কলিকাতা, পৃ: ৩৩৭ ।

৮৪. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, বিশ্বভারতী পৃ: ২৭৮

৮৫. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৯৫

৮৬. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বা-এ- ১৯৮৩, পৃ: ১৩৭ ।

৮৭. ঐ, পৃ: ১২৫-২৬

৮৮. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৪১৪

৮৯. ঐ, পৃ: ৪০৫

৯০. ঐ, পৃ: ৪২২

৯১. ঐ

৯২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ: ১৭২-৭৩

৯৩. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১১৯-২০

৯৪. ঐ, পৃ: ৬৩১

৯৫. ঐ, পৃ: ৬৩৫

৯৬. র-র, একাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৩১

৯৭. রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নীহার রঞ্জন রায়, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃ: ৩৫৯-৬৩ ।

৯৮. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৮২

৯৯. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মুক্তধারা, পৃ: ৩৫৯-৬৩

১০০. ঐ, ৩৬১

১০১. ঐ, পৃ: ৩৫৫

১০২. ঐ, পৃ: ৩৩৯

১০৩. ঐ

১০৪. ঐ

১০৫. এ, পৃ: ৩৫২

১০৬. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ: ২০৮-৯

১০৭. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২১০

১০৮. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ: ২০৮-৯

১০৯. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভাঁ, কলি-১৪০২, মুক্তধারা, পৃ: ৩৫০

১১০. Capitalism in India, Levkovsky, P-40, 1972. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্র সাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র- ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলিকাতা, পৃ: ৯ থেকে উদ্ধৃত ।

১১১. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ: ৩৭৮-৭৯

১১২. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মশক্তি, পৃ: ৬৩৩

১১৩. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সমবায়নীতি, পৃ: ৩২৫

১১৪. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ৯৫ ।

১১৫. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি, আনু মুহাম্মদ, প্রথম প্রকাশ- ২০০০, ঢাকা, পৃ: ৪৬ ।

১১৬. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, প্র-প্র- ১৯৮৩, বা.এ., ঢাকা, পৃ: ১৮৪-৮৫ ।

১১৭. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৭০

১১৮. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৩২

১১৯. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৬১

১২০. ঐ, ৩৬২

১২১. বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা, নীলিমা ইব্রাহিম, প্রথম সংস্করণ- ১৩৭৯, ঢাকা, পৃ: ৩৫১ ।

১২২. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ৩৩৪ ।

১২৩. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার, প্র-প্র- ১৯৮২, কলিকাতা, পৃ: ৩০২ ।

১২৪. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৭৯

১২৫. ঐ, পৃ: ৭১৬

১২৬. ঐ, পৃ: ৩৯২

১২৭. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বা.এ., ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ: ১৮১

১২৮. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩২২

১২৯. ঐ, পৃ: ৩১৮

১৩০. রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা, কাননকুমার মজুমদার। রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্র-সং- ১৩৯৫, কলিকাতা, পৃ: ২৫১-৫২ থেকে উদ্ধৃত।

১৩১. বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, গোপাল হালদার, বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮০, ঢাকা, পৃ: ৯।

১৩২. বাঙলা ও বাঙালী, অজয় রায়, ১৯৭৭, ঢাকা, পৃ: ৬১-৬২

১৩৩. ঐ, পৃ: ১৮৯

১৩৪. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সফলতার সদুপায়, পৃ: ৬৪৬

১৩৫. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্র-সং- ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ৩৪১।

১৩৬. গ্রন্থপরিচয় : রাশিয়ার চিঠি, র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৮১

১৩৭. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৫৬

১৩৮. ঐ, পৃ: ৫৫৩

১৩৯. ঐ, পৃ: ৫৭০

১৪০. ঐ, পৃ: ৫৯৭

১৪১. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সমবায়নীতি, পৃ: ৩১৩

১৪২. ঐ, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ: ৩৭২

১৪৩. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাশিয়ার চিঠি, পৃ: ৫৫৭-৫৮

১৪৪. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ: ৩৮৩

১৪৫. ঐ, পৃ: ৩৭২

১৪৬. ঐ, পৃ: ৩৮৩

১৪৭. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, কালান্তর, পৃ: ৫৫৪

১৪৮. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গীতাঞ্জলি, পৃ: ৭২

১৪৯. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৫৬১

১৫০. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২১২

১৫১. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৬

১৫২. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৭১

১৫৩. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য, প্র-সং- ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ৩৮৪।

১৫৪. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, তাসের দেশ, পৃ: ২৪০

১৫৫. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, প্র-সং- কলিকাতা- ১৩৫০, পৃ: ৩০৫।

১৫৬. রবীন্দ্র-নাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, তৃ-সং- ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ১৩৭।

১৫৭. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, তাসের দেশ, পৃ: ২৪৩-৪৪

১৫৮. ঐ, পৃ: ২৫৭

১৫৯. নির্বাচিত প্রবন্ধ, আহমদ শরীফ, প্রথম মুদ্রণ- ১৯৯৯, ঢাকা, পৃ: ১৭৬

১৬০. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, তাসের দেশ, পৃ: ২৪৭

১৬১. রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা, মুহাম্মদ মজির উদ্দীন, প্র-প্র- ১৯৭৮, বা.এ., ঢাকা, পৃ: ১৬৪

১৬২. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৬০

১৬৩. রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার, প্র-প্র- ১৯৮২, কলিকাতা, পৃ: ১৩৮-৩৯

১৬৪. দামোদর চাপেকারে আত্মজীবনী থেকে সিডিশন কমিটি (১৯১৮) প্রতিবেদনে উদ্ধৃত, নিউ এজ সংস্করণ, পৃ: ২

১৬৫. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৩১

১৬৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ৩৩৮

১৬৭. রবীন্দ্র আহ্বান, সুভাষচন্দ্র বসু, মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনা উপলক্ষে, রবীন্দ্র বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রণ-১৩৯৪, কলিকাতা, পৃ: ২১ থেকে উদ্ধৃত।
১৬৮. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র- ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ: ১২৬
১৬৯. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ৩৬১
১৭০. ঐ, পৃ: ৩৬১
১৭১. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, নকলের নাকাল, পৃ: ৫৩৫-৫৩৬, ৫৩৮
১৭২. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৪৬২
১৭৩. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭, কলিকাতা, পৃ: ৪৩০
১৭৪. ঐ, পৃ: ৪৩০-৪৩১ থেকে উদ্ধৃত।
১৭৫. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৩৫
১৭৬. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২১৯
১৭৭. সামাজিক ইতিহাস ও উন্নয়ন ভাবনা, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্র-প্র- ১৯৯৯, ঢাকা-১১০০, পৃ: ২৬ থেকে উদ্ধৃত।
১৭৮. বাঙালি নারী, মাহমুদ শামসুল হক, প্রথম পাঠক সমাবেশ সংস্করণ- ২০০০, ঢাকা, পৃ: ৮৭-৮৮ থেকে উদ্ধৃত।
১৭৯. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ধর্মের অধিকার, পৃ: ৫৬২
১৮০. রবীন্দ্র -ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা, মুহম্মদ মজির উদ্দীন, প্র-প্র- ১৯৭৮, বা.এ., ঢাকা, পৃ: ৬১-৬২
১৮১. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশেষ সংস্করণ, ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ: ১৫৯ থেকে উদ্ধৃত।
১৮২. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, চণ্ডালিকা, পৃ: ২১৭
১৮৩. ঐ, পৃ: ২১৭
১৮৪. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্র সাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র- ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ- ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ: ১২২
১৮৫. র -র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পত্রপুট, পৃ: ১২৬-২৭
১৮৬. রবীন্দ্রপ্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, হুমায়ুন আজাদ, ১৯৭৩, ঢাকা, পৃ: ৯৮
১৮৭. র -র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সাহিত্যের পথে, পৃ: ৫২৬
১৮৮. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সমাজ, পৃ: ৫৫৫
১৮৯. রবীন্দ্রনাথ : শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, নেপাল মজুমদার, প্রথম প্রকাশ-২০০০, কলিকাতা, পৃ: ২৩
১৯০. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, বাঁশরি, পৃ: ২৭০
১৯১. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৭, কলকাতা, পৃ: ১২৬।
১৯২. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সাহিত্যধর্ম, পৃ: ৪৫৪
১৯৩. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সাহিত্যের পথে, পৃ: ৫২২
১৯৪. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ: ১৮১
১৯৫. রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, সম্পাদক, এমাজউদ্দিন আহমদ, হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-২০০৭, ঢাকা, পৃ: ৪৯৯ থেকে উদ্ধৃত।
১৯৬. বাঙালি নারী, মাহমুদ শামসুল হক, প্রথম পাঠক সমাবেশ সংস্করণ- ২০০০, ঢাকা, পৃ: ১৫৫ থেকে উদ্ধৃত।
১৯৭. রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, সম্পাদক, এমাজউদ্দিন আহমদ, হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ-২০০৭, ঢাকা, পৃ: ৪৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
রবীন্দ্রনাটকে সংস্কৃতি

'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যের বক্তব্যবিষয় ও অনুষঙ্গ উপাদান ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণমূল-প্রবাহ থেকেই গৃহীত। দস্যু বাল্মীকির বরলাভে কবিত্বশক্তিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী এ দেশের লোক ঐতিহ্যের ধারায় প্রচলিত। আবহমানকাল থেকেই ভারতীয় লোকসাহিত্যের গল্পগাথায় এর সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা বরাবরই অক্ষুণ্ন রয়েছে। যা কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণের কাহিনীতে বেশ গুরুত্বের সাথে স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ এই 'রামায়ণ' থেকেই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যের কাহিনী সংগ্রহ করেন। এই কাহিনীর চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহও এ দেশের লোকায়ত মরমীয়া সুফি বাউল সাধকদের প্রভায় গড়ে ওঠে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর বরপ্রদানে বাল্মীকির মধ্যে সৃজনধারার উৎসারণ প্রসঙ্গটি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশবিশেষ। এর ঐতিহ্যিক অনুভবের নিবিড় প্রযত্ন পরিচর্যা– যা ভারতীয় সমাজে লালন করা হয়। এছাড়া 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের আবহ কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ বনভূমি ও বৃক্ষনিধনের পরিপার্শ্ব অবস্থাকে বেছে নেন। এতে উপনিষদের বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতীয় সংস্কৃতি-ধারাই নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকে বাল্মীকি চরিত্রের মধ্যে বাউল সাধকদের রূপপ্রকৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই বাউল-বৈষ্ণব ও সন্ন্যাস-জাতীয় ভাবতরঙ্গে তাড়িত হন। পরিবারসূত্রে বাল্যকাল থেকেই তিনি এর সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। ফলে সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর বিচিত্রভঙ্গিম সৃষ্টিকর্মেও এই বাউল-প্রভাব লক্ষণীয়। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সংগীত ইত্যাকার রচনাশৈলীর মধ্যে এর সুগভীর প্রভাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন, 'শারদোৎসব' নাটকের সন্ন্যাসীবেশে রাজা, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জর বৈরাগী, 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউল ইত্যাদি চরিত্র বাউল চরিত্রের আদলে গড়া। এছাড়া রবীন্দ্ররচিত 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মধ্যে বিভিন্নভাবে বাউল প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সংগীতরচনায় বহু জায়গায় বাউল সুর গ্রহণ করেছেন। যা তিনি নিজেই অকপট স্বীকারোক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বরেন, "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। ... তখন আমার নবীন বয়স। শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল, 'কোথায় পাব তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে/ হারায়ে সেই মানুষ তার উদ্দেশ্যে/ দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে'। কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল... 'অন্তরতর হৃদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল।" তাছাড়া 'চিত্রা', 'জীবনদেবতা', 'অন্তর্যামী' 'Religion of Man' প্রভৃতি রচনার অন্তর্গত প্রকৃতির মধ্যে বাউল প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যের বাল্মীকি চরিত্র বাউল বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে গড়ে তোলা হয়েছে। এসব চরিত্র সাধারণত নির্মোহ, সত্যসন্ধানী, মানবতার পূজারি, সন্ন্যাস প্রকৃতির ও বোহেমিয়ান জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে। 'বাল্মিকীপ্রতিভা' গীতিনাট্যে 'বাল্মীকি' চরিত্রের মধ্যেও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

"বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।
কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের এই বাউল-প্রীতি ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যিক প্রবাহ পরম্পরার মাধ্যমেও গড়ে ওঠে। তিনি জন্মাবধি লক্ষ করেন– তাঁদের বাড়িতে বাউল বৈষ্ণবদের যাতায়াত ছিল বরাবরই চোখে পড়ার মতো। তিনি অত্যন্ত কৌতূহলের সাথে এসব চরিত্র ধর্মের সান্নিধ্য উপলব্ধি করতেন। তাছাড়া পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুবাদে উপনিষদের ঋষি কবিদের বাণীও তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। "গুরুদেবের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঔপনিষদিক ধর্মচিন্তার একান্ত সাধক। তাঁকে আমরা বলতে পারি রামমোহন রায় প্রবর্তিত ঔপনিষদিক চিন্তার জ্ঞানমার্গের সাধক। ... গুরুদেব তাঁর পিতার প্রভাবে বাল্যকাল থেকেই উপনিষদের জ্ঞানমার্গের চিন্তায় লালিত-পালিত ছিলেন।"[২]

পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিপ্রাবল্য ও মুসলমানদের সূফীতত্ত্ব রবীন্দ্রচিন্তায় পরিপুষ্টি দান করে। 'বাল্মিকীপ্রতিভা' নাটকেও এসব ধর্মীয় সংস্কৃতির রূপরেখা বিভিন্নভাবে ফুটে ওঠেছে। বাংলার লোক ঐতিহ্যের পথ বেয়ে ঠাকুর পরিবারে এসব চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটে। উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথও এসব ভাবভাবনার সাথে গভীর সামীপ্য অনুভব করেন। মূলত বাউল, বৈষ্ণব, সূফী ও উপনিষদের মধ্যে একটা সমন্বয়বাদী চিন্তাচেতনাই তাঁকে তাড়া করে ফেরে। যা তাঁর 'বাল্মিকীপ্রতিভা' নাটকেও অনুভব করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনেও বাউল ধর্ম সাধনার কাছাকাছি আসার সুযোগ পান। ১৮৯১ সালে তিনি পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে বসবাস শুরু করেন। এ সুবাদেই সেখানকার লালন ফকিরের ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। এ এলাকায়ই বিখ্যাত মরমী সাধক কাঙাল হরিনাথ, লালন ফকির, সিরাজ সাঁই ও গগন হরকরা বসবাস করত। এঁদের সাথে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি 'পত্রপুট' কাব্যের পনের-সংখ্যক কবিতায় বলেন,

"কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে
... .
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।"[৩]

বাউল সাধকগণ সারাজীবন মনের মানুষকে খুঁজে বেড়িয়েছে। তাঁরা গেয়ে বেড়ান–

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।"

এই মনের মানুষ ও এর অন্তর্গত রূপরহস্য রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টিসাধনার প্রাণ-প্রণোদনা গড়ে দিয়েছে। বিশেষত, জীবনদেবতা পর্যায়ের রচনাসৃষ্টির পেছনে এর সতত সহযোগ নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্ররচনায় অধ্যাত্ম অনুভব ও সৃষ্টিতত্ত্বের উৎসারণ মূলত এর মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে।

এছাড়া বাউল ও উপনিষদের সাধনগত পদ্ধতি প্রয়াস প্রায় একই রকম। যা উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথকে সারাজীবন সম্মোহিত করে তোলে। তিনি এই সাধনমার্গের গূঢ় রহস্যকথা 'Religion of Man' বক্তৃতাগুলোতে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমলা স্মৃতি বক্তৃতায় 'মানুষের ধর্ম' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে বাউল ও উপনিষদের সাধকগণের চিন্তার সাম্য-সম্প্রীতি উল্লিখিত হয়। এবং এসব ঐতিহ্যিক ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র প্রতিপন্ন করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোনো এক সময়ে বাউলসুরের ভক্তিরসে গভীরভাবে নিমজ্জিত ছিলেন। বিশেষত, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। এসময় পুরো ভারতবর্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্তুঙ্গ সংগ্রামে লিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ এই মুক্তিপিয়াসী স্বাধিকারপ্রমত্ত ভারতবাসীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এবং নানা উপায়ে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলেন। এ সময় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে দেশাত্মবোধক সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। আলোচ্য সময়ে মাত্র তিন মাসে তিনি প্রায় ২৬ টি দেশপ্রেমের গান রচনা করেন। এসব গানের অধিকাংশই বাউল সুরে রচিত। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্ররচিত অজস্র ছোটগল্পের কথাও স্মর্তব্য। 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', 'পোস্টমাস্টার', 'মুক্তির উপায়', 'দৃষ্টিদান', 'মেঘ ও রৌদ্র' ইত্যাদি গল্পে বাউল ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির উজ্জ্বল চিত্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া 'গোরা' উপন্যাসের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথকে এক বিখ্যাত বাউল গান জুড়ে দিতে দেখা যায়–

"খাচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।"[৪]

'বাল্মিকীপ্রতিভা' নাটকে দেবী সরস্বতীর বরলাভ পেয়ে বাল্মীকির কবিত্বশক্তিতে হয়ে ওঠা মূলত ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচয়বাহীরূপে গৃহীত। মহাকবি কালিদাস থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অনেক কবিই এই কাব্যিকতা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেন। মধ্যযুগের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বলেন যে, 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তিনি লিখেননি, দেবী চণ্ডী তাঁর হাত দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন।' কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের রচনা-প্রসঙ্গেও অনুরূপ মন্তব্য করেন। এই কাব্যে কবি দেবী অন্নদার আশ্বাস-ভরসা প্রসঙ্গে বলেন, "যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখিবে'। এ প্রসঙ্গে 'বাল্মিকীপ্রতিভা' নাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এখানেও দেবী সরস্বতী বলেন,

"আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।"[৫]

আধুনিক বাংলা কাব্যের জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) এই দেবী সরস্বতীর বন্দনায় মুখর ছিলেন। তিনি মহাকাব্য 'মেঘনাদবধকাব্য' (১৮৬১) রচনার সময়ও এই মাহাত্ম্য-কীর্তনে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। মধুসূদন প্রসঙ্গক্রমে দস্যু রত্নাকরের কবি বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী উল্লেখ করতেও ভুলেন নি। তিনি বলেন,

'বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতা, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
... .
... উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
– তুমিও আইস, দেবী তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু
লয়ে। রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে কবিরে পান সুধা নিরবধি।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই সরস্বতী বন্দনা আরও ব্যাপক ও বহুবিচিত্র রূপরেখায় সমর্পিত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শান্ত-সমাহিত ধ্যানগম্ভীর ভক্তিবিশ্বাসে লালন করা হয়। তিনি সরস্বতীকে 'মানসসরসবাসিনী', 'শুক্ল বসনা', 'শুভ্রহাসিনী', 'মঞ্জুভাষিণী' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করেন। এই বহুবর্ণিল নামবৈচিত্র্য মূলত ভারতীয় সাহিত্যে দেবী সরস্বতীর ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি নির্দেশিত করে থাকে। এছাড়া দেবী সরস্বতীকে অনেকেই 'মনসা', 'দুর্গা', 'চণ্ডী' 'অন্নদা' ইত্যাদি নামেও অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই বৈচিত্র্যবিভা লক্ষণীয়। তাঁর বহুল আলোচিত জীবনবেদবতা-বিষয়ক গূঢ় রহস্য ও তত্ত্বকথা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে 'অন্তর্যামী', 'চিত্রা', 'জীবনদেবতা', 'মানসসুন্দরী', 'মানসী' ইত্যাদি নামে মূলত প্রেরণাদায়িনী দেবী সরস্বতীর অস্তিত্বই স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এরই বহুভঙ্গিম প্রকৃতির উল্লেখ করতে গিয়ে চিত্রা কাব্যে বলেন,

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"[৭]

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে বলেন, "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে। কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। ... তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম–

"এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।"[৮]

রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যময় ভাবভাবনার বহুবিস্তৃত ব্যাখ্যা থাকলেও মূল স্রোতধারাটি দেশীয় সংস্কৃতিরই পরিচয়বাহী। মূলত ভারতীয় কাব্য-ঐতিহ্যের এক সমূল সংস্কৃতি-সহযোগ এখানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। যা তাঁর কাব্যিক সাফল্যের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবেও মনে করা হয়ে থাকে।

'বাল্মিকীপ্রতিভা' নাটকে বৃক্ষ নিধন, বন উজাড় ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কথা বলা হয়েছে। এবং এর ফলে সামাজিক জীবন-জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের শঙ্কিত ভাবভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। নাটকের শুরুতেই বনদেবীগণের সশঙ্ক উক্তিতে শোনা যায়–

"সহে না সহে না কাঁদে পরাণ।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ
ত্রাসে সকল দিক কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।"[৯]

রবীন্দ্রনাথের এই অরণ্য-বেষ্টিত সমাজ পরিপার্শ্ব বর্ণনার মূলে ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতিরূপ লক্ষণীয়। এবং ক্রমান্বয়ে এর ধ্বংসসাধন প্রচেষ্টায় এদেশেরই বাস্তব রূপপ্রকৃতি ফুটে ওঠেছে। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় ভিত্তিভূমি সর্বপ্রথম বনভূমির মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছিল। বিশেষত উত্তর ভারতে ঋষিদের তপোবন-কেন্দ্রিক সভ্যতাই ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণ-তোরণ রচনা করে দেয়। এছাড়া বিশ্বসৃষ্টির ঊষালগ্নেও বনবৃক্ষের মাধ্যমে পৃথিবীর যাত্রাপথ সূচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে এ প্রসঙ্গে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন। অরণ্য-প্রকৃতির এই সুমহান ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণে তিনি বলেন, "সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায়নি। চারিদিকে অগ্নি-উদগীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন সুযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অঙ্গনে, চারিদিকে তাঁর তৃণশষ্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ হল, নগ্ন পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন করে। ... সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি সূর্যতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে। তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে; আজও সভ্যতা অগ্নিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলেছে।"[১০] পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব অংশের সাথেও বৃক্ষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। আর্যদের উন্নত জীবন জীবিকার উৎস ছিল এই অরণ্য প্রকৃতি। যা পৌরাণিক কাহিনীর যত্রতত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। শ্বেতাশ্বতরাপনিষদে বলা হয়, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'– অর্থাৎ, বৃক্ষের মতো নিশ্চলভাবে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত। এটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় একটি প্রসঙ্গ। তিনি বিভিন্নভাবে এটি নানা রচনায় ব্যবহার করেন। "তিনি শান্তিনিকেতনের লেখার মধ্যে একটি লেখায় এই বাণীটিকে প্রসারিত করিয়া তাহাকে অপূর্ব রূপ দিয়াছেন। অন্যত্রও বহু স্থলে তিনি এই বাণীটিকে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু 'আরোগ্য'র নবম সংখ্যক কবিতাটি যখন দেখিতে পাই–

... .
দেখিলাম যুগে যুগে নটনটী বহু শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি

শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী ।”[১১]

এই দৃশ্যপটের বর্ণনায়ও রবীন্দ্রচিত্তে উপনিষদের প্রচ্ছায়া সক্রিয় রয়েছে । যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণমূল প্রবাহই চিত্রিত হয়ে ওঠে । বিশেষত, ঐতিহ্যিক অরণ্য সভ্যতার কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয় । রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ভাষণাবলির মাধ্যমে এই সভ্যতার নানাদিক নিয়ে তাৎপর্যময় বক্তব্য উপস্থাপন করেন । এবং মুগ্ধ মননশীলতায় এর মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস খুঁজে বেড়ান । প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি বলেন, “ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীনযুগ চলে গেছে বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে । কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন । রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয়নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল ।”[১২] রবীন্দ্রনাথের অজস্র সৃষ্টিসম্ভারের ভাঁজে ভাঁজে এই অরণ্য সংস্কৃতির প্রভাব-প্রাণনা অনুভূত হয় । ‘বাল্মিকীপ্রতিভা’ নাটক জুড়েও এরই স্ফূরণ-সহযোগ কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের আবহ-অবয়ব বর্ণনায় বলেন,

“রিম্ রিম্ ঘন ঘন রে বরষে ।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে,
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ।”[১৩]

‘মায়ার খেলা’ (১৮৮৮) নাটকে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের কিছু নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন । লিরিক্যাল প্রবণতার কারণে নাটকীয় রস তেমন করে জমে ওঠার সুযোগ পায় নি । নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য– বস্তুনিষ্ঠ ঘনপিনদ্ধ দ্বন্দ্বসংঘাত এখানে অনেকটাই উপেক্ষিত । একটা সহজ সরল গীতিপ্রাণতা ‘মায়ার খেলা’ নাটকের পুরো ঘটনা ও চরিত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছে । এবং তা স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় নাটকীয়ত্ব দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ পায় নি । তথাপি স্বল্প আবেষ্টনীর মধ্যেও অমর শান্তা ও প্রমদার একটা ত্রিভূজ প্রেমকাহিনী গড়ে ওঠে । এখানে অমর ও শান্তার সুদীর্ঘ প্রেমময় সম্পর্ক অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে মিলনের মালা গাঁথে । অমর প্রমদার প্রতি আকর্ষণ, সান্নিধ্য ও দীর্ঘ বিরহদশা পেরিয়ে শান্তার মধ্যেই স্থিতিলাভ করে । এদের প্রেম-পরিণয় সাফল্যের পথে নির্দেশিত করতে রবীন্দ্রনাথ বিরহ-বিচ্ছেদ ও দুঃখের আঘাতকে অনিবার্যরূপে প্রতিপন্ন করেছেন । এবং প্রমদার চপল নিরাবলম্ব প্রেমকে শান্তার নির্ভরশীলতা গার্হস্থ্য প্রেমপরিণতিতে উত্তরণ দেখিয়েছেন । ‘মায়ার খেলা’ নাটকে শেষপর্যন্ত সুখ-দুঃখ পরিবেষ্টিত সংসারনিষ্ঠ প্রেমেরই জয়জয়কার ঘোষিত হয় ।

প্রেমের জন্য দুঃখ বিরহের অনিবার্য আবশ্যকতা রবীন্দ্রদর্শনের অন্যতম প্রধান দিক । যা তাঁর শিল্পসৃষ্টির একটা সবিশেষ উৎস হিসেবেও গৃহীত । রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যয়বোধ মোটেই নতুন কিছু নয় । বরং তা ভারতীয় সংস্কৃতির সুগভীর প্রাণমূল থেকে উৎসারিত । এ দেশের ঐতিহ্যিক সাহিত্য সৃষ্টির পরতে পরতে যা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব । রবীন্দ্রনাথও নিরাবলম্ব সংসার-বিচ্ছিন্ন প্রেমকে কখনো পূর্ণাঙ্গ বলে ভাবতে পারেন নি । প্রেমের মোহমত্ত রোমান্স অপেক্ষা অবলম্বন-আশ্রয় বড় বেশি প্রয়োজন । ‘মায়ার খেলা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষণীয় । এখানেও প্রমদার আশ্রয়হীন চপল প্রেমের চেয়ে শান্তার গম্ভীর স্থিতিশীল প্রেমকে প্রধান ভাবরূপে প্রতিপন্ন করা হয় । এবং এরকম একটি তত্ত্বদর্শনকে ভিত্তি করেই ‘মায়ার খেলা’ নাটকের পরিণতি নির্দেশিত । যা ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সাজুয্য বহন করে চলেছে ।

বিরহ-ভিত্তিক সার্থক প্রেমের বর্ণনায় এ দেশের কবি সাহিত্যিকগণ বরাবরই মুখর । দুঃখ-বিলাসী বাঙালি বরাবরই দুঃখের মধ্যেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চান । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুঃখের মধ্যেই যাত্রাপালা সমাপ্ত করেন নি । প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে ‘দুঃখের বারমাস্যা’ নামে একটি অনিবার্য অংশ সংযোজিত হতে দেখা যায় । কিন্তু এই দুঃখের তিমিরাভিসারের মধ্যেই তারা জীবনসূর্যের প্রদীপ্ত আলোকে অবগাহন করেছেন এবং এর মাধ্যমেই বাঙালির আপন মহিমা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পেতে সক্ষম হয় । মহাকবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ ও ‘শকুন্তলা’ কাব্যে বিরহব্রতী প্রেমকেই কবি মিলন মাধূর্যের আধারে প্রতিস্থাপন করেছেন । এই রূপ-রূপান্তরিত প্রেমই শেষপর্যন্ত সত্য ও কল্যাণের পথে অভিষিক্ত হয় । “দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে । সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্রকারু-খচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে । তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ– তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ

করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ্রদীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।'[১৪] প্রাচীন কবি রচিত এই ভাবধারা মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ বাণীর সাধনা করে গেছেন। যদিওবা কখনো কখনো তা ধর্মতাত্ত্বিক গূঢ় রহস্যের রূপ-প্রতীক ও অভিব্যঞ্জনার আলোকে পরিবেশিত। জীবাত্মা পরমাত্মার আধারে বর্ণিত হলেও শেষপর্যন্ত দুঃখদহনের সুতীব্র লীলাবিলাসই জেগে থাকে। মধ্যযুগের প্রায় পুরো অংশ জুড়েই অজস্র মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। এসব কাব্যের ভাবদর্শন মিলিয়ে দুঃখই প্রধান হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ শত-সহস্র পদরচনার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনায় বিরহ বিচ্ছেদকেই উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁদের কাব্যরচনায় মিলনমুহূর্তের কথায়ও বিচ্ছেদের সুর অনুরণিত হতে দেখা যায়। যেমন–

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল।" (বিদ্যাপতি)[১৫]

অথবা,

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিল জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে সই, আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।"[১৬] (চণ্ডীদাস)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির যোগ্য উত্তরসাধক হিসেবে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। তাঁর সৃজন-মনন জুড়ে সবসময় একটা বিরহের আবহ-আঙ্গিক চিত্রিত হয়ে ওঠে। তিনি কাব্যসাধনার উষালগ্নেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন–

"আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ
জননীর স্নেহে তোরে কবির পোষণ
হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন।"[১৭]

সাহিত্য সাধনার বর্ণবহুল পথপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ বারবার দুঃখের আঘাতে জর্জরিত হন। এবং এর মাধ্যমেই নিজের সত্যস্বরূপ অবগত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এর ফলে কখনো কখনো তিনি দুঃখকেই সত্য বলে ঘোষণা করেন। এমনকি বিরহ-উত্তর মিলনমাধুর্যের মধ্যেও দুঃখকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। তিনি বলেন,

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহুতের মতো।"[১৮]

দুঃখের আঘাতেই মানুষ দুঃখকে বিনাশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এবং একসময় দুঃখ ফুটেই বেরিয়ে আসে আনন্দধারার স্নিগ্ধ মাধুর্য। পরিশেষে মানুষ দ্বন্দ্বদীর্ণ নিঃসীম অন্ধকারের পথ হাতড়ে আলোর সন্ধান পেয়ে থাকেন। ফলে সেখানে শুধু মানব ও মনুষ্যত্ববোধের অক্ষয় আবিষ্কার নিষ্কম্প শিখার মতোই জাগরূক থাকে। রবীন্দ্রনাথ সপ্রসঙ্গ ভাবনার আলোকে বলেন–

"দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে,

ভয় কিছু না করিস তারে
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে।”[১৯]

দুঃখের আঘাতে আঘাতে আত্মদহনের তীব্র আলোয় মানুষ স্বকীয় অবস্থানকে অনুধাবন করতে পারে। এ সুবাদেই কর্তব্যনিষ্ঠ সঠিক পথের রূপরেখাটি উদ্ভাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে একটা সুদূরপ্রসারী কর্মপন্থা ও পরিণতিও সেখানে এসে ধরা দিতে বাধ্য। আর এভাবেই মানুষ জীবনপথে সাফল্য সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত হতে পারে। তখন বৃহতের ভাবনায় মানুষ বিশ্বপৃথিবীর এক অনিবার্য অংশরূপে নিজেকে আবিষ্কার করে থাকে। এবং এই বৃহত্ত্বই মানুষকে অক্ষয় আনন্দের অধিকারী করে তোলে।”... দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত সচেতন করিয়া তোলে। এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ, ভূমৈব সুখং, নাল্পে-সুখমস্তি-অল্পে আমাদের আনন্দ নাই। যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না– যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়।”[২০]

রবীন্দ্রনাথ বেদ পুরাণের ধর্মতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেও দুঃখ বিচ্ছেদের অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। আত্মদহনের সাধনব্রত পথ পেরিয়ে ভারতীয় ধর্মে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর সৃজন সাধনার বহুভঙ্গিম আলোচনা তুলে ধরেন। এবং প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনায় বেশ প্রশস্তিসূচক কাব্যিকতা উচ্চারিত হতে দেখা যায়। এমনকি কবি নিজেও এরই ঐতিহ্য সংস্কৃতির সুযোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে তৃপ্তিবোধ করেন। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিরহব্যথাপূর্ণ কাব্যিকতার প্রতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট–

“আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
....
ছটা ঋতু পূর্ণ করে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছটা সর্গে বার্তা তাহার
রইত কাব্যে গাঁথা।
বিচ্ছেদও সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মতো
....
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বধুঁর আশে
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত বসে।”[২১]

রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যভাবনার পার্থিব লীলাবিলাসে নয়– স্বর্গসুখের কল্পনায় দুঃখবিচ্ছেদের অপরিহার্য অবস্থান স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি স্বর্গবাসের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সুখকেও মেনে নিতে নারাজ। তাছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও জ্ঞানগরিমায় অনন্ত সুখের জন্যও দুঃখের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের শ্রেয়বোধের সুদীপ্ত বাসনার সঙ্গে দুঃখ-দহন বরাবরই আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে রয়েছে। “... কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে।”[২২] সুখ-দুঃখ, ভোগ-ত্যাগ, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও জীবন-মৃত্যুর অবিরাম প্রবাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। এবং এর মাধ্যমে মানুষ প্রতিনিয়ত তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-ঠিকানা নির্মাণ করে চলে। আঘাতে আঘাতে বেদনা-নিষিক্ত বিশ্বাসের বেলাভূমিতে মানুষ আপনার জয়পতাকা তুলে ধরেছে। “সেই জন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে আসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মমৃতং গময়। ‘গময়’ এই কথার মানে এই যে পথ পেরিয়ে যেতে হবে। পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।”[২৩]

‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ (১৮৮৪) নাটকটি রবীন্দ্রদর্শনের অন্যতম মূলীভূত সত্য হিসেবে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথ কখনো জনবিচ্ছিন্ন পৌরোহিত্য, পুঁথিপাণ্ডিত্য, জ্ঞানচর্চা বা সন্ন্যাসব্রতকে জীবনে গ্রহণ করতে পারেন নি। এ-

সম্পর্কিত অজস্র সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবদর্শন প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এখানে দেখা যায়, আত্মবিস্মৃত, জীবনবিমুখ, গুহায়িত একজন সন্ন্যাসী গভীর সাধনায় নিমগ্ন। পার্থিব জগৎ জীবনের প্রতি উদাসীন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্ছিদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে থাকাই একমাত্র ব্রত। এই আত্মগত ভাবনার আত্মলীন অবস্থায় উত্তরণই জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটি সামান্য বালিকার উষ্ণ সান্নিধ্যে সন্ন্যাসীর চৈতন্যবোধ ফিরে আসে। এবং বালিকার সমর্পিত সান্নিধ্য-সহযোগ সন্ন্যাসীকে জনজীবনে ফিরিয়ে আনে। এই আত্মগত জনবিচ্ছিন্ন সন্ন্যাসীকে সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গৃহীত। এবং শেষপর্যন্ত সমাজ-সংসার-পরিবেষ্টিত স্পন্দনের মধ্যেই সন্ন্যাসী জীবনের মহত্তম নির্দেশনা খুঁজে পায়। যা রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্তর্গত দর্শন দীক্ষারূপে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে আত্মসুখপরায়ণ সন্ন্যাসী উচ্চারণ করে–

"কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস।
অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম।
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।"[২৪]

আত্মসুখমগ্ন এই সন্ন্যাসীর কৃত্রিম ভাববলয়ের মধ্যেই একটি সামান্য বালিকার আগমন ঘটে। বালিকার উষ্ণ সান্নিধ্য ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে সন্ন্যাসী নড়েচড়ে বসে। বালিকার আত্মবিসর্জন–সুবাদে সংসারজীবনের অমেয় মনুষ্যমর্যাদা সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এবং সংসারই সকল তীর্থের কেন্দ্রভূমি বলে অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে সব প্রকারের জড়িমা-জীর্ণতা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উচ্চারণ করে–

"আমি তো সন্ন্যাসী নই। ওঠো ভাই, ওঠো-
এসো ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মতো
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।"[২৫]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটি ভারতদর্শনের মূলীভূত সংস্কৃতির আলোকে রচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যাবতীয় কাব্যসাধনাকে সীমা অসীমের পালা বলে উল্লেখ করেছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেও এই মতবাদ সবিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। মূলত রবীন্দ্রনাথের এই ভাবভাবনা ভারতীয় শাস্ত্র সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্য থেকে গৃহীত। যা ঋগবেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির পথ বেয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যুগোপযোগী অভিব্যঞ্জনা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির এই অনুষঙ্গ-উপাদান আত্মস্থ করেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক রচনা করেন। তাঁর আজন্ম প্রিয় ও বহু পঠিত ঈশোপনিষদ থেকেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের ভাবদর্শন গৃহীত বলে মনে করা হয়। ঈশোপনিষদের মূল বক্তব্য অনেকটা এরকম "ব্রহ্ম সংসারাতীত নয়, তিনি দূরে-কাছে, অন্তরে-বাইরে, সর্বত্রই বিরাজিত আছেন। কোথাও এককভাবে গুহায়িত হয়ে নয়। সংসারের সবখানেই তাঁর মহিমময় অবস্থান রয়েছে।" (ঈশোপনিষদ– শ্লোক সংখ্যা ঃ ১॥ ৫॥)।

উপনিষদপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকে স্বকীয় ভাবকল্পনায় আত্মস্থ করে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে প্রয়োগ করেন। "... পুরানী প্রজ্ঞাকে আধুনিক জীবনের গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এই বাণীরই শিল্পরূপ।"[২৬] সন্ন্যাসধর্মের আত্মকেন্দ্রিক গুহায়িত জীবনে ভগবান নেই– তিনি সংসারের সর্বত্র মহিমময় সৌন্দর্যে বিরাজিত আছেন। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে এই বাণী আদর্শেরই রূপপ্রকৃতি ফুটে ওঠেছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতীয় সংস্কৃতিধারা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এ সময় তিনি দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের চিরন্তন ধারাকে আত্মস্থ করতে প্রয়াসী হন। এবং বিশ্ব সংস্কৃতির মহাকালিক স্রোতে আবগাহন করার জন্য দারুণভাবে উদগ্রীব। কোনো প্রকার ভেদসঙ্কুল সীমায়তি বা খণ্ডিত জাতীয়বাদ তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বরং এ সময়েই আত্মবিবরের গ্লানিমা থেকে আত্মবিকাশের নিরন্তর যাত্রাপালা সূচিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "একসময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি। শান্তি পাইনি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। ... আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম। সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানব নাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি।"[২৭] এভাবেই ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথ মোহাবরণ ছিন্ন করে বিশ্ব পৃথিবীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্ব মানবাত্মার সীমাহীন যাত্রাপথে

নিজেকে অন্বিত করার দুর্মর বাসনাকে ব্যক্ত করেন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রত কবি ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে তাবৎ বিশ্বের মেলবন্ধন রচনায় প্রয়াসী হন। মহাকালিক যাত্রাপথে বিশ্বমানবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কবি বলেন,

"বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এককণ্ঠ হয়ে কব।
মানবের সুখ মানবের আশা
বাজিবে আমার প্রাণে,
শত লক্ষ কোটি মানবের ভাষা
ফুটিবে আমার গানে।"[২৮]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীকে সংসারের যাত্রাপালায় সম্পৃক্ত করেই নাটকের পরিণতি দান করেন। সন্ন্যাসী সীমা অসীমের মধ্যে ভেদরেখা তৈরি করে বিকৃত সাধনায় লিপ্ত। সংসারকে অস্বীকার করেই সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে চান। কিন্তু এ তো কখনো সম্ভবপর নয়। যা ভারতীয় সংস্কৃতির মূলীভূত সত্য হিসেবে বহুজনগ্রাহ্যতা লাভ করেছে। উপনিষদের মধ্যেও এ কথার সত্যতা যত্রতত্র চোখে পড়ে। সেখানেও সীমা-অসীম, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, পার্থিব-অপার্থিব ও ইহজাগতিক-পারত্রিক ভাবনার মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াস লক্ষণীয়। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ অনুরূপ ভাবনার আলোকেই মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করে যান। এমনকি গম্যস্থানের জন্য পথকে অস্বীকার নয়, বরং গ্রহণ-স্বীকরণ করেই এদেশের ঋষি-কবিগণ শাস্ত্র-সংহিতা রচনা করেন। তাঁদেরই মনন মনস্বিতার আলোকে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটি রচিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

"তাই পুরাতন ঋষি বলেছেন–
'অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতীঃ।'

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াতৃতমশুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র করে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুতে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।"[২৯] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের সন্ন্যাসীও সংসার সীমা অস্বীকার করে অসীমের সাধনায় ব্যাপৃত হয়। অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্ত নিয়ে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এবং এর ফলেই সন্ন্যাসী আরও বেশি অন্ধকারে নিমজ্জিত। "... অন্তকে বাদ দিয়া সন্ন্যাসী অনন্তের উপাসনা করিয়া আরও বেশি অন্ধকারে ডুবিয়াছিল।"[৩০]

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে পার্থিব জীবনে মানুষের মহত্তম যাত্রাপথের চিত্র অঙ্কিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের অনিঃশেষ কীর্তি পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হতে দেখা যায়। কারণ, জীবজগতে একমাত্র মানুষই মহাকালিক প্রবাহে আপন স্মারক-স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম। এর মাধ্যমে তিনি শাশ্বত মানবসংস্কৃতির এক অনুপম চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে। ইতিহাসে তাদের নাম ওঠে না। আপন প্রাণ থেকে মানুষের প্রাণপ্রবাহে তারা ঢেলে দিয়ে যায় তাঁরই অমিততেজ যশ্চায়য়স্মিন্ তোজাময়োহ মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ– যিনি এই আত্মার মধ্যেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ। যিনি সমস্তই অনুভব করেন, যেমন আকাশব্যাপী তেজকে উদ্ভিদ আপন প্রাণের সামগ্রী করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণলোকে উৎসর্গ করে।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার সুখ-দুঃখ পরিবেষ্টিত সংসারের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে বেড়ান। কোনোরকম অলীক মোহমত্ততায় স্বর্গসীমানা রচনা করতে চান নি। তাঁর সবরকম সৃষ্টিসাফল্যই এই প্রত্যক্ষ সংসারধর্মকে স্বাঙ্গীকরণ করে স্ফুর্তিলাভ করেছে। দৃশ্যমান জগতের প্রতিটি মুহূর্ত সহজভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"মনেরে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"[৩২]

নিস্পৃহ জীবনের আসক্তিবিহীন নির্লোভ ভালোবাসাই এই প্রবৃত্তিকে সার্থকতা দান করে। এবং এর মাধ্যমেই মানুষ চিরন্তন মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ আত্মগত স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, “ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বারবার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে। বারবার নিজেকে বলেছি– ‘তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধা।– আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে– যা রয়েছে তোমার চারদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন– লোভ কোরো না।”[৩৩]

‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রাত্যহিক জীবন সংসারের চিত্ররূপ অত্যন্ত কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলেন। এই ভাবনাস্থলে ভারতীয় শাস্ত্র সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিরূপ ধরা পড়েছে। এই সংসারপ্রীতি রবীন্দ্রচিন্তায় বরাবরই অধ্যাত্ম আলোকে বিধৌত। সংসারের সর্বত্রই ঈশ্বরের মহিমময় অবস্থান বিরাজিত রয়েছে। বিশেষত উপনিষদের ভাবানুযায়ী সংসারের সবখানেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বমহিমায় দীপ্যমান হয়ে আছে। এ অর্থে সংসারের কর্মই ঈশ্বরের কর্ম, সংসারের ভালোবাসাই ঈশ্বরের ধর্ম। “সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশে সমর্পিত হইবে।”(৩৪) রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবই প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। যা ঔপনিষদিক সংস্কৃতির সাথে গভীর ভাবে সাজুয্য বহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের অজস্র শিল্প সৃষ্টির মূলে এই সংসারপ্রীতি নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণনা জুগিয়েছে। তিনি এই প্রত্যক্ষ জীবনধর্মকে গভীর মূল্যমানের সাথে গ্রহণ করেছেন। এবং সংসারের প্রতি উদাসীন ও মায়াবাদীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি ‘কড়ি ও কোমল’ (১৮৮৬) কাব্যের চিরদিন শীর্ষক কবিতায় এরকম একটি প্রশ্নের অবতারণা করেন–

“বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে, সে স্বপন কাহার স্বপন?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার।”(৩৫)

এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটা নান্দনিক ভাবভঙ্গিমায় অবতীর্ণ হন। তিনি এই সংসারকে মায়াময় না ভেবে তা প্রেমের সীমাহীন ভাববিনিময়ের ক্ষেত্ররূপে উল্লেখ করেন। এবং মানবজীবনে এই সংসারের অনিবার্য উপযোগিতার কথা উল্লিখিত হয়। বরং তা মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বিত পরিপোষকরূপে গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক ব্যঞ্জনার অনুপম বাণীভঙ্গিমায় বলেন,

“অসীম জগতে একি আদান প্রদান
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন”।(৩৬)

সংসারকে মায়াময় বলে থাকে এরূপ খ্যাতিমান মায়াবাদীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড প্রতিবাদ ছুঁড়ে দেন। তাঁর এই প্রতিক্রিয়ায় মায়াবাদীদের অন্তর্গত রূপপ্রকৃতিও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মায়াবাদীরা যাবতীয় সৃষ্টিকর্মকে সৃষ্টির চাতুরি বলে উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কাব্যের মায়াবাদ কবিতার বলেন–

“হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।

..   ..

মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ববসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।”(৩৭)

রবীন্দ্রনাথ এ কথার প্রতিবাদস্বরূপ খেলা’ কবিতায় বলেন,

“হোক খেলা এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।”(৩৮)

রবীন্দ্রনাথের এসব ভাবনার মূলে ভারতের ঔপনিষদিক সংস্কৃতির স্রোতধারা ক্রিয়াশীল রয়েছে। বরং তা রবীন্দ্রচিন্তার অধিকতর পরিশ্রুত অভিব্যক্তিতে ভাস্বর। উপনিষদের দ্বৈত ভাবমণ্ডিত ভাবানুভাব কাব্যিক ব্যঞ্জনার সাথে রবীন্দ্র রচনায়

প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বিশ্বস্রষ্টা নিজেই সংসারের উপর দ্বৈত ভাব আরোপ করে আত্মপ্রকাশ ফুটিয়ে তোলেন। পৃথিবীর ফল-ফুল, গন্ধ-গীত, রূপ-সৌন্দর্য তথা সবরকম দৃশ্যচিত্রে ঈশ্বর নিজেই নিজের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এবং এর মধ্য দিয়েই সৃষ্টিলীলার উদ্দেশ্য প্রাণনা সম্পন্ন হয়–

> "যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
> আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ।
> দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
> নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।"(৩৯)

তাবৎ বিশ্ব পৃথিবীর সবরকম অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই উপনিষদ রচিত। দ্বৈত অদ্বৈতবাদের কোনো বিভাজন-বৈষম্য কখনো তা ভারাক্রান্ত করতে পারে নি। উপনিষদের এই বাণীভাবনা রবীন্দ্রনাথকে জন্মের পর পরই গভীর ভাবে পেয়ে বসে। "দ্বৈতবাদ- অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি আমার মধ্যে আমার অন্তদেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে।"(৪০) সংসারের বিচিত্র সৃষ্টিলীলার মধ্যে স্রষ্টার প্রতীক-প্রতিভাস লক্ষণীয়। এই সৃষ্টি রাজ্যের বহুবিচিত্র রূপ প্রকৃতিই স্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলে উপনিষদ ইঙ্গিত প্রদান করে। ফলে এই স্রষ্টা-সম্ভূত সৃষ্টির সেবা করাই পরম ধর্ম বলে উপনিষদে বলা হয়। সুতরাং সৃষ্টি-সংসার কখনো মায়া বা অহেতুক বলে গণ্য হতে পারে না। বরং তা স্রষ্টারই অনিবার্য অবস্থিতি হিসেবে অভিষিক্ত হতে পারে। " উপনিষদের মূল ভাবধারা দ্বৈতভার মণ্ডিত বহুরূপে প্রকাশ বিশ্বকে স্বপ্ন বা মায়া বা ছায়া বলে প্রত্যাখ্যান করে নি; বরং তাকে বিশ্বসত্তার প্রকাশ বলেই গ্রহণ করেছে। তাই বিশ্বকে সেখানে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। . . . এই চিন্তাটি রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই তিনি মায়াবাদের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।"(৪১) রবীন্দ্রনাথ বরাবরই সংসারপ্রীতিতে উপনিষদের এই প্রেক্ষণবিন্দু থেকে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকেও তাঁর অনুরূপ মনন মনস্বিতার পরিচয় আবিস্কার করা সম্ভব। ফলে ভারতেরই ঔপনিষদিক সৃষ্টি সংস্কৃতি গভীরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

রাজা ও রানী (১৬৬৯) নাটকের যাবতীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূলে রাজা বিক্রমদেবের অস্বাভাবিক মোহমত্ত, কর্তব্যবিমুখ প্রেম ক্রিয়াশীল রয়েছে– রানী সুমিত্রার প্রতি রাজার এই বেসামাল আসক্তি তাকে সবকিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে। রানী শত-সহস্রবার বুঝিয়ে শুনিয়েও রাজাকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। বিক্রমদেবের এই মোহ-নিমজ্জন প্রেমের ফলেই রাজ্য জুড়ে অমানিশার ঘোর অরাজকতা নেমে এসেছে। রানীর কুটুম্ব সকল রাজ্যকে খণ্ড খণ্ড দখল করে নিয়েছে। এ অবস্থায় রানী প্রজাসাধারণের প্রতি দায়িত্ব-বশত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এবং এর একটা বিহিত প্রতিকারের চেষ্টায় নিজেই সংগ্রামে লিপ্ত হন। ফলে রাজা বিক্রমদেবের সাথেই একটা প্রচণ্ড বিরুদ্ধ ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে। এবং শেষপর্যন্ত রানীর মৃত্যু ও রাজার চৈতন্যলাভের মাধ্যমে নাটকীয় পরিণতি নির্দেশ করা হয়। তবে সবমিলিয়ে সব নাটকীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজা বিক্রমদেবের অস্বাভাবিক প্রেমই সক্রিয় রয়েছে।

প্রেমকে সংসারের দায় দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার ফলে প্রেম ও প্রেমিক স্বাভাবিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এবং এক পর্যায়ে তা জড়ত্বের গ্লানিকর কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ে। প্রেম যেখানে মানুষের বহুবর্ণিল বিকাশ নয়– সেখানে তা মানব জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। দায়িত্ববিরহিত প্রেম প্রবণতা যন্ত্রণা ও একঘেয়ে অবস্থার আকর হয়ে দাঁড়ায়। মানবমানবীর যতসব আনাচার অনাসৃষ্টি এই বিকৃত প্রেমের ফলেই সংঘটিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কখনো এহেন প্রেমের বিকৃত বিলাসকে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর অজস্র সৃষ্টি সম্ভারের ভাঁজে ভাঁজে এ কথার সাক্ষ্যপ্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার মূলে ভারতীয় সংস্কৃতির সুগভীর অনুপ্রাণনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। বিশেষত, বেদান্তদর্শন থেকেই রবীন্দ্রনাথ এরূপ জীবনভাবনাকে আত্মস্থ করেছিলেন।

রাজা ও রানী নাটকে সুমিত্রার প্রেম সংসারের সুখ-দুঃখময় হাজারো দায়িত্বচক্রের মহিমময় বির্বতনে ধরা দিয়েছে। সবরকম মূল্যবোধ ও দায়বোধের নিরতনিষ্ঠ প্রয়াস প্রবৃত্তিতে উজ্জ্বল। এবং বৃহতের কল্যাণকামনায় সতত উন্মুখ। নারীহৃদয়ের শাশ্বত মাধুর্য মহিমা দ্বারা রানী সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। তাঁর যাবতীয় এবং যাবজ্জীবন বিসর্জন নিবেদন একটা সার্বজনীন কল্যাণ কামনার মূলে বারিধারা সিঞ্চন করেছে। একমুহূর্তের জন্যও তা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক আসক্তি দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে নি। কোনো অস্বাভাবিক কপট-চাতুরি বা প্রলোভনের মুখেও তা অবিচল রয়েছে। "রাজা ও রানীর সুমিত্রা অনেকটা সংসারের নারীর অংশ দিয়ে গড়া, শক্তিশালী দৃঢ় তরুর গায়ে লতার মতো আশ্রয়প্রত্যাশী। অন্ত

রের তেজ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও বাহিরে স্নিগ্ধ মাধুর্যমণ্ডিত নারীর হৃদয়গৌরবের অধিকারিনী স্নেহময় ভগিনী।”(৪২) সংসারধর্মে নিমগ্নচিত্ত নারীর এই সুষমা সৌন্দর্য এদেশের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার দ্বারা অনুমোদিত। ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শের আলোকে তা পর্যায়ক্রমে গড়ে ওঠে। সেখানে নারীর প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে সংসারকেই চিহ্নিত করা হয়। ভারতীয় হিন্দুসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সংসার সেবাই পরম সেবা এবং তা স্বামী সেবা। “কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসারকর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম : স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন– কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। . . . এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। . . . আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ। ।”(৪৩)

‘রাজা ও রানী’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভোগলোলুপ মোহময় প্রেমের অশুভ পরিণতি চিত্রিত করেন। এই দেহসর্বস্ব বিকৃত প্রেম প্রবৃত্তিতে জগতে অনেক অনর্থপাত- অনাচার সংঘটিত হয়েছে। এই অস্বাভাবিক প্রেমপ্রবাহ ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতিতেও জায়গা করে নেয়। উপনিষদ থেকেই এই ধারাবাহিক প্রেমপ্রকৃতি এদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে চিত্রিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ গভীর মনোযোগের সাথে এই প্রেমের ধারাপ্রকৃতিকে আত্মস্থ করেছিলেন। এবং স্বকীয় শিল্পভাবনার পরিশ্রুত সৃষ্টিলোকে তা ফুটিয়ে তোলেন। সেখানে তিনি প্রেমের সত্যস্বরূপ তুলে ধরতে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন।

“রবীন্দ্রনাথ ভোগকে ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধ এবং সংযত করিবার কথা বহুস্থানে বলিয়াছেন,.... যে প্রেম কামনার সুড়ঙ্গপথে চলে, ত্যাগ ও নিষ্ঠার রাজপথে বিচরণ করে না; সংসারের অশেষ প্রকার কর্তব্য নিয়ত ‘অয়মহংভো’ বলিয়া আহবান জানাইতেছে, যে প্রেম তাহা শুনিতে পথ না। সেই প্রেম শুভ, মঙ্গলদায়ক নহে, অশান্তি ও অতৃপ্তি তাহার একমাত্র পরিণাম, ইহা ভারতীয় সাধনায় নিমগ্নচিত্ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা।”(৪৪)

প্রেম বরাবরই মুক্ত ও অবাধ স্বাধীনতার মাধ্যমে সমুন্নত হওয়ার সুযোগ পায়। সবরকম সামাজিক সম্পর্ক সমবায়ের মাধ্যমে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দান প্রতিদানের স্বাস্থ্যপ্রদ মেলবন্ধনের মাধ্যমে প্রেমের মহিমময় প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। ত্যাগের ক্রমাগত অহং অবস্থিতির বিলোপ সাধন করে প্রেমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়া সব প্রকারের বিরোধ বিপত্তি পেরিয়ে প্রেমের স্বর্ণময় ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে। উপনিষদের ঋষি কবিগণ এই প্রেমেরই সাধনায় জীবনপন প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। কোনো খণ্ডিত প্রেমপ্রয়াসের গ্লানিকর অনুপ্রবেশ সেখানে অনুপস্থিত। পার্থিব জীবনের ত্যাগ ভোগ সুখ-দুঃখ বিরহ মিলন বিরোধ বৈপরীত্য ও সর্ববাদী সমন্বিত রূপের মধ্যেই ব্রহ্মের অবস্থান। নর নারীর প্রেমভাবনাও উপনিষদের কবিগণ এই সর্বময় রূপপ্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এরই আলোকে নরনারীর প্রেমপ্রতিষ্ঠা নির্ধারিত করে যান। রাজা ও রানী নাটকেও তাঁর এই প্রয়াস প্রবৃত্তির দিকনির্দেশনা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এখানে রাজা বিক্রমদেবের প্রেমপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র ভোগের অপরিমেয় মোহগ্রস্ততায় সমাচ্ছন্ন ছিল। কোনোপ্রকার বাস্তবতা বিরোধ বৈপরীত্য বা ত্যাগ স্বীকারে সে প্রস্তুত নয়। বিক্রমদেব কামনার সুড়ঙ্গপথে বিকৃত লীলাবিলাসে সারাক্ষণ মত্ত। যা কখনো রবীন্দ্রমানস বা ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়– আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখিনে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে। নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না– প্রেমের সূর্য একবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।”(৪৫)

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে রমণীহৃদয়ের প্রেমকে একটা সর্বানুগ-সার্বজনীন রূপের আধারে বর্ণনা করা হয়েছে। যা সর্বময় মুক্তির আলোকিত পথে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। পার্থিব জীবনের সর্বময় পরিস্থিতিকে স্বীকার করে এই প্রেমই শেষপর্যন্ত ব্রহ্মপ্রেমে রূপলাভ করেছে। যা উপনিষদের সমাজ-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বারবার উল্লেখ করা হয়। সেখানে নারীহৃদয়ের গুহায়িত প্রেমপ্রবৃত্তিকে উন্মুক্ত-উদার জীবনবাস্তবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী প্রেমভাবনার উদাত্ত প্রকাশে বলেন, “হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে... হে রুদ্র, হে ভয়ানক– তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ, রুদ্র যত্তে

দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও- তেন মাং পাহি নিত্যম- তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মধ্যে বাঁচাও।"[৪৬] উপনিষদের প্রতি নিমগ্নচিত্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এসব বাণী গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। নারীহৃদয়ের এই সকরুণ প্রেম আর্তি যেন আমরা অনেকটাই সুমিত্রা চরিত্রে আবিষ্কার করতে পারি। রানীর প্রেমও একটা স্বার্থ-সংকীর্ণ-গুহায়িত অবস্থার বিকৃতি থেকে মুক্তির জন্য নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিল। ফলে সুমিত্রা চরিত্রের স্বরূপ-প্রকৃতি রচনায় এদেশের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিই গভীরভাবে অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে। তাছাড়া সুমিত্রা চরিত্রের কিছু উপস্থাপনা উচ্চারণের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির পৌরাণিক প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়,

"সুমিত্রা। দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে।
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ। মা গো, সে দিনের কথা
দেখ মনে করে। জননী, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে। রমণীর
ভালোবাসা ছিন্নশতদলসম দিতে
পদতলে।"[৪৭]

খণ্ডিত প্রেমের বিপন্ন বিলাসিতার মধ্যে মানবচরিত্রের বিকৃতি-বিলাস উৎকট রূপ ধারণ করে। দায়িত্ব ও কর্তব্যরহিত বলে তা বিপদজনকও বটে। এ অবস্থায় ভোগের অতলস্পর্শ ক্লান্তিতে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাজের পক্ষে যা অকল্যাণ ও দুর্ভর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ যদি আবার কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির বেলায় ঘটে- তাহলেতো সমূহ ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সামাজিক কায়া-কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিপন্নতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। 'রাজা ও রানী' নাটকের রাজা বিক্রমদেব চরিত্রে আমরা অনুরূপ অবস্থারই প্রতিফলন লক্ষ করে থাকি। সংসারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও তিক্তমধুর প্রবাহের বাঁকে বাঁকে নরনারীর প্রেম মুখরিত হয়ে ওঠে। মোহান্ধ বিক্রমদেব একথা বেমালুম ভুলে বসে আছে। ভোগসর্বস্ব জীবনই তার কাছে সত্য- আর বাকি সবকিছুই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। এর ফলেই রাজ্য জুড়ে অনাচার-অনাসৃষ্টি দানা বেঁধে ওঠে। প্রজাসাধারণের মধ্যে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, দীনতা তথা সর্বময় অরাজক অবস্থার মধ্যে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সেখানে সাম্রাজ্যবাদী পেশিশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। সবলের অত্যাচারে দুর্বলের আর্তচিৎকার রাজ্যের আকাশ-বাতাস ভারি করে তোলে। কিন্তু রাজা বরাবরই তথৈবচ। রানী সুমিত্রার আসঙ্গ লিপ্সায় দিনরাত মশগুল হয়ে রয়েছে। সব দায়দায়িত্বও 'জীর্ণ রাজকর্মে চূর্ণ হয়ে যায়' অলস চিন্তায়। নৈতিক ব্রতের মহান দায়দায়িত্ব সব রানীর চরণধূলিতে মাথা কুটে কুটে মরে। সংসারের জমি থেকে উন্মূলিত এই উৎকট প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক- সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়, তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই- কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।"[৪৮] রবীন্দ্রবর্ণিত এই বক্তব্যের সাথে রাজা বিক্রমদেবের প্রেমপ্রকৃতি বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। যা রানী সুমিত্রা দেবী কখনো গ্রহণ করতে পারে নি। রাজার এই অশুভ মোহের বিকৃত রতিবিলাসকে বিভিন্ন উপায়ে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। রাজাকে মহান কর্তব্যকর্ম ও ঔচিত্যবোধের ললিত বাণী শুনিয়েও কোনো কাজ হয় নি।

"সুমিত্রা। ... ছি ছি মহারাজ
একি ভালোবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী-আমি শুধু অনুগত ছায়া

তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে।"[৪৯]

এ অবস্থায় নিরুপায় রানী নিজেই কতর্ব্যকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রজাকুলের হাহাকারে পুরুষের ছদ্মবেশে নিজেই এর একটা প্রতিকারের জন্য বেরিয়ে যান। এবং সবরকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও নির্মম বাস্তবতার মধ্যেও নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হন নি। অবশেষে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে স্বকীয় আদর্শের প্রদীপ্ত জয়পতাকা সমুন্নত রাখতে সক্ষম হন। রানী সুমিত্রা ঔচিত্যবোধের সামঞ্জস্য রক্ষায় নিজের সবটুকু অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েই বাঙালি নারীর চিরন্তন বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। রানীর চিরন্তন এই আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে চিরায়ত বাঙালি নারী সমাজের সমুজ্জ্বল সংস্কৃতি অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। রানী সুমিত্রা মূলত ঐতিহ্যিক বাঙালি সমাজের কল্যাণী নারীপ্রেমের বেদিমূলেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। "এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযতভাবে নির্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক শ্রী আছে– সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জ্বলে উঠে হয়তো কর্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে। সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে।শ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়– এইরূপে সে– প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে।"[৫০] 'রাজা ও রানী' নাটকে রানী সুমিত্রা দেবীর প্রেমের মধ্যে এই কল্যাণীরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সুমিত্রার এই সর্বজনপূজ্য প্রেমের কাছেই বিক্রমদেবের মোহমগ্ন প্রেমের সমর্পিত সমাপ্তি নির্দেশ করেছেন। এবং এই ভাবতাত্ত্বিক মতাদর্শের আলোকেই 'রাজা ও রানী' নাটকের পরিণতি নির্দেশ করা হয়–

"বিক্রমদেব। দেবী। যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের।
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে।"[৫১]

'বিসর্জন' (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় একটি নাটক। বিষয়-প্রকরণ ও চরিত্রসৃষ্টির এমন সুষম সমন্বয় পুরো রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ। 'বিসর্জন' নাটকে বিষয় বাস্তবতার সাথে চরিত্র সৃষ্টির প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাত গড়ে তোলা হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে চিরায়ত মানবপ্রবৃত্তিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে প্রতিমা পূজার জন্য পশুবলি, রাজা-রানী সংঘাত, পিতা রঘুপতি ও পুত্র জয়সিংহের মধ্যে অবিশ্বাস-সন্দেহ, প্রেমময়ী অপর্ণার উষ্ণ আবির্ভাব, পরিণামে জয়সিংহের আত্মবিসর্জন ইত্যাদির মাধ্যমে চিরায়ত মানবতার প্রেমপ্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। মূলত প্রতিমাপূজাকে কেন্দ্র করে নির্মম প্রথানুগত্য ও মনুষ্যত্ববোধের মধ্যে একটা ট্র্যাজিক আবেদনের সম্মোহ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিমাপূজা হিন্দু সমাজের একটি ঐতিহ্যিক ধর্মীয় সংস্কৃতি। যুগ যুগ ধরে প্রতিমাপূজক হিন্দু সম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় এই সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করে আসছে। রবীন্দ্রনাথ এরই আলোকে 'বিসর্জন' নাটকের অবয়ব-উপাদান গড়ে তুলেছেন। এবং শেষপর্যন্ত তিনি এই অন্ধ অযৌক্তিক ও অমানবিক প্রথাকে অসারত্ব প্রমাণের মাধ্যমে নাটকের পরিণাম নির্দেশ করেন। "বিসর্জন আমাদের ধর্মের একটা অর্থবিহীন নিষ্ঠুর সংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।"[৫২]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই প্রাচীনতম কাল থেকেই সাকার বা বস্তুপূজার প্রচলন লক্ষ করা যায়। সনাতন হিন্দুধর্মে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান পদার্থের মধ্যে দেবত্ব আরোপের একটা প্রবণতা গড়ে ওঠে। আদিম মানুষ যেখানে অসহায় এবং যার মাধ্যমে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পায়– সেখানেই একটা অলৌকিক শক্তি কল্পনা করে থাকে। সেই অস্তিত্ব অংশের কাছেই আত্মসমর্পণের মাধ্যমে একটা দৈবশক্তি কল্পনা করে নিয়েছে। এবং এভাবেই একটা দেব-অংশ বা দেবতা ক্রমান্বয়ে পূজিত হয়। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অজ্ঞতা-কুসংস্কার, দুর্বলতা-দীনতা এসব অন্ধ সংস্কারকে যুগ যুগ ধরে জিইয়ে রেখেছে। শত-সহস্র সংস্কারের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ মানবসমাজ প্রবল-প্রতাপ দর্শনেই দেবকল্পনায় নিজেদের সমর্পণ করত। এমনকি বস্তু পদার্থের মধ্যেও অনন্ত-অসীম দেবশক্তির কল্পনায়, দ্বিধাবোধ করত না। এবং এই বস্তুপূজার মাধ্যমে একটা অনন্তশক্তির সাক্ষাৎলাভের ব্যাপারটি আকৃষ্ট করে তুলত। "কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে। ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে, যন্ত্র একটা উপলক্ষ মাত্র– যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে; কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা, যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী– তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।"[৫৩]

এই বস্তুপদার্থে দেবত্ব আরোপের পথ বেয়েই প্রতিমাপূজার একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে । বিশেষত, হিন্দুসমাজে এর একটা ঐতিহ্যিক ধর্মীয় সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো এই জড়-পদার্থ পূজাকে গ্রহণ করতে পারেন নি । তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের পথ বেয়ে রামমোহন রায়ের চিন্তাস্রোতের মাধ্যমে প্রাক-পৌরাণিক যুগকে ধারণ করেছেন । প্রাক-পৌরাণিক যুগের একেশ্বরবাদী চিন্তার সাথেই রবীন্দ্রনাথের মানসিক সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে । "তার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে একেশ্বরবাদী ভক্ত ছিলেন । অথচ পৌরাণিক হিন্দুধর্মে যে বিগ্রহপূজার রীতি আছে তাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি । এর জন্যেই রামমোহনের অনুসরণে তাঁর নিজস্ব ব্রাহ্মধর্ম পরিকল্পনা ।"[৫৪] অথচ এই ধর্মাদর্শের মূলে বিগ্রহপূজা বা অবতারবাদের কোনো অবস্থান নেই ।

উপনিষদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতেও বস্তু বা প্রতিমাপূজার কোনো প্রয়াস পরিদৃষ্ট নয় । উপনিষদপ্রিয় রবীন্দ্রনাথও কখনো তা মেনে নিতে পারেন নি । বরং ব্রহ্মলাভ বা মানুষের আধ্যাত্ম সমুন্নতির পক্ষে তা অন্তরায় বলে মনে করেছেন । রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার মূলে সগৌরব ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণমূল-প্রবাহ গভীরভাবে কার্যকর রয়েছে । বিশেষত, প্রাচীন ভারতের তপোবনভিত্তিক আদর্শ সংস্কৃতিই তাঁকে অধিক পরিমাণে প্রভাবিত করে তোলে । "চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল– অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ– যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, এমন যে নিত্য পরমব্রহ্ম, তাঁহাকে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে থাকিয়া লাভ করিতে পারি কিনা? তপোবনে অরণ্যচ্ছায়াতলে সেদিন তাহার এক সুগম্ভীর উত্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল– বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি ।"[৫৫] এর মাধ্যমে পরমপুরুষকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে অনুভব দ্বারা লাভ করার ইঙ্গিত প্রদান করা হয় । বাইরের বিভেদ-বৈষম্য-বিকৃত-খণ্ডিত পরিবেশে কখনো তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয় । বরং সেখানে মূর্ত রূপরীতির মধ্যে মানুষের অনৈক্য-অহংবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে । ফলে সেখানে একটা স্ববিরোধী চেতনা দানা বেঁধে ওঠতে বাধ্য । এবং এতে করেই মানুষ বিকৃত-ভ্রষ্ট পথে কূপমণ্ডুকতার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়ায় । ফলে চিরায়ত মানবপ্রবৃত্তির দেবকল্পনা একটা প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "... সাকার মূর্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য; কারণ স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ– তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে, সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন এবং সেইজন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত শিবং শান্তি মত্যন্তমেতি, অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তি লাভ হয়– অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে, তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী ।"[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মভাবনায় বরাবরই একটা অধ্যাত্ম-আকুতি অনুভব করেছেন । অনন্ত অসীম নিসর্গ প্রকৃতির সাথে আত্মার মিলনসাধন এর অন্যতম দিক । আত্মার সাথে অনন্ত জগৎ ও অনন্ত ব্রহ্মের মেলবন্ধন সাধনায় মানবজীবন পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারে । তাতে সাকাররূপের খণ্ডিত ভাবভাবনায় মানুষ ব্রহ্মোর কাছ থেকে দূরে সরে যায় । এবং তা একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনাও বটে । "উপনিষদে আছে যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং– এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে । অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোনোপ্রকার হস্তপদ বিশিষ্ট মূর্তি দ্বারা কল্পনা করিতে পারি ।"[৫৭] রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার সাথে ভারতীয় প্রাচীন ঋষি কবিদের একাত্মতা-অনুভব গভীরভাবে লক্ষণীয় । তাঁরা অনির্দেশ্য-অনির্বচনীয় কল্পনায় পরমপুরুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন । সেখানে সাকার মূর্তির ভেদ কল্পনায় একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর তৈরি করা হয় মাত্র । এ অবস্থায় ব্রহ্মকে আরো দুষ্প্রাপ্য করে তোলা হয় । উপনিষদ ব্রহ্মসাধনায় কোনো প্রকার সীমায়তি আরোপ করে নি । সেখানে জগতের প্রতিটি স্থানেই ব্রহ্মের মহিমময় অবস্থান কল্পনা করা হয়েছে । তাঁরা ওঁ শব্দ দ্বারা বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম দ্বারা আচ্ছন্ন বলে নির্দেশ করেছেন । উপনিষদের এই নিঃসীম ব্রহ্মভাবনাকেই হিন্দু সমাজ খণ্ডবিখণ্ড করে তোলে । শ্রেণিবৈষম্যের আত্মবিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে জাতিগত বিভেদ সংস্কৃতি চালু করা হয় । ফলে এক প্রকার আত্মসুখপরায়ণ অহং-অন্বেষা তাদের পেয়ে বসে । "মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে– যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না ।"[৫৮]

কিন্তু উপনিষদে ব্রহ্মকে জীবনের সর্বত্র কল্পনা করে মানুষের সাথে তাঁর একটা একাত্ম-অন্বয় প্রতিষ্ঠা করে যান । এতে প্রতিমা বা বিগ্রহপূজার কোনো অবকাশ নেই । রবীন্দ্রনাথ এই ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ সংস্কৃতিকেই 'বিসর্জন' নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

'বিসর্জন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের সুমহান সংস্কৃতির ধারকরূপে আবির্ভূত হন। যা উপনিষদ থেকে শুরু করে সুফী, লালন, কবীর, নানক, দাদু, তুলসীদাস, সুরদাস, চৈতন্যদেব প্রমুখ সাধকের মাধ্যমে তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছে। এ অর্থে তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মের হুবহু অনুসারী হতে পারেন নি। নির্দিষ্ট কোনো দেবতামন্দিরে পূজা নিবেদিত হয় নি। মন, মনন ও মনুষ্যত্ববোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোনো ধর্মাদর্শই গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। মূলত সারাজীবনই তিনি অন্তরের অখণ্ড ভাবনার আলোকে মহামানবের মিলনক্ষেত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দেবতার অধিষ্ঠান মানুষেরই অন্তরাত্মায় মন্দির-মসজিদে নয়। আত্মিক সাধনার মধ্য দিয়েই সেই দেবতাকে আপন করে পাওয়া যায়।"[৫৯] ফলে তিনি উপাস্য দেবতাকে কখনো কোনো সংকীর্ণ-সীমানায় আবদ্ধ করেন নি। কারণ, ব্রহ্ম অন্তরের অখণ্ড-অদ্বয় আসনে বিরাজ করে থাকেন। তাঁকে চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি মূর্তিরূপে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। "যিনি চক্ষুষশ্চক্ষুঃ, চক্ষুর চক্ষু, তাঁহাকে কি চক্ষুর বাহিরে দেখিব? যিনি শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, কর্ণের কর্ণ, তাঁহাকে কি কর্ণের বাহির শুনিব? যাঁহার সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন–

> ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
> ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।
> হৃদা মনীষা মনসাভিকপ্তো।
> য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

ইহার স্বরূপ চক্ষুর সম্মুখে স্থিত নহে, ইহাকে কেহ চক্ষুতে দেখে না– হৃদিস্থিত বুদ্ধি দ্বারা ইনি কেবল হৃদয়েই প্রকাশিত, ইঁহাকে যাঁহারা এইরূপেই জানেন তাঁহারা অমর হন– এমন যে আত্মার অন্তরাত্মা তাঁহাকে বহির্বস্তুর মতো বাহিরে পাইতে গেলেই তাঁহাকে পাওয়া যায় না এ কথা আমরা কেন না স্মরণ করি?"[৬০]

রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাটকের পরিণতিতে প্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সাকার মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণত্বকে তীব্রভাবে আঘাত করেছেন। তাঁর এই মনোভাব অবশ্যই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাণমূল থেকে উৎসারিত।

'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) নাটকের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠ সংস্কৃতির গভীর প্রাণমূল-প্রণোদনা ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকটি মহাভারত অবলম্বনে রচিত। মহাভারতের আদিপর্বে পঞ্চাশাধিক দ্বি-শতমত অধ্যায়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাহিনী উল্লিখিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক রচনায় এখান থেকেই উপাদান অনুষঙ্গ সংগ্রহ করেছেন। তবে বরাবরের মতোই তিনি এ ক্ষেত্রেও স্বকীয় ভাবকল্পনার অভিব্যঞ্জনায় সৃজনকর্মটি সম্পন্ন করেন। মহাভারতের কাহিনীতে ঐতিহাসিক পরম্পরার সশঙ্ক বাঁধন ও নীতি-আদর্শ সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানে মানবিক সুষমাসম্পন্ন সাহিত্যবোধ গড়ে তোলেন। ফলে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের কাহিনী পৌরাণিক হয়েও একটা সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম। এতে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক অবয়ব-উপাদান নবতর অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠেছে। এবং যেখানে একটা স্থায়ী ভিত্তিবৈভব বাঙালি জাতিসত্তাকে প্রতিনিয়ত নির্মাণ করে চলে। আর এভাবেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক-প্রতিভূ ও রূপকাররূপে একটা স্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে সক্ষম হন। মহাভারতে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাহিনী সংক্ষেপে এরকম, অর্জুন মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। মণিপুর রাজার নিকট এই অভিলাষ যথাসময়ে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু রাজা একথায় সম্মতি প্রদান করেও বংশগত একটা শর্ত জুড়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করার পর অর্জুনকে মণিপুর রাজ্যেই বসবাস করতে হবে। এবং তাদের গর্ভজাত সন্তান মণিপুর রাজ্যেরই ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসেবে অভিষিক্ত হবেন। এসব শর্তাবলি মেনেই তাদের বিবাহপর্ব সম্পন্ন হয়ে যায়। এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাদের বভ্রুবাহন নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। পরবর্তীকালে কয়েক বৎসর পরে অর্জুন পত্নী ও পুত্রকে সেখানে রেখে চলে আসেন। মহাভারতের কাহিনী এ পর্যন্তই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে এই কাহিনীকেই নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে গড়ে তুলেছেন। অধিকতর নাটকীয় ও মানবিক বোধসম্পন্ন হওয়ায় তা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। যেমন, অর্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার প্রেম নিবেদন, প্রত্যাখ্যাতা চিত্রাঙ্গদার বর প্রার্থনা, মদন ও বসন্ত দেবতার সহায়তায় অর্জুনকে লাভ, নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-শ্রান্তি, সন্তানসম্ভবা চিত্রাঙ্গদার মধ্যে গার্হস্থ্য প্রেমের প্রকাশ– ইত্যাদির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবাহ পরম্পরার মধ্যেই নিজেকে সমর্পণ করেন। এছাড়া চরিত্রগুলোর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দূরস্থিত পৌরাণিক আবহে ধুলিমলিন প্রাত্যহিকতা আরোপ করা হয়। ফলে তিনি বাঙালির মৃতকল্প ইতিহাসে গর্বিত ঐতিহ্যধারার প্রাণবন্ত গতিবেগ দান করেন। এবং এভাবেই রবীন্দ্রসৃষ্টিতে বাঙালি সংস্কৃতির বহুবর্ণিল রূপপ্রকৃতিতে একটা স্থায়িত্ব-মহিমা সঞ্চারিত হয়েছে।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাস রচিত 'কুমারসম্ভব' নাটক দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উভয় সৃষ্টির মধ্যেই বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক প্রবাহ-পারম্পর্য একটা সুগভীর অনুপ্রাণনা দান করেছে। কালিদাস সৃষ্ট 'উমা' ও রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্র মূলত একই উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় থেকে উৎসারিত। স্থান-কাল-পাত্রের ভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা অন্তর্গত সাজুয্য-সহযোগ বিদ্যমান। কুমারসম্ভবে উমার তপস্যাই চিত্রাঙ্গদার মদন ও বসন্তের বরলাভের মাধ্যমে একটা রূপান্তরিত গতি প্রকৃতি খুঁজে পায়। তাছাড়া পার্বতী ও চিত্রাঙ্গদার প্রণয়নিবেদন ও মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নানামাত্রিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এতে কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ সংস্কৃতি-সংহতি আবিষ্কার করা সম্ভব। "পার্বতী যেমন শিব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। ... কালিদাসের পার্বতী ধিক্কার দিয়াছিলেন তাঁহার মেয়েলি রূপকে, কেননা 'প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা' রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা ধিক্কার দিল নিজের পুরুষালি বিদ্যাকে, চিত্রাঙ্গদার রূপ নাই। এবং তিলে তিলে অর্জুনের হৃদয় জয় করিবার অবকাশ ও ধৈর্যও নাই। তাহার চরিত্রে বেশ একটু পুরুষাংশ ছিল অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারিতা। পার্বতী আশ্রয় করিয়াছিলেন তপস্যা, চিত্রাঙ্গদা সাধনা করিল রূপের।"[৬১]

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই বিভিন্নভাবে মহাকবি কালিদাস দ্বারা আলোড়িত হন। তাঁর অজস্র রচনা সৃষ্টির মাধ্যমে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব। চিত্রাঙ্গদা নাটকেও এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জায়া জননীবাদ দ্বারা নিবিড়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কালিদাস তাঁর সৃজনকর্মে নরনারীর আকস্মিক মোহমত্ততাকে বরাবরই প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যেই জীবনের চূড়ান্ত কল্যাণ-পরিণতি নির্দেশ করতে পারেন নি। তাঁর মতে, এর ফলে সংযমের সৌষম্যবোধ বিঘ্নিত হয়ে প্রেম বিপন্নতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। যা সংসারের পক্ষে দুর্ভর ও বিকার বন্ধ্যাত্বদশার আকর হয়ে পড়ে। এ প্রেম সংসারের আর সবকিছু বিস্মৃত হয়ে অতলস্পর্শ অমানিশার গহ্বরে ঘুরপাক খায়। পার্থিব জীবনের যাবতীয় সংস্পর্শ-রহিত এই প্রেম কিছুদিনের মধ্যেই প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের জন্য কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অনুরূপ ভাবপ্রবণ আদর্শ সংস্কৃতির সাক্ষাৎ মেলে। প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে তিনি বলেন, "যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম দুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে। কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।"[৬২] কালিদাস 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব' নাটকে গার্হস্থ্য ধর্মের কল্যাণময় আদর্শ প্রকৃতিকে মহিমময় রূপে ফুটিয়ে তোলেন। নরনারীর মোহমত্ত ভোগস্পৃহাকে দাম্পত্যধর্মের সংযত-সম্বন্ধ দ্বারা পরিস্নাতরূপে উপস্থাপন করা হয়। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ অর্জুন চিত্রাঙ্গদার নিরাবলম্ব সমাজবিচ্ছিন্ন প্রণয় প্রমত্ততার মধ্যে জননীত্ব আরোপ করেন। সংসারের বাইরে উন্মুক্ত কুঞ্জ বিহারের লীলাবিলাস থেকে শেষপর্যন্ত গার্হস্থ্য ঘরকন্নায় পরিণতি দান করা হয়।

নিরতিশয় ভোগসর্বস্ব সর্ববিস্মৃত মোহান্ধ অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রেম একসময় ক্লান্তভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রশ্নবিদ্ধ জিজ্ঞাসায় কেবলই তা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। আত্মবিস্মৃত অর্জুন একসময় সমাজ সংসারের যথার্থ প্রতিভূরূপে নিজেকে আবিষ্কার করতে উন্মুখ–

"অর্জুন। সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব।"[৬৩]

সংসারের শত-সহস্র উৎসধারায় প্রেম তার আপন ঠিকানা খুঁজে পেতে উদগ্রীব। অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা ভোগসর্বস্ব ক্লান্তিকর জীবনে তাই হাহাকার করে ওঠে। এবং শেষপর্যন্ত চিত্রাঙ্গদা সংসারের যাবতীয় সুখ-দুঃখ– পরিবৃত প্রাত্যহিক বন্ধন-মুক্তির জীবনেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্জুনের জনবিচ্ছিন্ন সাধনব্রত জীবনে কর্মকোলাহলমুখর সংসারধর্মের সমন্বয় সাধনায় নাটকের পরিণতি দান করা হয়। উভয় চরিত্রের এই সুষম সার্থকতার পেছনে মূলত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণবান প্রবাহই নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। সংসারধর্ম ও আত্মিক সাধনায় সন্ন্যাসব্রত– উভয়ই ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যিক জীবনে সগৌরব মহিমা প্রদান করে আসছে। এবং দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনায় জীবনের রূপপ্রকৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এক দিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই। দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে।"[৬৪]

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকেও ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরূপ জীবনধারার পরিচয় মেলে। একদিকে সাধনভজনের কঠিন-কঠোর তপস্যা- অন্যদিকে প্রাত্যহিক সংসারধর্মের প্রতি নিরন্তর আকুতি-আর্তি ফুটে ওঠে। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার খণ্ডিত রূপতৃষ্ণা, নিষ্প্রাণ মোহমত্ততা, নিরাবলম্ব সন্ন্যাসব্রত শেষ পর্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্মের সবকিছুই বরণ করে নিয়েছে। এবং এতে করেই এই নাটকের কাহিনী, চরিত্র, দর্শনবোধ ও সামগ্রিক অর্থে আপন সার্থকতা খুঁজে পায়। যা অবশ্যই ভারতীয় সংস্কৃতি-জীবনের যথার্থ প্রতিভূরূপে চিত্রিত হয়েছে।

'মালিনী' নাটকে সচেতন নাট্য সৃষ্টির কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটা তত্ত্বাদর্শের দায়বোধ থেকেই এটি রচনা করেছেন বলে মনে হয়। কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির বাঁকে বাঁকে প্রচুর নাট্যসৃষ্টি সম্ভাবনা থাকলেও শেষপর্যন্ত তা রক্ষিত হয় নি। এর চেয়ে বরং নাট্যকার প্রচারলগ্ন উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের দিকে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। এর ফলেই 'মালিনী' নাটকের শৈল্পিক রসস্ফূর্ততা পদে পদে বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তত্ত্বকথার গাম্ভীর্য গরিমায় কাহিনী ও চরিত্র স্বধর্ম রক্ষা করতে পারে নি। ফলে প্রচলিত নাট্যকথায় রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী'-কে সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়।

'মালিনী' নাটকের প্রধান চরিত্র মালিনী- একটা সবিশেষ তত্ত্বকথার প্রচারক-প্রতিভূরূপে আবির্ভূত। প্রায় পুরো নাটক জুড়েই 'মালিনী' চরিত্রের এই তত্ত্ববাহী বিচরণ-বিস্তার অব্যাহত থাকে। সে নবধর্মে উদ্বুদ্ধ। তাঁর এই ধর্মপ্রবণতা অন্তরের চেতনাবোধ দ্বারা তাড়িত নয়। গুরু কাশ্যপের সান্নিধ্যে একটা বিশেষ প্রভাবিত-আরোপিত মতাদর্শই 'মালিনী'কে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এবং এই ধর্মের প্রচারকরূপে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। একমাত্র বিরুদ্ধ-বিন্দুর প্রতাপশালী 'ক্ষেমঙ্কর' চরিত্রও এই ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। এই নবধর্মের স্বরূপ-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলি মূল বৌদ্ধধর্মের ছায়া অবলম্বনে পরিকল্পিত। এই ধর্মের মৈত্রী, করুণা, অহিংসা ও সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী মানবধর্মের উপরই 'মালিনী' প্রচারিত নবধর্মের ভিত্তি রচিত। বৌদ্ধধর্মের একটা সর্বপ্লাবী আদর্শ-অন্বেষা 'মালিনী' নাটকের কাহিনী চরিত্র গড়ে তোলে। এই ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ, পরিণতি ও আদর্শবোধ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন আলোড়িত হয়েছেন। তাঁর বিপুল-সংখ্যক সাহিত্যসৃষ্টির অনুষঙ্গ উপাদানরূপে বৌদ্ধধর্মের বহুমাত্রিক রূপপ্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত, এই ধর্মের ঐতিহ্য সংস্কৃতির প্রতি তিনি চিরদিনই গভীর সম্মোহ প্রকাশ করেন। 'মালিনী' নাটকের মাধ্যমেও তাঁর এই বৌদ্ধ ধর্ম তথা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় চালচিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই নাটকের উৎস-আখ্যান পরিকল্পনায়ও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সাহিত্যের সমূল সংস্কৃতির দ্বারস্থ হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধসাহিত্যের 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থের 'মালিন্যবস্তু' থেকে 'মালিনী' নাটকের কাহিনী সংগ্রহ করেন।

বৌদ্ধযুগের উদ্ভব-বিকাশ ভারতীয় ঐতিহ্যের আদি-অনাদিকালের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এই ধর্মের একটা সমৃদ্ধি-সংস্কৃতি আবহমান কাল থেকেই বাঙালিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। বৌদ্ধধর্মের সঠিক উৎপত্তিকাল নিয়ে প্রচুর মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। তবে সুদীর্ঘ বিবর্তন বিস্তারের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের আমলেই এই ধর্মের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপপ্রকৃতি গড়ে ওঠে। যা ভারতীয় জীবনে সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটা স্থায়ী আসন তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব- শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।"[৬৫] এই ঐতিহ্যিক ধর্মপ্রবণ জীবন সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মুগ্ধচিত্তে উপলব্ধি করেছেন। তবে বরাবরের মতোই এ ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয় অন্বয় অন্বেষার প্রয়োগ ঘটান। বৌদ্ধধর্মের সবটুকুই তিনি গ্রহণ করার পক্ষপাতী নন। রবীন্দ্রনাথ মন-মনন ও মনুষ্যত্ববোধের উপযোগী উপাদানটুকু সাগ্রহ চিত্তে বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসব্রতকে তিনি কখনো গ্রহণ করতে পারেন নি। এবং নির্বাণলাভের অলৌকিক শূন্যগর্ভ সাধনাকেও প্রশ্রয় দিতে নারাজ। শুধুমাত্র এই ধর্মের সাম্য-মৈত্রী-করুণা-প্রেম তথা মানবিক-নান্দনিক চেতনাবোধই তিনি বিনম্রচিত্তে লালন করেছেন। এবং বহুবর্ণিল শিল্পসংহত ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে তিনি তা ফুটিয়ে তোলেন। 'মালিনী' নাটকেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রয়াস-প্রতীতি লক্ষণীয়। এখানেও তিনি বৌদ্ধধর্মের মানবিকতাবোধকে মুখ্য উদ্দেশ্য উদ্দীপকরূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

বৌদ্ধধর্ম পার্থিব জীবনযাত্রায় প্রেমকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। নিঃশর্ত-নির্বাধ-নির্মোহ প্রেমের মিলনমোহনায় মানুষের সমূহ-শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়। ভেদবুদ্ধির শ্রেণিবৈষম্য দ্বারা ভারাক্রান্ত পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্মই সকল প্রাণির প্রতি বাধাশূন্য প্রেমের আহ্বান জানিয়েছে।

"বুদ্ধদেব বলিয়াছেন–

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসমআধিং অবেরমসপত্তং
তিটঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধে।
এতং সতিং অধিটঠেযং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধসাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে– ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।"[৬৬] রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের এই মৈত্রী-মানবতার প্রতি বরাবরই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি মাত্র ২১ বছর বয়সেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেন। এবং বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিক্ষাপদ্ধতি আত্মস্থ করার সুযোগ পান। এরই আলোকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে প্রয়াসী হন। "বুদ্ধদেবের বাণী, তাঁহার 'অমেয় প্রেমের মন্ত্র' ও একইভাবে তাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তরে জীবনকে জ্ঞানে, কর্মে ও ভাবে বিচিত্র প্রেরণায় উদবোধিত করিয়াছিল। বুদ্ধবাণীকে শুধুই তিনি বুদ্ধির কোঠায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন নাই– তাহাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক নীতিবোধে, জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায়, বিভিন্ন শিল্পের সাধনায়, বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি স্থাপনে, বিশ্বমানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের প্রয়াসে পরম-সহায়ক অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিবার জন্য এবং জনসমক্ষে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সেই জীবন্ত সর্বকালীন ও সর্বজনীন প্রাণীন আদর্শটিকে প্রচার করিবার জন্য তরুণ বয়স হইতে জীবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বহুধাবিসর্পিত উদ্যোগ-আয়োজনে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখিয়াছেন।"[৬৭] রবীন্দ্রনাথের এই সম্মোহ-সংরাগের প্রতিচ্ছবি তাঁর বহুবিস্তৃত সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে আবিষ্কার করা সম্ভব। তিনি বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক চিন্তাচেতনার মধ্যেও বিশেষত মহাযান সম্প্রদায়ের আগম, সাহিত্য ও দার্শনিক নিবন্ধাবলির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। এর মাধ্যমেই শুধু ভারতবর্ষ নয়– সারা পৃথিবীতেই একটা মানবমৈত্রীর অভাবনীয় আলোড়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ বহু দেশ বহু তীর্থ ভ্রমণ করতে গিয়েও যা উপলব্ধি করার সুযোগ পান। যেমন তিনি শ্যামদেশ ও যবদ্বীপে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্ময়কর স্থাপত্য দর্শনে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবং বুদ্ধদেবের আহ্বানে বৈশ্বিক জাগরণকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন,

"ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
  তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
  দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।"[৬৮]

বুদ্ধদেব-প্রবর্তিত সাধন-সংস্কৃতি ও এর আন্তর্জাতিকতা প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। দেশ-কাল-পাত্র গোত্রের সীমানা পেরিয়ে বুদ্ধ আদর্শ একটা সার্বজনীন আবেদনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্নাতীত প্রত্যয়ের সাথে উচ্চারণ করেন, "বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই।[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনেও নানাভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির আদর্শ-প্রকৃতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী' মূলত বুদ্ধদেবের শান্তি, মৈত্রী ও সর্বসংস্কারমুক্ত মানবিকতার প্রেরণায় গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তিনি

দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমাদের অন্তরে অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানাতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই।"[৭০] বিশ্বভারতীর শিক্ষাপদ্ধতি ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োগ প্রবর্তনায় অনুরূপ আদর্শ-অন্বেষা লক্ষণীয়। বিশেষত, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বৌদ্ধধর্মের সুগভীর প্রভাব-প্রতিপত্তি রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল। এছাড়া সেখানকার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ভিত্তিচিত্রণ, বাসস্থান– ইত্যাদি পরিকল্পনায় বৌদ্ধসংস্কৃতি একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মূলত বৌদ্ধধর্মের শান্ত-সংযত অহিংস প্রেমের বাণীর মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করাই ছিল মূল লক্ষ। মননশীল চেতনাবোধ ও শুদ্ধতম আত্মার বিকাশে ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে মানবিকতার উদ্বোধন ঘটাতে হবে। যা মানুষের কাঙ্ক্ষিত সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই এরকম একটা দর্শনদীপ্ত আদর্শবোধকে লালন করেছেন। এবং এর মাধ্যমেই মানুষ শাশ্বত প্রকৃতির সন্তানরূপে নিজেকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসংস্কৃতির মধ্যে এই অবিনাশী মানবাত্মার নন্দনশৈলী ও শিল্পকলার অস্তিত্ব খুঁজে পান। "বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনায় গুহাগহ্বরে চৈত্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপর্যাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্ম মানুষের অন্তরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে। যা তার স্বভাবকে পঙ্গু করেনি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টি মহিমায় সেসকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।"[৭১+]

যুগপরম্পরায় পৃথিবীতেঁ ধর্মের শাস্ত্র-পুরোহিত প্রবর্তক-পথিকৃৎ ও মহাপুরুষগণ শান্তির বিজয়বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের মূলীভূত ধর্মদর্শন মূলত মানবতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে অনুসৃত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্র-রচিত 'মালিনী' নাটকেও এই ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির জয়জয়কার ঘোষণার মাধ্যমে পরিণতি নির্দেশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই সুদীর্ঘ প্রবাহ পরম্পরায় অম্বিষ্ট মহাপুরুষদের সাথে মুগ্ধভাব-একাত্মতা প্রকাশ করেন। "পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খ্রীষ্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন। তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না।"[৭২] তাঁদের প্রেম ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এবং চিরন্তন মানবাত্মার অনিঃশেষ ভালোবাসায় উজ্জ্বল। তাঁরা তাবৎ বিশ্ব মানবতার মনন-মৈত্রী ভাবনাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন। মৈত্রী মন্ত্রের এই প্রবহমান সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবসমাজের যাবতীয় বিভেদ-বৈষম্য দূর করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মানুষের আত্মাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এক অখণ্ড আত্মার বন্ধনে সবার মিলনসাধনা কামনা করেছেন। যা বুদ্ধধর্মেরও অন্তর্নিহিত সত্য হিসেবে মানবসমাজকে অনুপ্রাণনা যুগিয়ে আসছে। "প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায়–

> ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
> গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়।"[৭৩] এ দেশের শাস্ত্রবিধ-সাধক মনীষীগণ আত্মিক সাধনায় ব্রহ্মভাবনার একটা অখণ্ড রূপ প্রত্যক্ষ করেন। কোনোরকম ভেদবুদ্ধি বা দৈশিক ভাবনায় তা কখনো বিভক্ত করা হয় নি। এবং এর মাধ্যমেই তাঁরা মানুষ ও মানুষের আত্মাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তোলেন। বুদ্ধ বলেছেন–

> "ন পরোপরং নিকুব্বেথ
> নাতিমঞ্ঞেথ কথচি ন কঞ্চি
> ব্যারোসনা পটিস সঞ্ঞা
> নঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খ মিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না– কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।"[৭৪] এর মাধ্যমে মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব-অধিকার নিশ্চিত করা হয়। অনাদি-অনন্ত যাত্রাপালায় মানুষ আত্মিক সাধনায় অক্ষয় গৌরবের অধিকারী হতে পারে। মানুষ স্বীয় আত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনায় অখণ্ড মর্যাদায় পরিস্নাত হওয়ার সুযোগ পায়। এবং এর ফলেই বিশ্বসংসারে সুষম-সৌন্দর্যবোধ মানবজীবনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করতে পারে। "আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে– পাপপরিশূন্য মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের

আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক থেকেই জগৎকে দেখব– নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই ভেদবুদ্ধি-বিরহিত মনন মুক্তির সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর নানামাত্রিক সৃজন স্বাক্ষরের কেন্দ্রভূমিতে মূলত এই আদর্শই ক্রিয়াশীল রয়েছে। ধর্মের নামে তথাকথিত আচারসর্বস্ব মূঢ়তা ও অনাচার অসত্যকে তিনি সারাজীবন ধিক্কার জানিয়েছেন। ভগবান-বিশ্ব, স্রষ্টা-সৃষ্টি, নিসর্গ-প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়-অতিন্দ্রীয়– তথা সবকিছুই রবীন্দ্রনাথ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন, "আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে– এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা– তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"[৭৬] রবীন্দ্রনাথের এই সর্বপ্রাণনিষ্ঠ মানবপ্রেমের মূলে বৌদ্ধধর্মেরই একটা ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি প্রাণ সঞ্চার করেছে। জীবনের নিরন্তর সাধনার বাঁকে বাঁকে সর্বমানবের মুক্তি কামনাই ছিল প্রধান ব্রত। কখনো কখনো তিনি যাবতীয় সৃষ্টিকর্মকে বুদ্ধদেবের অমেয়মন্ত্রের কাছে সমর্পণ করেন। এবং বুদ্ধের মহান ভাবনায় নিজেকে অন্বিত করে পরম শান্তি খুঁজে পান –

"কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়।
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে–
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।"[৭৭]

'মালিনী' নাটকের প্রধান চরিত্র 'মালিনী' সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবিকতার মহান মুক্তিমন্ত্রে সবাইকে আহ্বান জানান। কোনো অবস্থাতেই সেখানে জাতিগত ভেদবৈষম্য স্থান পায় নি। এমনকি চরম বিপন্ন মুহূর্তে শত্রুর প্রতিও মালিনী ক্ষমার স্নিগ্ধমধুর বাণী উচ্চারণ করেছে। এই চরিত্র তথা 'মালিনী' নাটকের অন্তর্গত ভাবদর্শনের মূলে অবশ্যই ঐতিহ্যিক বৌদ্ধসংস্কৃতি গভীরভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব একটা প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়ে ওঠে।

'শারদোৎসব' (১৯০৮) নাটকটি পরবর্তীতে নামান্তর সংস্করণে 'ঋণশোধ' (১৯২১) নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নামের মাধ্যমেই 'শারদোৎসব' নাটকের মর্মার্থ তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এর তত্ত্বগত ভাবদর্শন ও অন্তর্গত অন্বয়-অন্বেষায় 'ঋণশোধ' নামের মধ্যেই সার্থকতা নিহিত। নাটকীয় ঘটনায় দেখা যায়, প্রধান চরিত্র উপনন্দের গুরুর প্রতি ঋণশোধের ব্যাপারটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। শরৎকালের প্রসন্ন প্রভাবে ঠাকুরদা উপনন্দকে লক্ষ করে বলেন, "... ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে– এও কি চক্ষে দেখা যায়?"[৭৮] সন্ন্যাসী এর উত্তরে বললেন, "বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে।"[৭৯] এছাড়া নাটকে মহারাজ বিজয়াদিত্য সন্ন্যাসী সেজে প্রজাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে তিনি প্রেমের মধ্য দিয়ে রাজঋণ শোধ করে চলেছেন। নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রীও আপন আপন কর্তব্যকর্ম ও দানপ্রতিদানের মাধ্যমে ঋণশোধের পালায় অন্তর্ভুক্ত হন। এছাড়া জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেম-দুঃখ, আনন্দ-ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে একে অন্যের ঋণশোধ করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঋণশোধের এই সর্বময় বিস্তৃতির ভাবটি ভারতীয়

সংস্কৃতির অন্তর্গত দর্শনদীক্ষা থেকেই আহরণ করেছেন। এবং যা তিনি 'শারদোৎসব' নাটকে একটা রূপকাবহের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।

ভারতীয় শাস্ত্রসাহিত্যে ঋণশোধের ব্যাপারটি প্রাচীন ঋষি কবিগণ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেছেন। এর সাথে ধর্মীয় নৈতিকতা ও মজ্জাগত সংস্কার আদিমকাল থেকেই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। যা বাঙালি জীবনে অপরিহার্য সংস্কৃতিরূপে স্বীকৃতি পায়। "আমাদের শাস্ত্রে দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ শোধের উল্লেখ আছে।"[৮০] এছাড়া লোকায়ত জীবনেও এর একটা সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। অনেক সময় ভক্তের অকুণ্ঠ ভালোবাসার দান প্রতিদানে ঋণশোধের ব্যাপারটি শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফলে সেখানে অধ্যাত্ম আকুতি-অনুভব একটা ভিন্নতর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে। "কাঠুরিয়াগণ গাছ কাটিবার জন্য কুড়াল তুলিবার পূর্বে বৃক্ষটির উদ্দেশে তিনবার সেলাম করিয়া লয়। সেও ঐ ঋণশোধের অঙ্গ। তাহারা যেন বলিতে চায়– তোমার কাষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনধারণ অসম্ভব, কিন্তু আমি অকৃতজ্ঞ নহি, তুমি যে কাষ্ঠ দান করিতেছ, আমি তজ্জন্য তোমাকে অভিবাদন জানাইতেছি। কাজেই কি শাস্ত্র কি লোকব্যবহার সর্বত্র– ঋণশোধের ভাবটি পরিব্যপ্ত।"[৮১] ভারতীয় সংস্কৃতির এই মহিমান্বিত অধ্যায় অনুষঙ্গ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' নাটকের প্রাণপ্রতিমা নির্মাণ করেন।

ঋণশোধের সাথে বরাবরই বন্ধন-মুক্তি, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, প্রাপ্তি-প্রত্যাশা প্রভৃতি মানব জীবনের অনিবার্য প্রবৃত্তিগুলো জড়িয়ে রয়েছে। বন্ধন ও মুক্তি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির পরিপূরক। বরং প্রেমময় বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির গৌরব নিহিত। প্রেমের প্রাণপন নিবেদনের ফলেই মুক্তির সুষম-সুন্দর পথটি উন্মুক্ত হতে থাকে। ভারতীয় শাস্ত্রের নানামাত্রিক গূঢ়ার্থ কথায় অনুরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এবং এর সাথে তপস্যাতপ্ত যন্ত্রণা ও প্রেমময় মুক্তির প্রসঙ্গটি গভীরভাবে লুকিয়ে রয়েছে। যেমন, ঈশ্বর তপের দ্বারা তাপিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি প্রেমবন্ধনের মাধ্যমে সৃষ্টির পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে রয়েছেন। উপনিষদে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। "ঈশ্বর দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির আন্তরিক যোগ, প্রেমের যোগ। কাজেই জগতের সঙ্গে তিনি চিরকালের মতন বাঁধা হয়ে আছেন।"[৮২] এই স্রষ্টাই প্রতিনিয়ত তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে চলেছেন। এখানেও তিনি বন্ধন মুক্তির প্রেমময় আনন্দের অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। একটি শ্লোকে আছে, "স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা তস্য লোকাঃ সউ লোক এব। অর্থাৎ, তিনি বিশ্বকৃৎ, তিনি এই সবকিছুর স্রষ্টা, বিশ্ব তাঁরই এবং তিনিই বিশ্ব।"[৮৩] আরেকটি বচনে বলা হয়, "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। অর্থাৎ, এই মহাত্মা দেবতা বিশ্বকর্মা এবং সর্বদা বিভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।"[৮৪]

রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধন-মুক্তির তত্ত্ব-উপাত্ত উপনিষদের সুগভীর প্রাণমূল থেকে উৎসারিত হয়েছে। এই ভাবনাই তাঁর বিভিন্ন রচনায় সীমা-অসীম, জীবাত্মা-পরমাত্মা, রূপ-অরূপ, দ্বৈত-অদ্বৈত, জীবনদেবতা-মানসসুন্দরী ইত্যাদি রূপকাবহে পরিবেশিত হয়েছে। তাই সবকিছু নিয়েই রবীন্দ্রমানস এক অখণ্ড ঐক্যানুভূতিতে আপন সার্থকতা খুঁজে পায়। "এক দিকে বিচ্ছেদ আর এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে।"[৮৫] এই মিলনসাধনায় অধ্যাত্ম আকুতি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বাণীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং বহুধাবিস্তৃত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে খুঁজে ফেরেন। সংসারের যাবতীয় কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়েই স্রষ্টা তাঁর নিজস্ব অস্তিত্ব ছড়িয়ে দেন। এবং একটা প্রেমময় বন্ধনের মধ্য দিয়ে প্রভু জগতে বাঁধা পড়ে আছেন। মানবজীবনের মুক্তিতেও এই বন্ধন ভাবনা রবীন্দ্রমানসে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে–

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপন প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে।"[৮৬]

বিশ্বস্রষ্টার এই বন্ধন-মুক্তি মানুষের মধ্যেও অনুভূত হয়। বিশ্বপ্রাণের অখণ্ড অস্তিত্বরূপেই মানুষের মধ্যে তা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। মানুষ প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ইত্যাদির মাধ্যমে অনন্ত স্রষ্টা সৃষ্টির সাথে নিজেকে অন্বিষ্ট করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী' গীতিমাল্যের 'বিদেশিনী', 'পূরবী'র 'লীলাসঙ্গিনী', 'বিচিত্রা'র 'ছায়াসঙ্গী'– প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতিতে অদৃশ্য লীলাময়ীর রূপ উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব-অন্বেষার মূলেও প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সংসারের প্রেম, সৌন্দর্য, প্রকৃতির সমন্বয়ে মানুষের মুক্তি সাধনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে। এবং এই মুক্তির জন্যই বন্ধন অপরিহার্য। বন্ধন মূলত প্রকাশেরই অন্য একটি

রূপ-রূপান্তর মাত্র । স্রষ্টা ও সৃষ্টিস্বরূপ মানুষের মধ্যে এই প্রকাশ-প্রবণতা সমপরিমাণে ক্রিয়াশীল রয়েছে । "বৈদিক ভাষায় ঈশ্বরকে বলেছে আবিঃ প্রকাশস্বরূপ । তাঁর সম্বন্ধে বলেছে, যস্য নাম মহদযশঃ । তাঁর মহদযশই তাঁর নাম, তাঁর মহৎ কীর্তিতেই তিনি সত্য । মানুষের স্বভাবও তাই– আত্মাকে প্রকাশ ।"[৮৭] স্রষ্টা-সৃষ্টির এই অভিন্ন স্বরূপপ্রকৃতি দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন আলোড়িত হন । একটা বন্ধন মুক্তির লীলাপ্রকৃতি অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত রয়েছে । মুক্তির সাধনায় প্রেমময় বন্ধনই প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ । রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বন্ধন ও মুক্তি মূলত একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ মাত্র ।

'শারদোৎসব' নাটকে উপনন্দ চরিত্র ঋণশোধের জন্য দুঃখসাধনার কঠিন ব্রতকে অবলম্বন করেছেন । এবং এর মাধ্যমেই দায়মুক্তির আনন্দ অর্জন করা সম্ভব । কারণ, দুঃখের যন্ত্রণাদগ্ধ উপলব্ধির মাধ্যমেই মানুষের আত্মপরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এ সুবাদেই মানুষ নিজেকে চিনতে পেরে আত্মসমুন্নতির পথে এগিয়ে যায় । এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের অক্ষয় আনন্দে জীবনকে পরিশোভিত করে তোলে । এতে করেই মানুষ প্রকৃত গৌরবে মহিমান্বিত হওয়ার সুযোগ পায় ।

"... ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি– সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে । দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না । এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি । যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে ।"[৮৮] রবীন্দ্রনাথের এই দুঃখদর্শনও ভারতীয় শাস্ত্র সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে সাজুয্য বহন করে । বিশেষত, ঔপনিষদিক ভাবনার সাথে এর অন্তর্গত সাদৃশ্য লক্ষণীয় ।

"উপনিষৎ বলিয়াছেন–

স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্তা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন । সেই তাহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে । আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা-কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয় । আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া । সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া । ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি । তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে । সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ, সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা হইয়াছে–

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'
আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে ।"[৮৯]

এই দুঃখভারগ্রস্ত আনন্দঘন সাধনার কথা ভারতীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতির যত্রতত্র উল্লিখিত রয়েছে । সেখানে দুঃখসাধনার অমৃত গাথা জয় জয়কাররূপে কীর্তিত হয় । দুঃখ দহনের প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়েই পরমানন্দের সাক্ষাৎলাভ সম্ভবপর হয়ে ওঠে । "আমাদের দেশের সর্ববিধ অধ্যাত্মচিন্তারও সার কথা– ত্যাগেনৈকেনাস্থ– তত্ত্বমানশুঃ – একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব পেয়েছেন । এ ত্যাগ হল তপস্যা, অর্থাৎ কষ্ট করা । জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার মূল্য দিতেই হবে । অনিচ্ছায় দিতে হলে তা নিছক ক্লেশ, দুর্গতি । আর সে ঋণ সজ্ঞানে শোধ করতে চেষ্টা করলে তার মধ্যে মিলবে-সুখভোগ নয়– দুঃখ মুক্তি, অর্থাৎ আনন্দ, যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, তার উপরে মানুষের জীবনে, তার সংসারে, তার চিন্তায় যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, সে সবই এই ঋণশোধেরই বেদনার পথেই লব্ধ ।"[৯০] খ্রিস্টীয় ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যেও দুঃখকে অপরিসীম আনন্দ ও মুক্তির আকররূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে । কিন্তু এই দুঃখবোধই প্রেমের মাধ্যমে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে । এর মাধ্যমেই আত্মিক সমুন্নতি সম্ভব হয়ে ওঠে । ফলে ক্রমান্বয়ে মুক্তির পথও প্রশস্ত হতে থাকে । এবং অক্ষয় আনন্দের অধিকারী মানুষ আপন আপন গন্তব্যে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয় । কিন্তু কখনো যদি দুঃখকে স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করা হয়– তাহলে তা সমূহ বিপদাশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে । এবং একসময় তা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও বিপন্ন করে তোলে । অথচ, অনেকেই স্বার্থের প্রলোভনে জড়িয়ে দুঃখকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে থাকে । সে ক্ষেত্রে অনেক সময় সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি ঘটলেও এক প্রকার পৈশাচিক আনন্দ পরিলক্ষিত হয় । যা মানবিক বোধবুদ্ধির চরম অবক্ষয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয় । এবং মনুষ্যত্ববোধের শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নেয় । মানবিক মূল্যবোধের পরম সুষমাবোধ হারিয়ে মানুষ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে । "দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা । কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সদগতির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখব্রত গ্রহণ করে, মুক্তিলোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখসাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে । তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্যকেই প্রকাশ করে ।

প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য। তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তুলে।”[৯১]

দুঃখকে পাশ কাটিয়ে নয়, বরং বরণ করে অন্তরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব। ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকারের মাধ্যমে ব্রত পালন করে মানুষ আপনার সৌন্দর্য-শক্তি আবিষ্কার করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে বিভিন্ন সৃজনকর্মে এই দুঃখ-মাহাত্ম্যকে অভিনন্দিত করেছেন–

> “বিপদে মোরে রক্ষা করো
> এ নহে মোর প্রার্থনা
> বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
> দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
> নাই-বা দিলেন সান্ত্বনা,
> দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।”[৯২]

রবীন্দ্রনাথ সর্বাবস্থায় দুঃখদহনের আলোকিত পথে মানুষের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন। দুঃখস্বীকারের অতলস্পর্শ অনুভূতির মূলে প্রেম-প্রণোদনা মানুষকে গৌরবান্বিত করে তোলে। মনন-মর্যাদার একটা সুষমাবোধ ব্যক্তিচরিত্রকে উন্নত করে। প্রেমের আনন্দ-মুক্তি দুঃখের দুঃসহ ব্রতসাধনাকে উপলব্ধির মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে। এবং এর ফলেই মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী হতে পারে। অন্যদিকে দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো। “দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়।”[৯৩] দুঃখের নিরন্তর অন্তঃসলিলা স্রোতের মধ্যেই জীবনের প্রাণকণিকা নিজেকে বারবার ফিরে পায়। এবং আত্মনিঃসৃত প্রেমের সুষমায় তা মহিমময় রূপপ্রকৃতি লাভ করে থাকে। “... কষ্টই আমাদের আত্মার আমাদের প্রেমের আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একমাত্র মূল্য।”[৯৪] রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক দুঃখযন্ত্রণার শিকারে পরিণত হন। তবে তিনি বরাবরই তা ভারতীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতির দুঃখবোধের আলোকে মোকাবেলা করেন। যা তাঁর অজস্র সৃষ্টিকর্মে বারবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এবং এই দুঃখসংস্কৃতির উপলব্ধিতেই তিনি বিশ্বরহস্যের রূপপ্রকৃতি উদঘাটন করতে সক্ষম হন। “... জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদযাপন করেছি– সেই তপস্যার ফলেই বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যময় গভীরতা আমার সম্মুখে প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের মতো প্রসারিত হয়ে রয়েছে।”[৯৫] রবীন্দ্রনাথ দুঃখের সীমাহীন অনন্ত প্রকৃতির মাধ্যমে বৃহতের সন্ধান লাভ করতে সক্ষম হন। এবং এর মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে একটা অন্তরের সামীপ্য খুঁজে পান। যা তাঁকে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে ওঠতে নিবিড়ভাবে সাহায্য করেছে। “রবীন্দ্রনাথের জীবনে বারংবার যে নানাবিধ দুঃখের অভিঘাত দেখা দিয়াছে, তাহা নীরবে শান্তচিত্তে বহন করিবার প্রেরণা তিনি যেমন নিজের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যেই পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগাথা হইতেও তাহার সমর্থন লাভ করিয়া দুঃখ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা যে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।”[৯৬]

‘শারদোৎসব’ নাটক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা শিক্ষাবিষয়ক ভাবভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। এই শিক্ষার অন্তর্মূলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রাণনা নিবিড়ভাবে সক্রিয় রয়েছে। ভারতের তপোবনভিত্তিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ বরাবরই তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন এবং এরই আলোকে তিনি শিক্ষাভাবনার মূলীভূত আদর্শ-অবয়ব গড়ে তোলেন। তপোবনভিত্তিক শিক্ষাদর্শের প্রধান শর্ত, প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষাগ্রহণ– যা রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনারও মূল কথা। এ ছাড়া জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে গুরুগৃহবাস ছিল প্রাচীন শিক্ষার অনিবার্য অংশ। এতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুগৃহ ও নিসর্গ প্রকৃতির ছোঁয়ায় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। যা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। এছাড়া প্রাচীন তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষা সংস্কৃতি উন্মুক্ত-উদার পরিবেশ, সংযম শিক্ষা, আচরণিক সংহত সাধনায় ব্রত পালন, ব্যবহারিক শিক্ষার অনুশীলন, ধর্মাচরণ প্রদর্শন– ইত্যাকার বিষয়াবলি শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাতে একজন শিক্ষার্থী পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যিক শিক্ষা সংস্কৃতির অন্তর্গত সত্যস্বরূপ নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। যা তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাভাবনায় অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “নিয়ম সংযমের অভ্যাস দ্বারা এমন একটি বললাভ হইত, যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত অতি সাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য। সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত

হইত।"[৯৭] রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাদর্শের প্রতি সারাজীবনই সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। এবং এরই আলোকে তিনি শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

'শারদোৎসব' নাটকের প্রধান উৎসব হিসেবে পুঁথি পোড়ানো উৎসবই প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকটির নাটের গুরু সন্ন্যাসী চরিত্রটি এখানে সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর মন-মানসিকতা, চলন-বলন ও ক্রিয়াকর্মের উপর 'শারদোৎসব' নাটকের প্লট-পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে। এ সন্ন্যাসী মূলত পুঁথিপত্র পোড়াবার উদ্দেশ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সন্ন্যাসী বলেছে, '... পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি। ... চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।"[৯৮] এখানে পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ লক্ষণীয়। পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষা ও জীবন মানুষকে প্রকৃত জীবন থেকে আড়াল করে রাখে। জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিবিমুখ বিকৃত শিক্ষাই পুঁথিগত শিক্ষা। এ শিক্ষা বরাবরই পঙ্গু ও অথর্ব। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "যে বিদ্যা পুঁথিগত যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেমনি সে শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত তাহাও আমাদের লক্ষ্যে প্রায় তেমনি নিষ্ফল।"[৯৯] এই শিক্ষার নিষ্ফল-নিষ্প্রাণ কসরৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। শিক্ষাকে তিনি উপলব্ধির স্বকীয় চেতনার সাথে মিশিয়ে বাস্তবসম্মতরূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। মনকে পুঁথি সর্বস্ব না করে, পুঁথিতেই মনের আধিপত্য বিস্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা গ্রহণ করেন। এবং পুঁথিকে মননশীল চর্চার সহায়করূপে গণ্য করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ করে বলেন, "আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব। ইহা গর্বের বিষয় নহে। ... জগতকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।"[১০০] রবীন্দ্রনাথ এহেন শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে রীতিমত বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যা তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্বকীয় অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। এই শিক্ষাদর্শ মূলত প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎসারিত। "রবীন্দ্রনাথ নিজেই বহুবার বলেছেন, প্রাচীন ভারতের কাব্যেই পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন তথা বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মডেলটিকে। কবি কালিদাসের কাব্যে সংস্কৃত কাব্যের গভীরে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে প্রেম, সৌন্দর্য ও অধ্যাত্ম-ভাবুকতার একটি বরণীয় ও অনুসরণযোগ্য মডেল পেয়ে গেলেন।"[১০১] শান্তিনিকেতনের আবহ কল্পনায়ও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন তপোবন শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারস্থ হন। এখানকার শিক্ষার্থীদের আশ্রম বালক বালিকাদের ছাঁচে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া শান্তিনিকেতনের বহিরঙ্গ ও অন্তর্গত ভাবসম্মিলনের সাথেও আশ্রম শিক্ষানুরাগের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টার মশায় গোরু চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুশি হত সন্দেহ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তবু শরীর মন খাটাবার কাজ বিস্তর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায়রে, পড়া মুখস্থ সর্বদাই থাকে বাঁকি। পাতা ভরে রয়েছে কনজুগেশন অফ ইংরেজি ভর্বস্। তা হোক আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়া মুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।"[১০২]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের প্রভাবকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের নান্দনিক সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতির মূর্ত প্রতীক কালিদাস। যা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই মুগ্ধভাব চিত্তে উপলব্ধি করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যসংস্কার থেকে আহূত তপোবনাদর্শকেই বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর।"[১০৩] সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক আদর্শ-আঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও রচনাকর্মে প্রয়োগ করেছেন। বিশেষত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেন। এবং তিনি তা নিজস্ব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ফুটিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ... ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার মনে দৃঢ় ছিল। ... সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে। তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"[১০৪] প্রাচীন ভারতের এই সুমহান সংস্কৃতি শিক্ষার আলোকেই তিনি নিজস্ব মতামতের ভিত্তি গড়ে তোলেন। পাশাপাশি মরমিয়া সাধক কবিদের একটা ভাবাদর্শ-অনুসন্ধিৎসা এর সাথে সমন্বিত করা হয়। এ পথ বেয়েই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ভাবনায় ক্রমান্বয়ে ঐক্যবোধজনিত বিশ্বগত ভাবভাবনা যুক্ত করেন। যা তাঁর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতীতে রূপান্তরের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। "শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে যে বিশ্বভারতী জন্ম নিল তার মূল মন্ত্র ছিল 'যত্র বিশ্বং ভারত্যেকনীড়ং।"[১০৫] বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলিয়ে একটা বিশ্বজনীন

ভাবদর্শন সক্রিয় রয়েছে। ফলে তাঁর ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি আরও বেশি বিনম্র শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হয়। কারণ, ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি বিশ্বগত ভাববিনিময়ের ফলেই জগতে একটা মর্যাদার আসন তৈরি করতে সক্ষম হয়। যা এখনও অথবা কোনোকালেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নয়। বিশেষত, জাতিগত ভেদবুদ্ধিরহিত অসাম্প্রদায়িক চেতনাই শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "... ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।"[১০৬]

'রাজা' (১৯১০) নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রত্যক্ষত কোথাও উপস্থিত নেই। অথচ সবখানেই তাঁর মহিমময় অদৃশ্য অবস্থান বিরাজিত। এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে 'রাজা' নাটকটি 'অরূপরতন' নামে প্রকাশ করেছেন। এই নাম-শিরোনাম নাটকটির ক্ষেত্রে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলে সমালোচকগণ মনে করেন। 'রাজা' নাটকে অরূপরতনরূপী অদৃশ্য রাজা আড়ালে থেকেই নাটকের সব পাত্র-পাত্রী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোথাও নেই, অথচ সবখানেই আছেন, সবার মাঝেই আছেন। সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সবকিছু মিলিয়ে যে জীবন, সে জীবনের কেন্দ্রমূলে 'রাজা' স্ব-মহিমায় অবস্থান করছেন। প্রজারা তাঁকে না চিনলেও রাজার সুষম শাসনে সবাই আসক্ত, সন্তুষ্ট ও নির্ভরশীল। রাজার পরিচয় প্রসঙ্গে ঠাকুরদা বলেন, "... আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে। ... সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।"[১০৭] এই রাজ্যে প্রতিটি প্রজাই ব্যক্তিক অধিকারের পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করছে। মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ মর্যাদায় সবার জীবনই স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। যে কোনো অসঙ্গত অনাচারের তাৎক্ষণিক পর্যায়ে অদৃশ্য রাজা তা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকি বিপদের সময়ও এই রাজা প্রজাসাধারণের পাশে থেকে সহযোগিতা ও আশ্বাসের অভয় বাণীতে ভরিয়ে তোলেন। যেমন, দাসী সুরঙ্গমাকে রাজা পাপ পঙ্কিল পৃথিবী থেকে উদ্ধার করেছেন। রাজা প্রসঙ্গে সুরঙ্গমা বলে –

"সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম... তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই, আর মনে হয়– এই আমার ঢের, আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।"[১০৮] দাসী সুরঙ্গমা রাজার কারণেই পাপাসক্ত জীবন থেকে এক সুস্থ-সুন্দর জীবনে পদার্পণ করেছে। এবং এর ফলেই সুরঙ্গমা নিবেদন-নিষ্ঠ শুভ্র-সুন্দর পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পায়।

'রাজা' নাটকটি রানী সুদর্শনার সাথে রাজার বহুমাত্রিক বিরহ মিলনের উপাখ্যান নিয়ে রচিত। এখানে রানী সুদর্শনার কিছু মোহমত্ত প্রবৃত্তির কারণেই যতসব নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়। সুদর্শনার স্বামীগৃহ ত্যাগ, মোহমুগ্ধরূপে ভুল রাজা সুবর্ণকে মাল্যবরণ, অগ্নিদাহের সূচনা, সুদর্শনার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন, ষড়যন্ত্র, বিভিন্ন রাজার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিশেষে রানীর অনুশোচনা, আত্মশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে রাজার সাথে মিলনসাধনে নাটকীয় পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে। রানীর এতসব ভুল বোঝাবুঝি, অনাসৃষ্টি-অনর্থপাত, বিরোধ-বিবাদ ও যাবতীয় দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যেও রাজা এক মুহূর্তের জন্যেও রানীকে ত্যাগ করেন নি। বরং সার্বক্ষণিকভাবে রাজা রানী সুদর্শনাকে পরম যত্নের সাথে আগলে রেখেছে। এবং সবশেষে রানী সুদর্শনাও স্বীয় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও সর্বস্ব নিবেদনের মাধ্যমে রাজাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এছাড়া নাটকের অন্যান্য পাত্র-পাত্রীও সব বিরোধ ভুলে অদৃশ্য রাজাকেই পরম অভীষ্ট বলে অন্তরের সবটুকু অর্ঘ নিবেদন করেছে।

'রাজা' নাটকের এই ভাবদর্শনের মূলে যাবতীয় শাস্ত্র সংস্কৃতির অনুপ্রাণনা গভীরভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঋগবেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ, কোরান, পুরাণ, বাইবেল, গীতা, বৈষ্ণব প্রভৃতি শাস্ত্র সাহিত্য ও এর সুমহান সংস্কৃতি প্রয়োগ করেন। বিশেষত, উপনিষদের দর্শনদীপ্ত প্রত্যয়ভাবনাই এখানে অধিকতর রূপপ্রকৃতি নিয়ে ফুটে ওঠেছে। 'রাজা' নাটকে বর্ণিত অদৃশ্য রাজা মূলত সৃষ্টির নিয়ন্তা-শক্তি ঈশ্বরের প্রতীক। উপনিষদে যাকে পরমং প্রেমাস্পদং বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উপনিষদ বর্ণিত এই রাজা ও রবীন্দ্রসৃষ্ট রাজার মধ্যে গভীরভাবে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই ঈশ্বরকে পেতে হলে কঠিন দুঃখব্রত ও ঘাতপ্রতিঘাত স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলেছেন। আত্মোপলব্ধির দুর্গম দুস্তর সাধন ভজনের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে অর্জন করে নিতে হয়। কারো কৃপা বা ভিক্ষার দান দ্বারা কখনো তা সম্ভব নয়। 'রাজা' নাটকের রাজা রানী সুদর্শনাকে বলেছে, "... তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না।"[১০৯] এর

ফলেই রানী সুদর্শনাকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। রূপজ মোহের কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়েই সত্যসীমানায় নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে। রাজ্য জুড়ে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের নানা বিপত্তি অতিক্রম করে রানী আত্মিক শুদ্ধতা অর্জন করেছে। উপনিষদে এই বিরোধপূর্ণ সংঘাত-সংহতি সাধনার কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় শাস্ত্র, ঐতিহ্য, ধর্ম, সুফি সাহিত্য, বাউল সাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্রতসাধনার প্রসঙ্গ উল্লিখিত রয়েছে। বিশেষত, এ দেশের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারে তর্কাতীতরূপেই প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে বলেন, "যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে। আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি। তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়।"[১১০] 'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনা প্রবৃত্তির অনাহুত মোহমগ্নতা জয় করে রাজার সমুন্নত মহিমা-মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। রাজার বাহ্যিক-বহিরঙ্গ কুৎসিত ভয়ংকর রূপের মধ্যেও অনন্ত সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছে। আত্মগত উদ্বোধনে সেই সমুজ্জ্বল মুহূর্তে রানী উচ্চারণ করেছে– "তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।"[১১১] অবশেষে অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে আসার আহ্বান ধ্বনিত হয়। রাজা বলেন, "এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো– আলোয়।"[১১২] রানী সুদর্শনা এবার বললেন, "যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।"[১১৩] সুদর্শনার এই প্রার্থনার সাথে উপনিষদের মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সেখানে বলা হয়, "অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবীরাধার্ম– এধি-রুদ্র যত্তে দক্ষিণং তেন মা গাহি নিত্যম (বৃহদারণ্যক উপনিষদ! ১৩৭২৮)। অর্থাৎ আমাকে অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে যাও, হে স্বপ্রকাশ তুমি আমার হয়ে প্রকাশ পাও, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ উহা আমাকে নিত্যকালের জন্য দেখাও, যাতে চিরকাল ঐ প্রসন্নতায় আমি স্থান পেতে পারি।"[১১৪] রানী সুদর্শনার মধ্যে এই ভাবই সুগভীর অভিব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠেছে। এবং তা নাটকের আদিগন্ত জুড়ে একটা পরিণামী ভাবভাবনা রূপেও পাঠকসাধারণের কাছে ধরা দেয়।

'রাজা' নাটকে রাজা-রানীর মিলন, বিরহ, অভিসার, স্রষ্টা-সৃষ্টি, জীবাত্মা-পরমাত্মা বা ব্রহ্ম-জীবের সম্পর্কগত ভাবটির অনুসরণে রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত। এটি পার্থিব জীবনে নরনারীর বহুমাত্রিক সম্পর্ক সমবায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যা মানব সমাজের আদি-অনাদিকালের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিতে প্রবহমান রয়েছে। স্রষ্টা-সৃষ্টি বা নরনারী অনাদিকালব্যাপী মোহময় প্রবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন রয়েছে। কিন্তু নির্মোহ-নির্লোভ-নিস্পৃহ প্রেমের সাধনায় সব বাধা অতিক্রম করে মিলিত হওয়া সম্ভব। যেখানে প্রার্থিত মিলন-মধুরিমা অনন্ত সুখের আস্বাদন বয়ে আনতে পারে। "... রাজা নাটকের ভাবধারাও অনুরূপ– রানীর দৃষ্টি যতদিন মোহাচ্ছন্ন ছিল ততদিন রাজা তার কাছে কালো। সত্য ও সুন্দরের প্রেম রানীর কাছে ভাল লাগেনি। কিন্তু মোহের যখন মৃত্যু ঘটলো তখনই রাজার প্রতি রানীর প্রেম জেগে উঠল। আমি আজ পথের ধূলি মাড়িয়ে পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে যাব। সে সুন্দর নয় সে অপরূপ, সে অনন্য।"[১১৫] রাজা ও রানীর এই মিলনমাধুর্যে রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ অনুভূতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। যা এদেশের প্রাচীন ধর্ম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত। নাটকে দেখা যায়, রাজা অন্ধকার ঘরের বাসিন্দা। উপনিষদেও ব্রহ্মকে বলা হয়েছে– "আদিত্য বর্ণং তমস পরস্তাৎ, অর্থাৎ, অন্ধকারের ঊর্ধ্বে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাছাড়া 'রাজা' নাটকে রাজার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিচয় উল্লিখিত হয় নি। অনুরূপভাবে উপনিষদেও ব্রহ্মকে রূপের অরূপম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনার কাছে অদৃশ্য রাজাই পরম অভীষ্ট। কিন্তু রানী তাঁকে অন্ধকার জগতে উপলব্ধির ধ্যানলোকে পেয়ে খুশি নন। সুদর্শনা তাঁকে বাইরের জগতে সাকার মূর্তিতে পেতে চায়। একটা মোহমগ্ন প্রবৃত্তি তাঁকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়। ভ্রান্তি-বিহ্বলতায় রানী সৌম্য-সুন্দর ও পরিশুদ্ধ পথ থেকে ছিটকে পড়ে। মোহমত্ত প্রবৃত্তির গ্লানিকর তাড়না রানী সুদর্শনাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এর ফলেই রাজ্য জুড়ে যতসব অনর্থপাত ঘটে। কারণ, ঈশ্বরকে কখনো খণ্ডিত বা প্রত্যক্ষবৎ মূর্তিতে অবলোকন করা সম্ভব নয়। যা সকলের চেয়ে বড় পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়। ঈশ্বরের ব্রহ্মের আনন্দ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে আছে। কোন এক বা একাধিক খণ্ডকে নিতে গেলে সমগ্রকে হারাতে হয়। তাই যতক্ষণ সুদর্শনার প্রেম পাকা না হচ্ছে। ভালোবাসা ভালোলাগা-মন্দলাগার ঊর্ধ্বে না ওঠছে ততদিন তার কঠিন পরীক্ষা অহংকার বিধ্বংসের সাধনা চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপরতন'-এর ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে স্রষ্টা-সৃষ্টির সাধনতত্ত্ব উল্লেখ করেন। যা রবীন্দ্রচিন্তায় ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচয়বাহী।

'রাজা' নাটকে রাজার অধিষ্ঠান অন্ধকার গৃহে অবস্থিত। কিন্তু সে বাইরের বিচিত্র নিসর্গ-প্রকৃতি ও তাবৎ জগৎপ্রবাহের সাথে মিশে রয়েছে। রাজা নিজের রূপ প্রসঙ্গে রানী সুদর্শনাকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছে– "সুদর্শনা। ... নববর্ষার দিনে

জলভরা মেঘে আকাশের শেষপ্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম... শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ... আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুন্তল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।" রাজা বা ব্রহ্মকে বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ করার ভাবটি রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় উপনিষদ ও সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেছেন। উপনিষদ ঈশ্বরকে কোনো জাগতিক রূপপ্রকৃতিতে নয়, বিশ্বের সর্বত্রই কল্পনা করেছে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বের সবকিছুর মধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। "... বিশ্ব এক প্রচ্ছন্ন মহাসত্তাদ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্ব হতে তা অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই সর্বেশ্বরবাদ একরকম সমর্থিত।"[১১৬] রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে ব্রহ্ম সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলেন। ব্রহ্ম সম্পর্কে অখণ্ড সার্বভৌম একটা অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৃজিত হতে থাকে। এতে বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের কর্ম বলে নির্দেশিত হয়েছে। এরূপ মনন মানসিকতায় মানুষ খুব সহজেই নির্লোভ, নিস্পৃহ ও নির্মোহ জীবনের অধিকারী হতে পারে। স্থূল বৈষয়িক স্বার্থপ্রবুদ্ধ সংকীর্ণসীমা কখনো তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। সংসারের সবখানে ব্রহ্মের অবস্থান জ্ঞানে মানুষ বিকৃতবুদ্ধি থেকেও রক্ষা পায়। বৈষম্য বিকারের উৎকট চরিতার্থতাও মানুষকে কলুষিত করতে পারে না। এবং এর ফলেই মানুষের কল্যাণকর ও শান্তিপ্রদ জীবনের নিশ্চয়তা অর্জিত হতে পারে। "ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে–

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে, ... যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে– সে যাহা ভোগ করে তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে– সেই ভোগে সে ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করে না– নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য বলিয়া জানি, তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে।"[১১৭]

উপনিষদে ব্রহ্মবাদ প্রসঙ্গে নানামাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। সেখানে ব্রহ্ম ও বিশ্বকে অভিন্ন কল্পনায় বেশ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এমনকি বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্মের মধ্য থেকে উদ্ভব, বিকাশ ও বিলীন হয়ে থাকে। "ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথার সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝান হয়েছে এই বলে যে, এই সবকিছুই ব্রহ্ম, ব্রহ্মেই তাদের জন্ম, পুষ্টি এবং বিলয় (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলনিতি ॥ ছান্দোগ্য, ৩॥১৪॥১)।"[১১৮] রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অজস্র সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থান কল্পনা করেছেন। এবং এর মধ্যে তিনি স্বকীয় ভাবভাবনার আলোকে এক স্বতন্ত্র মতাদর্শ গড়ে তোলেন। বিশেষত, শান্তিনিকেতন পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহে এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে তিনি অহং-আমিত্ববোধ পরিহারের কথাই বারবার উচ্চারণ করেন। এবং প্রকৃতির মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের সবকিছু উপলব্ধি করার কথা বলা হয়। এ সুবাদে মানুষের মধ্যে একটা অবাধ নিরবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড-অনন্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। যা মানুষের ঔদার্য-অসাম্প্রদায়িক ও মহত্তম চেতনাবোধকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাবনার আলোকেই 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে প্রকৃতির অপার রহস্যের মধ্যে নিজের অবস্থানকে নির্দেশ করেন। এবং এর মাধ্যমেই তিনি সীমা ও প্রত্যক্ষ দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মের প্রেমময় অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানান। যেমন, বিশ্বপ্রকৃতির জলস্থল, গাছপালা, পশুপাখি, সূর্যচাঁদ, অনু-পরমাণু, ধূলিকণা ইত্যাদির মধ্যে তিনি ব্রহ্মশক্তির চেতনাময় অভিব্যক্তির বিচিত্র রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন–

"অবির বৈ নাম দেবতর তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ॥

– সেই দেবতার নাম অবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরিবৃত– এই যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা।"[১১৯] এ সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা কল্পনা করেছেন। এবং নিজেকেও এর অনিবার্য অংশরূপে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হন। তাঁর প্রায় সব সৃষ্টিশীল রচনাশৈলীর মধ্যেই অনুরূপ ভাবপ্রবণতা লক্ষণীয়। বিশেষত, ছিন্ন পত্রাবলির পাতায় পাতায় রবীন্দ্রচিত্তের এই স্মারক-স্বাক্ষর চিত্রিত হয়ে ওঠেছে। যেমন, শিলাইদহে বর্ষার নদীস্রোতের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রাণকণিকার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। এমনকি তিনি প্রকৃতিকে মানুষের সজীব চেতনার অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এবং এ সুবাদেই প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা অনুভূত হয়। এ সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হবার মতো নয়। এমনকি মৃত্যুর পরেও নয়। যা যুগ-যুগান্তর, রূপ-

রূপান্তর, মন-মনান্তর এক অখণ্ড আত্মার ঐক্যস্রোত ধারায় প্রবহমান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' কাব্যের 'অনবচ্ছিন্ন আমি' কবিতায় বলেন,

> "আমি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে;
> যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
> ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
> আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
> অনন্ত-আকাশ-তলে দেখিলাম নামি
> আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি"।[১২০]

রবীন্দ্রদর্শনের অনুরূপ চিন্তাচেতনার মূলে একটা ঐক্য-অন্বয় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কোনোরকম নির্দিষ্ট সীমায়তি দিয়ে তা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। অনাদি অনন্ত জীবনপ্রবাহের সাথে এর সুগভীর সাজুয্য রয়েছে। এই জীবনভাবনার সাথে নিসর্গ প্রকৃতি একাকাররূপে ধরা দেয়। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির কোনোকিছুই এই ভাবভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই অদ্বৈত জীবনদর্শনই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি ও সৃজনশীল জীবনবোধকে সবসময় তাড়িত করেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে এই অনুভবক্রিয়া যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের পথ বেয়ে প্রবহমান রয়েছে। সেখানে মৃত্যু বা অন্য কোনো বিঘ্ন বিপর্যয়ের স্থান নেই। অর্থাৎ এই ধারাবাহিকতায় কোনোরকম বিচ্ছিন্নতা নেই। এমনকি মৃত্যুর অস্তিত্ব এখানে স্বীকৃতি পায় নি। ফলে রবীন্দ্রদর্শনের এই সার্বভৌম চিন্তাচেতনার মূলে একটা অনন্ত-অসীম সৃষ্টিশীলতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। এবং এর মধ্য থেকেই তিনি বিশ্বস্রষ্টার স্বরূপ-প্রকৃতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মানবপ্রকৃতির অন্তর্গত অবয়ব জুড়েই পরম স্রষ্টা অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন বলে তিনি মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই এই ভাবানুভব অন্বিষ্ট হয়ে আছে। যা তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উপনিষদ থেকেই আহরণ করেছেন। বিশ্বের সর্বত্র এক-অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার মহিমময় অবস্থান রবীন্দ্রসৃষ্টির মূল কথা। যা তাঁর এদেশীয় সংস্কৃতি-প্রবুদ্ধ চেতনাকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। "অনন্ত মহিমা এই অগ্নির– এই অগ্নি ব্রহ্ম, এই যে বায়ু, যে অন্তরিক্ষে মরুদরূপে সঞ্চরমান, ভূলোকে স্পর্শরূপে প্রতীয়মান, দেহ মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া আছে এই বায়ুই ব্রহ্ম– এই যে বিশ্বজৈবিক প্রবাহের প্রতিষ্ঠা অন্ন– এই অন্নই ব্রহ্ম, এই যে অনন্তকালে প্রবাহিত মহাপ্রাণ– এই প্রাণই ব্রহ্ম। এই যে মহাকাশে পরিব্যাপ্ত মহা-আনন্দ– এই আনন্দই ব্রহ্ম। প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থিত এই আত্মা ব্রহ্ম। এই সব মহিমা জুড়িয়া এক সত্য– সেই সত্যই পরম সত্য, সকল সত্যের অন্তর্নিহিত সত্য। সেই সত্য মহত্তম, সেই সত্য বৃহত্তম, সেই সত্যই ব্রহ্ম। উপনিষদের সর্বত্র এই একের সন্ধান, এই একের উপলব্ধি।"[১২১] এই ভাবেরই বহুবর্ণিল বিস্তার বেদান্তদর্শন পেরিয়ে অন্যান্য শাস্ত্রসূত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটা মুখ্যস্থান আসন তৈরি করে নেয়। রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক কবিপ্রাণের উপলব্ধিতে প্রকৃতি ভাবনা অখণ্ড-অদ্বয়-সূত্রে জড়িত। তিনি মনে করেন, মানুষের অহংবোধই এই সম্বন্ধ-সৃষ্টির প্রধান অন্তরায়। যা মানুষকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে লোভ-মোহ ও বিকৃত ভাবনায় বন্দি করে ফেলে। যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে মানুষের ঐক্য উপলব্ধি অপরিহার্য। এর সাথে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের সযত্ন সাধনা প্রয়োজন। এবং এতে করেই পরমানন্দের সত্যোপলব্ধি সম্ভব হয়ে ওঠে। মানুষ মহাকালিক পরিক্রমায় অখণ্ড সত্তার মহিমময় ধারায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই এই ব্রতসাধনার নিবিড় সাধকরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে যান। তাঁর মতে, সীমা থেকে অসীম, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষের যাত্রাপথে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রকৃতির সাথে অভিন্ন মহিমায় স্বকীয়তা উপলব্ধি করছে। সমস্ত আসক্তির বন্ধন ছিঁড়ে অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠছে। 'রাজা' নাটকে এই মোহময় বন্ধন ছিন্ন করার সাধনাই 'সুদর্শনা' চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্য ভাবসমবায় ভারতীয় সংস্কৃতির যত্রতত্র আবিষ্কার করা মোটেই আয়াসসাধ্য নয়।

'অচলায়তন' নাটকের প্লটসংঘটন ও নাট্য পরিণতি ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংস্কৃতির অধ্যায় অনুষঙ্গ অবলম্বনে নির্মিত। শতধা বিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক বিভেদ ধর্মের আত্মসংবৃত সাধনভজন এর পটভূমিকা হিসেবে গৃহীত। প্রাচীনতম জীর্ণ ভারতবর্ষ ও আচারসর্বস্ব ধর্মকর্ম 'অচলায়তন' নাটকে রূপকাবহের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। এবং এরই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় ভাবদর্শনের অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অচলায়তনে প্রাচীরবেষ্টিত, সমাজবিচ্যুত আয়তনিকদের অবস্থান-অবয়ব প্রাচীনতম ভারতবর্ষের প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত। এবং তাদের আচারপরায়ণ মন্ত্রক্লিষ্ট জীবনপ্রণালী বাঙালি জাতির অনুসরণে রূপায়িত হয়। পুরপ্রাচীর দিয়ে অবরুদ্ধ জীবনে তপজপ মন্ত্রোচ্চারণই সার কথা। প্রকৃত জীবনের প্রাণস্পন্দন

সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু এই জড়িমাগ্রস্ত কর্মকুণ্ঠ জীবনেও যুগে যুগে মুক্তিদূত এসে হাজির হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি-প্রজাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। সমবায়-সহাবস্থান ও সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুনের আগমন অভিনন্দিত হয়েছে। শত-সহস্র বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সমুন্নত মহিমা লাভ করতে থাকে। বর্ণসংকর বাঙালি সংস্কৃতি একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এই সমন্বয়-সাধনা অনাদিকাল থেকেই এদেশে প্রবহমান রয়েছে। ‘অচলায়তন’ নাটকের আঙ্গিক-উপাদানে এরই প্রতিচ্ছবি প্রতিরূপ রূপকাবহের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

অচলায়তনের পটভূমিকা হিসেবে প্রাচীন ভারতবর্ষকে বেছে নেয়া হয়েছে। বেদ-পুরাণে মন্ত্রসিদ্ধ ঋষিগণ সাধনক্ষেত্ররূপে যার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তন্ত্র-মন্ত্র ও আচারসর্বস্ব পুনরাবৃত্তির প্রাত্যহিকতা এদের জীবনে সার্বক্ষণিক সহচর। “এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে– কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে ওঠেছে।”[১২২] কিন্তু এই সাধনব্রত বৃহত্তর গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে প্রাত্যহিক জীবন পরিচর্যার কোনো স্থান নেই। কেবল শুন্যগর্ভ আত্মতৃপ্তির অহংবোধই দিন দিন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। তাতে কেবল নিস্প্রাণ ধর্মসাধনার গ্লানিকর আত্মাবমাননা বেড়ে চলে। প্রাচীন বাংলার অজস্র মঠমন্দিরের আনুষ্ঠানিকতা-কেন্দ্রিক প্রবৃত্তির মধ্যে এর সাক্ষ্য-প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। আবার এর মধ্যেই মুক্তিদূতরূপে গুরুর আগমন ঘটে। বহিরাগত জীবন ও শক্তির অনুপ্রবেশ যোগযুক্ত হতে থাকে। নতুনের মাত্রাযোগ সমন্বয় সহাবস্থান সম্ভব হয়ে ওঠে। অচলায়তন নাটকে গুরুর আগমনের মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারটি সুসম্পন্ন হয়। এবং গুরুর মধ্যস্থতায় ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও নতুনের মধ্যে ঐক্যসাধনা অভিব্যক্তি লাভ করে। “অদৃশ্য গুরুর পরিচালনায় বাহির হইতে উন্মুক্ত কর্মপন্থীর দল সেই প্রাচীর ভূমিস্যাত করিয়া সেই অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িল। অচলায়তনের নিষ্ক্রিয় শান্তি নষ্ট হইল। লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া প্রবেশ করিয়া আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্রবৎ মন্ত্র আবৃত্তি ও ন্যায়প্রাণায়ামের দিনের অবসান ঘটাইল। ইহারাই শক, হুণ, যবন, পারদ, পাঠান, মোগল এবং শেষে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতি। এই শোণপাংশুর দল বার বার ভারত-অচলায়তনে ঢুকিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাইরের আলোহাওয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে। তারপর ভারত তাহাদের গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি নিজেদের শক্তির সহিত মিলাইয়া নূতন করিয়া, বৃহৎ করিয়া আয়তন গড়িয়াছে। স্থবিরদের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে, উভয়ের মিলনের ফলে নূতন শুভ্র সৌধকে ‘আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড়’ করানো হইয়াছে। এই সমন্বয় সাধনের শক্তি ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত শক্তি ইহাই তাহার সভ্যতার প্রাণবস্তু।”[১২৩] ভারতের এই ঐতিহাসিক সমাজ সংস্কৃতি নিয়েই অচলায়তন নাটকের প্লটসংঘটন সম্ভবপর হয়ে ওঠেছে। দেশীয় সংস্কৃতির বর্ণসংকর সমবায়-সহাবস্থান ও সমন্বয়ধর্মী বৈশিষ্ট্য-বিস্তৃতি এই নাটকের ভিত্তি নির্মাণ করে দেয়। এই নাটকে দেখা যায়, অচলায়তনের নতুন ভিত রচনায় গুরু কাউকে বাদ দেন নি। নবীন-প্রবীণ সবাইকে নিয়েই এই নির্মাণশৈলী সুসম্পন্ন হয়েছে। সংস্থিতি ও প্রগতির মেলবন্ধন রচনা ভারতীয় সংস্কৃতির মূলীভূত সত্য। যা ‘অচলায়তন’ নাটকেরও অন্তর্গত ভাবসত্যরূপে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

‘অচলায়তন’ নাটকে মহাপঞ্চক আয়তনের রক্ষক ও একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে নিয়োজিত। নিয়মনীতি-বিধিবিধান প্রতিপালনে এতটুকু নড়চড় বা ত্রুটিবিচ্যুতি নেই। চরম প্রতিকূল প্রতিবন্ধক পরিবেশেও মহাপঞ্চক স্বীয় বিশ্বাসভূমিতে ঝলসে ওঠেছে। আপন বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষায় সে জীবনপন সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। এবং প্রাচীন শাস্ত্রসূত্র রক্ষার ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ, আয়তনিক জীবনের কোনো এক ক্রান্তিলগ্নে মহাপঞ্চক উচ্চারণ করেছে– “পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার। কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।”[১২৪] প্রাচীন শাস্ত্র সংস্কৃতির প্রতিভূ এই মহাপঞ্চক আপন বিশ্বাসে অটল। মূল্যবোধের মূল্যমান-মর্যাদায় বরাবরই পরিসিক্ত। কোনো ভয়ভীতি বা বৈরী-বাধা তাকে এতটুকু বিচ্যুত করতে পারে নি। “মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পার। তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।”[১২৫]

‘অচলায়তন’ নাটকে মহাপঞ্চকের চরিত্র চিত্রণেও একটা সৌষম্যবোধ অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই এই চরিত্র রূপায়ণে একটা মর্যাদা-গুরুত্ব আরোপ করেন। এই চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক প্রকার শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন বিশ্বাস-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতীকী চরিত্র হিসেবে এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সবিশেষ অনুরাগ লক্ষণীয়। যেমন, পঞ্চকের প্রশ্নের উত্তরে মহাপঞ্চক প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর বলেন, “কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লোভভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।”[১২৬] এই অচলনিষ্ঠ প্রাচীনের সাথে প্রগতিপন্থী নবীন বিদ্রোহীদের সমন্বয় করা হয়। যুগোপযোগী নতুন ও প্রাচীনের

মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমেই মানব-সংস্কৃতি টিকে থাকে। রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন নাটকে এই সমন্বয়ের ব্যাপারটি অত্যন্ত চমৎকার শিল্প কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। নাটকে আয়তনিকের নতুন ভিত রচনায় বিদ্রোহের প্রতীক পঞ্চকের ভূমিকাকে স্বাগত জানানো হয়। এখানে পঞ্চকের চরিত্রও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিত্রিত হয়েছে। এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রগতিশীল যুগোপযোগী ভাবভাবনাকে এই নাটকে ফুটিয়ে তোলেন। পঞ্চক চরিত্রের প্রতিটি আচরণ-হাবভাব উজ্জ্বল রসস্রোতের মাধ্যমে পাঠকসাধারণের মধ্যে একটা সম্মোহ সৃষ্টি করে। চরিত্রটি সংগীত, ছন্দবোধ, সুরমাধুর্য ও রসসিক্ত বাগভঙ্গিমার দ্বারা উপস্থাপিত হয়। পঞ্চক সুভদ্রকে একসময় বলে, "এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।"[১২৭] এখানে পঞ্চক আধুনিকতার মূর্ত প্রতীক। প্রাচীনপন্থী মহাপঞ্চকের সহোদর হলেও সে তন্ত্রমন্ত্র আচারের অসার-অদ্ভুত বিধিবিধানকে মেনে নিতে পারে নি। পঞ্চক সবকিছুই যৌক্তিক ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও আনন্দের মধ্যেই সব নিবেদিত। "পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।"[১২৮] রবীন্দ্রনাথ একই বৃন্তে অবস্থিত দুই বিপরীতধর্মী পঞ্চক ও মহাপঞ্চক চরিত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। স্থিতধী ও প্রগতিবাদের সমন্বিত-প্রতিপন্ন ভাবদর্শন দ্বারা নাটকীয় পরিণতি নির্দেশিত হয়। "পঞ্চক সত্য হউক, ইহা নিশ্চয়ই কাম্য, কিন্তু মহাপঞ্চক কি একান্তই মিথ্যা? ইহারা দুই সহোদর ভাই। একজন বিদ্রোহের প্রতীক। আর একজন নিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের। বিদ্রোহই একমাত্র সত্য নয়। ঐতিহ্যবোধ এবং একান্ত নিষ্ঠাই বিদ্রোহের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সাধনার নূতন সভ্যতার ইমারৎ গড়িয়া তোলে। এই নূতন সাধনায় মহাপঞ্চকেরও প্রয়োজন আছে।"[১২৯]

'অচলায়তন' নাটকে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মিলনমুখী সংস্কৃতি সহাবস্থান উপস্থাপিত হয়েছে। যা এদেশেরই সগৌরব ঐতিহ্যের ধারায় নিবিড়ভাবে প্রবাহিত। উচ্চ, নীচ, সভ্য-অসভ্য প্রায় সব সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে নবগঠিত আয়তনের ভাবদর্শন নির্মিত। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির এই জাতিগত সম্মিলন-সংহতি ভারতীয় ইতিহাস ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যুগে যুগে বহু বহিরাগত জাতি সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষ আত্মস্থ করে নিয়েছে। এবং গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে স্বকীয় সমুন্নতি সম্ভব করে তোলে। অথচ নিজস্ব ভাবসত্যের ঐতিহ্যিক ভাবপ্রকৃতি কখনো বিসর্জন দেয় নি। "ভারত সংস্কৃতি বহু-স্তরবদ্ধ এবং বহু শাখাজালজটিল, ভালোতে-মন্দতে জড়ানো, অমৃতে-গরলে মেশানো বহু-বিচিত্রের ঐক্য। যে দেশে বহু নরগোষ্ঠী, বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জীবনচর্যা, বহু বিশ্বাস, বহু ক্ষুদ্র-সংস্কৃতি ও বৃহৎ সংস্কৃতি বহু কাল ধরে বিরোধে মিলনে পাশাপাশি চলতে চলতে একসঙ্গে মিশেছে।"[১৩০]

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির মধ্যেও এই মিলনাত্মক ভাবপ্রবণতার পরিচয় মেলে। ধর্মীয় দীক্ষার অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যা নিবিড়ভাবে অনুসরণীয়। ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নয়, ধর্মনীতিতেও দেখা যায়। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা তা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সম্প্রদায়ের সাধনমার্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। আয়তনিকদের পন্থা জ্ঞানমার্গ, শোণপাংশুদের পন্থা কর্মমার্গ এবং দর্ভক পল্লীবাসীদের পন্থা ভক্তিমার্গ। এদের চিন্তাভাবনা ও বৈষম্যবিভাগের সাথে আধুনিক মনন বিশ্বাসকে অভিষিক্ত করা হয়। এবং এভাবেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির সত্য স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন।

অচলায়তনে পুরপ্রাচীরের নিশ্ছিদ্র বাতারবণের মাধ্যমে একটা দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস সম্ভব হলেও সদ্ভাব-সম্প্রীতি সৃষ্টির কোনো উপায় নেই। অথচ প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। এবং অবস্থানগত গুরুত্বও বহন করে থাকে। "অচলায়তনে তিন জাতের ভূমিকা আছে। 'স্থবিরক (অর্থাৎ উচ্চবর্ণ), 'দর্ভক' (অর্থাৎ শূদ্রবর্ণ) এবং শোণপাংশু (অর্থাৎ ম্লেছ)"[১৩১] এই অবস্থানগত সামাজিক সংস্কৃতি মূলত ভারতীয় ঐতিহ্যেরই স্মারক-সাক্ষ্য বহন করছে। এর মধ্যেই যুগে যুগে বহিরাগত জাতি-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং সমন্বয়ক্রিয়ার মেলবন্ধন সম্ভবপর হয়ে ওঠে। প্রাচীন স্থবিরক ভারতীয় জীবনে নতুনের আগমন জয় জয়কাররূপে অভিনন্দিত হতে থাকে। এবং সেখানে তারুণ্য ও যুগোপযোগী প্রগতি স্পৃহা বিশ্রাম-বৈরাগ্যনিষ্ঠ ও জড়িমাগ্রস্ত ভারতবর্ষে নবপ্রাণের বার্তা বয়ে আনে। "প্রাচীন অচলায়তন, শোণপাংশু নবাগত জাতি-যাহাদের সহিত সংঘর্ষে বারংবার পুরাতন প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আর গঠনশীল ভারতবর্ষ বারংবার নূতন করিয়া বৃহত্তর করিয়া জীবনগণ্ডী রচনা করিয়া তুলিয়াছে। কারণ ইতিহাসের বিচিত্র উপকরণকে একীভূত, অঙ্গীভূত করিয়া জীবনগণ্ডী রচনা করিয়া সভ্যতা গঠনের শক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে স্বাভাবিক।"[১৩২] রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে এই মিলনমুখী বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি এই জাতিগত সম্মিলনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে

তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।"[১৩৩] রবীন্দ্রনাথ এহেন ভেদবুদ্ধিপ্রবণ মানসিকতাকে বারবার বিদ্রূপবাণীতে কষাঘাত করেছেন। তিনি মনে করেন, সবরকম জড়ত্ব ও বিচ্ছিন্ন বিপর্যয়ের মূলে এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা। এ দেশের পরাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়হীন বিপন্নবাধা আচারসর্বস্ব পুরুপ্রাচীরই জিইয়ে রেখেছে। ফলে জাতীয় মুক্তিকামনার সর্বানুগ স্বপ্ন-কল্পনা বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে। যা এদেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। সেখানে বহুবার জনগণ সকলের মুক্তির লক্ষ্যে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারিত হতে দেখা যায়। "একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন–

যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন। স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনো বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না। কেন বলবেন না, আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা তারা সকল দিক থেকে আসুক। দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি।"[১৩৪] এই সর্বতোমুখী মিলনসাধনাই 'অচলায়তন' নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যা মূলত ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রতিরূপ-প্রতিচ্ছবি বলে চিনে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' নামক প্রবন্ধে অনুরূপ একটা বিষয়ের উপর বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। তিনি সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতিরই উত্তরসাধকরূপে অবতীর্ণ হন। এবং বিশ্বব্যাপী দেশকাল-নিরপেক্ষ অখণ্ড মনুষ্যত্বের সাধনায় ভারতবাসীকে আহ্বান জানান। "বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য– এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য বাধামুক্ত করতে চাই।"[১৩৫] এছাড়া 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেণিগত বিভেদ-বৈষম্য ও এর অন্তর্গত উৎকট রূপপ্রকৃতি নিয়ে বাস্তবসম্মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি সব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভাবসম্মিলন সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। এবং এর বাস্তবসম্মত উপযোগিতা নিয়েও বেশ যৌক্তিক মতামতসমূহ তুলে ধরা হয়। "আর্য-অনার্য বা হিন্দু-বৌদ্ধ অভিঘাতে কোনো পক্ষকেই নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা হয় নি। মুসলমান অভিঘাতের ক্ষেত্রেও সেই কথাই প্রযোজ্য। এই দুই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মাঝখানে এমন একটি মিলনবিন্দুর সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে এই দুই সমাজই এসে মিলতে পারত এবং মিলতও। নানকপন্থী কবীরপন্থী বা নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব সমাজ এর দৃষ্টান্তস্থল। আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান সকলেই এসে মিলিত হয়েছে।"[১৩৬]

'অচলায়তন' নাটকের ঐক্যবিস্তারের পটভূমিকায় ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের অনুরণন পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মচিন্তায় এই ঐক্যানুভবের দর্শনদীক্ষা গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মে জীবনের যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একাত্ম অনুভবে মান্য করা হয়। এমনকি কোনো গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় নি। ভগবদগীতায় জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির শৃঙ্খলাস্থাপনের মাধ্যমে পুরো মানবসমাজে একটা সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এভাবে জীবনের একটা সর্বানুগ-সার্বজনীন রূপাবয়ব ফুটিয়ে তোলার জন্যই শাস্ত্রকারগণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সপ্রসঙ্গ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়– বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে। তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই– ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।"[১৩৭] কিন্তু যুগে যুগে এই মিলনমাধুর্যের সুষম পথকেও কতিপয় মুখোশধারী সুবিধাভোগী বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এরা মানবসমাজকে স্বার্থপ্রবুদ্ধ জড়ত্বের কারাগারে নিক্ষেপ করতে চায়। সুস্থ-স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক জীবনের গতিপথ বিপন্ন করে তোলে। এমনই অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুগে যুগে ত্রাণকর্তারূপে গুরুর আবির্ভাব ঘটে থাকে। 'অচলায়তন' নাটকেও অনুরূপ একটা প্লটসংঘটন গড়ে তোলা হয়েছে। "ইতিহাসেরই সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখনই গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন।"[১৩৮] এবং এর ফলেই সমাজের যত অসঙ্গতি-অনাচার ক্রমান্বয়ে দূর হয়েছে। 'অচলায়তন' নাটকেও এই অন্ধ

আচারপরায়ণ সমাজজীবনের প্রতিবিম্ব লক্ষণীয়। এই যুক্তিহীন আচার সংস্কার যুগে যুগে ভারতবাসীকে নির্লজ্জভাবে শোষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এরই আলোকে 'অচলায়তন' নাটকের ভাবদর্শন ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। যা তাঁর এদেশীয় সংস্কৃতিরই অন্তরনিষ্ঠ পরিচয়ের স্মারকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকের ঘটনাস্থলের নাম স্থবিরপত্তন, রাজার নাম মন্থরগুপ্ত ও আবাসিকদের নাম অচলায়তনিক বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে মূলত প্রাচীন ভারতবর্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রকৃতিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ আবহকল্পনায়ও জড়তাগ্রস্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্রকল্প ফুটিয়ে তোলেন। বিশেষত, ধর্মের বিকৃত-বিকার ও অসারত্বকে উপস্থাপন করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আচারসর্বস্ব বাহ্যিক ধর্মকর্ম কখনো মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এর মাঝে জ্ঞান ও মননশীলতার সেতুবন্ধন অপরিহার্য। এর ফলে আচরণিক পরিবর্তনে পরিশুদ্ধ জীবনে উত্তরণই ধর্মের মূল লক্ষ হওয়া উচিৎ। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ কাব্যিক ব্যঞ্জনার দীপ্ত অভিব্যক্তিতে উচ্চারণ করেন-

> "হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
> ধর্মমূঢ়জনের বাঁচাও আসি।
> যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
> ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে
> ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
> এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"[১৩৯]

রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে ধর্মাচারের অন্ধ মোহকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে যৌক্তিক ব্যাখ্যায় তুলে ধরেন। এছাড়া সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীদের সমালোচনা সত্ত্বেও তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। এবং ধর্মের গূঢ়তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতপন্থা নিরূপণ করতে সক্ষম হন। "অচলায়তন প্রকাশিত হলে যে ক্ষোভ নানাস্তরে প্রকাশ পেয়েছিল তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ অমল হোমকে লেখেন- 'ধর্মের নামে যে বিরাট কারাগার আমরা আমাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্দীশালা থেকে আমাদের সংস্কারকে, অভ্যাসকে মুক্তি দেবার আহ্বানই অচলায়তনের আহ্বান।"[১৪০]

'অচলায়তন' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির একটা পূর্ণাবয়ব নাট্যসংস্থান ফুটিয়ে তোলতে সক্ষম হন। শত-সহস্রব্যাপী এদেশীয় সংস্কৃতি বহিরাগত বিভিন্ন সংস্কৃতি-সমবায় নিয়ে গড়ে ওঠে। অস্ট্রিক-মোঙ্গলদের মূলধারার সাথে যুগে যুগে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, মোগল, পাঠান ও খ্রিস্টান জাতির রক্তধারা অঙ্গীভূত রূপ লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালি তার নিজস্ব মনন-সত্তা কখনো ত্যাগ করতে পারে নি। এই বৈশিষ্ট্য এদেশের জাতিগত ঐতিহ্যের মধ্যে নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যা আজও প্রতিনিয়ত নব নব মাত্রাযোগে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকে বাঙালি সমাজের এই মূলীভূত সংস্কৃতিরই চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলতে সক্ষম হয়েছেন।

'ডাক্‌ঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ একটা স্বল্পাবয়ব পরিধির মধ্যে অতীন্দ্রিয় গীতিমধুর সুরলোক সৃষ্টি করেছেন। নাটকের ঘটনা-প্রবাহ, পাত্রপাত্রী ছাপিয়ে একটা অদৃশ্য সম্মোহ-সংরাগ বিস্তৃত হয়ে আছে। ফলে কাহিনী ও চরিত্রের সরলরৈখিক উপস্থাপনায় নাটকীয় গুণাবলি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ পায় নি। প্রধান চরিত্র বালক অমলের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিসরের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত। অমলের সুদূরের প্রতি আগ্রহ ও অকাল পরিণতিকে মূলভাব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট একটা ছকপথেই অমলের যাবতীয় জীবনধর্ম আবর্তিত হতে থাকে। এর মধ্যে অদৃশ্য একটা বিধিলিপি যেন অমলকে টাইপচরিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। জীবনঘনিষ্ঠ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, বিরহ-মিলন তথা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের লক্ষণ এখানে অনুপস্থিত। সামান্য পরিসরে একটি রুগ্ন অসহায় বালকের সুদূরে মিলিয়ে যাওয়ার আর্তি পুরো নাটকের করুণ আবহ তৈরি করেছে। বালক চরিত্রের এই আর্তি-অভিপ্রায় মূলত জীবাত্মা পরমাত্মার রূপকাবহে পরিকল্পিত। অমল এখানে জীবাত্মার প্রতিনিধিরূপে পরমাত্মার সাথে মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছে।

'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির একটা অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি তুলে ধরেন। জীবাত্মা-পরমাত্মারূপী স্রষ্টা ও সৃষ্টির লীলাবিলাসে ভারতবর্ষের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ ভরপুর। বেদ, উপনিষদ, বৈষ্ণব, ভাগবত পেরিয়ে তা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিরই যথাযথ রূপকাররূপে 'ডাকঘর' নাটকে আবির্ভূত হন। এই নাটকের প্রধান চরিত্র অমল- কাহিনী-বিস্তার, প্রবাহ-পরিণতি ও প্রতিপাদ্য ভাবদর্শন মূলত এর উপরই নির্মিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্ম-অনুভব মূলত প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলেই সম্ভব হয়ে ওঠে । প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে প্রতিনিয়ত তিনি এক প্রচ্ছন্ন মহাশক্তির আহ্বান শুনতে পান । এই অনুভূতিসঞ্জাত কাব্যিক অভিব্যক্তি তাঁর প্রায় প্রতিটি সৃষ্টিকর্ম আচ্ছন্ন করে রয়েছে । 'ডাকঘর' নাটকটিও এর বাইরে নয় । বরং বলা যায়, এই অনুভবের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে । "রবীন্দ্রনাথের 'মানসীর' 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় এই ভাবের আভাস আছে । 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় শুধু পৃথিবী নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই যোগ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । 'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় একই ভাবের রূপায়ণ দেখিতে পাই । 'পূরবী'র 'মাটির ডাকে'র মধ্যে ইহার আরও নিবিড় রূপ দেখিতে পাই । এই ভাবটি টুকরা টুকরা হইয়া কবির বিভিন্ন যুগের আরও অনেক কবিতার ভিতরে ছড়াইয়া আছে ।"[১৪১] এই প্রকৃতিপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে জন্মের পরপরই নিবিড়ভাবে পেয়ে বসে । নীল আকাশ, সাদা মেঘ, তরু-লতা, নদ-নদী, ময়ূরের নাচ, রাখালের বাঁশি, সুদূরের আহ্বান তথা অদৃশ্য এক প্রচ্ছন্ন শক্তির উপস্থিতি সবসময়ই তাঁকে উন্মনা করে রাখত । রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল । ... সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতর মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত ।"[১৪২] 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রের মধ্যেও এই আত্মগত আর্তি-অনুভব লক্ষণীয় । যা মূলত রবীন্দ্রনাথেরই ব্যক্তিক অনুভবের সংরাগ-সংহতি নিয়ে গড়ে ওঠেছে ।

রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রের ভাববিন্যাসে প্রাচীন শাস্ত্র-সংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন । সেখানে বলা হয়, স্রষ্টা তাঁর অস্তিত্ব অংশ থেকে মানবাত্মা সৃষ্টি করে আপন লীলা উদযাপন করে চলেছেন । মানুষও একদিন যাবতীয় পার্থিব লীলাবিলাস সমাপ্ত করে স্রষ্টা বা পরম ব্রহ্মের সাথে মিলিত হবেন । এবং এভাবেই স্রষ্টা-সৃষ্টি বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিশ্বলীলার সাথে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছেন । "উপনিষদে আছে আত্মার লক্ষ্য ব্রহ্ম, ওঙ্কারের ধ্বনিবেগ তাকে ধনুর মতো লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয় ।"[১৪৩] স্রষ্টা সৃষ্টির এই বিরহ মিলন প্রসঙ্গ পবিত্র কোরানের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে । সৃষ্টি ও স্রষ্টার দ্বৈত তত্ত্বই ইসলামের মূল ভিত্তি । আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে দাস (আব্‌দ) ও প্রভুর (রব) । নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যেই এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব (ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাহি রাজিউন) । রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় বৈষ্ণবদর্শনের অধ্যাত্মভাবনায় বরাবরই সম্মোহ প্রকাশ করেছেন । বৈষ্ণব ধর্মে জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলাপ্রসঙ্গ রাধা কৃষ্ণের রূপকাবহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত । 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্রের অদৃশ্যলোকে মিলিত হবার আকুতি এই বৈষ্ণবীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয় । "বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে একটি আকুলতা, একটি করুণ বেদনাঘন পরিবেশের পরিচয় পাই । এই বেদনার আলিম্পন বৈষ্ণবতত্ত্বের মধ্যেই নিহিত । সেই তত্ত্বে বলা হইয়াছে, ভক্ত ও ভগবান নিত্য প্রেমের সম্পর্কে সন্নিবিষ্ট । নিত্য মিলনের প্রয়াসে উভয়ের নিবিড় প্রেমের পরাকাষ্ঠা । ভগবানের সহিত লীন হইয়া যাইবার সাধনাই ভক্তের সাধনা । যতক্ষণ ভক্ত মিলিত হইতে পারিতেছে না, ততক্ষণ তাহার কেবল ছুটিয়া চলা, কেবলই উধাও হইবার মন্ত্রে বেদনার্ত ক্রন্দনের কলরোল । রাধা ও কৃষ্ণের রূপাশ্রয়ে ভক্ত-ভগবানের নিত্য-বিরহ, নিত্য-মিলনের অপরূপ আধ্যাত্মিক লীলা কীর্তিত হইয়াছে ।"[১৪৪]

উপনিষদের বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঘুরেফিরে এর মধ্যেই প্রাণের খোরাক খুঁজে পেয়েছেন । তিনি জন্মাবধি উপনিষদের অধ্যাত্ম আবহে বেড়ে ওঠেন । পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রাহ্মধর্ম সুবাদেই উপনিষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান । রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই গভীর শ্রদ্ধাবিষ্ট চিত্তে উপনিষদ পাঠ শুরু করেন । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

"বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল । সবকিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে । শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো ।"[১৪৫] এর ফলেই রবীন্দ্ররচনায় উপনিষদ প্রভাব সবচেয়ে বেশি আবিষ্কার করা সম্ভব । 'ডাকঘর' নাটকের মূলদর্শন তথা অমল চরিত্র সৃষ্টির পেছনেও উপনিষদের প্রভাব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ।

'ডাকঘর' নাটকে বন্দি অমল নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন মহাশক্তির আকর্ষণ-অনুভব করেন । এবং এর মাধ্যমেই মুক্তির সন্ধান করে সারাজীবন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকে । অর্থাৎ, প্রকৃতির মাধ্যমে এক অদৃশ্যলোকে হারিয়ে যাবার জন্যই অমলের এই ব্যাকুলতা । এক অদৃশ্য শক্তির মোহমগ্ন আনন্দ-ভালোবাসায় অমল ভেসে চলে বারবার ।

"অমল । আমাদের জানলার কাছে বসে সেই দেখা যায় আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই ।"[১৪৬]

... ...

"কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা

ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব।"[১৪৭]

অমলের এই চলে যাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক সবিশেষ দর্শনভাবনা লুকিয়ে আছে। এখানে দেখা যায়, অমল এমন এক দেশে যাওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ করে- যে দেশ থেকে আর কেউ ফিরে আসে না-

"অমল। ... আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই। যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।
প্রহরী। সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা।"[১৪৮]

এই অনন্তলোকের যাত্রাপথে অদৃশ্য রাজা বা ব্রহ্ম ডাকঘরের মাধ্যমে অমলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। রাজা ডাকঘর বসিয়ে রাজকবিরাজ পাঠিয়ে ভালোবাসার অর্ঘ পাঠিয়ে দেন। অমলও রাজার প্রতিনিধিরূপে চিঠি বিলি করার কাজে নিয়োজিত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এবং এক সময় এই অদৃশ্য রাজা বা ব্রক্ষের মাধ্যমেই চিরতরে হারিয়ে যায়। সেখানে অমল ব্রক্ষরূপী বিশ্বসত্তার সাথে একাকার হয়ে পড়ে। উপনিষদের যত্রতত্র এই ভাবের বহুবর্ণিল রূপপ্রকৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। "উপনিষদের মধ্যে প্রথমে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিবার এবং সেই আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়া সর্বব্যাপী 'এক'কে অনুভব করিবার কথা এবং সেই সর্ব্বব্যাপী 'এক'-এর ভিতর দিয়াই আবার সব কিছুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে সব কিছু হইয়া যাইবার কথা বহুভাবে পাই।"[১৪৯]

প্রকৃতির নানা লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যা উপনিষদের পাতায় পাতায় বারবার বহুবার এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হয়েছে। "স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা তস্য লোকাঃ স উ লোক এব (বৃহদারণ্যক॥৪॥৪॥১৩)। তিনি বিশ্বকৃৎ, তিনি এই সবকিছুর স্রষ্টা, বিশ্ব তাঁরই এবং তিনিই বিশ্ব।"[১৫০] 'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই সার্বভৌম ব্রহ্ম প্রকৃতির বহুভঙ্গিম রূপরেখা অমল চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করেন। এখানে প্রকৃতি রাজ্যের মধ্য দিয়ে এক অদৃশ্য ব্রক্ষের অবস্থিতি-আহ্বান অমলকে উন্মনা করে তোলে। সৃষ্টিজগতের অংশই এই অনিবার্য আহ্বানে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া, ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন- আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া। জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।"[১৫১]

'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির কিছু মূলীভূত ভাবদর্শন ফুটে ওঠেছে। এর মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত মরমী সুফি সাধক কবিগণের আন্তরিক সামীপ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিশেষত, ফারসি কবি মৌলানা জালালুদ্দিন রুমীর সাহিত্য চিন্তার সাথে এর অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মহাকবি রুমীর বিশ্বনন্দিত কাব্য মসনবীর কিছু ভাবানুভব 'ডাকঘর' নাটকে গভীরভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছে। 'মসনবী' কাব্যে আত্মার প্রেমময় মুক্তিসাধনার আকুলতাই মূল ভাব হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই আকুলতা মূলত স্রষ্টার সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় মিলিত হওয়ার সাধনায় কাব্যরূপ লাভ করেছে। "রুমী তাঁর কাব্যের প্রথমেই বলতে চান 'আমি মানুষ, আমার পরম প্রিয়তম স্রষ্টার সান্নিধ্যে অনন্তকাল লীন হয়ে পরম সুখে ছিলাম। যেদিন আমাকে সেই পরম প্রিয়ের সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত করে দূরে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিন হতেই আমার হৃদয়ের আর্তনাদ, সেদিন হতেই আমার কান্না, আমি প্রিয়তমের কাছে ফিরে যেতে চাই। কবির ভাষায়-

যে বিষাদঘন মুহূর্তে আমার বিচ্ছেদ ঘটে বেণুবন হতে
সে হতেই আমার বিলাপের সূত্রপাত।
সেই বিচ্ছেদ- মুহূর্ত থেকেই আমার ক্রন্দন রোল
বিশ্ব মানবের হৃদয়তন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলছে
যত অব্যক্ত বেদনার শিহরণ"[১৫২] (মসনবী, বংশী বিলাপ)

এই ভাবের বশবর্তী রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটক ছাড়াও অন্যান্য বহু সৃষ্টিকর্মে নিজেকে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ একটি গানের মধ্য দিয়ে বলেন,

"তুই ফেলে এসেছিস কারে মন, মনরে আমার
তাই জনম গেল শান্তি পেলি নারে মন
মনরে আমার।"[১৫৩]

গানটিতে প্রিয়সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকুল আর্তনাদের ভাব অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের অজস্র কাব্যকথা ও চিঠিপত্রে এই ভাবের প্রতিফলন লক্ষণীয় মাত্রায় ফুটে ওঠে। ছিন্নপত্রের একটা বিস্তৃত অংশ জুড়ে এই ভাবেরই প্রতিফলন অন্তরনিষ্ঠ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের অনেকস্থলেই এই ভাবের প্রতিফলন লক্ষণীয়-

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।"[১৫৪]

'ডাকঘর' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল তথা প্রতিপাদ্য ভাবদর্শনের মূলে এই ভাবই নিবিড়ভাবে কার্যকর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসাধনায় ব্রহ্মের সাথে মিলন-বিরহ-অভিসার ভাবনায় প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন। প্রকৃতিবিশ্বের মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মের মহিমময় অবস্থান প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ব্রহ্মকে পেতে চাইলে সেই প্রকৃতির সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 'ডাকঘর' নাটকে অমল চরিত্র প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। প্রকৃতিনিষ্ঠ মানবমনের এই আকুলতার ভাবটি রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকেই আহরণ করেছেন। উপনিষদের ভাষ্যমতে, ব্রহ্ম আদিতে এক ছিলেন। পরে বিশ্বসৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে বহুবিচিত্ররূপে প্রকাশ করেন। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই। সেখানে বলা হয়েছে পূর্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেন, আমি বহু হব, আমি জন্মগ্রহণ করব। তিনি তপস্যা করলেন এবং তপস্যা করে এই সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তাদের সৃষ্টি করে তিনি তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করে সত্তাবান ও সত্তাহীন রূপ ধারণ করলেন, বিশেষ বস্তু হলেন ও নির্বিশেষ হলেন, আশ্রিত ও অনাশ্রিত হলেন, চেতন ও অচেতন হলেন। সোহকাময়ত॥ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত॥ স তপস্তপ্তা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিং চ॥ স তৎ সৃষ্টা॥ তদেবানু প্রাবিশং॥ তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ নিরুক্তং চানিরুক্তনং চ॥ নিলয়নং চানিলয়নং চ॥ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ (তৈত্তিরীয়॥ ২॥ ৬)"[১৫৫]

'ডাকঘর' নাটকে প্রকৃতি-পিয়াসী অমল চরিত্র উপনিষদের আলোকে গড়ে তোলা হয়েছে। পার্থিব জীবনে বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে অবরুদ্ধ অমল প্রকৃতির মাধ্যমেই মুক্তির সন্ধান পেলেন। রাজারূপী ব্রহ্ম প্রকৃতিলগ্ন বালক অমলকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এতে উপনিষদ তথা ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতির নিবিড় প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। এই পৌরাণিক সংস্কৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকে কিছু বৈষয়িক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন চরিত্র ও সমাজ সংস্কৃতির রূপময় দৃশ্য চিত্রিত করেন। যেমন, মাধবদত্ত, মোড়ল, দইওয়ালা, পাহারাদার প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে এদেশীয় বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-সংস্কৃতি ভাষা খুঁজে পায়। এবং এদের মাধ্যমেই প্রাত্যহিক সমাজ বাস্তবতা অত্যন্ত চমৎকার নাটকীয় ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়। যা ভারতবর্ষের চিরায়ত-প্রবাহিত সংস্কৃতিরই অনিবার্য অংশবিশেষ– এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

সময় ও সমাজ সত্যকে স্বীকরণ করেই 'মুক্তধারা' নাটকের জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়ে ওঠে। বৃটিশশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের শোষিত-বঞ্চিত সীমানাকে নাটকীয় পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বৃটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী উৎকট শাসন-শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, বঞ্চনা-প্রতারণা বিভিন্ন রূপকাবহের মাধ্যমে চিত্ররূপ লাভ করেছে। এ ছাড়া সমসাময়িক বিশ্বের যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ-দুর্দশা, দীনতা-দুর্বিপাক, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, রাজনীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি অবস্থার সফল নাট্যরূপ মুক্তধারা নাটকে অভিব্যক্তি লাভ করে। এতসব বাস্তবতা সত্ত্বেও 'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের সমূল সংস্কৃতির কাছেই দ্বারস্থ হন।

'মুক্তধারা' নাটকে উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ মুক্ত জলস্রোতের উপর বাঁধ নির্মাণ করে। শিবতরাইবাসীদের পদানত-অনুগত করে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রকৃতিদত্ত এই জলস্রোত বন্ধ হলে শিবতরাই জনপদে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। সেখানে দুর্ভিক্ষ-দুর্বিপাক জনজীবনে একটা হাহাকার সৃষ্টি করে। এবং এর ফলেই নাটকীয় কাহিনির মূলস্রোত অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। মূলতঃ 'মুক্তধারা' নাটকের যাবতীয় নাট্যসংস্থান জল সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। কাহিনী, চরিত্র, সংঘাত, সমন্বয়, পরিণতি– সবই মুক্তধারার জলস্রোতকে অবলম্বন করেই অভিব্যঞ্জনা লাভ করে। ভারতবর্ষীয় ভূখণ্ড জলের দেশ হলেও জলের সমস্যাও কম নয়। অথবা, জলসমস্যাকে কেন্দ্র করে এদেশে যুগে যুগে রটনা-ঘটনাও কম সংঘটিত হয় নি। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ জলপ্রবাহের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি ও ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ভৌগোলিক কারণেও জলাভাব ও জলাধিক্য এদেশের মানুষকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তাদের সার্বিক জীবনাচারের ভিত্তি-বৈভব এর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই ধারাবাহিকতার ঐতিহ্যবাহী জীবন-সংস্কৃতি আজও অব্যাহত রয়েছে। এখনও এদেশে জলের অভাব ও অতিরিক্ত জলের প্রবাহে জনজীবন ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। কখনো বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন মানুষের জীবনে ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনে। আবার কখনোবা খরা, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, মৃত্যু মানুষের জীবনে সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনে। মূলত জল-সমস্যা প্রাচীনকাল থেকেই

এদেশের সংস্কৃতিতে একটা অনিবার্য অংশরূপে স্থান দখল করে নেয়। আবার ভারতীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতিতে জলের মহিমময় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। তবে জলের অভাবই ভারতীয় জীবনে বারবার মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করে তোলে। 'মুক্তধারা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ সমস্যার আলোকেই শিবতরাইবাসীদের জীবনচিত্র উপস্থাপন করেছেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শাস্ত্র-সংবেদে শাস্ত্রকারগণ জলকে বিভিন্নভাবে মহামহিমরূপে অভিব্যক্তি দান করেছেন। তাঁরা জলের কল্যাণকর রূপকে বিনম্র চিত্তে বরণ করে নিয়েছেন। সেখানে মা-মাটি-মাতৃভূমির সাথে জলকেও একাত্ম ভাবনায় অভিষিক্ত করা হয়। "ঋষি বলেছেন– হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের যোগ্য করো। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য-দূরকারী এই জল মাতার ন্যায় আমাদের পবিত্র করুক... মন্ত্রে আছে ঃ আপো অস্মান্ মাতর ঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক।"[১৫৬] পবিত্র কোরানে সৃষ্টিরহস্যের অন্তর্মূলে পানির সর্বৈব প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। "আমি পানির সাহায্যে যেমন কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে নানারূপ ফুল ফল ও শস্য জন্মাইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিয়া থাকি সেইরূপভাবে আমি মানুষের জীবনকে নানাভাবে কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে সুশোভিত করি এবং পরে উহা বিলীন ও নিশ্চিহ্ন করিয়া থাকি"(সুরা ইউনুছ-২৪)। "তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ যে, আমি সমস্ত চেতন পদার্থ ও জীবজন্তুকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি" (সুরা আম্বিয়া-৩০)। সৃষ্টিজগতে সর্ববিধ উৎপত্তির মূলে পানির এই প্রভাব শাস্ত্রকারগণ বারবার উল্লেখ করেন। অথচ এই জলসমস্যাও বাংলার জীবনযাপনকে যুগে যুগে বহুবার বিপন্ন করে তোলে। বিশেষত, গ্রামবাংলায় এই দুর্বিষহ চিত্ররূপ মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়। রবীন্দ্রনাথ উত্তরবাংলায় অবস্থানকালে জলের এই তীব্র সংকট বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশেষ করে পল্লীবাংলায় জলের অভাবে মেয়েদের করুণ অবস্থা তাঁকে বারবার ব্যথিত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি যে গ্রামের কাজে হাত দিয়েছিলুম সেখানে জলের অভাবে গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হলে গ্রাম রক্ষা করা কঠিন হয়।"[১৫৭] রবীন্দ্রনাথ জলের এই দুর্লভ প্রাপ্তি ও এর ভয়াবহ পরিণতি বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে প্রত্যক্ষ করেন।

তিনি এই অসঙ্গত জীবনের বিপদাশঙ্কা দূর করার জন্য কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন। এবং এ ব্যাপারে দেশের আপামর জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়াসী হন। লেখালেখি, গণসংযোগ, সমবায়-সমিতি প্রভৃতি মাধ্যমে তিনি সবাইকে উৎসাহিত করে তোলেন। এবং জলের সাথে এ দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনিবার্য সম্পর্কের কথাটিও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিতে জলের মহিমময় অবস্থানের কথা ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করেন। "একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুণ্য কাজ বলে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে। কলেরা, ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারও কল্পনাও করা যায় না।"[১৫৮] পল্লী সংস্কৃতির এসব সেবামূলক কাজের সাথে একটা অধ্যাত্ম-অনুভবও জড়িত ছিল। মানুষ এসবের সাথে পুণ্যব্রতী মহান আত্মার অবস্থানকে একাত্মভাবনায় কল্পনা করে নিত। ফলে এসব কর্মকাণ্ডে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অংশগ্রহণ করত। "যারা সেকালে কীর্তি অর্জন করতে উৎসুক ছিল, যাঁরা উচ্চ পদস্থ ছিলেন, তাঁদের উপর দেশের লোক দাবি করেছে। তাঁরা মহাশয় ব্যক্তি– তাঁদের উপর জল দেবার, মন্দির দেবার, অতিথিশালা করে দেবার, আরো অন্যান্য অভাব মোচন করবার দাবি করেছি তাঁদের পুরস্কার ছিল ইহকালে কীর্তি ও পরকালে সদ্গতি। এখানকার দিনে তার ফল এই দেখতে পাই গ্রামের লোকেরা এখন পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে কে এসে তাদের জলদান করবে– জলদান পুণ্যকর্ম, সে পুণ্যকর্ম কে করবে। অর্থাৎ তাদের বলবার কথা এই আমাদের জলদান দ্বারা তুমি আমার উপকার করছ সেটা বড়ো কথা নয়। তুমি যে পরকালে পুরস্কার পাবে সেজন্য তুমি করবে।"[১৫৯] এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বক্তৃতা-বিবৃতি বা সমবায়-সমিতি নয় বিশ্বভারতীর মাধ্যমে জলাশয় প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসব অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জলের সুমহান সহাবস্থানের কথা বারবার উচ্চারিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ সালে ভুবনডাঙা গ্রামে এক জলাশয় প্রতিষ্ঠা উৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি এই উৎসবের মাধ্যমে একটা ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি-বোধ সবার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছেন। "সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে পুকুরটিকে খনন করে নির্মল জলের সম্বলকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এই জলাশয়-প্রতিষ্ঠা সেবার বর্ষামঙ্গল উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়।"[১৬০] উৎসবকে প্রাচীন শাস্ত্রের কিছু মন্ত্রপাঠ দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়েছে। এবং এর মাধ্যমে সেখানে একটা পৌরাণিক সংস্কৃতির আবহ-অবয়ব সৃষ্টি হতে থাকে। এসব মন্ত্র উচ্চারণে সর্বজীবের কল্যাণের মাধ্যমে সেখানে সার্বজনীন আবেদন

তৈরি করা হয়। যাতে এদেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক অন্বয়-অনুষঙ্গ প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানের কয়েকটি মন্ত্র নিম্নরূপ :

"জল-প্রশস্তি॥ বৈদিক

...   .

শং নো দেবীরভষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং ববৃথং তন্বে মম
জ্যোক চ সূর্য্যাং দৃশ্যে
শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সম্স্ত্বনূপ্যাঃ
শং নং খনিত্রয়া আপঃ শিবাঃ নঃ সম্স্তু বার্ষিকীঃ॥

এই দিব্য জল আমাদের ইষ্টকল্যাণ হউক, পানের জন্য কল্যাণময় হউক, ইহা আমাদের জন্য মঙ্গল ও আরোগ্য বহন করিয়া আনুক।

হে জল, আমার শরীর হইতে সবরোগ দূরে রাখ, আমার শরীরস্থ সর্বরোগের ভেষজ (আরোগ্যকারী) হও, আমি যেন চিরকাল জীবিত থাকিয়া সূর্যকে দেখিতে পাই।

জলহীন কঠিন দেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণকর হউক, সজল প্রদেশের জল আমাদের কল্যাণকর হউক খননের দ্বারা প্রাপ্ত জল আমাদের কল্যাণকর হউক, বর্ষণ সংগৃহীত জল আমাদের কল্যাণকর হউক,

...   .

জল-উৎসর্গ॥ তান্ত্রিক
প্রীয়ন্তাং মনুজা নিত্যং প্রীয়ন্তাং ভূমিগাঃ খগাঃ।
লতাবনস্পতিবৃক্ষাঃ প্রীয়ন্তাং জলবাসিনঃ॥
কীটাঃ পতঙ্গা যে চান্যে দৃষ্টাদৃষ্টাশ্চ প্রাণিনঃ।
ভূতা বৈঃ ভাবিনঃ সর্বে প্রীয়ন্তাং সর্বজন্তবঃ॥

এই জলে মানবগণ নিত্য প্রীতিলাভ করুক, ভূমিগ ও খগগণ প্রীতিলাভ করুক, লতা বনস্পতি বৃক্ষ ও জলবাসী জীবগণ সকলেই তৃপ্তি লাভ করুক।"[১৬১]

মুক্তধারা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রকে বঞ্চিত জনতা শিবতরাইবাসীর প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রটির মধ্যে সাধারণ জনগোষ্ঠির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, নির্মোহ-নিস্পৃহ জীবনব্রত প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ধনঞ্জয় বৈরাগী হাসি-খুশি মুক্ত জীবনানন্দের অধিকারী শুদ্ধ পুরুষ হিসেবে সকলের কাছেই প্রিয়। চরিত্রটির এই সার্বজনীন আবেদন পুরো কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাছাড়া এই চরিত্রের কথাবার্তা, চলন-বলন, প্রাণনা-নির্দেশনা ও অন্যান্য ব্যবহারের মধ্যে একটা অধ্যাত্ম-আবেদন সম্মোহ ভাবনা সৃষ্টি করে চলে। ফলে এই চরিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম একটা বিশেষ ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ মূলত ধনঞ্জয় চরিত্র রূপায়ণে প্রাচীন ঋষি, কবি, সাধু ও সন্ন্যাসজাতীয় চরিত্রের দ্বারস্থ হন। তাঁদের সংযত আদর্শ-অন্বেষা ও পরিশুদ্ধ জীবনই এই চরিত্রের ভিত্তি নির্মাণ করে দেয়। আদর্শ জীবনচর্যা-ভিত্তিক এই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ আজীবন একটা আকর্ষণ অনুভব করেন। যা তাঁকে সারাজীবন সৃজনব্যক্তিত্বরূপে গড়ে ওঠতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে তাঁর দেশপ্রেমের অন্তর্মূলে এই ভাবাদর্শের অনুরণন লক্ষণীয়। এ পর্যায়ে মূলত উপনিষদের উদাত্ত-গাম্ভীর্য সুস্থিত প্রত্যয়বোধই রবীন্দ্র দেশপ্রেমে পরিশ্রুত রূপ লাভ করেছে। "রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম উপনিষদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট ঔপনিষদিক আত্মপ্রত্যয়ে দেশকে ভালোবাসার শপথ নিয়েছিলেন জীবনের প্রথম প্রত্যুষে। ... রবীন্দ্রনাথ মর্তের মাধুরী আকণ্ঠ ভরে পান করেছেন। মর্তের মানুষকেও তিনি ভালোবেসেছেন হৃদয় দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম স্বদেশপ্রেমের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। একদিকে উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে তাঁর যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তেমনি হিন্দু মেলার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন দেশ-মুক্তি কামনার জ্বলন্ত প্রেরণা।"[১৬২] বেদান্ত দর্শনের এই সংস্থিত সংস্কৃতির প্রত্যয়দীপ্ত আদর্শ দ্বারাই ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্র গঠিত। এই চরিত্রের সাথে অনেকে আবার মহাত্মা গান্ধীর সুগভীর সাদৃশ্য খুঁজে পান। মহাত্মা গান্ধী ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের মাধ্যমে খৃস্টান ধর্মের অহিংসনীতি গ্রহণ করেছিলেন। এদিক থেকে দেখতে গেলেও ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্র নির্মাণে একটা ধর্মীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি সক্রিয়

রয়েছে। প্রাসঙ্গিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "খৃষ্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়। ... মহাত্মা নম্র অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে। তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে।"১৬৩ মহাত্মা-সম্পর্কিত এসব রবীন্দ্ররচনার সাথে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রের গভীর সাজুয্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, এই চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় আবহ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুষঙ্গকেই প্রয়োগ করেছেন।

'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ একটা সবিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। এর বিষয়বস্তু, বাণীভঙ্গিমা, উপস্থাপনা, রুচিবোধ– সব মিলিয়ে দর্শক সাধারণের মনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনা সৃষ্টি করে। এর অভূতপূর্ব মঞ্চ সাফল্য সমকালীন সমাজে আলোড়নের ঝড় তোলে। এই ধারাবাহিকতা আজও সমানতালে অব্যাহত আছে। 'রক্তকরবী' নাটকের মূল চরিত্র নন্দিনীর মাধ্যমে চিরায়ত প্রেম ও প্রাণশক্তির আহ্বান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। তাছাড়া ভারতীয় কৃষি সভ্যতার ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই নাটকের পরিণাম নির্দেশিত। এসব উদ্দেশ্য-অম্বেষাকে শিল্পরূপ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এখানে সমকালীন সমাজ সমস্যাকে স্থান দিয়েছেন। পশ্চিমের বস্তুসর্বস্ব পুঁজিনিরুদ্ধ সমাজের অন্তর্গত গতিপ্রকৃতি প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। পশ্চিমের বস্তুপূজারী পুঁজিপতিদের নিষ্প্রাণ সমাজসত্যকে 'রক্তকরবী' নাটকে আবহরূপে ব্যবহার করা হয়। এবং এভাবেই রবীন্দ্রভাবনায় নাটকীয় চমৎকারিত্ব বেশ সাফল্যের সাথে অভিব্যক্ত হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ভাবভাবনার সম্মিলনে ভারতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী জড়সর্বস্ব সমাজজীবনে তারুণ্য ও প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এর প্রভাবে নিরেট-নিষ্প্রাণ মকররাজ থেকে শুরু করে রাজ্যের সবাই এক অনাস্বাদিত সুখ-সরোবরে ভেসে যায়। নন্দিনীর অফুরন্ত প্রাণবন্যায় দুর্বার প্রেমের আকর্ষণে সবাই ভেসে চলে। মকররাজ জালের আড়াল ছেড়ে ধ্বজাদণ্ড ভেঙে চুরমার করে নন্দিনীর সাথে যোগদান করেছে। এবং জড়ত্বের কারাগার ভেঙে প্রাণ-প্রতীক নন্দিনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। "রাজা। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক সম্পূর্ণ মারুক– তাতেই আমার মুক্তি।১৬৪ তারুণ্য-লীলার প্রতীক নন্দিনী জড়-যান্ত্রিক জীবনের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। লুব্ধ চেষ্টার নিঃসাড় জীবনে নন্দিনী অনন্ত প্রাণ-প্রণোদনা সঞ্চার করে দেয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "নন্দিনী এল প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"১৬৫ তবে 'রক্তকরবী' নাটকে প্রত্যক্ষ সমাজবাস্তবতা থাকলেও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুষঙ্গই মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

'রক্তকরবী' নাটকে কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের মূলে নন্দিনীর প্রাণশক্তি সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রাণ-প্রেরণা মূলত উপনিষদের আলোকেই পরিকল্পিত। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে পণ্ডিত শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর নিকট বলেন, "উপনিষদ বলেন, প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই, হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কে কবে মারতে পেরেছে? আমার ঘরের কাছে একটি লোহালক্কড়জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়েছিল। ওটা চাপা দেবার সময়ে দেখতে পাইনি, পরে লোহাগুলি সরিয়ে আর চারাটুকুর খোঁজ পাওয়া গেল না। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহার জালজঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠেছে একটি লাল ফুল বুকে করে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত দেখিয়ে সে মধুর হেসে প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এলো। সে বললো, ভাই মরিনি তো, আমাকে মারতে পারলে কই? তখন আমার মনের মধ্যে এই বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরী', 'নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার তৃপ্তি হয়নি, তাই নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।"১৬৬ উপনিষদে ব্রহ্ম, আত্মা, প্রাণ, মায়া, প্রেম প্রভৃতিকে এক অখণ্ড-অন্বয় দ্বারা এক অদৃশ্য মহাশক্তির অঙ্গীভূত করা হয়েছে। মানুষের এসব স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস প্রবৃত্তিকে ঋষি-কবিগণ সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই মানবজীবনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা অখণ্ড চেতনাবোধ অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। উপনিষদের মতে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড আত্মা প্রবহমান রয়েছে। মানুষ এই আত্মার অংশীরূপে বাঁধা আছে। এবং এই অদৃশ্য বাঁধনের ফলেই মানুষ প্রতিনিয়ত স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করছে। "বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, জায়ার নিকট যে পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয়, পতির কাছে যে জায়া প্রিয় হয় তা জায়ার কারণে নয় ইত্যাদি। তিনি বলেছেন তারা প্রিয় হয়, তার কারণ সকলকে ব্যাপ্ত করে একই আত্মা বর্তমান আছেন (ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভব্যারনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া

ভবত্যারনন্তু কামায় জায়া ইদং সর্বং যদয়মারা। বৃহদারণ্যক॥ (৪ ॥ ৫ ॥ ৭)।"[১৬৭] এই অখণ্ড আত্মার উন্মীলন প্রকাশে 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনীকে অবলম্বন করা হয়েছে। যা ভারতীয় সংস্কৃতিরই স্মারকরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব। এছাড়া নন্দিনীর মাধ্যমে নারীপ্রেমের পথ বেয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাস্ত্র সংস্কৃতির দ্বারস্থ হন। কারণ, ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রে নারীর প্রেমকে আদিম, অকৃত্রিম ও কল্যাণের প্রতিভূরূপে মান্য করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে। বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে। ... সে জীবধাত্রী, জীবনপালিনী, তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত।"[১৬৮] প্রাণের এই সার্বভৌম অবস্থিতি নিয়ে উপনিষদে গুণকীর্তনের অন্ত নেই। এই অখণ্ড প্রাণকণিকার বিচিত্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও উপনিষদের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। "জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে। নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ, আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অনুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন– যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম, বিশ্বে এই যা-কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃদপিণ্ডেও তেমনি, ঠিক একই সুরে একই তালে।"[১৬৯] এই মহাজাগতিক প্রাণকণিকার প্রতিষ্ঠাই 'রক্তকরবী' নাটকে অন্তর্গত প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল রয়েছে। নন্দিনী চরিত্রের মাধ্যমে যা নাট্যরূপ লাভে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা মূলত ভারতের ঔপনিষদিক সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষ ও ব্রহ্মের অখণ্ড স্রোতধারায় একই মূলশক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। তাঁর সুবিস্তৃত শিল্পকর্মে এই ভাবেরই কাব্যিক ব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। জীবনের প্রথম দিককার কাব্যরচনায়ই তিনি এই অনিঃশেষ প্রাণপ্রবাহের জয়গান গেয়েছেন। মহাবিশ্বে সংঘটিত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ, অভিসার-অন্বেষা, অবস্থিতি-পরিস্থিতি তথা শত-সহস্র বিপর্যয় বিপত্তির মূলে এক অনন্ত মহাপ্রাণ সক্রিয় রয়েছে,

"যুগযুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই, সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা-উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শুন্যতায়?
... ...
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।"[১৭০]

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন যাত্রাপথে প্রাণের অস্তিত্বই সৃষ্টি রহস্যের মূল উৎস হিসেবে পরিগণিত। মহাবিশ্বের রূপ-রস-মূল্যমান প্রাণশক্তির তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। মহাবিশ্বের অনাদি-অনন্ত সময়সীমানায় পৃথিবীতে প্রাণের মাধ্যমেই একটা মেলবন্ধন রচিত হয়েছে। এবং এই নিঃসীম পরিক্রমায় মনুষ্যপ্রাণের ইতিহাস রচিত হতে থাকে,

"ওই চাঁদ ওই তারা ওই তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হল, বিরাট হল, সম্পূর্ণ হল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে।"[১৭১]

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ জড়মূর্ত সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ভারতীয় কৃষ্টি সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এবং এই প্রাচীন সংস্কৃতির একটা আবহ-অবয়ব নাটকটির পরিণামী ভাবনা সৃষ্টি করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ভারতীয় কৃষি সংস্কৃতির একটা ঐতিহ্যিক রূপপ্রকৃতি তুলে ধরেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "কৃষি-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা

পড়ছে। নইলে গ্রামের পঞ্চবটছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষীরা চিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।" 'রক্তকরবী' নাটকে গ্রামীন সমাজ-সংস্কৃতির একটা সম্মোহ ভাবনা শেষ পর্যন্ত অভিব্যঞ্জিত হতে থাকে। কারণ, ভারতীয় সভ্যতা মূলত গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে। এ দেশের যাবতীয় সমাজ সংস্কৃতির উপাদান গ্রামই ধাত্রীরূপে প্রতিপালন করে আসছে। "যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করেছে।"[১৭২] এই গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশই আমাদের জাতিগত স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে। এর ঐতিহ্যিক বিবর্তনের ধারাপরম্পরায় ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ণয় করা সম্ভব। এবং এর মাধ্যমেই আমাদের একটা স্বচ্ছ-সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। "গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রয়োজনও ছিল কম। সরল কৃষিনির্ভর সমাজের যেটুকু প্রয়োজন তা গ্রামেই উৎপাদিত হতো। কোনো গ্রাম থেকে বাড়তি উৎপন্ন দ্রব্য যে শহরে বিক্রির জন্যে না যেত তা নয়। শিল্পজাত দ্রব্যও পণ্য হিসেবে বাজারে বেচা-কেনা হত, রপ্তানি হত। তবে মোট উৎপাদনের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। সাধারণত: গ্রামের যা প্রয়োজন তা গ্রামের শিল্পীরাই তৈরী করতো। হাল আর বলদ, আখ মাড়াই যন্ত্র, চরকা আর তাঁত সাধারণত এই ছিল প্রধান যন্ত্র। যে সময় থেকে বাঙলা দেশের ইতিবৃত্ত মোটামুটি জানা যায়– অর্থাৎ খ্রীস্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতক থেকে। সে সময় থেকে একেবারে ইংরেজ শাসন দৃঢ়মূল হওয়া পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রাম্য উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তনই হয় নি।"[১৭৩]

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বহুবিধ প্রয়াস-পদক্ষেপ বাস্তবতার নিরিখে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, জল, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পল্লীবাংলাকে সমুন্নত করতে চেয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি এই গ্রাম ও কৃষি। মূলত কৃষিই এদেশের গ্রামীণ সমাজকে একটা সুষম সম্প্রীতির মিলনবিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দেয়। যা এখনো কালের সাক্ষীরূপে দীপ্যমান রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কৃষিবিদ্যায় জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমা থেকে বহুল পরিমাণে মুক্তি" সম্ভব করলে সমাজের বহু লোকের মধ্যে জীবিকার মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্মক্ষেত্রে ঘোষণা করলে– আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্য সমাজ, কত বড়ো মূল্যবান বলে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণ রেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ করে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।"[১৭৪]

'রক্তকরবী' নাটকের পরিণামদর্শিতায় এই ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যিক রূপময়তাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাটকটির পরিণতি-প্রণোদনা ও দর্শনগত ভাবনার মূলে কৃষি ও শস্যশ্যামল গ্রাম সংস্কৃতির ভাবভাবনাই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। "রক্তকরবীতে পৌষের ডাকে প্রকৃতির ও শস্যময়ী ধরিত্রীর আহ্বান জানিয়ে কবি পূর্বজীবনে মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ্যগুলির অতিপ্রিয় আকর্ষণ উদবোধিত করতে চেয়েছেন।"[১৭৫]

রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটকে বার্ধক্যকে পেরিয়ে চিরযৌবনের অনন্ত স্রোতের জয়গানই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যু কখনো জীবনের সমাপ্তিসূচক নির্দেশিকা নয়। বরং অন্য একটি রূপরূপান্তরের সোপান মাত্র। 'ফাল্গুনী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মাধ্যমে অমরত্বের জয়গাথা নাটকীয় ভাবব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকে অন্ধ বাউল বলে–

> "যারা মরে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে
> দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে– আমরা পথের বিচার করিনি
> আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি– আমরা ছুটে এসেছি,
> আমরা ছুটে বেরিয়েছি।"[১৭৬]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রসঙ্গক্রমে নাটকটির আলোচনায় বলেন, "বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র এ কাদের পত্র? যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে তারাই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আকড়ে থাকতে পারত, তাহলে জরাই অমর হত– তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর সর শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে।"[১৭৭] রবীন্দ্রনাথ এখানে মৃত্যুর মাধ্যমে এক অখণ্ড জীবনচেতনার কথা ব্যক্ত করেন। যাতে অখণ্ড আত্মার অনন্ত প্রাণকণিকা ক্রিয়াশীল রয়েছে। 'ফাল্গুনী' নাটকের মূল দর্শনগত ভাবনার মূলেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রতত্ত্বের এই ভাবপ্রবণতার মূলে ভারত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ-প্রণোদনা সক্রিয় রয়েছে। বিশেষত, উপনিষদের মধ্যে এর প্রাণবন্ত প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনেও সবসময় এক অখণ্ড আত্মার সংলগ্ন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মনে করেন, সৃষ্টির উষালগ্নের এক মাহেন্দ্রক্ষণ থেকেই এই আত্মার যাত্রাপথ সূচিত হয়েছে। এর ফলেই জগতের সবকিছু গভীর এক কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ। যার কোনো শুরু বা শেষও নির্দেশিত করা সম্ভব নয়। কেবলই এক অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারার-গতিশীল প্রাণ-প্রবাহে সবকিছু বয়ে চলেছে। এতে জীব, জড় ও অন্যান্য প্রতিটি অনু-পরমাণুর মধ্যে এক অবিনাশী আত্মার প্রাণস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এর ফলেই জগতের সবকিছুর মধ্যেই এই সজীব আত্মার প্রতিফলন অনুভব করেন। এবং এ কারণেই জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে ঐক্য সাদৃশ্য বিরাজমান বলে তিনি মনে করেন। যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকেও গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পদ্মা জীবনের স্মৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেন, "I live in eternity"। এই অখণ্ড আত্মিক অনন্ত জীবনবোধসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত। বিশেষ করে 'ছিন্নপত্র' যুগের রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব চমৎকার এক ভাবব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়ে ওঠে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে ভারতীয় ঐতিহ্য-অনুষঙ্গ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত ঔপনিষদিক সংস্কৃতি ভাবনাই অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়। উপনিষদের প্রভাবেই তিনি জাগতিক বিশ্বের মধ্যে এক প্রাণলীলার গতিশক্তি প্রত্যক্ষ করেন। যা অনেক সময় গতিবাদের তত্ত্বরূপ নিয়েও অনেক লেখায় অভিব্যক্ত হয়। 'ফাল্গুনী' নাটকেও এই গতিলীলার ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি-অনুষঙ্গ নিবিড়ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

জন্ম-মৃত্যু ছাপিয়ে জাগতিক বিশ্বে এক অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বয়ে চলেছে। এই গতিশীলতার কথা উপনিষদের ঋষি-কবিগণ বারবার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা জীবনকে কোনোক্রমেই খণ্ডিত সীমায়তি দ্বারা নির্দেশ করেন নি।

> "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাং সর্বংহি পশ্যঃ
> পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশ॥ ছান্দোগ্য॥ ৭ ॥ ২৬ ॥ ২
> অর্থাৎ, যিনি যথার্থ দেখেন, তিনি মৃত্যু রোগ ও দুঃখ
> দেখেন না। যিনি যথার্থ দেখেন তিনি (অখণ্ড ভাবেই)
> সব দেখেন এবং সর্বতোভাবে অখণ্ডকে পান।"[১৭৮]

উপনিষদের অন্য একটি শ্লোকে আছে–

> "সম্ভতিং চ বিনাশং চ যস্ত্রদ্বেদোভয়ং স হ"
> বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভুত্যামৃতমশুনে॥ ঈশ ॥ ১৪

অর্থাৎ, যিনি তাকে (ব্রহ্ম) জানেন, তাঁর কাছে সম্ভূতি (প্রাণের ধারা) ও বিনাশ উভয়ই তিনি। বিনাশের মধ্য দিয়ে মৃত্যুশোক ভোগ করে সম্ভূতির বা প্রাণধারার অখণ্ডতা বোধের সাহায্যে অমৃত আস্বাদ করতে হয়।"[১৭৯]

এসব বাণী বিন্যস্ততার মধ্য দিয়ে ব্রহ্ম, প্রকৃতি, বিশ্ব ও মানবমনে অখণ্ড প্রাণের চিরন্তন ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই প্রবাহকে জন্ম-মৃত্যু কখনো স্তব্ধ করতে পারে না। বরং নব নব উদ্যমে গতিশীলতা দান করে। প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> "জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা
> যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।"[১৮০]

জন্মমৃত্যুর অনন্ত প্রবাহে মানবজীবনে এই অখণ্ড চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক আদর্শের আলোকে ব্যক্ত করেছেন। ভারতবর্ষীয় জীবনের এই প্রাচীন সংস্কৃতি রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। যা ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতায় আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের লেখায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যেমন, প্রাচীন শাস্ত্র 'ঋগবেদ' থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক রচনায় এই গতিসত্যের মর্মকথা প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনের এই সুমহান ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিকে 'ফাল্গুনী' নাটকে রূপায়িত করেন। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে এই অখণ্ড প্রাণের গতিসত্যকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোকে ইউরোপীয় যৌবনমত্ততার প্রতীকে ফুটিয়ে তোলেন। যেমন তাঁর 'বলাকা' (১৯১৬) কাব্যে এই মনোভাবেরই অন্তর্গত সত্যতা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পাই চরৈবেতি-র মর্ম সত্য। রবীন্দ্রনাথের বলাকায় এই গতিশীলতার তত্ত্বই পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্গসঁর-ভাবনার সঙ্গে সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। 'চরৈবেতি' মন্ত্রে গতিশীলতার যে আকুতি আছে পরবর্তীকালে কবীর-এর বাণীতে তারই প্রতিধ্বনি শুনেছেন ক্ষিতিমোহন। কবির বলেন– 'বহতা পানী নির্মল বন্ধ্যা গন্‌ধিলা হোয় অর্থাৎ যে জল বহিয়া চলে তাহা নির্মল থাকে বদ্ধ জল ওঠে পচিয়া।"[১৮১] তবে রবীন্দ্রভাবনার এই গতিতত্ত্বে কোনো ভাববাদী দর্শনদীক্ষা নেই। এর মধ্যে শুধুমাত্র ছুটে চলা আত্মার অবিরাম যাত্রাপ্রবাহকে

নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি জগৎপ্রাণের অখণ্ড স্রোতধারার উপর ভিত্তি করেই অনেক সৃষ্টিকর্ম সম্ভব করে তুলতে সমর্থ হন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, জগৎ, জীবন, প্রকৃতি তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব-প্রশ্নে এই গতিসত্য অনিবার্য। "পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়, এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায় মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন, তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও– জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক। প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।"[১৮২]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, জগতের অন্তর্গত ভাবদর্শনের মূলে এক নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতা প্রবহমান রয়েছে। এক অখণ্ড প্রাণশক্তি জগতের সবকিছু অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে চালিত করছে। এতে করেই পৃথিবীর গতিপথ ক্রমান্বয়ে পুণ্যের পথে এগিয়ে যায়। মানবজীবনও এর সাথে সুগভীর সম্পর্কসূত্রে জড়িত। এ জন্যেই মানবজাতিকে অবিরাম চলতে হবে। এবং এই চলার মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব-অংশ পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল। যা রূপ-রূপান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মহাকালের পথে অবিরাম প্রবহমান রয়েছে। এই প্রবহমানতাই জগতের সামঞ্জস্য-সৌষম্য রক্ষা করে থাকে। এবং মানুষও এর মাধ্যমে সম্পন্ন সমুন্নতিতে নিজেকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এভাবেই বলেন, পৃথিবীতে থেমে থাকা মানেই মৃত্যু। জড়ত্বের কারাগারে বন্দি হয়ে মৃত্যুবরণ করার শামিল। এতে পৃথিবীর আর সব গতিবেগ এই জড়ত্বভাবনায় কেবলই আঘাত করতে থাকে। ফলে তা একসময় বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এ অবস্থায় পৃথিবীতে অবিরাম চলার কোনো বিকল্প নেই। এতে করেই কালের অনাদি অনন্ত স্রোতধারায় নিজেকে অন্বিত করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ 'ফাল্গুনী' নাটক রচনায় এরকম একটা জাগতিক বিশ্বের অখণ্ড প্রাণপ্রবাহকে নাট্যরূপ দিতে প্রয়াসী হন। এই ভাবনার উৎস উচ্চারণ ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র-সংবেদ থেকে শুরু করে আধুনিক শিল্প-সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত। যা মূলত ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রাণধারায় গভীরভাবে প্রবহমান রয়েছে।

'কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ আবহ-অনুষঙ্গ হিসেবে রথযাত্রার মেলাকে অবলম্বন করেছেন। এবং নাটকের প্রতিপাদ্য দর্শনভাবনার মূলে ভারতবর্ষীয় শ্রেণিবৈষম্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এসব ভাবভাবনার কেন্দ্রভূমিতে মূলত এদেশীয় সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ঐতিহ্যধারা প্রাণসঞ্চার করেছে। এ ছাড়া নাটকের আদিগন্ত জুড়ে ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতির আবহ-আমেজ নিবিড়বাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। পরিশেষে নাটকে গণমানুষের মুক্তি মহোৎসবের মাধ্যমে পরিণতি দান করা হয়। ফলে 'রথের রশি' নাটকে বাঙালি সংস্কৃতির একটা প্রবহমান ঐতিহ্যধারা উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হয়ে ওঠে।

মেলা বাঙালি সংস্কৃতির অনিবার্য-অনুষঙ্গ হিসেবে যুগ যুগ ধরে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। যা অদ্যাবধি সমানভাবে অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পারিপার্শ্বিক প্রভাবে এর আঙ্গিক-উপাদানের কিছু তারতম্য ঘটলেও মেলা সংস্কৃতির অনিবার্য অংশরূপেই গৃহীত। গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে মেলাই ছিল বাঙালিপ্রাণের উৎসবমুখর মিলনকেন্দ্র। প্রাণের সহজ-সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে উপযোগী প্রাণদায়িনী মাধ্যম। ভারতবর্ষে বহুজাতিক সংকর সংস্কৃতির বৈষম্য ও বিদ্বেষপূর্ণ সমাজে মেলাই সহাবস্থান সম্প্রীতির প্রাণ রস যোগান দিয়েছে। এবং সমাজজীবনে সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে বহিরাগত বিভিন্ন জাতি স্বকীয় সত্তা ভুলে ভারত সংস্কৃতিকে একাত্ম অনুভবে আপন করে নেয়। এবং একসময় এদেশীয় রূপপ্রকৃতির মধ্যেই নিজেদের অস্তিত্ব দেখে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিভিন্ন রচনা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে মেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় নিমগ্ন হতেন। তাঁর অনেক সৃষ্টিকর্মে মেলার প্রাণবন্ত রূপাবয়বকে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এবং প্রসঙ্গক্রমে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশে মেলার উপযোগী উদ্দীপনার কথা বর্ণনা করেন। বাঙালি জীবনের এই ঐতিহ্যিক মেলার মাধ্যমেই জাতিগত বিকাশ ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব বলে মতামত প্রদান করা হয়। সপ্রসঙ্গ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়– তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ।"[১৮৩]

সনাতন ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতিতে মানুষে মানুষে উৎকট শ্রেণিসমস্যার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান প্রবহমান রয়েছে। 'রথের রশি' নাটকের কাহিনি-সংস্থান নির্মাণে অনুরূপ শ্রেণিসমবায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এই ঐতিহ্যিক শ্রেণিসমস্যার একপেশে আধিপত্য-আগ্রাসন নাটকীয় কাহিনির অন্তর্মূলে নিহিত রয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই অনাদিকাল থেকেই স্তরবহুল শ্রেণিবৈষম্য সতর্ক নিয়মানুসারে অনুসৃত হয়ে আসছে। যা কোনোক্রমেই বিন্দুবিসর্গ এদিক-সেদিক হবার উপায়

নেই। "এই সমাজের শ্রেণীভেদ এবং শ্রমবিভাগ ছিল পুরুষানুক্রমে সুনির্দিষ্ট। ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, জ্যোতির্বিদ, কর্মকার, চর্মকার, সূত্রধর সকলেই পালিত হত, 'at the expense of the whole community (The Capital Vol. l. Chapter-xiv, Section-4) এবং এক অলিখিত অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারেই। ব্যবস্থাটি ছিল এতই অনড় এবং দৃঢ়মূল যে ঘটনাচক্রে কোনো একটি গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় বিনষ্ট হলেও 'Spring up again on the spot and with the same name (ঐ)। রাজনৈতিক যে ঘূর্ণিঝড়ই উঠুক না কেন সমাজের অর্থনৈতিক উপাদান এবং উপাদানের শর্তগুলি পূর্বনির্দিষ্ট সূত্রানুসারেই অক্ষত এবং অপরিবর্তিত থেকে যেত।"[১৮৪] এই অনতিক্রান্ত বিধিবিধানের ফলেই সামাজিক অসঙ্গতি ক্রমান্বয়ে দানা বেঁধে ওঠে। অনাচার-অব্যবস্থা মানবজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এহেন অবস্থার প্রেক্ষাপটেই কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল যুগে যুগে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। ক্ষেত্রবিশেষে এরা স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে থাকে। এতে ধর্মান্ধ মানুষগুলো খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক বিভেদ-বৈষম্য ও শ্রেণিসংকটের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান জিইয়ে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। এ পর্যায়ে ধর্মের বিকৃত ও মনগড়া ব্যাখ্যায় তা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যুগে যুগে অবশ্য কখনোবা এই বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বিপ্লব-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু স্পর্শকাতর ধর্ম ও মোহমগ্ন ধর্মান্ধ মানুষদের জন্য তা কখনো নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। কারণ, ভারতীয় জীবনসংস্কৃতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মকে জীবনের উপরে স্থান দেয়া হয়। জীবনের প্রয়োজনে ধর্মের পরিশীলন-পরিচর্যা খুব অল্প ক্ষেত্রেই অনুসৃত হতে দেখা যায়। ফলে এই বর্ণবৈষম্য প্রথা ভারতীয় সংস্কৃতিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। "বর্ণভেদ ভারতভূমিতে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে, মানুষ মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল অস্পৃশ্য। ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ এবং আর্য সমাজ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। উচ্চবর্ণের প্রদত্ত বিধান অনুসারে নিম্নবর্ণের মানুষ বঞ্চিত হয়েছিল সামাজিক অধিকার থেকে। এমনকি ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ এবং মন্দিরে প্রবেশও ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ।"[১৮৫]

এই অনতিক্রম্য বর্ণভেদ প্রথা মূলত ধর্মধারীদের বিকৃত ধর্মব্যাখ্যার কারণেই অধিকতর বিস্তার লাভ করে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধ লোকবিশ্বাস ইত্যাদি কিছু মজ্জাগত অনুভূতি এই ধারাপরম্পরায় প্রাণরস সঞ্চার করে দেয়। এতে দেশের অধিকাংশ মানুষই রীতিমত জিম্মি হয়ে পড়েছিল। বিশেষত পল্লীবাসী জনসাধারণ ধর্মপালনসূত্রেই এই বর্ণবিভেদ প্রথাকে মনেপ্রাণে মান্য করে এসেছে। এ ক্ষেত্রে আচার-বিচার, ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, পাপ-পুণ্য বাছাই করার ক্ষমতাও লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে এহেন সমাজব্যবস্থায় একটা অস্তিত্ববিনাশী ধ্বংসাত্মক অবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "... বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না– সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না।"[১৮৬]

'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেণিবৈষম্যের বিলুপ্তি দেখিয়ে নাটকীয় পরিণতি নির্দেশ করেছেন। এবং গণমানুষের জয়জয়কার প্রদর্শনের মাধ্যমে এর কাহিনিসংস্থান প্রতিপন্ন করা হয়। অভিজাত শ্রেণির উপরে অস্পৃশ্য শূদ্রদের আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারটিও বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বণিক সম্প্রদায়ের একক আধিপত্য ও তার অবসানের ইঙ্গিত রূপকাবহের মাধ্যমে বর্ণিত। মহাকালের পরিক্রমায় এই বর্ণপ্রথার মিথ্যা অহমিকা-অসারত্ব প্রমাণ করার জন্যই শূদ্রদের আহ্বান করা হয়। এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে এদের অবস্থানকে অনিবার্য হিসেবে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বর্ণবৈষম্য প্রথার স্বরূপ-প্রকৃতি তুলে ধরেন। এবং ভারতবর্ষের এই ঐতিহ্যিক সামাজিক জীবনে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন। যা এদেশেরই সংস্কৃতি-স্মারকরূপে চিহ্নিত করা খুব সহজেই সম্ভব। যা তাঁর 'রথের রশি' নাটকেও বেশ অভিব্যঞ্জনার সাথে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বর্ণাশ্রম প্রথার রূপরেখা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যৌক্তিক ভাষাভঙ্গিমায় বলেন, "এক সময় আর্য সভ্যতা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ শূদ্রে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমে সেই ব্যবধান বর্ণাশ্রমধর্মের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণাশ্রম আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল না। সে যখন উচ্চ অঙ্গের মনুষ্যত্ব চর্চা হইতে শূদ্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল তখন ধর্ম তাহার প্রতিশোধ লইল। তখন ব্রাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম লইয়া পূর্বের মতো আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অজ্ঞানজড় শূদ্র সম্প্রদায় সমাজকে গুরুভারে আকৃষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শূদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই। কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল।"[১৮৭]

'কবির দীক্ষা' নাটিকার মূল বক্তব্য ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য-সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবটি ভারতীয় সংস্কৃতির সুগভীর ঐতিহ্য দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে নাট্যরূপ লাভ করেছে। বেদ, বাইবেল, গীতা, উপনিষদের অন্তর্গত ভাবদর্শনের মূলে অনুরূপ ভাবভাবনার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন

বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য-প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে এসেছে। মহাকবি কালিদাস তাঁর সৃজনমুখর কাব্যভাবনায় বহুবিধ চরিত্র সৃষ্টিতে এই ভাবেরই দ্বারস্থ হন। এমনকি তিনি ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ ও ভোগের বিচ্ছিন্ন ভাবনায় সামাজিক অমঙ্গলের আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যেও, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব। সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হইতে উদ্ধার পায়। অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি।"[১৮৮]

প্রাচীন ঔপনিষদিক সংস্কৃতির মধ্যে এই ত্যাগ ও ভোগের সুষম সমন্বয়ের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। যা ভারতবর্ষীয় সমাজ জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। জগতে যাহা কিছু চলমান পরিবর্তনশীল বিকারশীল তাহার সব কিছুই যে এক পরম সত্যের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ বিধৃত এবং পরিচালিত সেই কথাটিই উপলব্ধি করিতে হইবে। এই যে বহুর মধ্যে ব্যাপৃত বিশ্বসৃষ্টি ইহাকে চঞ্চল বা বিকারশীল বলিয়া ধিকৃত করিতে হইবে না। তাহাকে গ্রহণ করো, ভোগ করে – কিন্তু 'ত্যাক্তেন' ত্যাগের দ্বারা।"[১৮৯] এই বাণীবিন্যাসের প্রেক্ষাপটে উপনিষদ বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও তুলে ধরেছে। এর বাস্তবতা, উপযোগিতা ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপের কথা উপস্থাপিত হয়। এবং সেখানে বারংবার আত্মসংযমের পাশাপাশি আত্মভোগের বিচিত্র গতিরাগের প্রতি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। "উপনিষদে আত্মদমনের জন্যই শিক্ষা-অবস্থায় ব্রহ্মচর্যপালনের ব্যবস্থা ছিল। তা সন্ন্যাসের প্রস্তুতি নয়, গৃহজীবনের প্রস্তুতি। এ বিষয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায় সমাবর্তনের দিনে আচার্য আন্তবাসীকে উপদেশ দিচ্ছেন শিক্ষা সমাপ্তির পর সংসার আশ্রমে প্রবেশ করে বংশধারা অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থা করতে (আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মাব্যবচ্ছেৎসী) এখানে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার উপদেশটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনে ত্যাগেরও স্থান আছে, ভোগেরও স্থান আছে। শুধু ভোগ বা শুধু সন্ন্যাস সামগ্রিক কল্যাণ বা শ্রেয়ের পরিপন্থী।"[১৯০] রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে সারাজীবন এই ত্যাগ ও ভোগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যা তাঁর ব্যক্তি ও সমাজীবনে একটা সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করে দেয়। এছাড়া রবীন্দ্রসৃষ্টির অধিকাংশ বিষয় ভঙ্গিমায় এই ত্যাগ-ভোগের সমন্বয়-সহাবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনার পরতে পরতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রিয় প্রসঙ্গটি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি, এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ। ... সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে– এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তাহলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তাহলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তাহলে আমরা বিলুপ্ত হই। বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা।"[১৯১]

'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নাটকটি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অলৌকিক আবহ-অনুষঙ্গ দ্বারা পরিকল্পিত। কাহিনি ও চরিত্র পরিকল্পনায় ভারতবর্ষীয় সমাজ সংস্কৃতির স্মৃতিমুখর বিষয়ভাবনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরো প্লটসংস্থাপন জুড়ে রূপকথা রাজ্যের স্বপ্নিল পটভূমিকা বিস্তৃত হয়ে আছে। যা এদেশীয় সংস্কৃতিরই রূপাবয়ব নবতর অভিব্যঞ্জনা নিয়ে রবীন্দ্রনাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন, রাজপুত্র সদাগরপুত্রের সমুদ্রযাত্রা, অজানা দেশে গমন, ঘুমন্ত রাজ্যের ঘুমজাগানিয়া– প্রভৃতি প্রেক্ষিতের প্রবর্তনায় বাঙালিচিত্তের শেকড়বাহী সংস্কৃতিরই সাক্ষ্য বহন করে। বরং রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকে তা স্বকীয় ভাবকল্পনা সহযোগে আরো বেশি শিল্পসুন্দররূপে গড়ে তোলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী মহিমা দান করা হয়। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য সৃষ্টিকর্মেও ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিকে প্রগতি প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে একটা চিরন্তন গৌরব দান করেছেন। ফলে তাঁর প্রাচীন সংস্কৃতি ও অতীতচারী ভাবনাসমূহ জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেনে,

"হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে
... ...
হে অতীত তুমি গোপনে হৃদয়ে
কথা কও তুমি কথা কও।"[১৯২]

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন জীবন সংস্কৃতিতে আধুনিক চিন্তাচেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ফলে তা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য রূপরূপান্তরের মাধ্যমে সংহত হওয়ার সুযোগ পায়। যা রবীন্দ্রদর্শনের নান্দনিক মাত্রাযোগে একটা চিরন্তন আবেদন নিয়ে সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের এই ঐতিহ্যনিষ্ঠ বিনম্র ভালোবাসায় ভারতবর্ষীয় ভূখণ্ডের একটা সর্বানুগ সংস্কৃতি-স্বরূপ ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন, "গ্রহণ করেছেন অতীত ভারতের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ বাণী সম্পাদনে, তা সে ঋগবেদই হোক, কিংবা অথর্ববেদই হোক, অথবা তা সে উপনিষদই হোক, কি বুদ্ধের বাণীই হোক, প্রাচীন ভারতের যা কিছু মূল্যবান তার প্রায় সবই রবীন্দ্র নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মচিন্তা, তার জ্ঞান-কর্ম-অনুভব, প্রাচীন ভারতের নির্লোভ সারল্য, তপোবনের আদর্শ, সমূহ নৈতিকতা, প্রাচীন ভারতের সাধনা, তার সৌন্দর্যবোধ, ভারত সংস্কৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাহৃত ও পুনরুজ্জীবিত।"[১৯৩]

'তাসের দেশ' নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় কোনো নতুনত্ব নেই। ভারতবর্ষীয় জীবনের ধর্মসর্বস্ব জীর্ণশীর্ণ ও জড়মূর্ত অবস্থাকেই এখানে নাটকীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়। যন্ত্রবৎ একঘেয়ে গতানুগতিক জীবনের চিত্ররূপ অঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ এখানে অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায় আবির্ভূত। এতে নিয়মানুগ-নিস্প্রাণ জীবন থেকে মুক্তির আশ্বাস রাজপুত্রের মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে। শুধুমাত্র অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধানসম্বলিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই পুরো নাটকে রাজপুত্রের অভিযান অব্যাহত। মুক্তি কামনার এই জয়জয়কার রাজপুত্রের ব্যক্তিজীবন ছাড়িয়ে নাটকের অন্যসব পাত্রপাত্রীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। যা ভারতবর্ষীয় জীবনে ধর্মসর্বস্ব জড়বৎ অবস্থায় মনুষ্য-মহিমার বার্তা বয়ে আনে। এরকম একটা বিষয় ভাবনার উত্তরণ-রূপান্তর দেখিয়ে নাটকের পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাচেতনার মূলে এদেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতিই নানাভাবে প্রাণ সঞ্চার করে দেয়। 'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিকা বেছে নিয়েছেন। এখানে বাঁধাবুলির প্রাত্যহিক আড়ষ্টতায় জীবন পদে পদে বিপর্যস্ত। স্বকীয়-স্বাধীন চিন্তাভাবনার কোনো অবকাশ নেই। এ অবস্থায় রাজপুত্রের নবীনা-অন্বেষণ এবং নবীনার সাথে প্রাচীনের সংযুক্তি সংঘটিত হয়। যাতে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিভাবনায় প্রগতিশীল প্রাণনা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে। 'তাসের দেশ' নাটকের কাহিনিতে দেখা যায়– রাজপুত্র বুড়ো দেশের বুড়োমি থেকে পরিত্রাণ পেতে সদাগরপুত্রকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে আধুনিকতার স্রোতে আবগাহন করাই মূল উদ্দেশ্য–

> "রাজপুত্র। সবাই মিলে মনটাকে যেন বুলি-চাপা দিয়ে রেখেছে।"[১৯৪]
>
> ... ...
>
> "আমরা পড়েছি অসত্যের বেড়াজালে। নিরাপদের
> খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল।
> আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে।"[১৯৫]
>
> ... ...
>
> "বুড়োমানুষির সুবুদ্ধি-ঘেরা জগতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।"[১৯৬]

এহেন গৎবাঁধা গণ্ডিবদ্ধ চিরভ্যস্ত জীবন ছেড়ে রাজপুত্রের তাসের দেশে আগমন ঘটে। এই দেশটিও পূর্বোক্ত জীবনেরই ঘনপিনদ্ধ রূপমাত্র। এখানকার আচার-আচরণ অলসের বেড়া ও নির্জীবের গণ্ডি দিয়ে অবরুদ্ধ। এতটুকু নড়চড় বা প্রাণস্পন্দনের কোনো অবকাশ নেই। এ দেশের জাতীয় সংগীতের মধ্যেও অনুরূপ কৃষ্টি-সংস্কৃতির চালচিত্র ধরা পড়ে। যা মূলত ভারতীয় সংস্কৃতিরই রূপ-রূপান্তর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিত্রিত। সঙ্গীতটি নিম্নরূপ ঃ

> "চিড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন
> অতি সনাতন ছন্দে
> করতেছে নর্তন
> চিড়েতন হর্তন।
> কেউ-বা ওঠে কেউ পড়ে
> কেউ-বা একটু নাহি নড়ে।
> কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে
> করে কালকর্তন।
> নাহি কহে কথা কিছু,
> একটু না হাসে

সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা
নাই কোনো উলটা-পালটা
নাই পরিবর্তন।"[১৯৭]

এই অলস-অসাড় সমাজজীবনে রাজপুত্র-সদাগরপুত্র মিলে মানুষ হওয়ার মন্ত্র সঞ্চার করে দেয়। ফলে তাসজাতীয় প্রাণীগুলোর মধ্যে একসময় মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হতে থাকে। এবং একসময় মনুষ্যপ্রাণের স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে নিজেদের আন্তরিক সামীপ্য উপলব্ধি করে। তবে এদের নারীরাই প্রথম বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এবং তাসজাতীয় প্রাণিদের রাজ্যে তা ছড়িয়ে দেয় –

"দহলানি। কাল ভোর রাত্তিরের ঘুমে স্বপ্নে দেখলুম
হঠাৎ মানুষ হয়ে গেছি, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছি ঠিক
ওদেরই মতো।"[১৯৮]

... ...

"ময়ূর গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে। আজ
কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম
ছড়িয়ে দিয়ে।"[১৯৯]

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে ব্যক্তিজীবনে মন, মননশীলতা ও মনুষ্যত্ববোধকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। 'তাসের দেশ' নাটকেও পরিণাম-নির্দেশিকায় মনুষ্যত্ববোধেরই জয়জয়কার কীর্তিত হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। প্রাণপ্রবাহের সার্থক পরিণতি ও বিস্তরণ বিক্রিয়ায় মানুষের মনন-মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে। এর মধ্যেও সুদীর্ঘ ঐতিহ্য-অনুষঙ্গ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রবহমান রয়েছে। "পৃথিবীর এমন একদিন ছিল যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিণ্ড লইয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুযুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপরূপ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্যে তাহার স্থল জল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মানব সমাজেও মননশক্তি দ্বারা মনঃসৃষ্টি বহুযুগের এক বিচিত্র ব্যাপার। তাহার সৃষ্টিকার্য অনবরত চলিতেছে।"[২০০] প্রাণ ও মনের সুসংহত সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবজীবন পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। স্বার্থ ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এই জীবন সমৃদ্ধি-সমুন্নতিতে ভরপুর। এবং সৃজনশীল কল্যাণকামিতায় সতত নিবেদিত। এমনকি মনুষ্যত্ববোধের মনন-সৃজন দ্বারা তা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বৈশ্বিক মর্যাদা পেতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অনুরূপ জীবন-সাধন ব্রতভাবনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর এই ভাবভাবনার মূলেও ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি-সংহতি নিবিড়ভাবে প্রাণ-প্রণোদনা সঞ্চার করে দেয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ধম্মপদং গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ... গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলে আছে-

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেটঠা মনোময়া

চারুবাবু ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন– মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।"[২০১] রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে এই মনন-মনস্বিতার আলোচনায় নিজেকে স্পষ্ট করে তোলেন। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শাস্ত্র সংস্কৃতির নানামাত্রিক রূপরেখা উপস্থাপিত হয়। "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীয় মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন–

"তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।

তরুলতাও জীবনধারণ করে। পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।"[২০২] এই মননপ্রবণ' পরিবেষ্টিত জীবনই প্রকৃত জীবন। এ জীবন অন্তর্গত বিবেকবোধ ও নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খলা দ্বারা পরিশোধিত। বাহ্যিক যে কোনোরকম পরিস্থিতির মধ্যে তা অকম্পিত শিখার ন্যায় দীপ্যমান এবং এ সুবাদেই মানুষ তাঁর ব্যক্তিক আদর্শের কীর্তি মহিমায় জাগ্রত হয়ে ওঠে। যা মানবসমাজে যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে অবিনাশী ভাস্বরতায় বেঁচে থাকার স্পর্ধা করতে পারে। এ অর্থেই চিরায়ত মানবতার কাছে তা অনুকরণীয় দৃষ্টান্তরূপে বিবেচ্য হতে পারে। যাতে শেষপর্যন্ত সৃজনশীল-মননশীল মানুষেরই জয়জয়কার কীর্তিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনীষী কার্লাইলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন,

"অর্থাৎ, তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনন্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারি দিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অন্তররাজ্যকেই তাঁহার অস্তিত্ব, কর্ম-দ্বারা অথবা বাক্য-দ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অন্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন।"[২০৩] কিন্তু তবুও এই কাঙ্ক্ষিত জীবনাদর্শ ভারতবর্ষীয় জীবনে বারবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেখানে অসঙ্গত-অনাচার এসে মিথ্যা আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। আবার কখনোবা কিছু সম্মিলিত বিবেকবোধের প্রয়াসে এর উত্তরণও ঘটে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বিকৃত ধর্মবোধের অন্ধ শেকলে বাঁধা পড়ে। সেখানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মনন-মনস্বিতা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় সাংস্কৃতিক জীবনে এর যুগ-যুগান্তর প্রাদুর্ভাব-প্রবণতা আবিষ্কার করা মোটেই অসম্ভব নয়। বরং যুগে যুগে এই অসাড় ধর্ম বিকৃতিই এদেশের স্বতঃপ্রণোদিত বিকাশ-বিস্তার ও মননশীল সৃষ্টি পরিক্রমার গতিপথকে রুদ্ধ করে দেয়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুত্তলী যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে এক প্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি ভক্তি করি না, পূজা করি- চিন্তা করি না, কর্ম করি- বোধ করি না, অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভালো ও কোনটা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা– স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।"[২০৪] এ পর্যায়ে ভারতীয় ইতিহাসে আচারপরায়ণ হিন্দু সমাজই জীবনের যাবতীয় বিকাশকে ধর্মকারায় অবরুদ্ধ করে ফেলে। উৎকট শ্রেণিচেতনার বিচ্ছিন্ন ভাবনায় দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। এবং বৃহত্তর পৃথিবী প্রাঙ্গণ থেকে সরে এসে তারা কৃত্রিম ভাবনায় জড়ত্বের কারাগার গড়ে তোলে। "বৌদ্ধ পরবর্তী হিন্দু সমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে।"[২০৫] 'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যিক ভারতবর্ষীয় জীবনের চিত্ররূপ তুলে ধরতে সক্ষম হন। এখানে রাজপুত্রের নবীনা সন্ধানের মাধ্যমে এ দেশেরই সাংস্কৃতিক রূপরেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'তাসের দেশ' নাটকে জড়ত্বের পূজারী তাসজাতীয় প্রাণিগুলোর মধ্যে তাসানীরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অর্থাৎ, নারীরাই প্রথম জড়িমাগ্রস্ত কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন দেখতে থাকে। এবং এক পর্যায়ে রাজা, রানী তথা রাজ্যের সবাই এদেরই অনুসরণ করে। ফলে সবারই মননশীল-জীবনে উত্তরণ ঘটে। এ পর্যায়ে জড়ত্বের শেকল ছিন্ন করার পেছনে– নারীর ভূমিকা প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ দেশীয় সংস্কৃতিরই দ্বারস্থ হন। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র সংস্কৃতিতে নারীকে আদ্যশক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এবং সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের মাধ্যমে নারীর কল্যাণীরূপ চিত্রিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রাচীনকাল থেকে বাঙালি সমাজে মা এবং মাতৃশক্তির সম্মান সর্বস্তরে অব্যাহত রয়েছে। নারী একাধারে জন্মদাত্রী, স্তন্যদাত্রী, জীবপালিনী– সর্বোপরি প্রজননশক্তির আধাররূপে পূজিত হতেন প্রাচীন বাংলায়। তখন নারীর একটা সামগ্রিক শক্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এ পর্যায়ে নারী জাতিকে বলা হতো মাতৃকা জাতি। ক্রমান্বয়ে পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সামগ্রিক অর্থেই মাতৃজাতি পূজনীয়া এবং প্রগাঢ় ভক্তি প্রেমের বেদিস্বরূপ। সম্ভবত এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজে মাতৃদেবী ও ভক্তবালক এর উদ্ভব ঘটে। জন্মধাত্রী ও প্রতিপালিকা হিসেবে জননীর মর্যাদা লাভ করেন, 'ধরিত্রীমাতা' মা বসুন্ধরা। অতঃপর আদ্যাশক্তির প্রতিভূ নারীশক্তি এবং প্রজননশক্তির অধিকারিণী মায়ের একীভূত চেতনা মূর্ত হয় দেবীচেতনায়। এবং এর ফলেই মাতৃরূপী দেবীর বিগ্রহ নির্মাণের মাধ্যমে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে প্রাণকণিকার আশ্রয়-অবলম্বন নারীকে ঘিরেই রসস্ফূর্ততা লাভ করেছে। জীবের উদ্ভব, বিকাশ, লালন, স্নেহ-প্রেম ও বন্ধন-ভালোবাসায় নারীই জিইয়ে রেখেছে। এরকম চিন্তার মানসপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নিমগ্ন ছিলেন। "প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাহীন। সেই আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে।"[২০৬] পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার প্রার্থনা নারীর মধ্য থেকেই উৎসারিত। যা প্রকৃতি পুরুষের সাথে একটা মেলবন্ধন রচনা করে থাকে। এর মধ্যে সৃষ্টিধারার অব্যাহত অবস্থিতি বারবার নিজেকে খুঁজে খুঁজে পায়। "মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। বাতাসে লতার আন্দোলনের মতো, বসন্তের নিকুঞ্জে ফুল ফোটবার মতোই এই লীলা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত, চিন্তাক্লিষ্ট চিত্তের পক্ষে পূর্ণতার এই প্রাণময়ী মূর্তি নিরতিশয় রমণীয়। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে তা নয়, তাকে বলে দেয় তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদঘাটিত করে দিতে থাকে।... কর্মের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে এই শক্তিকে দেখি নে, ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ় শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তাকে কোথাও ধরা-ছোঁয়া যায় না। পুরুষের কীর্তিতে মেয়ের শক্তি তেমনি নিগূঢ়।"[২০৭] প্রকৃতির সৃষ্টিলীলাকে আত্মস্থ করেই তা অনুবিকাশের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। এবং প্রকৃতিও নারীর মধ্য দিয়ে আপনার প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করে থাকে।

"সৃষ্টি বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,
তুমি নারী,
তাঁহারি আপন সহকারী ।"[২০৮]

পৃথিবীর অধিকাংশ শাস্ত্রকারগণ নারীর ঐতিহ্যিক কল্যাণী রূপমাধুর্যকে অভিনন্দিত করেন । ভারতবর্ষীয় জীবনেও এই প্রবাহ-পরম্পরা অব্যাহত রয়েছে । তাঁরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ধারক-বাহক হিসেবে নারীর মনোময় ভূমিকাকে একটা ধারাবাহিক দৃষ্টিতে তুলে ধরেন । এবং পুরুষের সম্পন্ন সমাজ-সংহতি বিনির্মাণের মূলে নারীকে অনিবার্যরূপে প্রতিপন্ন করা হয় ।

"চন্দ্রবাবু তাঁহার 'হিন্দুপত্নী' প্রবন্ধে বলিয়াছেন, খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও माननीয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল । খ্রীষ্টধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল । 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ । যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতা সন্তুষ্ট হন ।"[২০৯]

'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে গ্রহণ করেছেন । নারীপ্রকৃতিকে কেন্দ্রীয় শক্তির আধাররূপে বিবেচনা করা হয় । তাসের দেশরূপী জড়পুত্তলিবৎ সমাজেও নারীর পথিকৃৎ-প্রবর্তনা দৃশ্যরূপ লাভ করেছে । যা ভারতীয় সংস্কৃতিরই অন্তর্গত রূপপ্রকৃতিরূপে এখানে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ।

'নটীর পূজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ সংস্কৃতির মনোরম-মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন । এখানে বৌদ্ধধর্মের একটা সার্বজনীন আবেদন-আহ্বান নাটকীয় চমৎকারিত্বরূপে বর্ণিত হয়েছে । এই ধর্মের দুর্বার প্রেমচেতনায় মানুষের সর্ব-সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় । হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটা দ্বন্দ্বমুখর প্রেক্ষাপট 'নটীর পূজা' নাটকে প্লট হিসেবে গৃহীত । বৌদ্ধধর্মের বিশ্বজনীন মানবমহিমার সামনে আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্ম প্রশ্নের মুখোমুখি হয় । নাটকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি লোকেশ্বরী চরিত্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বস্বভাব লক্ষণীয় । যাতে ভারতীয় সমাজজীবনে বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি স্বকীয় মর্যাদায় ফুটে ওঠে । এবং এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাব-প্রাচুর্য প্রতিপন্ন করা হয় । ভারতীয় সংস্কৃতিতে যুগে যুগে বৌদ্ধধর্মের সাম্য মৈত্রী করুণা আচারপরায়ণ হিন্দুধর্মের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে । এ কথা আজ ঐতিহাসিকভাবেই সত্য । 'নটীর পূজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ একটা অবস্থিতি-অন্বেষা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন ।

"বুদ্ধদেব যে চারটি আর্যসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'শূন্যং শূন্যম' এটি অন্যতম । এবং ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে মহাযান মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'শূন্যবাদ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যাহার মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন ভদন্ত নাগার্জুন । বুদ্ধদেবসম্মত এই 'শূন্যবাদের' স্বরূপ লইয়া পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের অন্ত ছিল না ।"[২১০]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের একটা ঐতিহ্যিক বিকাশ-বিবর্তন লক্ষণীয় । যুগ যুগ ধরে এর মানবিক মাহাত্ম্য-প্রচার শতধা বিচ্ছিন্ন ও ভেদসঙ্কুল সমাজজীবনকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে । এ পর্যায়ে সনাতন হিন্দুধর্মের উপরই বৌদ্ধধর্ম অধিকতরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় । ফলে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন এই ধর্মের প্রতি গভীর আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন । এবং এই মর্মে গভীর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয় । যা তাঁর জীবনব্যাপী সৃজনসাধনার পরতে পরতে জায়গা করে নিয়েছে । তিনি দীর্ঘকাল ধরে বৌদ্ধকাহিনি অবলম্বনে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, নৃত্যনাট্য, সংগীত ইত্যাদি রচনা করেন । বৌদ্ধধর্মের সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, অহিংসা, মানবতা শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয় । এসব সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যিক সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন । এবং মানুষের চিরায়ত প্রয়াস প্রবৃত্তিকে এর সাথে সমন্বিত করতে উদ্যোগী হন । বিশেষত, বৌদ্ধধর্মের মানবিক বোধ বিকাশের ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করে চলে । এই আদর্শবোধে তাড়িত হয়েই এর বহুভঙ্গিম প্রকাশ প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন । পাশাপাশি তিনি উৎকট শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তোলেন । দেখা যায়, এই ভেদরেখাসমন্বিত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব অব্যাহত রয়েছে । যুগে যুগে বৌদ্ধ বিকাশের এই মিলনাত্মক ধারাই ভারতীয় সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে । এবং সেখানে একটা উদার অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধ সৃষ্টি হতে থাকে । প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "বৌদ্ধধর্ম ... তাতে কেবলতো মঙ্গল দেখছিনে... মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে । মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে । অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয় । কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বড়ো । কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে

কেবলই দেওয়া। যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা– সেইটেই ব্রক্ষের স্বরূপ– তিনি নেন না। এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।”[২১১]

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে 'চণ্ডালিকা' ও 'নটীর পূজা'-তেই সংস্কৃতি ভাবনার কিছু ছিটেফোঁটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 'চণ্ডালিকা' নাটকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীনতম বর্ণাশ্রম প্রথার স্বরূপ-প্রকৃতি তুলে ধরা হয়। এর নেতি-নেতি ভাবপ্রবণ অমানবিক দিকটি তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে শেষপর্যন্ত বর্ণবিভেদ প্রথার সংকীর্ণ ও হীনমন্য প্রবণতাকে মানবিক মহিমায় অভিষিক্ত করেন। 'চণ্ডালিকা' নাটকে বুদ্ধ ধর্মের উদার মানবিকতার প্রতিনিধিরূপে বুদ্ধশিষ্য আনন্দ আবির্ভূত। এবং শ্রেণিবৈষম্যের উৎকট প্রথানুগত্যের প্রতিভূ হিসেবে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। প্রকৃতি স্বরচিত আত্মগ্লানির অন্ধ চেতনায় বিপর্যস্ত। নিজেকে নিজের মধ্যে প্রতিনিয়ত ক্ষুদ্রতমরূপে ভাবতে শিখেছে। কিন্তু বুদ্ধশিষ্য আনন্দের সান্নিধ্যে মানবতার বিশ্বজনীন বাণীর অসাম্প্রদায়িক বোধবুদ্ধি ফিরে পায়। প্রকৃতির এই আত্মবোধসমন্বিত বহিঃপ্রকাশ নারীবাদী বিকাশের অন্যতম অধ্যায় থেকে গৃহীত। বিশেষত, ঊনবিংশ শতকের সর্বতোমুখী রেনেসাঁর যুগে নারীর এই স্বকীয়-স্বাধীনতা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। যা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টিকর্মকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। 'চণ্ডালিকা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বর্ণপ্রথার সাথে আধুনিক চিন্তাচেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। যাতে বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যিক ধারা-পরম্পরা সংহত হওয়ার সুযোগ পায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে বর্ণবিভেদ সমাজ-সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রবহমান রয়েছে। এ পর্যায়ে আর্যদের আগমনের ফলেই তা প্রকাশ্য ও প্রকটরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। এবং ক্রমান্বয়ে এই উৎকট বিধিব্যবস্থা বহুবিস্তৃত দৃঢ়মূল ভিত্তিতে বাহুবিস্তার করে। “আর্যরা গোটা ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর আর্যকৃত সমাজে স্বীকৃত হয়েছে বর্ণাশ্রমের আদর্শ। বাঙালীর সমাজেও তাই হলো, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথার নামে যে প্রথা বাঙলায় চালু হলো সেখানে চতুর্বর্ণ নয়, দেখা দিলো নানারকম জাত। কথায় বলে বাঙালি হিন্দুদের ছত্রিশ জাত। আর বর্ণভেদ প্রথার নামে এই বিচিত্র জাত-ভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা এ দেশে বিকশিত হলো তা আজও প্রশ্নের উদ্রেক করে।”[২১২]

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্মই মানুষে মানুষে অলঙ্ঘনীয় বিভেদ-বৈষম্য তৈরি করে দেয়। এখানকার জাতিগত সমন্বয়ের প্রয়াস প্রবৃত্তিকে বারবার খণ্ডবিখণ্ড করে দেয়। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অস্বীকার করে তা বিকৃত পথে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ জীবনভর এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ধর্মবিধানকে নির্মম ভাষায় হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে আচারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে অধিকতররূপে দায়ি করা হয়।

'চণ্ডালিকা' নাটকেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ মানসিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। যাতে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অধ্যায় অনুষঙ্গ নিবিড়ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বর্ণভেদ প্রসঙ্গে কোনো এক আলোচনায় বলেন, “আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না– অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ?... আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নীচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে– শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নরনারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছে।”[২১৩]

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪০২

২. গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ও বাউলদের মনের মানুষের ধর্ম, শান্তিদেব ঘোষ, রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা– উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, ১৩৯৫, পৃ: ২০৫-৬ ।

৩. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১২৬

৪. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৭৯

৫. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, বাল্মীকিপ্রতিভা, পৃ: ৪১০

৬. মাইকেল- রচনাসম্ভার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ– ১৩৬৮, কলিকাতা, ১৫৩

৭. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৩৩

৮. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৮১৯-২০

৯. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৯৭

১০. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ: ৩৭২-৭৩

১১. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, দ্বি-সং– ১৩৮১, কলিকাতা, পৃ: ১০-১১

১২. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৯১

১৩. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪০৪

১৪. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, প্রাচীন সাহিত্য, পৃ: ৭১৮

১৫. বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা, সম্পাদনা– মাহবুবুল আলম, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮১, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা, পৃ: ১০৯ থেকে উদ্ধৃত ।

১৬. ঐ, পৃ: ৮৮ থেকে উদ্ধৃত ।

১৭. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সন্ধ্যাসংগীত, পৃ: ১৭

১৮. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গীতিমাল্য, পৃ: ১৫৭

১৯. ঐ, গীতালি, পৃ: ১৯৪

২০. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ধর্ম, পৃ: ৪৫৮

২১. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ক্ষণিকা, পৃ: ১৯৭-৯৯

২২. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৮০

২৩. ঐ

২৪. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, প্রকৃতির প্রতিশোধ, পৃ: ৩৬১

২৫. তদেব, পৃ: ৩৯১-৯২

২৬. রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, তৃ-সং– ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ১৩৩

২৭. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মানুষের ধর্ম, পৃ: ৬৫৯

২৮. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, কড়ি ও কোমল, পৃ: ২২১

২৯. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, সঞ্চয়, পৃ: ৫৭০-৭১

৩০. রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, তৃ-সং– ১৯৯৮, পৃ: ১৪৯

৩১. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মানুষের ধর্ম, পৃ: ৬৪৭

৩২. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৮৩

৩৩. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২২

৩৪. র-র, পঞ্চদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ঔপনিষদ ব্রহ্ম, পৃ: ১৬২

৩৫. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২১৭

৩৬. ঐ

৩৭. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১০৬-৭

৩৮. ঐ, পৃ: ১০৭

৩৯. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, স্মরণ, পৃ: ৩৩০

৪০. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৪১

৪১. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র– ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ৮৪-৮৫

৪২. রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্র-সং- ১৪০৫, কলিকাতা, পৃ: ১২৫
৪৩. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, কর্ম, পৃ: ৫৮২
৪৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৯৯, কলিকাতা, পৃ: ২৭৯
৪৫. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, প্রেম, পৃ: ৫৩৪
৪৬. ঐ, পৃ: ৫৪০-৪১
৪৭. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৪৭২
৪৮. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৫৪১
৪৯. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৪৫৬
৫০. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৫৪২
৫১. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা ও রানী, পৃ: ৫২৭
৫২. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৯, কলিকাতা, পৃ: ২৭৪
৫৩. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৬০
৫৪. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র- ১৯৮৩, কলি, পৃ: ৪৬
৫৫. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬১৮
৫৬. র-র, পঞ্চদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৬১
৫৭. ঐ, পৃ: ১৬২
৫৮. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৩১
৫৯. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ১৮৩
৬০. ঐ, পৃ: ৬১৯
৬১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চম সংস্করণ- ১৩৮৮, কলকাতা, পৃ: ২০৩
৬২. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, প্রাচীন সাহিত্য, পৃ: ৭১৯
৬৩. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, চিত্রাঙ্গদা, পৃ: ২৬৩
৬৪. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, প্রাচীন সাহিত্য, পৃ: ৭২৩
৬৫. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পরিচয়, পৃ: ৫৮৭
৬৬. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ধর্ম, পৃ: ৪৮৮
৬৭. অমেয় প্রেমের মন্ত্র, বুদ্ধের শরণ লইলাম, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্র-সং- ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ৩১৩ থেকে উদ্ধৃত।
৬৮. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পরিশেষ, বুদ্ধদেবের প্রতি, পৃ: ২০৫
৬৯. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, বিশ্বভারতী, পৃ: ২৫০
৭০. ঐ, পৃ: ২৬৬
৭১. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬১৮
৭২. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬০০
৭৩. ঐ, পৃ: ৫০৬
৭৪. ঐ, পৃ: ৫০৬
৭৫. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৮৪
৭৬. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, অবতরণিকা, প: ২৩
৭৭. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জন্মদিনে ৬-সংখ্যক কবিতা, পৃ: ৬২-৬৩।
৭৮. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শারদোৎসব, পৃ: ৩৭৯
৭৯. ঐ, পৃ: ৩৭৯
৮০. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ- ১৯৯৮, পৃ: ১৪৭
৮১. ঐ, পৃ: ১৩৪-৩৫
৮২. রবীন্দ্রনাথের দর্শনভাবনা, অমিয়কুমার মজুমদার, রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্র-সং- ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ২২৩ থেকে উদ্ধৃত।
৮৩. বৃহদারণ্যক ॥ ৪॥৪॥১৩, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র- ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ২২৪ থেকে উদ্ধৃত।
৮৪. শ্বেতাশ্বতর॥৪॥১৭॥ ঐ
৮৫. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৬৯
৮৬. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গীতাঞ্জলি, পৃ: ৮০

৮৭. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মানুষের ধর্ম, পৃ: ৬৩০
৮৮. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ধর্ম, পৃ: ৪৯৪
৮৯. ঐ, পৃ: ৪৯৪-৯৫
৯০. রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু, সুকুমার সেন, প্র-সং– ১৩৯০, কলকাতা, পৃ: ২
৯১. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৩৩
৯২. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গীতাঞ্জলি, পৃ: ১৪, ১৫
৯৩. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫২৯
৯৪. ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা-২৩১, র-র, ১১শ খণ্ড, প:ব:স: শিলাইদহ, ১৮৯৫, পৃ: ২৪৩ ।
৯৫. র-র, ১১শ খণ্ড, প:ব:স: পৃ: ২৪৭, ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-২৩৬, কুষ্টিয়া, ৫ অক্টোবর, ১৮৯৫ ।
৯৬. অমেয় প্রেমের মন্ত্র, বুদ্ধের শরণ লইলাম, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা– উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্র-সং– ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ৩০৩ থেকে উদ্ধৃত ।
৯৭. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ধর্ম, পৃ: ৫১১
৯৮. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শারদোৎসব, পৃ: ৩৭৮
৯৯. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মশক্তি, পৃ: ৬৬৮
১০০. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শিক্ষা, পৃ: ৫৭০
১০১. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্র-প্র– ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ২০ ।
১০২. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ: ২২৪
১০৩. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্র-প্র– ১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ৫৪
১০৪. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৩২-৩৩
১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঃ উপনিষদ ও হাফিজ, জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্রনাথ ঃ তুলনামূলক আলোচনা, সম্পাদনা– অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র-প্র– ২০০১, ঢাকা, পৃ: ৮৪ থেকে উদ্ধৃত ।
১০৬. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৪৩
১০৭. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা, পৃ: ২৭৮
১০৮. ঐ, পৃ: ২৬৯-৭০
১০৯. ঐ, পৃ: ২৭৩
১১০. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৬৫
১১১. র-র, পঞ্চম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রাজা, পৃ: ৩১৮
১১২. ঐ
১১৩. ঐ
১১৪. রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, প্র-প্র, বা.এ., ঢাকা-১৯৮৩, পৃ: ৮১ থেকে উদ্ধৃত ।
১১৫. রবীন্দ্রনাথ ও রুমী, অধ্যাপক শাহজাহান আলী, তুলনামূলক সমালোচনা, সম্পাদনা– অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র-প্র– ২০০১, ঢাকা, পৃ: ১৭১ থেকে উদ্ধৃত ।
১১৬. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র, ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ৩৩ ।
১১৭. র-র, পঞ্চদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ব্রহ্মমন্ত্র, পৃ: ১৪৩
১১৮. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র, ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ১৭ থেকে উদ্ধৃত ।
১১৯. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৭৩-৭৪
১২০. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: পৃ: ১৬৪-৬৫
১২১. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দ্বি-সং– ১৩৮১, কলিকাতা, পৃ: ১৫-১৬
১২২. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, অচলায়তন, পৃ: ৩১৪
১২৩. রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ– ১৪০৫, কলকাতা, পৃ: ২৪৭
১২৪. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, অচলায়তন, পৃ: ৩৪৪
১২৫. ঐ
১২৬. ঐ, পৃ: ৩৫০
১২৭. ঐ
১২৮. ঐ, পৃ: ৩৩৬
১২৯. রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৬৯, কলকাতা, পৃ: ৩২৩ ।
১৩০. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশেষ সংস্করণ, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ: ২৯৩

১৩১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, পঞ্চম সংস্করণ– ১৩৮৮, কলকাতা, পৃ: ২২৬

১৩২. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, কলিকাতা, পৃ: ১৮৯-৯০।

১৩৩. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৮২

১৩৪. ঐ

১৩৫. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৯৮-৯১

১৩৬. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, প্র-প্র– ১৯৮০, কলি, পৃ: ২১৭ থেকে উদ্ধৃত।

১৩৭. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ভারতবর্ষ, পৃ: ৭০৭

১৩৮. র -র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ: ৭৮৫

১৩৯. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ধর্মমোহ, পৃ: ২০৭

১৪০. রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা– উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রথম সংস্করণ– ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ২৬৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৪১. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দ্বি-সং– ১৩৮১, কলি, পৃ: ৫৫।

১৪২. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, জীবনস্মৃতি, পৃ: ৪৯৫

১৪৩. র-র, একাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গদ্যছন্দ, পৃ: ৫৭৬

১৪৪. বৈষ্ণব পদাবলী ও গীতিকবিতা, ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনা, সম্পাদনা– মাহবুবুল আলম, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮১, ঢাকা-১, পৃ: ৬৩ থেকে উদ্ধৃত।

১৪৫. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৫৩

১৪৬. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৫৭

১৪৭. ঐ, পৃ: ৩৫৮

১৪৮. ঐ, পৃ: ৩৬০

১৪৯. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ– ১৩৮১, কলি, পৃ: ১০৯

১৫০. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ– ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ২২৪ থেকে উদ্ধৃত।

১৫১. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, গ্রন্থপরিচয়, পৃ: ৭৪৩

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ও রুমী, অধ্যাপক শাহজাহান আলী, রবীন্দ্রনাথ : তুলনামূলক আলোচনা, সম্পাদনা– অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র-প্র– ২০০১, ঢাকা, পৃ: ১৬৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৫৩. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪১১

১৫৪. ঐ, পৃ: ৪৮

১৫৫. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র– ১৯৮৩, কলি, পৃ: ৭৬-৭৭ থেকে উদ্ধৃত।

১৫৬. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ: ৪০১

১৫৭. ঐ, পৃ: ৩৫৬

১৫৮. ঐ. পৃ: ৩৭৯

১৫৯. ঐ, পৃ: ৩৯১

১৬০. রবিচ্ছবি, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, বাংলাদেশ সংস্করণ– ১৯৮২, ঢাকা, পৃ: ১১১

১৬১. ঐ, পৃ: ১১৪-১৫ থেকে উদ্ধৃত

১৬২. ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ, ড. শীতল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঃ তুলনামূলক আলোচনা, সম্পাদনা– অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র-প্র– ২০০১, ঢাকা, পৃ: ১৮৮ থেকে উদ্ধৃত।

১৬৩. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, মহাত্মা গান্ধী, পৃ: ২০৮-৯

১৬৪. র-র, অষ্টম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, রক্তকরবী, পৃ: ৩৯০

১৬৫. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৪৫১

১৬৬. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ-১৯৯৮, কলিকাতা, পৃ: ২৬০ থেকে উদ্ধৃত।

১৬৭. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র– ১৯৮৩, কলি, পৃ: ১৮১

১৬৮. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৪৫০

১৬৯. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৯৯

১৭০. র-র, প্রথম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২১৬-১৭

১৭১. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পত্রপুট, পৃ: ১১৪

১৭২. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পল্লীপ্রকৃতি, পৃ: ৩৫৫

১৭৩. বাঙলা ও বাঙালী, অজয় রায়, প্রথম সংস্করণ– ১৩৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ: ১৪৪।

১৭৪. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৩৮২

১৭৫. রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, ড. ক্ষুদিরাম দাস, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬০, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ও শেষ পরিমার্জন- ১৩৯৫, পৃ: ৩২৬
১৭৬. র-র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, ফাল্গুনী, পৃ: ৪১৩
১৭৭. র-র, চতুর্দশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মপরিচয়, পৃ: ১৬৬
১৭৮. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র- ১৯৮৩, কলিকাতা, পৃ: ১৪৪ থেকে উদ্ধৃত।
১৭৯. ঐ, পৃ: ১৪৫-৪৬ থেকে উদ্ধৃত।
১৮০. র -র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, কণিকা, পৃ: ৬৮
১৮১. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জ্যোতির্ময় ঘোষ, প্র-প্র- ১৯৯০, কলিকাতা, পৃ: ১৭২
১৮২. র-র, তৃতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৯৬
১৮৩. র -র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, আত্মশক্তি, পৃ: ৬২৯
১৮৪. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য, ড. জীবেন্দু রায়, পুনর্মুদ্রণ- ১৯০৬, কলি, পৃ: ৩
১৮৫. রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা, মুহাম্মদ মজির উদ্দিন, প্র-প্র- ১৯৭৮, বা.এ., ঢাকা, পৃ: ১০৭
১৮৬. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৬৬
১৮৭. র -র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭২৯
১৮৮. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৯৫
১৮৯. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, দ্বি-সং- ১৩৮১, পৃ: ২৩।
১৯০. উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-প্র- ১৯৮৩, কলি, পৃ: ২৫
১৯১. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৫৩১
১৯২. র-র, চতুর্থ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, কথা, পৃ: ১৫
১৯৩. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশেষ সংস্করণ, ১৩৮৯, কলকাতা, পৃ: ২৮২-৮৩।
১৯৪. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, তাসের দেশ, পৃ: ২৩৫
১৯৫. ঐ, পৃ: ২৩৬
১৯৬. ঐ, পৃ: ২৩৮
১৯৭. র-র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ২৪৫
১৯৮. ঐ, পৃ: ২৫৩
১৯৯. ঐ, পৃ: ২৪৯
২০০. র-র, দ্বিতীয় খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৭৮৫
২০১. ঐ, পৃ: ৭৫৯
২০২. ঐ, পৃ: ৭৮৩
২০৩. ঐ, পৃ: ২৮৪
২০৪. ঐ, পৃ: ৭৮৪
২০৫. ঐ, পৃ: ৬৩৯
২০৬. র -র, দ্বাদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, কালান্তর, পৃ: ৬২১
২০৭. র-র, দশম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, যাত্রী, পৃ: ৪৫১
২০৮. র-র, ত্রয়োদশ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫০
২০৯. র -র, ষষ্ঠ খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৬৫৮
২১০. রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অমেয় প্রেমের মন্ত্র বুদ্ধের শরণ লইলাম, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৫, কলকাতা, পৃ: ৩০৪ থেকে উদ্ধৃত।
২১১. র-র, সপ্তম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, শান্তিনিকেতন, পৃ: ৬৪৭
২১২. বাঙলা ও বাঙালি, অজয় রায়, প্রথম সংস্করণ- ১৩৭৬ সাল, বাংলা একাডেমী সংস্করণ- ১৩৮৩, ১৯৬৬, ঢাকা, পৃ: ১০৯
২১৩. র-র, নবম খণ্ড, বি-ভা, কলি-১৪০২, পৃ: ৫৬২

সপ্তম অধ্যায়

সামগ্রিক মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি আলোচনায় একটা ব্যাপকভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার অবকাশ নিতান্তই স্বাভাবিক। এমনিতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতলস্পর্শ প্রতিভার অধিকারী। এ প্রতিভা নিয়েও বিশ্বজুড়ে আলোচনা সমালোচনার কোনো শেষ নেই। তাঁর আদিগন্ত আত্ম-অবয়ব জুড়ে মানুষের চিরায়ত প্রবৃত্তিসমূহ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যা সত্য নিত্য কালের অক্ষয়পটে চির ভাস্বর। মানুষ যেমন অপরিসীম– এসব অনুষঙ্গ উপাদানও অনন্ত জিজ্ঞাসায় প্রতিনিয়ত দীপ্যমান হয়ে ওঠে। অথচ কোনো কূল কিনারা নেই। যেমন সৃষ্টির প্রবাহ-পরম্পরা নিরন্তর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে সংকুচিত বোধবুদ্ধির আলোক-প্রক্ষেপণ কেবলই ম্রিয়মাণ হতে বাধ্য। রবীন্দ্র গবেষণায় অনুরূপ একটা চিন্তাচেতনা মনে রাখা খুবই জরুরি। এ অর্থে রবীন্দ্র আলোচনায় সংক্ষেপণ ও বিস্তরণ ভাবনায় বারবার হোঁচট খেতে হয়। কোনো ব্যাপারেই বিষয়-সম্পৃক্ত হয়ে থাকাটা সুকঠিন হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বাঙালি সংস্কৃতির একজন যথার্থ প্রতিনিধি। সংস্কৃতি যেমন একটি জাতির প্রতিবিম্ব-রবীন্দ্রনাথও তেমনি ভারত সংস্কৃতির সুযোগ্য প্রতিফলন হিসেবে গৃহীত। এর ফলেই রবীন্দ্রসাহিত্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি– প্রায় সব ব্যাপারই বিস্তৃতভাবে জায়গা করে নেয়। তাছাড়া এর সাথে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিষয়ক ভাবভাবনা। এ অর্থেই তাঁকে ঋষি কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, এর ফলেই রবীন্দ্রসাহিত্য চিরায়ত মর্যাদা মহিমায় অভিষিক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের তাবৎ চিরায়ত সাহিত্যসমূহ অধ্যয়ন করেন। এবং তা আত্মস্থ করার মাধ্যমে স্বকীয় শিল্পভাবনায় প্রয়োগ করেন। বিশেষত, বিশ্বের যাবতীয় শাস্ত্র-সংহিতা নিবিড়ভাবে রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, কোরান, পুরাণ, বাইবেল, গীতা, সুফি সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব সাহিত্য ইত্যাদি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কবিগণও তাঁর নিয়মিত অধ্যয়নের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, কালিদাস, বানভট্ট, ভর্তৃহরি, হাফিজ, রুমি প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম সৃজনলীলার মূলে আছে প্রকৃতি। তাঁর মননধর্মের ভিত্তি রচনায় নিসর্গ- প্রকৃতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এবং এর মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে একটা অধ্যায় অনুভব অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। ফলে বিশ্ব স্রষ্টার পরম রহস্যসমূহ একে একে ভাষা খুঁজে পায়। এ অর্থে প্রকৃতিপ্রাণতা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কোনো অস্তিত্ব নেই। একেবারে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে অন্য এক রবীন্দ্রনাথ। এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি সৃজনমুখর চিত্তচাঞ্চল্য অর্জন করে থাকেন। তবে শেষপর্যন্ত তাঁর এই আত্ম- উপলব্ধি কোনোরকম অতিন্দ্রীয় তুরীয়লোকে স্থিতিলাভ করে নি। যা প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতাকে কেন্দ্র করেই স্ফূর্তি লাভ করেছে। মাটি ও মানুষের নির্মম বাস্তবতাই রবীন্দ্রসৃষ্টিব ভিত্তি- বৈভব রচনা করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি বিশ্বের মধ্য দিয়ে এক পরম স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে পান। এ সূত্রে তাঁর সব সৃজনপ্রয়াস অনুরূপ ভাবানুষঙ্গ দ্বারা পরিস্নাত হওয়ার সুযোগ পায়। সীমা- অসীম, খণ্ড-অখণ্ড বিশ্বসৃষ্টির সাথে ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক সমন্বয় সহযোগ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব সৃষ্টিশিল্পের মধ্যে এই অন্বয়-অন্বেষা নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর এ সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের মনে একটা আইডিয়া বা আদর্শ জাগ্রত হয়। এর ফলে নিজের মধ্য থেকেই একটা দ্বিতীয় সত্তা অঙ্কুরিত হতে থাকে। এই সত্তার সাথেই কবির জন্ম- জন্মান্তরের সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে। যাকে তিনি সর্বব্যাপী সত্তারূপে বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন। একেই তিনি জীবনদেবতা বলে উল্লেখ করেন। এই জীবনদেবতাই কবির যাবতীয় সৃষ্টিধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই জীবনদেবতাও রবীন্দ্রনাথের কাছে বহুবিধ রঙ-রূপে ধরা পড়ে। ক্ষেত্রভেদে এই জীবনদেবতা 'চিত্রা', 'অন্তর্যামী', 'উর্বশী', 'বিজয়িনী', 'মানসসুন্দরী', 'মানসী', মানমপ্রতিমা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়েছে। এই বহুবিচিত্র নাম ও ভাবের মধ্য দিয়ে এক পরম সত্তারূপী একক শক্তির লীলাই ফুটে ওঠেছে। যা রবীন্দ্র সৃষ্টির অন্তর্গত প্রকৃতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একেবারে জীবনের অন্তিম পর্যায়ে রচিত সৃষ্টিসমূহেও তা অনুভূত হতে দেখা যায়। বিশেষত, রবীন্দ্রকাব্যের অজস্র জায়গা জুড়ে এই জীবনদেবতার অস্তিত্ব লক্ষণীয়। এছাড়া অন্যান্য রচনাসৃষ্টির মধ্যেও তা

দুর্লক্ষ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির কথাও উল্লেখ করা যায়। তাঁর সব নাটকেই একটা কাব্যিক আবহ লক্ষণীয়। এবং এরই অন্তর্গত ভাবভাবনায় একটা প্রচ্ছন্ন শক্তির ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। যা তার জীবনদেবতারূপী দ্বৈত সত্তার বহিঃপ্রকাশ বলে প্রতীয়মান হয়। যেমন, বাল্মীকিপ্রতিভা নাটকে কাব্যলক্ষ্মীর বরপ্রদানে এই অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজা নাটকের পুরো অবয়ব জুড়ে এই অদৃশ্য বাজার উপস্থিতি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যা নাটকে মুখ্য চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শারদোৎসব নাটকে শরৎকালীন ঋতু উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। অথচ এর মধ্যেও শারদীয় দেবীর উপস্থিতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ডাকঘর নাটকে প্রকৃতিবিশ্বের মধ্য দিয়ে এক প্রচ্ছন্ন মহাশক্তির প্রভাব পুরো নাটকে উপস্থাপন করা হয়।

এক অদৃশ্য রাজার ডাকঘর বসানোকে কেন্দ্র করেই নাটকীয়তা দানা বেঁধে ওঠে। রথের রাশি নাটকে শ্রেণিবিভেদ তত্ত্বের প্রয়োজনে মহাকালবিধাতার আগমন ঘটে। এভাবে লক্ষ করলে প্রায় প্রতিটি নাটকের মধ্যেই একটা অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিত লক্ষণীয়। যা রবীন্দ্রসৃষ্টিতে একটা দ্বৈত শক্তির বার্তা বহন করে চলে। এটাই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রূপে- রঙে- রসে- নামে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এসব ব্যাপারগুলো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পারিবারিকভাবেও সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। ফলে আশৈশব ধ্যান-ধারণায় অনুরূপ অনুষঙ্গ উপাদান যেন তাঁর ভিত্তি বৈভবে পরিণত হয়। যা রবীন্দ্রনাথের লেখায় মূলীভূত ভাবনায় অন্বিষ্ট হওয়ার সুযোগ পায়। এ সুবাদে তিনি বিশ্বকবি এবং বিশ্বের সত্য, নান্দনিক ও নিত্য মানবাত্মার সতত সহচর। বলা যায়, এখানেই মূলত রবীন্দ্রপ্রতিভার শেকড়সঞ্চারী প্রাণবায়ু নিহিত। এসব শাস্ত্রসূত্রও রবীন্দ্রসৃজনের পথ বেয়ে মানুষের মৌলিক জিজ্ঞাসাসমূহ বারবার ভাষা খুঁজে পায়। এবং তা নিরন্তর ভাবনায় চিরায়ত বোধবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে। চিরদিনের মানুষ বরাবরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায় ভাস্বর। এবং এর সাথে সাজুয্য রক্ষা করেই পৃথিবীর শাস্ত্রসূত্র আবির্ভূত অথবা রচিত। রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো করেই এর মর্মমূল আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অনেকটা ধ্যানীর ধ্যান ও সাধনার সাধক পুরুষরূপে সারাজীবন তা লালন করে যান। এতে তাঁর ব্যক্তি ও সৃষ্টিরূপ যেন অনেকটা একাকাররূপে ধরা দেয়। এ পর্যায়ে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা অনেকটাই বহিরঙ্গের খোলস মাত্র। অন্যসব চিন্তাচেতনার ভিড়ে একটি মাত্র। কবি ও কাব্যিকতাসূত্রে যতটুক এসেছে- ততটুকুই। রবীন্দ্রনাথের সব সাধনার মূলে কাব্যসাধনাই প্রধান। একথা তিনি নিজেই বহুবার উচ্চারণ করেছেন। আর এই সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন মানুষ, মানুষ এবং মানুষ। মানবতার প্রশ্নেই তাঁর এই সৃজনসাধনা অব্যাহত ছিল। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সমালোচনা- প্রায় সব রচনা সুবাদেই এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। যেখানেই মানবতা লুণ্ঠিত- সেখানেই তিনি দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। এবং অলোকসামান্য প্রতিভার কিরণসম্পাতে প্রতিবাদের ভাষায় তা তুলে ধরেন। এর মধ্যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল-মত বা সাম্প্রদায়িকতা নেই। শুধুমাত্র মানুষের অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন থেকেই অনুরূপ প্রয়াস-প্রবৃত্তি নিবেদিত। এ অর্থে রাজনীতি কেন? যে-কোনো বিষয় নিয়েও তিনি কথা বলতে পিছপা হন নি। রবীন্দ্রনাথকে বরং এভাবেই বিচার করলে তাঁর ব্যক্তি ও সৃষ্টিসত্তার সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। আলোচ্য অভিসন্দর্ভ 'রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি' আলোচনায় অনুরূপ চিন্তাচেতনা প্রয়োগ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাটকের পুরো অবয়ব জুড়ে একটা কাব্যিক অলংকার ও প্রতীকাশ্রয়ী আবহ বিদ্যমান। রূপকের আড়ালে এক ব্যতিক্রমধর্মী নাট্য ভাবনা এখানে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রচলিত বস্তুগত নাট্যসংঘটন রবীন্দ্রচিন্তায় অনুপস্থিত। ফলে প্রত্যক্ষ রাজনীতির নির্মেদ বাস্তবতা রবীন্দ্রনাটকে প্রায় নেই বললেই চলে। যতুটুকু আছে- তাও আবার কাব্যকথার ছদ্মাবরণে প্রতীকী চরিত্রের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। তবে এর মধ্যেও একটা আলাদা মাত্রা-মহিমা প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যা রবীন্দ্রপ্রতিভার সবিশেষ স্মারক-স্বত্ব চিহ্নিত করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ এমনিতেই সারাজীবন রাজনীতির ডামাডোল থেকে দূরে ছিলেন। তবে প্রবলভাবে রাজনীতি- সচেতন ছিলেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনের ঘটনাবলি তাঁকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করত। যা তাঁর নানাধর্মী সাহিত্যসৃষ্টি, সভা-সমিতি, সেমিনার- সিম্পোজিয়াম, বক্তৃতা- বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে অবগত হওয়া সম্ভব। জীবনের শুরু থেকে একেবারে শেষপর্যন্ত তাঁর এই রাজনীতি- সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যায়ে তিনি অজস্র প্রবন্ধ, কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন। এসব সৃষ্টিকর্মে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা নিবিড়ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম বেলায় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। এবং এ সুবাদে তিনি অনেকগুলো সংগীত ও প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং এগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা সমাবেশে পাঠ করা হয়। যেমন, এ সময় তিনি

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', অয়ি ভুবনমোহিনী, জনগণ মন-অধিনায়ক জয় হে প্রভৃতি সংগীত রচনা করেন । এবং রাজনৈতিক উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষে তা বিভিন্ন সভায় পরিবেশিত হতে থাকে । তাছাড়া এরই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর প্রবন্ধ- নিবন্ধ রচনা ও পাঠ করেন । যেমনঃ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'কণ্ঠরোধ', 'শিবাজী- উৎসব', 'স্বদেশী সমাজ', 'আত্মশক্তি', 'স্বদেশ', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'পথ ও পাথেয়', 'রাজাপ্রজা', 'সমাজ', 'শিক্ষা', প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায় ।

এছাড়া বিশেষ কিছু উপন্যাস, কবিতা, গান ও নাটকের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা আবিষ্কার কথা সম্ভব । পাশাপাশি দেশ- বিদেশ ভ্রমণ করার মাধ্যমে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন । রবীন্দ্রনাথ সমাজসেবা-সুবাদে মানবিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আত্মনিয়োগ করেন । তাঁর রাজনৈতিক প্রয়াস- প্রবৃত্তির মূলেও অনুরূপ ভাবপ্রবণতা সক্রিয় ছিল । রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে চীন, পরে জাপান ও ১৯২৬ সালে ইতালি সফর করেন । এবং ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণে বের হয়ে যান । এসব দেশ ভ্রমণ করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বকীয় মতাদর্শ তুলে ধরেন । তবে তিনি বরাবরই শোষক চরিত্রের নগ্ন স্বরূপ- প্রকৃতিকে প্রচণ্ড ভাষাভঙ্গিমায় ধিক্কার জানিয়েছেন । এবং তা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ।

রবীন্দ্রনাটকে রাজনৈতিক আলোচনার পরিধি অনেকটাই সীমিত । কয়েকটি নাটক ব্যতীত বেশিরভাগ নাটকেই তা কাব্যকথার ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত । তাত্ত্বিকতার মোড়কে অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ স্বভাবগত- সুবাদে কবিপ্রতিভার অধিকারী । তিনি বরাবরই নির্জনতাপ্রিয় । আত্মগত উপলব্ধির ধ্যানস্থ মননপ্রবৃত্তির সাধনায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন । এবং এরই প্রতিফলন হিসেবে তাঁর অজস্র সৃষ্টিকর্ম অভিব্যক্তি লাভ করে । অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা এমনিতেই একটু কোলাহলময়, ষড়যন্ত্র, দলাদলি, কূটকৌশল ও জটিল পরিবেশ- পরিস্থিতির মধ্যে সংঘটিত হয় । যা রবীন্দ্রস্বভাবের একেবারেই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত। রাজনীতির অনুরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি বহুবার নিক্ষিপ্ত হয়েছেন । এবং বরাবরের মতোই হাঁপিয়ে ওঠেছেন । ফলে আত্মগত মুক্তির লক্ষে রবীন্দ্রনাথ নির্জনতম নিসর্গ প্রকৃতির সান্নিধ্যে চলে যেতেন । এর ফলেই রবীন্দ্রচিত্তের স্বাভাবিক ভারসাম্য ফিরে আসত । এ এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি- যা সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই অবলম্বন করেছেন । এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল ভাবপ্রবণতা ফিরে পেতেন । যা রবীন্দ্রনাথ বহুবার নিজেই অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন । প্রকৃতির সান্নিধ্যে আত্মসমাহিত অনুশীলন ছাড়া তিনি প্রাণধারন করতে পারতেন না । পর্যায়ক্রমে এরই যথাযথ ক্ষেত্র হিসেবে তিনি শিলাইদহ কুঠি বাড়ি, শাহজাদপুর কাছারি বাড়ি, কালিগ্রাম কৃষি পল্লী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শ্রীনিকেতন কৃষি কার্যক্রম গড়ে তোলেন । মূলত কোলাহলমুক্ত নিসর্গ প্রকৃতির ধ্যানে অন্বিষ্ট হওয়ার জন্যই এসব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল । এসবের মধ্যে দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ কোলাহলময় রাজনীতির অনুপ্রবেশ অনেকটাই সীমিত । শুধুমাত্র কতিপয় প্রবন্ধ ভিন্ন অন্যসব রচনায় রাজনীতি- প্রসঙ্গ ভিন্নভাবে বিচার্য । সেখানে রাজনীতি এসেছে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবসুলভ নান্দনিক ভাষায় । আত্মগত উপলব্ধির মননশীল ভাষাভঙ্গিমায় তা রূপাভিব্যক্তি লাভ করেছে । রূপক- সাংকেতিক ও অলংকারের প্রচ্ছায়া- প্রহেলিকা আশ্রয় করে । এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই অনুরূপ ভাবানুসারী তন্ময়তায় রচিত হয়েছে। এর মধ্যে রবীন্দ্ররচিত রাজা ও রানী, 'শারদোৎসব, চিত্রাঙ্গদা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। এসব নাটকে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ- প্রকরণ অনেক পরিমাণে সরাসরিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ।

রাজা ও রানী নাটকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী- আক্রমণের চিত্র পরিলক্ষিত হয় । যা ভারতে বিদেশি-বিভাষা– জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ, অনুপ্রবেশ, অত্যাচার- শোষণ ও নিপীড়নের দৃশ্যচিত্র মনে করিয়ে দেয় । বিশেষত ইংরেজ জাতির শাসন শোষণের প্রতিচিত্র নাটকীয় বর্ণনাভঙ্গিমায় এখানে বর্ণিত হয়েছে। জালন্ধররাজ বিক্রমদেবের রাজত্ব, বিদেশি কাশ্মীরী কর্মচারীদের অত্যাচার ও প্রজানির্যাতনের মধ্য দিয়ে তা দৃশ্যরূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্মের পূর্বেই এদেশ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির দখলে চলে যায় । বেনিয়া ইংরেজ শাসকের সীমাহীন শোষণ- পীড়ন মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয় । এতে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, দৈন্যদশা, মৃত্যুযন্ত্রণা, হত্যা, গুম, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ড ভারতীয় জীবনে নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় । এ অবস্থায় স্বাধিকারপ্রমত্ত ভারতীয় জনগণ মুক্তির লক্ষে আন্দোলন- সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে । 'রাজা ও রানী' নাটকে জালন্ধর রাজ্যের বিপর্যয়ে রানী সুমিত্রা যুদ্ধাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন । পরবর্তিতে রাজা বিক্রমদেবও রাজ্যরক্ষার্থে যুদ্ধের জন্য ছুটে যান । এসব নাটকীয় দৃশ্যপরম্পরার মাধ্যমে উনবিংশ শতকের ভারতীয় রাজনীতি- চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে । 'চিত্রাঙ্গদা নাটকটি 'পৌরাণিক আবহ- অনুষঙ্গ দ্বারা নির্মিত । মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এর প্লাটসংঘটন গড়ে তোলা হয়েছে । পুরো নাটক জুড়েই একটা দূরান্বয়ী ভাবসমবায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে । ফলে কাব্যিক অলংকারের প্রতিকাশ্রয়ী অনুষঙ্গ- উপাদান এর ভাঁজে ভাঁজে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । এর মধ্যেও 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্র

চিত্রণের মধ্য দিয়ে উনিশশতকীয় নারী জাগরণের চিত্ররূপ আবিষ্কার করা সম্ভব। সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা ও নারীর সর্বময় আত্মবিকাশের ব্যাপারটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রের আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্বপরায়ণতা, স্বাতন্ত্র্য চেতনা ও সর্বময় বিকাশ সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। শারদোৎসব নাটকটি মূলত ঋতুউৎসব–কেন্দ্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনো প্রভাব এর মধ্যে নেই। তবে শিক্ষাবিষয়ক ভাবভাবনার আলোকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির পরোক্ষ- প্রচ্ছায়ার প্রতিফলন লক্ষণীয়। নাটকে দেখা যায়, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বালক শিক্ষার্থীদের বিচরণ ও পুঁথিপোড়ানো উৎসব বেশ গুরুত্বের সাথে চিত্রিত হয়েছে। যা সমকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষা- ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য পুঁথিসর্বস্ব বিদ্যার ব্যবস্থাটি পাকাপোক্ত করেছিল। এবং নানাভাবে শিক্ষা সংকোচন নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।

সেখানে অবাধ পরিবেশে বাস্তবসম্মত বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন মারাত্মকভাবে পরিহার করা হয়। যা সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে নানারকম আলোচনা সমালোচনার ঝড় তোলে। শারদোৎসব নাটকে পরোক্ষভাবে হলেও এই শিক্ষাবিষয়ক রাজনীতির প্রভাব- প্রচ্ছায়া খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অচলায়তন নাটকের ক্ষেত্রভূমি হিসেবে প্রাচীনতম- স্থবিরক ভারতবর্ষকে বেছে নেয়া হয়েছে। যা আচারসর্বস্ব নিয়ামানুবর্তিতায় সমাচ্ছন্ন। এতে বিন্দু- বিসর্গ পরিমাণ এদিক- সেদিক হবার উপায় নেই। এই অনড়নিষ্ঠ আয়তনিকের মধ্যে যুগে যুগে নানারকম বিদেশি- বিভাষী জাতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটে। এসব সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ- গোষ্ঠি রাজনৈতিক স্বার্থ- প্রবুদ্ধ চেতনার মধ্য দিয়ে আগমন করতে থাকে। শাসন- শোষণ, কর-আদায়, লুটপাট, প্রশাসনিক সংস্কার- সর্বোপরি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই তা অব্যাহত থাকে। অচলায়তন নাটকে আয়তনিকের মধ্যে দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে কর্মপাগল শোণপাংশুদের প্রবেশ করতে দেখা যায়। এরাই মূলত চঞ্চলমুখর ইউরোপীয় জাতির প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। তারাই উনবিংশ শতকে স্থবিরক ভারতীয় সমাজজীবনে একটা বৈপ্লবিক চেতনা বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ভারতীয়দের রাজনৈতিক জীবনধারার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নান্দনিক বোধবুদ্ধি, কাব্যিক প্রতীক- প্রতীতি ও অলঙ্কারের অভিব্যঞ্জনায় অচলায়তন নাটকে তা দৃশ্যায়িত করেছেন। সমগ্র রবীন্দ্রনাট্যধারায় মুক্তধারা অধিকতরভাবে রাজনীতি-সচেতনতা দ্বারা রচিত। এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপনিবেশবাদ, শাসন-শোষণ, কর-আদায়, কর-বন্ধ আন্দোলন, স্বাধিকারচেতনা, দুর্ভিক্ষ- ইত্যাকার বিষয়সমূহ অবলম্বন করা হয়। যাতে উনবিংশ- বিংশ শতকের ভারতীয় রাজনীতির একটা উজ্জ্বল চিত্ররূপ ফুটে ওঠেছে। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো নাটকে এতটা হুবহু রাজনৈতিক দৃশ্যচিত্র অবলোকন করা সম্ভব নয়। তাত্ত্বিকতার গূঢ় রহস্যকথায় আচ্ছন্ন হলেও রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম রাজনীতি- সচেতন নাটক। এই নাটক রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে ইউরোপ- আমেরিকা ভ্রমণ করেন। সেখানকার পুঁজিবাদ, উৎকট সংগ্রহনীতি, ব্যক্তিক চরিতার্থতা, নগরায়ন, যান্ত্রিকতা, অমানবিক শিল্পপ্রসার– ইত্যাকার বিষয়াবলি রক্তকরবী নাটকের প্রাণপ্রতীতি নির্মাণ করেছে। এই নাটকে যক্ষপুরীর মকররাজকে কেন্দ্র করে অনুরূপ রাজ্য ব্যবস্থার কথা ফুটিয়ে তোলা হয়।

রবীন্দ্র নাটকে সংস্কৃতি আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। এবং তা অপরিসীম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাবি করে। এক অর্থে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সৃষ্টিশীল রচনাই সংস্কৃতির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সবক'টি প্রান্ত ছুঁয়ে এর সাফল্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একজন এদেশীয় সংস্কৃতির যথার্থ উত্তরসাধক। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের মতো এতবড় সংস্কৃতিসাধক খুঁজে পাওয়া কঠিন। যা তাঁর নাটকগুলোর পরতে পরতে নিবিড়ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। একেবারে প্রথম নাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' থেকে শুরু করে সর্বশেষ নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে ভারতীয় জীবনের একটা সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দেশীয় জীবনসংস্কৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনাবিভা প্রতিটি নাটকের ভিত্তিবৈভব গড়ে তোলে।

প্রথম নাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় ভারতীয় সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্যধারা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাবত্বশক্তির উদ্বোধনে অলৌকিক অনুপ্রাণনার বিষয়টি সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। ভারতের আদি কবি বাল্মীকি ও তাঁর রচিত রামায়ণ নিয়ে অনুরূপ গল্পকথা প্রবহমান আছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের মাটিতে দাঁড়িয়ে শত-সহস্র বছরের লালিত এই প্রাচীন সংস্কৃতিরই দ্বারস্থ হন। এবং তা যেন অনেকটা আত্মগত অনুরাগের সৃষ্টিসুখে অভিষিক্ত করে তোলেন। এই প্রাচীন ও নবীন ভাবনার সমন্বয় সাধনায় রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভিত্তি রচিত। কবিত্বশক্তির উদ্বোধনে ছন্দ ও সুরের সাধনা বাঙালি সংস্কৃতির রূপরেখা হিসেবে গৃহীত। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকে অনুরূপ একটি বিষয়কেই প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি আগাগোড়াই রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক পরীক্ষা ক্ষেত্র। এর মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেমবিষয়ক তত্ত্বকথা

অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। প্রেমের ক্ষেত্রে বিরহের অনিবার্য অধ্যায়– ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশবিশেষ। এছাড়া, দুঃখপ্রাণ বাঙালি হৃদয় চিরদিন আপন আপন কথায় মুখরিত। বিরহের দুঃখগাথা নিত্য ব্যবহার্য গৃহসামগ্রীর মতোই আপন। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে এরকম একটি বিষয়কে মনে রেখেই নাটকীয় পরিণতি নির্দেশিত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী চরিত্রের মাধ্যমে একটি গূঢ়তত্ত্ব রূপায়িত করেন। প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার পরিসীমা ও অনন্ত অসীমের ধ্যান-সাধনা কখনো বিচ্ছিন্ন নয়। বরং সমস্বয় সমবায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সীমা অসীমের মেলবন্ধন। এই বিষয়টি মোটেই নতুন কিছু নয়। বরং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন উৎস বেদ-উপনিষদের পথ বেয়ে এর সগৌরব ধারাপ্রকৃতি অব্যাহত রয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে সন্ন্যাসী চরিত্রের মাধ্যমে অনুরূপ একটি বক্তব্য অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা কাহিনী গ্রহণ করেছেন। ঐতিহ্যিক এই কাহিনী পরম্পরায় তাঁর স্বকীয় ভাবকল্পনা যুক্ত হয়েছে। চরিত্রগত বিন্যাস বিস্তৃতির বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। এদেশীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হন। 'মালিনী' নাটকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সুমহান রূপপ্রকৃতি তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য। নাটকীয় প্লটসংঘটন ছেড়ে এদিকেই যেন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অধিকতর। ভারতের মাটিতে উদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির প্রাণবান ধারার উপস্থাপনই ছিল 'মালিনী' নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব' নাটকে মূলত শরৎ ঋতু-প্রকৃতির অভিবন্দনায় মুখর হয়ে পড়েন। মানুষের জীবনে বিভিন্ন ঋতুপ্রবাহ অনিবার্য ধারায় নিপতিত। এ অর্থে বলা যায় তা সংস্কৃতিরই অংশবিশেষ। রবীন্দ্রনাথ এরকম একটি ধারণার বশবর্তী হয়ে ঋতু নাট্যসমূহ রচনা করেন। এর মধ্যে শারদোৎসব সবিশেষ সংযোজন হিসেবে স্বীকৃত। 'রাজা' নাটকে স্রষ্টা সৃষ্টির রূপকে একটা অধ্যাত্ম অনুষঙ্গ সংযোজিত হয়েছে। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে তা প্রাণপ্রবাহের মতোই অব্যাহত আছে। সেই বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি এরই ধারাপ্রকৃতি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ রূপক সংকেতের আশ্রয়ে 'রাজা' নাটকে তা-ই প্রতিপন্ন করেছেন। 'অচলায়তন' নাটকে বাঙালি জাতির অন্তর্গত রূপপ্রকৃতি উন্মোচন করা হয়। এছাড়া ধর্মসংস্কৃতির স্বরূপবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত নাটকীয় কাহিনী চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। এর সাথে আধুনিক মনন-মনস্বিতাও যুক্ত হতে দেখা যায়। ফলে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিভাবনা আরো বেশি সুসংহত হওয়ার সুযোগ পায়। 'ডাকঘর' নাটকটি নিতান্তই স্বল্পাবয়ব পরিধি পরিসরের মধ্যে রচিত। এর মধ্যে পল্লীবাংলার প্রাত্যহিক জীবনযাপন একটা অন্তর্গত অধ্যাত্ম আবহের প্রচ্ছায়ায় বর্ণিত। নিসর্গ প্রকৃতির আলোকে মানবচিত্তের অভিন্ন বন্ধন-বিরহ অমল চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। 'মুক্তধারা' নাটকটি প্রত্যক্ষ বাস্তবতার বস্তুগত সান্নিধ্য-সহযোগ দ্বারা নির্মিত। বিশেষত সমকালীন ভারত সমাজের রাজনৈতিক বাতাবরণ এর প্রাণপ্রবাহ তৈরি করে দেয়। এছাড়া মুক্তধারার জলপ্রবাহকেন্দ্রিক নাটকীয় সংঘাত ও পরিণতিতে ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। 'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় সংস্কৃতির পৌরাণিক আবহ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। এছাড়া পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যিক আগ্রাসনই নাটকের বহিরঙ্গ ভাবনায় ক্রিয়াশীল রয়েছে। তবে নন্দিনী চরিত্রের সর্বানুগ প্রতিপত্তির ব্যাপারে ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি অনুপ্রেরণা হিসেবে ভূমিকা রাখে। এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি' নাটকে ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির রথযাত্রা উৎসবকেন্দ্রিক নাট্যচিত্র তুলে ধরেছেন। এতে গ্রামবাংলা ও এদেশীয় সমাজে প্রচলিত শ্রেণিচরিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়। 'তাসের দেশ' নাটকে এদেশীয় সমাজের অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধান ও স্বরূপ প্রকৃতি উন্মোচিত হতে দেখা যায়।

এছাড়া রবীন্দ্র রচিত সামাজিক, ঋতুবিষয়ক ও নৃত্যনাট্যগুলোও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব নাটকে তাঁর বহুবিচিত্র সমাজসংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়। ঋতুনাট্যগুলোর মধ্যে তিনি বিশেষ এক জীবনদর্শন তুলে ধরেছেন। নিসর্গ প্রকৃতিকে মানবমনে অন্বিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এতে রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতীয় সংস্কৃতিধারাই বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। কারণ, এদেশীয় সংস্কৃতিকে প্রকৃতিই প্রাচীনতম কাল থেকে লালন করে আসছে। অনার্য থেকে আর্য জাতি গোষ্ঠির পথ বেয়ে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ কিছু প্রহসন রচনার মধ্যেও সমাজের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত কিছু চিত্র তুলে ধরেন। হালকা চালে চটুল উপস্থাপনায় এসব বিষয়দৃশ্য বেশ মনোগ্রাহী হয়ে দেখা দেয়। এর মধ্যেও দেশীয় সংস্কৃতির উপস্থাপনা মোটেই দুর্লক্ষ্য নয়।

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাটকে রাজনীতি ও সংস্কৃতি গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত, সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে এ কথাটি অধিকতর হারে প্রযোজ্য। আর রাজনীতিতো এরই একটা অংশবিশেষ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতি হলো একটি জাতি বা গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বরং তা প্রতিনিয়ত বিশ্ব পৃথিবীর সাথে সাজুয্য রক্ষা করে বিবর্তিত হতে থাকে। এবং নব-নব রূপ-মাধুর্যের মধ্য দিয়ে ধরা দেয়। এ অর্থে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা সংস্কৃতি-সার্বভৌম ব্যক্তিরূপে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি– এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

বর্ণানুক্রমিক সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. অমেয় প্রেমের মন্ত্র, বুদ্ধের শরণ- লইলাম, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্র- সং- ১৩৯৫ কলকাতা পৃঃ ৩০৩।

২. আরোগ্য, প্রবাসী, মাস, ১৩৪৭, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র- প্র, ১৯৮৩ কলিকাতা।

৩. উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৩৮১, কলি-

৪. ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ, শীতল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথঃ তুলনামূলক আলোচনা, সম্পাদনা- অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র- প্র- ২০০১, ঢাকা

৫. কাব্য পরিক্রমা, অজিতকুমার চক্রবর্তী বি- ভা, কলিকাতা- ১৩৭৪

৬. ছিন্নপত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ- ১৪১১, কলকাতা।

৭. দামোদর চাপেকারে আত্মজীবনী থেকে সিডিশন কমিট (১৯১৮) প্রতিবেদনে উদ্ধৃত নিউ এজ সংস্করণ।

৮. নাট্যকলার ক্রমবিকাশ, ইসমাইল হোসেন, বা- এ, ঢাকা- ১৯৮৭।

৯. ভারতীয়, বৈশাখ, শ্রাবণ- ১২৪৮, কলকাতা।- সম্পাদক

১০. মাইকেল রচনাসম্ভার, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ১৩৬৮, কলকাতা।

১১. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী, ১৯৮৯, কলকাতা।

১২. রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম - ১৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা- ১৪০২।

১৩. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য -প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড বিশ্বভারতী- ১৯৭০, কলিকাতা।

৩০. রবীন্দ্র- সংস্কৃতি, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্র-প্র; ১৩৯৪, কলিকাতা।

৩১. রবীন্দ্রনাথের গল্প, ড. সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মুক্তধারা, চতুর্থ প্রকাশ-১৯৯০, ঢাকা।

৩২. রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অরবিন্দ পোদ্দার, প্র- প্র, ১৯৮২, কলিকাতা।

৩৩. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য- প্রবেশক, শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী- ১৪১১, কলকাতা।

৩৪. রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য- প্রবেশক, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ -১৪০৬, কলকাতা।

৩৫. রবীন্দ্র- সাগর সংগমে, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৬৯, কলকাতা।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির আলোকে, মোবাশ্বের আলী, প্র- প্র, ২০০০, ঢাকা।

৩৭. রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, পম্পা মজুমদার, প্রথম দেঁজ সংস্করন, ২০০৭, কলকাতা।

৩৮. রবীন্দ্রনাট্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, ড, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, প্র-প্র, ২০০২ কলকাতা।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক নাট্য, শেখর সমাদ্দার, প্র- প্র, ১৯৯৮. কলকাতা

৪০. রবীন্দ্রনাট্য পবিক্রমা, প্রথম খণ্ড, অশোক সেন, কলকাতা।

৪১. রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, দ্বিতীয় প্রকাশ- ১৯৮৪, কলকাতা।

৪২. রবীন্দ্র- নাট্য ধারা, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ- ১৩৭৩, কলকাতা।

৪৩. রবীন্দ্র- এন্ড্রুজ পত্রাবলী, মলিনা রায় অনূদিত, বি- ভা, কলি- ১৯৬৭।

৪৪. রবীন্দ্র- নাট্য পরিক্রমা, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চম সংস্করণ- ১৪০৫ কলিকাতা।

৪৫. রবীন্দ্র বিচিত্রা, বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত , পুনর্মুদ্রণ- ১৩৮৪, কলিকাতা।

৪৬. রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, জোতির্ময় ঘোষ, প্র- প্র- ১৯৯৯৮, কলিকাতা।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ১৩৭১।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঃ তুলনামূলক আলোচনা, সম্পাদনা- অধ্যাপক নীলকমল বিশ্বাস, প্র- প্র- ২০০১, ঢাকা।

৪৯. রবীন্দ্র- ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা, মুহম্মদ মজির উদ্দিন প্র- প্র- ১৯৭৮।

৫০. রাতের তারা দিনের রবি, সম্পাদনা- উজ্জ্বলকুমার মজুমদার প্র-সং- ১৩৯৫, কলকাতা।

৫১. রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিশেষ সংস্করণ ১৩৮৯, কলকাতা।

৫২. রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রমথনাথ বিশী, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা- ১৩৭৮ ।
৫৩. রবীন্দ্রনাথের রূপক- সাংকেতিক নাটক, মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, বা- এ ১৯৮৩ ।
৫৪. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রমথনাথ বিশী, পূর্ণাঙ্গ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ ।
৫৫. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা,- ১৩৫১ ।
৫৬. রবীন্দ্র প্রবন্ধ রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, হুমায়ুন আজাদ- ১৯৭৩, ঢাকা ।
৫৭. রবীন্দ্রনাথঃ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, নেপাল মজুমদার, প্রথম প্রকাশ,- ২০০০, কলিকাতা ।
৫৮. রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি, সম্পাদক- এমাজউদ্দিন আহমদ, হারুন- অর- রশিদ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ- ২০০৭, ঢাকা ।
৫৯. রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু, সুকুমার সেন, প্র-সং- ১৩৯০, কলকাতা ।
৬০. রবিচ্ছবি, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, বাংলাদেশ সংস্করণ- ১৯৮২, ঢাকা ।
৬১. রবীন্দ্র- প্রতিভার পরিচয়, ড. ক্ষুদিরাম দাস, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৯৫, কলকাতা ।
৬২. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ড. জীবেন্দু রায়, ১৯৮৬, কলকাতা ।
৬৩. সংস্কৃতি নির্মাণ সংঘর্ষ । প্রবীর ঘোষ, কলকাতা, উনিশ শো বিরানব্বই ।
৬৪. সংস্কৃতির রূপান্তর, গোপাল হালদার, চতুর্থ সংস্করণ- ২০০৮, ঢাকা ।
৬৫. স্বদেশ অন্বেষা, আহমদ শরীফ, ব্রাদার্স এন্ড কোং- ১৩৭৭ ঢাকা ।
৬৬. সংস্কৃতি কথা, মোহাহের হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্র- প্র, ১৯৯৯, ঢাকা ।
৬৮. সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস, ড. দুলাল ভৌমিক, বা-এ, ১৯৯৪, ঢাকা ।
৬৯. হারানো দিনের নাটক, সম্পাদনা- পিনাকেশ সরকার ।
প্র- প্র, ১৯৯৯, কলকাতা ।